দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্র্যাজেডি

সাহাদত হোসেন খান

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ভাসাভাসা। এজন্য আমরা বিভ্রান্তিতে ভুগি। যার যার মতো করে ব্যাখ্যা দেই। কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়। আজ পর্যন্ত মানব ইতিহাসে যত ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থান সর্বাগ্রে। এত রক্তক্ষয় এবং এত ট্র্যাজেডি ভবিষ্যতে আর কখনো ঘটবে কিনা সন্দেহ। এ যুদ্ধ নিয়ে কম লেখালেখি হয়নি। তবে অধিকাংশ বই-ই মিত্রপক্ষের লেখা। এসব বই একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট। অক্ষশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরেকটি পক্ষ। পরাজিত হওয়ায় তাদের পক্ষে কেউ কলম ধরে না। তাদের কথা কেউ শুনতেও চায় না। মিত্রপক্ষ যা বলছে সবাই তাই বিশ্বাস করছে। কিন্তু ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে তা সঠিক হতে পারে না। যুদ্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং যুদ্ধের বিবরণ প্রদানে উভয়পক্ষের বক্তব্যকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্র্যাজেডিতে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : আককাস খান

www.pathagar.com

সাহাদত হোসেন খান ১৯৫৬ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার কাটাবাড়িয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুর রাজ্জাক খান ১৯৮০ সালে এবং মা শাহেদা খানম ১৯৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

১৯৭২ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন এবং ১৯৭৬ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ডিগ্রি লাভ করেন। সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেন ১৯৮৭ সালে। দৈনিক খবরে তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। পরে দৈনিক আল-আমিন, দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক ইনকিলাবে সাংবাদিকতা শেষে যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলা একাডেমির সদস্য। এছাড়া তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নে (ডিইউজে) চার মেয়াদে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি

সাহাদত হোসেন খান

আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

স্বত্ব ❑ লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ ❑ আগস্ট ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩
প্রথম প্রকাশ ❑ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১

প্রকাশক ❑ আসমা আরা বেগম
আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৮০৩৫

অক্ষর বিন্যাস ❑ ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১৭/১ কে.জি. গুপ্ত লেন, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ জি জি অফসেট প্রিন্টার্স নয়াবাজার ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ মশিউর রহমান

মূল্য ❑ ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70166-0010-4

Dwitiyo Bishawjudder Tragedy, By Shahadat Hossain Khan,
Published by Asma Ara Begum, Afsar Brothers,
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
Date of Publication : Amar Ekushe Granthamela 2011.
Third Print : August 2016
Price : 400 Tk. Only

ঘরে বসে আফসার ব্রাদার্স এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/Afsarbrothers
ফোনে অর্ডার করতে 015 1952 1971 হট লাইন 16297
afsarbrothers1100@gmail.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বড় ভাই
সাউথ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ
অধ্যাপক ড. মাহতাব উদ্দিন আহমেদকে–

www.pathagar.com

বইটি সম্পর্কে সামান্য কথা

ছোটবেলা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনে আসছি। বইটি লেখার আগেও শুনেছি। টুকিটাকি কিছু বইপত্রও পড়েছি। কিন্তু বিষয়টি এত ব্যাপক তা আমার জানা ছিল না। এক একটি লেখা তৈরি করতে আমাকে ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটের সহায়তা নিতে হয়েছে। ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে গিয়ে কখনো কখনো আমার মাথা ঘুরে যেতো। ইন্টারনেটে প্রতিটি বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক লেখা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় হাজার হাজার বই। আমার একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর যেসব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো উন্নত দেশগুলোতে প্রকাশিত বইয়ের তুলনায় কোনো হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। আমি ভেবে অবাক হই আমাদের লেখকগণ কেন বিশ্বের এত বড় একটি ঘটনাকে এড়িয়ে গেলেন।

পাঠকদের জানার আগ্রহ পূরণের পাশাপাশি আমার নিজের জানার কৌতূহলও আমাকে বইটি লিখতে তাড়না করেছে। লিখতে গিয়ে দেখেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো ঘটনা লেখা তো দূরের কথা, কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সারা জীবন লিখেও শেষ করা যাবে না। তাই ক্লান্তিতে এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেছি। আমি যা পারিনি আশা করি আগামী দিনে সে কাজ কেউ না কেউ সম্পন্ন করবেন।

ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে গিয়ে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, প্রায় প্রতিটি লেখক ও ঐতিহাসিক ইহুদীদের প্রতি বেমানান পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরে গেছেন। তারা হিটলারের উপর যুদ্ধের দায় চাপিয়ে দিয়ে খালাস পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইহুদী হত্যাকাণ্ড হলোকাস্ট নিয়ে তারা মাতম করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরতে পরতে যে অসংখ্য হলোকাস্ট লুকিয়ে রয়েছে তা তাদের চোখে পড়েনি। ঐতিহাসিক দলিলপত্রে হতাহতদের বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু হতাহত হওয়াই কি সব? কতজনের সুখের ঘর ভেঙ্গেছে, কত মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, কত শিশু এতিম হয়েছে—তার বিবরণ কখনো পাওয়া যাবে না। এমন কোনো সূত্র নেই যেখান থেকে নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া সম্ভব। সূত্রগুলোর সবই তখনকার জার্মানীর প্রতিপক্ষ বিজয়ী মিত্র শক্তি নিয়ন্ত্রিত। তাই তাদের কাছ থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য আশা করা যায় না। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও দু'একটি সত্যের নাগাল পাওয়া যায়। সেগুলোই ছিল আমার ভরসা। আমি কারো পক্ষ নই। মানুষ হিসেবে ইহুদীদের উপর নির্যাতন যেমন আমি সমর্থন করতে পারিনি তেমনি জার্মান ও জার্মানীর উপর অন্যায়কেও আমি মেনে নিতে পারিনি। যদি কারো সঙ্গে আমার দ্বিমত হয় তাহলে হবে এখানেই।

www.pathagar.com

যুদ্ধ মানেই ধ্বংস ও মৃত্যু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার ব্যতিক্রম নয়। এটাই হচ্ছে মানব ইতিহাসে বৃহত্তম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রায় ৫কোটি লোক নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে সৈন্য ছিল প্রায় অর্ধেক। যুদ্ধে শত্রু সৈন্য হত্যা করা অন্যায় নয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো নিহতরা সবাই ছিল মানুষ। যুদ্ধ মানুষকে পশুতে পরিণত করেছিল। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপে মুহূর্তে লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর করুণ উপাখ্যান শুনতে পেলে কার না হৃদয় কাঁদে! এমনকি কর্নেল পল টিবেটসের সহকারী রবার্ট লুই হিরোশিমায় বোমা নিক্ষেপের পর বেদনায় বলে উঠেছিলেন, 'হায় ঈশ্বর, আমরা একি করলাম! বইটি লিখতে গিয়ে এরকম একটি অনুভূতি আমার মধ্যেও কাজ করেছে। বার বার আপন মনে বলেছি, হায় যদি এ সর্বনাশা যুদ্ধ না হতো!

হিটলারকে যে যেভাবেই বিচার করুন না কেন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তার প্রেমিকা ইভা ব্রাউনের বেদনা ও আত্মত্যাগ আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। যুদ্ধের এক একটি ঘটনা যেন এক একটি ট্রাজেডি। যুদ্ধে মিত্র শক্তি বিজয়ী হলেও মানবতা ও নীতিবোধ বিজয়ী হতে পারেনি। তাই আমি বইটির নাম দিয়েছি 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হলেও দু'টি জায়গার লড়াই অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত লড়াইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার একটি ছিল ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট এবং আরেকটি ছিল ইস্টার্ন ফ্রন্ট। আমার লেখাগুলোয় বার বার এই দু'টি ফ্রন্টের বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে।

বইটি আমি নিজের হাতে কম্পোজ করেছি। কোনো পেশাদার প্রুফ রীডারের সাহায্য নেইনি বলে বানানে ভুল থাকা স্বাভাবিক। তথ্যগত ভুলও থাকতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট স্থান ও ব্যক্তির নামগুলো এত বিদঘুটে যে অনেকক্ষেত্রে আমার নিজেরই বিভ্রাট লেগেছে। বিভ্রাট সত্ত্বেও আমি এগিয়ে গিয়েছি। ফরাসী ও জার্মান শব্দগুলোর বাংলা করা খুবই দুরূহ। তার উপর রয়েছে সামরিক পরিভাষা। একজন বেসামরিক ব্যক্তি হিসেবে আমার পক্ষে ভুল করাই স্বাভাবিক। তবে কোনো ভুলই আমার ইচ্ছাকৃত নয়। বানানের ভুল-শুদ্ধের চিন্তা না করে ইতিহাসের একটি অমোচনীয় অধ্যায়কে এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। আশা করি পাঠকগণ মার্জনার চোখে দেখবেন।

১৫ জানুয়ারি ২০০৬, ঢাকা।

সাহাদত হোসেন খান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা / ১১
২।	হিটলারের বিস্ময়কর উত্থান / ১৮
৩।	হিটলারের শান্তি প্রস্তাব / ২৮
৪।	সমরাস্ত্র উৎপাদনের হিড়িক / ৩১
৫।	বৃটেন ও ফ্রান্সের সমরায়োজন / ৩৬
৬।	জার্মানীর ট্যাংক উৎপাদন / ৩৯
৭।	জার্মানী ও মিত্রদেশের যুদ্ধবিমান তৈরির হিসাব / ৪৩
৮।	জার্মান সশস্ত্র বাহিনী / ৪৬
৯।	জার্মানীর আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা / ৫৩
১০।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রযুক্তিগত বিপ্লব / ৬২
১১।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ / ৬৯
১২।	রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি / ৭৭
১৩।	পোল্যান্ডে জার্মান ব্লিৎসক্রিগ / ৮৮
১৪।	ডেনমার্ক ও নরওয়েতে জার্মান অভিযান / ৯৭
১৫।	বেলজিয়ামের পতন / ১০৪
১৬।	ডানকার্ক থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য অপসারণ / ১০৮
১৭।	রুশ-ফিনিশ সংগ্রাম / ১১৩
১৮।	রণাঙ্গনে ইতালী / ১১৮
১৯।	ব্যাটল অব আল-আমিন / ১২৬
২০।	চুয়াল্লিশ দিনে জার্মানীর ফ্রান্স দখল / ১৩৩
২১।	জেনারেল দ্য গলের সংগ্রাম / ১৪০
২২।	ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন তছনছ / ১৪৫
২৩।	লন্ডনে জার্মান বিমানের একটানা ৫৭ দিন বোমাবর্ষণ / ১৫৩
২৪।	আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা / ১৫৯
২৫।	হিটলারের রাশিয়া অভিযান / ১৬৭
২৬।	লেলিনগ্রাদে ৯শ' দিনের অবরোধ / ১৮০
২৭।	স্টালিনগ্রাদ অবরোধ / ১৮৯
২৮।	ডি-ডে ল্যান্ডিং : নরমান্ডি অপারেশন / ১৯৮

www.pathagar.com

২৯। ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর ১৩শ' বিমানের বোমাবর্ষণ / ২০৮
৩০। ব্যাটল অব বার্লিন / ২১৪
৩১। হিটলারের মৃত্যু / ২২৫
৩২। জার্মানীর আত্মসমর্পণ / ২৩৪
৩৩। বার্লিনে হিটলারের বাংকার / ২৪০
৩৪। হিটলারের প্রতি ইভার ভালোবাসা / ২৪৭
৩৫। নুরেমবার্গ ট্রায়াল / ২৫৩
৩৬। ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে হলোকাস্টের আজগুবি গল্প / ২৬০
৩৭। হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি / ২৭১
৩৮। ইহুদী ষড়যন্ত্র / ২৭৯
৩৯। চীন-জাপান যুদ্ধ / ২৮৩
৪০। পার্ল হারবারে জাপানী হামলা / ২৯২
৪১। জাপানে সোভিয়েত সামরিক অভিযান / ৩০১
৪২। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ / ৩০৭
৪৩। নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় আণবিক বোমাবর্ষণ / ৩১৩
৪৪। ওকিনাওয়া দখলে মার্কিন অভিযান / ৩২০
৪৫। কামিকাজে কৌশল : আত্মঘাতি হামলায় জাপানী রীতি / ৩২৯
৪৬। মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানের আত্মসমর্পণ / ৩৩৫
৪৭। জাপানে যে মার্কিন অভিযান চালানো হয়নি / ৩৪৩
৪৮। যুদ্ধের ধাক্কায় বৃটিশদের ভারত ত্যাগ / ৩৫৩
৪৯। সুভাষ বসুর রহস্যময় মৃত্যু / ৩৫৮

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা

সকল যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মূলে রয়েছে বিবদমান জাতি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অধিকার লাভের উন্মত্ত আকাংখা। মানব ইতিহাসে যুদ্ধ চিরকালই অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত। আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি এ সভ্যতাই এ অভিশাপের জন্মদাতা। মানব সভ্যতা যতই উন্নততর স্তরে পৌঁছেছে যুদ্ধবিগ্রহই ততই বর্বর ও অমানুষিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। আদিম অসভ্য মানুষেরাও যুদ্ধ করতো। তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ দলগত সুখ সুবিধা লাভ করা। তারপর সভ্যতার প্রাথমিক যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত যেসব বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে মোটামুটিভাবে সেগুলোর লক্ষ্য ছিল পররাজ্য ও পররাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করা। তারপর আসে ধনতান্ত্রিক যুগ। এই ধনতান্ত্রিক যুগের সমাজপতি ধনবাদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের হর্তা-কর্তা বিধাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধন ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথমে তারা সঙ্ঘবদ্ধ দলে পরিণত হয় এবং দেশের ধন-সম্পত্তি ও লোকবলকে নিজেদের করায়ত্ত করে। তারপর দেশের শাসনভার হস্তগত করে। অর্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে তারা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ নিজেদের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দুর্দান্ত লোভের বশবর্তী হয়ে তারা পর দেশের স্বাধীনতা ও ধন দৌলত কেড়ে নেয়। এভাবে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের আগে বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী ধনতান্ত্রিকগণ দুনিয়ার সকল সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ার করে লন। তারপর ধনতান্ত্রিক জাতিগুলোর মধ্যে দেখা দেয় প্রবল বিরোধ। এই বিরোধ বাধে বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিয়ে। ধনতান্ত্রিক জার্মানীর মুখপাত্র হিসেবে সেদিন কাইজার তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর চড়াও হয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মান জাতির জন্য তার ফল ভালো হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধকে প্রজাতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রর বিরোধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কিন্তু সে বিরোধ ছিল ধনতন্ত্রের উচ্চতর বিকাশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার লড়াই।

'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি গ্রহণ করায় ধনতান্ত্রিক জার্মানী পরাজিত হয়। জার্মানী কেবল তার উপনিবেশই নয়, নিজের ভূখণ্ডও হারায়। দেশটি পরাজিত হলেও যুদ্ধের মনোবৃত্তি তাদের দূর হয়নি। নতুন উদ্যমে সে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। স্বৈরতান্ত্রিক কাইজারীয় শাসনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে জার্মানী সমাজতন্ত্রের চটকদার লেবাস পরে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতেও জাতীয় সমাজতন্ত্র কায়েমের হিড়িক পড়ে যায়। ইতালী লোক দেখানো ডেমোক্র্যাসির ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ায় দেশটি ফতুর হয়ে যায়। এরপর ১৯২২ সালে বেনিতো মুসোলিনীর অভ্যুদয়। তিনি তার ফ্যাসিস্ট দলের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় তিনি দেশের সকল লোককে সুশিক্ষিত সৈনিকে পরিণত করেন। এক বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে ফ্যাসিস্টরা ইতালীয়দের হৃদয় ও বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এদিকে, জার্মানী কিছুতেই পরাজয়ের টাল সামলাতে পারছিল না। বিজয়ী পক্ষের রাইনল্যান্ড দখল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অসম্ভব অর্থের দাবি এবং দেশে দুর্ভিক্ষ ও হাজার হাজার বেকার সৈনিকের ভারে জার্মানী মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদান করে এবং লুকোর্নো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও জার্মানী রক্ষা পায়নি। এ সময়ে এডলফ হিটলারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার আগে তিনি একজন বাক্যবাগীশ আন্দোলনকারী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আত্মপ্রকাশের ১০ বছরের মধ্যেই তিনি জার্মান ধনতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। ধনতান্ত্রিক জার্মানী হিটলারের মধ্যে আবার তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন পূরণের প্রতিফলন দেখতে পেলো। গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে জার্মানী নাৎসীবাদের পথ ধরে।

হিটলার নিজেও ছিলেন একজন যুদ্ধ ফেরত সৈনিক। তাকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। কাজের প্রোগ্রাম তৈরি এবং দল গঠন করতে হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হয়েছে। মাসের পর মাস কারাগারে থাকতে হয়েছে। কারাগারে থাকাকালে তিনি তার আত্মচরিতের প্রথম খণ্ড লিখেছিলেন। হিটলারের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত জার্মান জাতি আবার জেগে উঠতে থাকে। ১৯২৪ সালে হিটলারের দল জার্মান রাইখস্টাগে ৩২ টি আসন দখলে সক্ষম হয়। তার কয়েক বছর পরেই তার দল ১ কোটি ৩০ লাখ ভোটারের সমর্থনে ২৩০ টি আসন লাভ করে। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারী হিটলার জার্মান রাইখস্টাগের চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হন। হিটলারের নেতৃত্বে পরাজিত জার্মানী আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা ভার্সাই চুক্তি অমান্য করতে থাকে। জার্মান সৈন্যরা প্রথমে সার অঞ্চল এবং পরে রাইনল্যান্ড দখল করে নেয়। এ সময় জার্মান সমরাস্ত্র কারখানায় প্রকাশ্যে জঙ্গীবিমান ও ট্যাংক নির্মিত হতে থাকে। বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানী একটি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়। তারপর ১৯৩৮ সালে রাইখের বাইরে অবস্থানরত জার্মানদের রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার আওয়াজ উঠে। একই বছরের মার্চে জার্মান সৈন্যরা অস্ট্রিয়া দখল করে। তারপর চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রতি হিটলারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিনা রক্তপাতে সুদেতানল্যান্ড দখল করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর তিনি মনোযোগ দেন পোল্যান্ডের দিকে। এ সময় ফ্রান্স ও বৃটেন হিটলারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় শংকিত হয়ে উঠে। এ দু'টি দেশ বুঝতে পারে যে, হিটলারের মূল আক্রোশ তাদের প্রতি। কেননা তদানীন্তন বিশ্বের ১২আনাই ছিল তখন তাদের দখলে। তাই তারা তাদের উপনিবেশ রক্ষার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজেদের গরজে তারা বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অগ্রসর হয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা দেখতে পায় যে, তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

www.pathagar.com

কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে কোনো চুক্তি হতে পারে– একথা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বৃটিশ সরকার জানতো, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউ কখনো কারো বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু তাদের সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয়নি। ধনবাদী রাষ্ট্রগুলো যাতে পরস্পর মারামারি করে ধ্বংস হয় এবং বিশ্বে সাম্যবাদী এক রাষ্ট্র গঠন করা যায় সে লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত শত্রু জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, আজন্ম শত্রু রাশিয়া যাতে সূচনাতেই জার্মানীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে না পারে সে জন্য চতুর হিটলার মস্কোর সঙ্গে রাখি বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিলের সঙ্গে কথা বলছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ার

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট রাতে কট্টর কমিউনিজম বিরোধী জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি তদানীন্তন বিশ্ব রাজনীতির গতি পরিবর্তন করে দেয়। নাৎসী পররাষ্ট্রনীতি নতুন পথে যাত্রা করে। অথচ মাত্র ক'বছর আগে জার্মানী জাপানের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

১৯৩৬ সালের ২৫ নভেম্বর বার্লিনে জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কমিউনিজম বিরোধী একটি চুক্তি হয়। তখন বৃটেনে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ভন রিবেনট্রপ ও জার্মানীতে নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত কাউন্ট মুশকোজি এ চুক্তিতে সই করেন। উভয় দেশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার গতিরোধে একমত হয়। ভন রিবেনট্রপ জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'জাপান পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের সম্প্রসারণ বরদাস্ত করবে

www.pathagar.com

না। জার্মানী মধ্য ইউরোপে এই মহাসমরের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় দুর্গ হিসেবে দণ্ডায়মান। আর দক্ষিণে ইতালী বলশেভিক বিরোধী পতাকা বহন করে অগ্রসর হবে।'

১৯৩৭ সালের ২৮ মে চেম্বারলিন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ডিক্টেটর-শাসিত দেশগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনার নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ৬ নভেম্বর রোমে কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাউন্ট সিয়ানো, হের ভন রিবেনট্রপ ও জাপানী দূত মিঃ হোতা নয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বার্লিনে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিশ্ববাসী আজ সুনির্দিষ্টভাবে জেনে রাখুক যে, ২০ কোটি মানুষের আশ্রয়স্থল পৃথিবীর তিনটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি কমিউনিজমের সঙ্গে কোনোরূপ আপোষ মীমাংসা বা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে তারা কখনো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত হবে না।'

ত্রিদেশীয় চুক্তিকে ব্যঙ্গ করে রাশিয়ার দৈনিক ইজভেস্তিয়ায় এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, 'ফ্যাসিজম সকল জাতির কাছেই বিভীষিকাময়। যুদ্ধ আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাই বলে সংগ্রামে আমরা ভীত নই। আমরা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন রোম-বার্লিন অক্ষশক্তির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা সাধনে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালের ৯ নভেম্বর গিল্ড হলে লর্ড মেয়রের ভোজ সভায় বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি হিসেবে মিলিত শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে বৃটেনের মনোভাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, মহামান্য রাজার সরকার তাদের সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।' এদিকে, রোম-বার্লিন চুক্তির প্রতিবাদে এন্থনী ইডেন ১৯৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

১৯৩৮ সালের ১ মার্চ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল সম্পন্ন হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অস্ট্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুষনিগ বার্চটেসগাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। অন্যথায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে বলে হুমকি দেন। শুষনিগ রাজধানী ভিয়েনায় ফিরে এসে ৯ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। অস্ট্রিয়ার নাৎসী দল বলপ্রয়োগে গণভোট পণ্ড করে দেয়। ১১ মার্চ জার্মান বাহিনী ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ মার্চ অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরদিন হিটলার বিজয়ী বেশে ভিয়েনায় প্রবেশ করেন। অস্ট্রিয়ার দুর্ভাগ্যে চেকোশ্লাভাকিয়া আতংকিত হয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সালের ১৪ মার্চ ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দেশকে অভয় দান করে। অল্পদিনের মধ্যে সুদেতানল্যান্ডে সংখ্যালঘু জার্মানদের উপর কথিত অত্যাচারের উপাখ্যানে জার্মানীর পত্র-পত্রিকাগুলোর পাতা পূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সালের ১৭ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এম, লিটভিনভ ফ্রান্স, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আক্রমণকারী দেশ হিসেবে জাপান, জার্মানী ও ইতালীকে প্রস্তাবিত সম্মেলন থেকে বাদ দেয়া হয়। এক সপ্তাহ পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

কমন্স সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে কতগুলো জাতির সমন্বয়ে একটি আলাদা জোট গঠিত হবে। ফলে ইউরোপীয় শান্তি বিপন্ন হবে।' ১৯৩৮ সালের ১৬ এপ্রিল ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মে মাসে জার্মানীতে চেকোশ্লাভাকিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা শুরু হয়। ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন মিঃ র‍্যান্সিম্যানকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চেকোশ্লাভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে পাঠান। নাৎসীদের প্ররোচণায় সেপ্টেম্বরে সুদেতানল্যান্ডে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। চেক সরকার সামরিক আইন জারি করলে জার্মান সৈন্যরা চেক সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। ১৪ সেপ্টেম্বর গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন বার্চটেসগাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য বিমান যোগে যাত্রা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। এরপর বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে গোপন কূটনীতি শুরু হয়। এ দু'টি দেশ ১৮ সেপ্টেম্বর চেকোশ্লাভাকিয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে। পরিকল্পনায় ৫০ শতাংশের অধিক জার্মান অধ্যুষিত চেক ভূখণ্ড জার্মানীর কাছে হস্তান্তর এবং ফরাসী ও চেক এবং চেক-সোভিয়েত চুক্তি বাতিল করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এ প্রস্তাব মেনে নিতে চেকোশ্লাভাকিয়ার উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ঘোষণা করলেন যে, ইঙ্গ-ফরাসীর চাপে চেকোশ্লাভাকিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারায় নাৎসী পশুবলের কাছে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের পরাজয় সূচিত হচ্ছে।

ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনায় চেকোশ্লাভাকিয়াকে যে সব শর্ত দেয়া হয় তাতে হিটলার সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ২২ সেপ্টেম্বর চেম্বারলিন আবার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হন। তার সঙ্গে বৈঠকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র সুদেতানল্যান্ড দাবি করে বসেন। মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চেম্বারলিন বৃটেনে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়। এ সময় তারবার্তা পেয়ে চেম্বারলিন আবার জার্মানী যাত্রা করেন। ২৯ অক্টোবর তিনি মিউনিখে হিটলার, মুসোলিনী ও এম, দালাদিয়েরের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টায় চতুঃশক্তির মধ্যে মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেদিনই অপরাহ্নে চেক পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করে। ১ অক্টোবর সুদেতানল্যান্ড জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মিউনিখ চুক্তি শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই ডেকে আনে। ১৯৩৯ সালে মার্চের প্রথমভাগে জার্মানীর প্ররোচণায় স্লোভাকিয়া জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৫ মার্চ জার্মানী বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া দখল করে নেয়। ১৮ মার্চ জার্মানী রুমানিয়ার কাছে চরমপত্রের আকারে কয়েকটি অর্থনৈতিক দাবি উত্থাপন করে। বৃটেন এ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিমত জানতে চায়। তখন ক্রেমলিন বৃটেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, তুরস্ক, পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। ১৯৩৯ সালের ২৩ মার্চ রুমানিয়া জার্মানীর সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করে। হিটলার বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়ার কাছে মেমেল দাবি করেন। লিথুয়ানিয়া এ দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়। ১৯৩৯ সালের ২৬ মার্চ হিটলার বিজয়ী বেশে মেমেলে প্রবেশ করেন।

www.pathagar.com

৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ঘোষণা করেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ৭ এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো শাসিত স্পেন কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করে। ফলে জার্মানী, ইতালী, জাপান, মাঞ্চুকুয়ো (জাপান অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া), হাঙ্গেরী ও স্পেন কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ৭ ও ৮ এপ্রিল ইতালীয় সৈন্যরা আলবেনিয়া দখল করে। ইতালীয় সৈন্যদের অগ্রযাত্রার মুখে রাজা জগু দেশ থেকে পলায়ন করেন। আলবেনিয়া ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩ এপ্রিল বৃটেন ও ফ্রান্স পূর্ব ইউরোপের দেশ গ্রীস ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২ এপ্রিল হিটলার পোল-বৃটিশ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং বৃটেনের সঙ্গে নৌ-চুক্তির অবসান ঘোষণা করেন।

১৯৩৯ সালের ৩ মে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ পদত্যাগ করেন এবং মলোটভ তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫ এপ্রিল থেকে ইঙ্গ-রুশ আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৫ মে পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল বেক ডানজিগ ও করিডোরের উপর হিটলারের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ৬ মে লন্ডনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রস্তাব পাঠায় এবং এ প্রস্তাব নিয়ে সেদিনই বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। পরদিন রোম-বার্লিন অক্ষ সামরিক মৈত্রী গঠন করা হয়।

১৯৩৯ সালের ৮ মে মস্কোতে বৃটেন পাল্টা প্রস্তাব পাঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটিশ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। বৃটিশ প্রস্তাবে বৃটেন ও ফ্রান্স আক্রান্ত হলে বাধ্যতামূলকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করবে—একথা বলা থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স বাধ্যতামূলকভাবে সহায়তা করবে কিনা তার উল্লেখ না থাকায় প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। অন্যদিকে, পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সামরিক সহায়তা প্রদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এসব দেশ সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণে অসম্মত হয়।

এদিকে, ১৯৩৯ সালের ১২ মার্চ ইঙ্গ-তুর্কী পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি এবং ২৩ জুন ফরাসী-তুর্কী পারস্পরিক সহায়তা দান সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন হয়। ১৯৩৯ সালে জুনের শেষভাগে ডানজিগ নিয়ে পোল্যান্ড ও জার্মানীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন পোল্যান্ডকে সর্বতোভাবে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ৩০ জুন মার্কিন প্রতিনিধি সভায় অস্ত্র রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জুলাইয়ের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বাতিলের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ১৯৩৯ সালের ২১ জুলাই জার্মানী আবার ডানজিগ অধিকারের সংকল্প ঘোষণা করে। ৩১ জুলাই মস্কোয় জার্মান সামরিক প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১১ আগস্ট সামরিক মিশন মস্কোয় উপস্থিত হয়। কিন্তু পোলিশ প্রতিনিধি দল যোগদান না করায় আলোচনা স্থগিত থাকে। পোল্যান্ড নিজের এলাকার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের অনুমতি দানে অসম্মত হওয়ায় সকল আয়োজন পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়।

www.pathagar.com

জার্মানরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। তারা পর্দার অন্তরালে তৎপর হয়ে উঠে। তার ফলে ১৯ আগস্ট রুশ-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শিগগির দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের আভাস ফুটে উঠে। ২১ আগস্ট নাৎসী পক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ আগস্ট জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ বিমান যোগে মস্কো গিয়ে সে রাতেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২৪ আগস্ট চুক্তির প্রকাশ্য শর্তগুলো প্রকাশ করা হয়। শর্তগুলো ছিল (১) এক পক্ষ একা বা তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করবে না। (২) তৃতীয় কোনো পক্ষ এক পক্ষের উপর হামলা চালালে অন্য পক্ষ তৃতীয় পক্ষকে কোনোরূপ সহায়তা করবে না। (৩) পরস্পরের স্বার্থ সম্পর্কে উভয় পক্ষই একে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করবে। (৪) এক পক্ষের প্রতি বৈরি কোনো জোটে অন্য পক্ষ যোগদান করবে না। (৫) স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে উভয় পক্ষ মৈত্রীপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করবে। (৬) ১০ বছরের জন্য চুক্তি বলবৎ থাকবে।

কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। উভয় পক্ষ চুক্তি লংঘন করে একে অন্যের উপর হামলা চালায়। জার্মানীই প্রথম চুক্তি লংঘন করে লেনিনগ্রাদ ও স্টালিনগ্রাদ অবরোধ করে। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও অনাক্রমণ চুক্তি খেলাফ করে বার্লিনে চূড়ান্ত সামরিক অভিযান চালায়।

www.pathagar.com

হিটলারের বিস্ময়কর উত্থান

এডলফ হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে যত আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তত আলোচনা অন্য কাউকে নিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ। 'হিটলার' নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখনো শরীরে শিহরণ জাগে। হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। মনের আয়নায় একটি ইস্পাত কঠিন পুরুষের ছবি ভেসে উঠে। প্রত্যেকেই তার সম্পর্কে জানতে চায়। কে তার পিতা, কোথায় তার জন্ম, কিভাবে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, কেন তিনি সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কেন-ই বা তিনি পরাজিত ও আত্মহত্যা করেছেন ইত্যাদি।

হিটলারের কালে পৃথিবীতে অনেকেই জন্ম নিয়েছিলেন। ইতিহাস তাদের ক'জনের কথা মনে রেখেছে? মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলেও তার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল কখনো কম ছিল না। তিনি এক কালজয়ী মানুষ। পরাজিতের কথা কেউ মনে রাখে না। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। মাইকেল হার্টস তার 'দি হান্ড্রেড' নামে পুস্তকে তাকে বিশ্বের একশো মানুষের মধ্যে ৫২ নম্বরে স্থান দিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে আন্তর্জাতিক টাইম ম্যাগাজিন তাকে বছরের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করে।

হিটলার ছিলেন গরীবের সন্তান। অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। জার্মানীর জন্য জীবন উৎসর্গ করলেও তিনি জন্মগতভাবে জার্মান ছিলেন না। তার জন্ম অস্ট্রিয়ায়। ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় জার্মানীর ব্যাভেরিয়া সীমান্তের ওপারে ব্রাউনাউ এ্যাম নামে একটি ছোট্ট অস্ট্রীয় গ্রামে তার জন্ম। তার পিতার নাম এ্যালোয়িস ও মায়ের নাম ক্লারা পোলজ। এডমান্ড নামে এক ভাই ও পলা নামে তার এক সহোদর বোন ছিল। হিটলারের ডাক নাম ছিল এডি। শৈশবে তাকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দান করা হয়। ১৮৯৫ সালে ৬ বছর বয়সে হিটলার অস্ট্রিয়ার লীঞ্জের কাছে ফিশহ্যাম নামে একটি গ্রামের পাবলিক স্কুলে প্রথম গ্রেডে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে তার পরিবার অস্ট্রিয়ার ল্যাম্বাস শহরে স্থানান্তরিত হয়। শহরে ক্যাথলিক গীর্জার একটি স্কুল ছিল। হিটলারকে এ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিদিন তিনি গীর্জার স্কুলে যেতেন। কাষ্ঠনির্মিত এ গীর্জায় সংরক্ষিত কয়েকটি স্বস্তিকা চিহ্নের প্রতি তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন এবং আবেগের সঙ্গে স্বস্তিকার জার্মান শব্দ 'হাকেনক্রুজ' উচ্চারণ করতেন।

জার্মান সভ্যতায় স্বস্তিকা চিহ্ন হচ্ছে সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রতীক। 'স্বস্তিকা' শব্দটিকে দু'টি শব্দে বিভক্ত করলে প্রথম শব্দটি দাঁড়ায় 'সু' যার বাংলা অর্থ হলো কল্যাণ এবং 'আস্তির' অর্থ সমৃদ্ধি। স্বস্তিকার 'সু' শব্দটি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। নাৎসী দলের প্রতীক ছিল স্বস্তিকা চিহ্ন। ১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ জার্মানীর প্রচলিত জাতীয় পতাকা পরিবর্তন করে জার্মান পার্লামেন্টের শীর্ষে স্বস্তিকা উত্তোলন করা হয়। স্বস্তিকার পটভূমিতে ছিল লাল ও সাদা রং। হিটলার স্বস্তিকার লাল রংকে দেখতেন জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং সাদা অংশকে দেখতেন আর্য জাতির বিজয় বা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে।

হিটলারের কন্ঠ ছিল সুরেলা। তিনি প্রায়ই স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। গীর্জায়ও তার ডাক পড়তো। ফিশহ্যাম গীর্জার পুরোহিতদের দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন। তার মধ্যে পুরোহিত হওয়ার স্বপ্ন জাগে। দু'বছর তিনি পুরোহিত হওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তিনি পুরোহিত সেজে অভিনয় করতেন। তাদের মতো ধর্মোপদেশ দিতেন। ৯ বছর বয়সে সিগারেট খেতে গিয়ে তিনি এক পুরোহিতের হাতে ধরা পড়ে যান। অবশ্য পুরোহিত তাকে সামান্য বকুনি দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ল্যান্স কর্পোরাল হিটলার (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় বসা)

হিটলারের ১১ বছর বয়সে আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোয়ারকে সমর্থন করতেন। হামে আক্রান্ত হয়ে হিটলারের কনিষ্ঠ ভাই এডমান্ড মারা গেলে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। এডমান্ডকে কবর দেয়া হয় বাড়ির পাশে একটি গোরস্তানে। হিটলারের শোবার ঘর থেকে ওই গোরস্তান দেখা যেতো। হিটলার গোরস্তানের দেয়ালে বসে ভাইয়ের কবরের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষে হিটলারের পিতা তাকে লীঞ্জ শহরের একটি টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। গ্রামের ছেলে হিটলার শহরে এসে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কেউ তার সঙ্গে মেশে না। গ্রামের ছেলে বলে সবাই তাকে অবজ্ঞা

www.pathagar.com

করে। এড়িয়ে যায়। এতে হিটলার নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন। এজন্য প্রথম বছরের পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। তিনি তার পিতাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি অংক ও বিজ্ঞানে কাঁচা। তাই তাকে শিল্পী হতে দেয়া উচিত। কিন্তু পিতা নাছোড়বান্দা। তাকে এই স্কুলেই পড়তে হবে। অগত্যা একই শ্রেণীতে হিটলারকে থেকে যেতে হয়। ক্লাশে তখন তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। অন্যদের তুলনায় বয়স্ক হওয়ায় তিনিই হয়ে উঠেন সবার অভিভাবক। এভাবে এখান থেকেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বছরে সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেলেও তিনি অংকে ফেল করেন।

হিটলারের শৈশবকাল কাটে জার্মান সীমান্তের কাছে অস্ট্রীয় ভূখণ্ডে। এখানকার লোকজন নিজেদেরকে অস্ট্রীয়-জার্মান বলে ভাবতো। তারা অস্ট্রিয়ার হ্যাম্পসবার্গের প্রজা হওয়া সত্ত্বেও তারা জার্মান হোহেনজোর্লান ইম্পেরিয়াল হাউস এবং জার্মান কাইজারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। হিটলার ও তার তরুণ বন্ধুরা অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রকে অভিবাদন না করে 'হেইল' বলে জার্মানীকে অভিবাদন জানাতো। তারা জার্মান জাতীয় সঙ্গীত 'উবার আলিস' গাইতো। স্কুলে ইতিহাসের একজন শিক্ষক ছিলেন। এই শিক্ষক ড. লিউপোল্ড পোৎস বিসমার্ক ও ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের মতো জার্মান বীরদের প্রশস্তি কীর্তন করতেন। এতে হিটলারের মনে আবেগের জোয়ার বয়ে যেতো। তার কিশোর মনে জার্মান জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়।

হিটলার স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাইরের বই-পুস্তকও পড়তেন। সময় পেলেই লাইব্রেরীতে যেতেন। পিতার ব্যক্তিগত সংগৃহীত বই-পুস্তক খুলে খুলে দেখতেন। একদিন পিতার বই-পুস্তক ঘাটতে ঘাটতে একটি বইয়ে জার্মান ও ফরাসীদের মধ্যকার একটি যুদ্ধের ছবির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বইটির নাম ছিল 'ওয়ার অব এইটিন্থ হান্ড্রেড সেভেনটি টু সেভেনটি ওয়ান।' এ বই খুলে যুদ্ধের ছবি দেখা তার নেশায় পরিণত হয়। তিনি বার বার বইটি পাঠ করতেন। যতই পাঠ করতেন ততই মুগ্ধ হতেন। জার্মান লেখক কার্ল মে ছিলেন তার প্রিয় লেখক। লেখক কার্ল মে দক্ষিণ আমেরিকার একজন বীর যোদ্ধাকে নিয়ে প্রচুর বই লিখেছিলেন। এ বীর যোদ্ধার নাম ছিল ওল্ড শ্যাটারহ্যান্ড। বীর শ্যাটারহ্যান্ড স্বদেশী রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। সাহস ও ইচ্ছাশক্তি ছিল শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভে শ্যাটারহ্যান্ডের বিজয়ের চাবিকাঠি। তরুণ হিটলার ওল্ড শ্যাটারম্যান সিরিজের ৭০টি বই পড়ে ফেলেন। তিনি এ বইকে এত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন যে, রাশিয়া অভিযানকালে তিনি তার কমান্ডারদের এ বইগুলো সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে হিটলারদের পরিবার লীঞ্জের কাছে লিয়নডিং নামে একটি গ্রামে বসতি শুরু করে। লিয়নডিং স্কুলে তিনি ভালো গ্রেড লাভ করেন। এ সময় চিত্রাংকনের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক তৈরি হয়। তিনি আশপাশের ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে ডিজাইন লক্ষ্য করতেন। পরে এসব ডিজাইন হুবহু খাতায় এঁকে ফেলতেন। তিনি চিত্রকর হওয়ার জন্য পিতার কাছে বায়না ধরেন। ক্লাসিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে বললেন। পিতা এ্যালোয়িস ছিলেন একরোখা মানুষ। তিনি চাইতেন ছেলে হিটলার তার মতো সরকারী চাকুরে হোক। এ নিয়ে পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। শেষে পিতার

www.pathagar.com

ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে ১৩ বছর বয়সে হিটলার আকস্মিকভাবে তার পিতাকে হারান। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এসে তার কাঁধে চাপে।

অস্ট্রিয়ায় চিত্রকর হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় হিটলার একদিন জার্মানীর মিউনিখে এসে উপস্থিত হন। খালি পা। পোশাক জরাজীর্ণ। তবে অচিরেই তার রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি এঁকে বিক্রি করতেন। এতে তার হাতে প্রচুর পয়সা আসতে থাকে। কাফে ও রেস্তোঁরায় তিনি আড্ডা দিতেন। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। জাতীয় রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নিয়ে তুখোড় আলোচনায় লিপ্ত হতেন। আলোচনায় তিনি হতেন প্রধান বক্তা। লোকজন তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনতো। কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তিনি রেগে যেতেন।

কথা ছিল যে, হিটলার ১৯১০ সাল নাগাদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হবেন। কিন্তু মিউনিখে এসে তিনি অস্ট্রিয়ায় ফিরে না যাওয়ায় পুলিশ তাকে খোঁজাখুজি শুরু করে। ১৯১৩ সালে তাকে মিউনিখে খোঁজে বের করা হয় এবং বলা হয় যে, হয় তাকে স্বেচ্ছায় অস্ট্রিয়ার বোর্ড অব ইন্সপেকশনের সামনে হাজির হতে হবে নয়তো তাকে বহিষ্কার কিংবা গ্রেফতার করা হবে। এ হুমকিতে তিনি অস্ট্রিয়া ফিরে যান। এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সামরিক বাহিনীতে তার চাকুরি করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া এবং অস্ট্রিয়ার জন্য লড়াই করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। তারপরেও তিনি একবার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা চালান। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় বাদ পড়েন। পরে আবার ব্যাভেরীয় রেজিমেন্টে ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি চান। জার্মান হওয়ার জন্য এটাই ছিল তার সামনে একমাত্র বিকল্প। তাকে অনুমতি দেয়া হয়। অনুমতি পত্র পেয়ে হিটলার এত খুশী হন যে, জীবনে তিনি আর কখনো এত খুশী হননি। অনুমতি পত্রের খাম খোলার সময় আনন্দে তার হাত কাঁপছিল। ভর্তি হয়ে যান ষোড়শ ব্যাভেরীয় রিজার্ভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের প্রথম কোম্পানীতে। তার রেজিমেন্টের নাম ছিল 'লিস্ট' রেজিমেন্ট। এ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ভন লিস্টের নামানুসারে এ রেজিমেন্টের নাম হয়ে যায় 'লিস্ট রেজিমেন্ট।' ১৯১৪ সালের ৮ অক্টোবর তিনি ব্যাভেরীয় রাজা তৃতীয় লুডউইগের নামে শপথ নেন। তিনি মনে মনে জানতেন যে, আসলে তিনি জার্মানীর পক্ষে লড়াই করার জন্য শপথ নিচ্ছেন। রাতারাতি হিটলার একজন প্রাদেশিক অস্ট্রীয় থেকে জার্মান সৈন্যে পরিণত হন। ২১ অক্টোবর লিস্ট রেজিমেন্টকে প্রশিক্ষণের জন্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে পাঠানো হয়। দু'মাস পথ চলার পর লিস্ট রেজিমেন্ট লিলেতে পৌঁছে। এ রেজিমেন্টকে ষষ্ঠ ব্যাভেরীয় ডিভিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২৯ অক্টোবর লিস্ট রেজিমেন্টের ৩ টি ব্যাটালিয়নকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। হিটলার ছিলেন তার একটি ব্যাটালিয়নে। ঘিলুভেল্টে তখন বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে জার্মান সৈন্যদের তুমুল লড়াই চলছিল। লড়াইয়ে জার্মান পক্ষে ব্যাপক হতাহত হয়। হিটলার শত্রুর বেপরোয়া গোলাবর্ষণের মুখে ছিলেন নির্ভয়। লড়াইয়ে তিনি কমান্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তিনি কখনো কোনো প্রশ্ন করতেন না। একজন উচুঁ মানের সৈনিকের সকল গুণাবলী তার ছিল। জার্মান পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পেতে থাকায় এবং তাদের মনোবলে ধস নামা সত্ত্বেও হিটলার ছিলেন কর্তব্য পালনে অবিচল। রণাঙ্গনে কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য তার প্রমোশন হয়। ল্যান্স কর্পোরাল পদে তিনি উন্নীত হন। পরে ওয়াইপ্রেস নামে একটি জায়গার ঠিক দক্ষিণে ফরাসীদের বিরুদ্ধে লিস্ট রেজিমেন্টের লড়াই শুরু হয়। ফরাসীদের প্রচণ্ড গোলাগুলী উপেক্ষা করে হিটলার একজন আহত অফিসারকে কাঁধে বহন করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এ বীরত্ব প্রদর্শন করায় ১৯১৪ সালে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহসিকতা পদক আয়রন ক্রস প্রদান করা হয়। লড়াইয়ে সাড়ে ৩ হাজার জার্মান সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৬ শ' সৈন্য রক্ষা পায়। নিহতদের মধ্যে রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল লিস্টও ছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় সহযোদ্ধারা ধারণা করতো যে, অলৌকিক ক্ষমতার জোরে হিটলার রক্ষা পাচ্ছেন। ওয়াইপ্রেসে লড়াইকালে হিটলার ছিলেন একটি বাংকারে। হঠাৎ একটি ভৌতিক কণ্ঠ তিনি শুনতে পান। বাতাসে ভেসে আসা ওই কণ্ঠ তাকে বাংকার ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তিনি কালবিলম্ব না করে বাংকার থেকে উঠে আসেন। তিনি বাইরে আসা মাত্রই ফরাসীদের কামানের গোলায় বাংকারটি উড়ে যায়। সেখানে যেসব জার্মান সৈন্য ছিল তাদের সবাই নিহত হয়। বেঁচে যান কেবল হিটলার। আরেকবার হেনরি ট্যান্ডি নামে সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত একজন বৃটিশ সৈন্য হিটলারকে গুলী করার নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। হিটলার পিছু হটছিলেন। এ সময় তিনি হেনরির নজরে পড়েন। হেনরি গুলী করার জন্য রাইফেল তাক করেন। কিন্তু কেন যেন তিনি গুলী ছুঁড়তে পারেননি। হেনরি রাইফেল নামিয়ে নেন। হেনরিকে রাইফেল নামাতে দেখে হিটলার বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধের দেবতা তাকে রক্ষা করছে। তিনি এ ঘটনা জীবনেও ভুলতে পারেননি। একসময় তিনি হেনরির সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পান। জার্মানীর চ্যান্সেলর হওয়ার পরও তিনি এ ছবি বার্চটেসগাডেনের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতেন। ১৯১৬ সালের ৭ অক্টোবার বাপাউমিতে লড়াইয়ে হিটলারের পায়ে গুলী লাগে। চিকিৎসার জন্য তাকে বার্লিনের কাছে বীলিজে পাঠানো হয়। কিছুটা সুস্থ হলে তাকে মিউনিখের পেছনে লিস্ট রেজিমেন্টের রিজার্ভ ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়। এ সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জার্মানদের দুর্দশার চিত্র দেখতে পান। এতে তার হৃদয় ব্যথিত হয়। এ দৃশ্য তিনি সইতে পারতেন না। মানুষের দুর্দশা যাতে দেখতে না হয় সে জন্য তিনি চাইছিলেন তাকে অগ্রবর্তী অবস্থানে পাঠানো হোক। তার আশা পূর্ণ হয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাকে অগ্রবর্তী অবস্থানে পাঠানো হয়। সহযোদ্ধারা তাকে জীবিত দেখতে পেয়ে অবাক হয়। অগ্রবর্তী ফ্রন্টে আরাস ও থার্ড ওয়াইপ্রেসে বৃটিশদের সঙ্গে জার্মানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। হিটলার এ দু'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শত্রুর বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তাকে তরবারীসহ তৃতীয় শ্রেণীর মিলিটারি ক্রস পদক দেয়া হয়। ১৯১৮ সালের ৪ আগস্ট ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে চূড়ান্ত লড়াইয়ে বীরত্বের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় তাকে অসংখ্য সম্মাননাসহ প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদকে ভূষিত করা হয়। রণাঙ্গনে তিনি একটি বাংকারে অবস্থান গ্রহণকারী একদল ফরাসী সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। হিটলার ছিলেন একা। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি গিয়ে বাংকারে অবস্থানকারী

www.pathagar.com

ফরাসী সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলেন, চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। আত্মসমর্পণ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। হিটলারের চাল বুঝতে না পেরে ফরাসী সৈন্যরা মাথার উপরে হাত তুলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

হিটলার যে সম্মান ও স্বীকৃতি চেয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদকে ভূষিত হওয়ায় তার সে সুযোগ এসে যায়। প্রথম শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদক এত মর্যাদাপূর্ণ ছিল যে, নন- কমিশন্ড অফিসার তো দূরের কথা, কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের দু'একজন মাত্র এ পদক পেতেন। হিটলার সারা জীবন এ পদক বহন করতেন। এমনকি চ্যান্সেলর হওয়ার পরও।

১৯১৮ সালের ১৩/১৪ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে ওয়াইপ্রেসের দক্ষিণে ওয়ারউইকে লিস্ট রেজিমেন্টের উপর বৃটিশরা বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করে। হিটলার বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হন। তিনি নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। পরদিন তিনি দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাকে পাসওয়াক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১০ নভেম্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদ শুনতে পান। এ দুঃসংবাদে তার অন্তর চুরমার হয়ে যায়। পাসওয়াক হাসপাতালের এক বৃদ্ধ পুরোহিত বাইরে থেকে ছুটে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে শয্যাশায়ী আহত যোদ্ধাদের জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদ দেন। পুরোহিত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, পরদিন যুদ্ধবিরতি হবে। কাইজারকে সিংহাসন ছাড়তে হবে এবং জার্মানী এখন থেকে প্রজাতন্ত্র। এ কথা শুনে হিটলার চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। আর্য জাতি জার্মানদের যেখানে বিংশ্ব শতাব্দীতে বিশ্ব শাসন করার কথা সেখানে তারা কিনা করছে আত্মসমর্পণ! হিটলার তার আত্মজীবনী 'মেইন ক্যাম্ফ-এ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনে কতটুকু কষ্ট পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, 'গভীর হতাশার সঙ্গে এ সংবাদ শুনে আমি আমার ওয়ার্ডে ফিরে আসি এবং কম্বল ও বালিশের নীচে আমার ব্যথা চাপা দেই।'

সেনাবাহিনীর চাকুরিতে ইস্তফা দেন হিটলার। দেশব্যাপী অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ৯০ লাখ সৈন্যসহ ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। জার্মানীর অর্থনীতি বিধ্বস্ত। চারদিকে বেকারত্ব। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে ১৮ হাজার মার্কের বিনিময় মূল্য দাঁড়ায় এক ডলার, জুলাইয়ে ৩ লাখ ৫০ হাজার এবং সেপ্টেম্বরে ১০ লাখ। যুদ্ধের পর জার্মানীকে ওয়েমার রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্র বিদায় নেয়। গণতান্ত্রিক শাসন দেশটির অগণিত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। রক্ষণশীল সামরিক নেতা ফিল্ড মার্শাল ভন হিন্ডেলবার্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় তিনি দক্ষিণ ও বাম উভয় ঘরানার লোকজনের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তার ফলাফল দাঁড়ায় শূন্য। জাতির এ দুর্ভাগ্য হিটলারকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। দিন রাত চিন্তার পর তার কাছে স্পষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে উঠে যে, পরাজয়ের জন্য বিশ্বাসঘাতক ইহুদী, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরাই দায়ী। তিন বলতেন, পঞ্চম বাহিনী তার দেশকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছে।

জার্মানীতে তখন কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল ছিল। নাৎসী দল ছিল তাদের একটি। তবে এ নামে নয়। অ্যান্টন ড্রেক্সলার নামে রেলওয়ের ৩৫ বছরের এক কর্মচারী জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করেন। প্রথমে এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০। দলটির সদস্য সংখ্যা বেশী– সাধারণ মানুষকে এ ধারণা দেয়ার জন্য ৫শ' থেকে সদস্যদের ক্রমিক তালিকা সংরক্ষণ করা হতো। নাৎসী দলে হিটলারের ক্রমিক নম্বর ছিল ৫৫৫। ১৯১৯ সালে মিউনিখে এক জনসভায় তিনি নাৎসী দলের সদস্য হন। বাগ্মী ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি এ দলের সর্বময় নেতা হয়ে যান। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি এ দলের নামকরণ করেন ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা সংক্ষেপে নাৎসী। 'নাৎসী' বা 'নাজী' শব্দটির মূল জার্মান শব্দ হচ্ছে National Sozialstische Deutsche Arbeiter Partie বা NSDAP. National-এর Na এবং SoZIalstische-এর Zi-মিলে সংক্ষিপ্তাকারে Nazi শব্দটি গঠিত হয়েছে। ১৯২০ সালে এ দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ হাজার এবং ১৯৩৩ সালে ৮ লাখ ৪৯ হাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এ সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যায়।

অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী হিটলার দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। কর্মীরা তার কাছে আমৃত্যু ত্যাগ স্বীকার করার শপথ গ্রহণ করে। এসএ বা স্ট্রংট্রুপার ছিল দলটির একটি আধাসামরিক শাখা। ১৯২০ সালের শেষদিকে হিটলার মিউনিখে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে Sturm Abteilung বা এসএ গঠন করেন। নাৎসী দলের সমাবেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেহরক্ষী হিসেবে তারা কাজ করতো। পরে এটিকে 'স্পোর্টাবটেইলং'-এ রূপান্তরিত করা হয়। স্পোর্টাবটেলং-কে স্পোর্টস সেকশন বলেও আখ্যায়িত করা হতো। ১৯২১ সালের শেষদিকে এটি স্ট্রর্মাবটেইলং বা এসএ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। কয়েক বছরের মধ্যেই এসএ'র সংখ্যা ৪ লাখে উন্নীত হয়। ১৯২৫ সালে এসএ'র অভ্যন্তরে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এসএস নামে আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপও গঠন করা হয়। ব্রাউন বা তামাটে ইউনিফর্ম পরিধান করতো বলে তাদেরকে ব্রাউনশার্ট-ও বলা হতো। তদ্রূপ কালো ইউনিফর্ম গায়ে থাকতো বলে এসএস-কে ব্ল্যাকশার্ট বা কালো কোর্তা বলা হতো। ১৯২৫ সালে হিটলার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিলে তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী জুলিয়াস স্ক্রীককে এসএস গঠনের নির্দেশ দেন। এসএস'র মূল জার্মান শব্দ হচ্ছে (Schutzstaffel বা Protection Squad)। হিটলার ইতালীর একনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর মতো সশস্ত্র কায়দায় কুচকাওয়াজ করে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি ১৯২৩ সালের ৮ নভেম্বর ২ হাজার সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে মিউনিখে প্রবেশ করেন। শহরে প্রবেশ করে তিনি সামরিক কায়দায় মার্চ শুরু করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে গুলীবিনিময়ে ১৪ জন নাৎসী কর্মী নিহত হয়। পরে হিটলার মিউনিখের বীয়ার হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটান। সেদিন এ হলে ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক সরকারের তিনজন নেতা

www.pathagar.com

একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে হাজির হন। সমাবেশে প্রায় ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। ভন কার বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াতেই ভারি মেশিনগান সজ্জিত স্ট্রমট্রুপাররা হলে প্রবেশ করে। এরপরই একটি পিস্তল উঁচিয়ে হিটলার প্রবেশ করেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে একটি চেয়ার তুলে নেন। হলের সিলিং লক্ষ্য করে একটি গুলী ছুঁড়েন। এ সময় পুলিশের একজন মেজর পকেটে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করলে তিনি তাকে পকেট থেকে হাত বের করার নির্দেশ দেন। মেজর তার নির্দেশ পালন করে। মঞ্চে উঠে হিটলার ঘোষণা করলেন, জাতীয় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের স্থানীয় সদর দপ্তর দখল করা হয়েছে। একথা বলে তিনি মঞ্চে উপস্থিত তিন জন ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক কর্মকর্তাকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেন। আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন, তার নির্দেশ অমান্য করলে তার

পিস্তলের ৪ টি গুলীর তিনটি তাদের জন্য এবং বাকি একটি তার নিজের। এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল লুডেনডর্ফ বীয়ার হলে প্রবেশ করেন এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন। তিনি ব্যাভেরীয় প্রাদেশিক সরকারের তিন কর্মকর্তা কার, লসো ও সীসারকেও হিটলারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিতে রাজি করান। পরে এ তিনজনকে টেনে হিঁচড়ে পেছনের একটি কক্ষে আটক করা হয়। মার্শাল লুডেনডর্ফের অনুরোধে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়ে বাইরে গিয়েই তারা বেঁকে বসেন। হিটলারের অভ্যুত্থানকে নস্যাত করে দিতে স্থানীয় জার্মান আর্মি গ্যারিসনকে নির্দেশ দেয়া হয়। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে ১০ নভেম্বর হিটলার গ্রেফতার হন। একই সময়ে নাৎসী দলকে নিষিদ্ধ এবং হিটলারকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ২৪ দিন পর্যন্ত শুনানি চলে। শুনানিকালে হিটলার দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। বিচারক পর্যন্ত তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তবে ৮ মাস পর তিনি ল্যান্ডসবার্গ কারাগার থেকে মুক্তি পান। কারাগারে বসেই তিনি তার আত্মজীবনীমূলক বই লিখেন। তার এ বইটি ছিল নাৎসী দলের রাজনৈতিক দর্শন।

হিটলার বইটির নাম দিয়েছিলেন, 'মিথ্যাচার, ভ্রষ্টতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে আমার ৪ বছরের সংগ্রাম।' খুব লম্বা মনে হওয়ায় প্রকাশক সংক্ষিপ্তাকারে বইটির নাম দেন 'মেইন ক্যাম্ফ' বা আমার সংগ্রাম। ১৯২৫ সালে বইটি প্রকাশিত হলে তার কাটতি ছিল খুবই সামান্য। হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর হলে এ বইটির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। মেইন ক্যাম্ফে হিটলার মানব জাতিকে শারীরিক ও বাহ্যিক গঠনের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন এবং গায়ের ফর্সা রং, কোঁকড়ানো চুল এবং নীল চোখের বিবেচনায় তিনি জার্মানদের শীর্ষ ভাগে স্থান দেন। জার্মানদের তিনি আর্য জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন যে, তারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম অংশ। তিনি ইহুদী, স্লাভ, রুশ ও চেকদের মানব জাতির নীচু স্তরে স্থান দেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নীতি অনুযায়ী সবলের কাছে তিনি দুর্বলের আনুগত্য কামনা করেন। তিনি দাবি করেন, 'আমাদের সামনে আমরা যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দেখছি সেগুলো আর্য জাতির অবদান। আর্য অঞ্চলেই প্রথম সভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।' তিনি বলেন, 'নিকৃষ্ট লোকদের সঙ্গে

www.pathagar.com

আর্যদের সংঘাত ঘটে। ফলে এসব জনগোষ্ঠী আর্যদের পদানত হয়ে উপকৃত হয়। বশ্যতা প্রাপ্তির এ ধারা যতদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন আর্যরা প্রভু থাকবে এবং একে অপরের সঙ্গে আন্তঃবিয়েতে একাকার হয়ে না যাবে ততদিন উপকৃত হওয়ার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।' তিনি বলেন, 'ইহুদীরাই হচ্ছে সেই চক্রান্তকারী যারা শ্রেষ্ঠ জাতি আর্যদেরকে বিশ্ব শাসনে তাদের ন্যায়সঙ্গত স্থান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে।' তিনি বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, ধনিক গণতন্ত্র ও মার্ক্সসবাদ লালন-পালনের জন্য ইহুদীদের অভিযুক্ত করে বলেন, এ অভিশপ্ত জাতি বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত।

হিটলার একসময় বুঝতে পারেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে থাকেন। ১৯২৮ সালের মে'তে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল ২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে তারা ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে রাইখস্টাগে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হিটলারের জনপ্রিয়তায় ক্ষমতাসীনরা ভীত হয়ে পড়ে। তাই ১৯৩২ সালের ১৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৪ বছরের বৃদ্ধ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেলবার্গ প্রার্থী হন। তিনি জানতেন যে, তিনি প্রার্থী না হলে হিটলার অনায়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হবেন। এ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ ছাড়া অন্য যে তিনজন প্রার্থী ছিলেন তারা হলেন এডলফ হিটলার, আর্নেস্ট থিয়েলম্যান ও থিওডোর ডুয়েসটারবার্গ। প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ পান ৪৯ দশমিক ৬ এবং হিটলার ৩০ দশমিক ১ শতাংশ ভোট। কোনো প্রার্থী নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিন জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ এপ্রিল তৃতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে হিন্ডেলবার্গ পান ৫৩ দশমিক শূন্য এবং হিটলার ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে হিন্ডেলবার্গ পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ফ্রাঞ্চ ভন পাপেনকে চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেন। পাপেন অবিলম্বে রাইখস্টাগ ভেঙ্গে দেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ৫ মাসের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় নির্বাচন। হিটলার ও তার অনুসারীরা নির্বাচন পণ্ড করার চেষ্টা করায় বার্লিনে সামরিক আইন জারি করা হয়। পার্লামেন্ট নির্বাচনে হিটলারের নাৎসী দলের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। ২৭ জুলাই হিটলার ব্রান্ডেনবার্গে ৬০ হাজার লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। একইদিন বার্লিনের গ্রিউনওয়াল্ড স্টেডিয়ামে তার জনসমাবেশে ১ লাখ ২০ হাজার লোক সমবেত হয়। বাইরে আরো লক্ষাধিক লোক তার ভাষণ শুনতে পায়। ১৯৩২ সালের ৩১ জুলাই নাৎসী দল ২৩০টি আসনে বিজয়ী হয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ৬০৮ আসনের পার্লামেন্টে তখনো তাদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। হিটলার তাকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। হিন্ডেলবার্গ অস্বীকৃতি জানান। ফলে আবার নির্বাচন হয়। ১৯৩২ সালের ৬ নভেম্বর নাৎসী দল ২০ লাখ ভোট কম পায় এবং ৩৪ টি আসন হারায়। বিশৃংখলা এড়াতে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ পাপেনকে বরখাস্ত করেন এবং সেনাবাহিনীর জেনারেল কুর্ট ভন সীশারকে চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে সীশার

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গের কাছে তার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সীশারের পদত্যাগের ৫৭ দিন পর প্রেসিডেন্ট হিন্ডেলবার্গ এডলফ হিটলারকে জার্মানীর চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। মাত্র ১৪ বছরের সাধনায় অখ্যাত অপরিচিত ল্যান্স কর্পোরাল হিটলার দেশের প্রধান নির্বাহী চ্যান্সেলর পদে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হিটলার তার শাসন কালের স্থায়িত্ব নিয়ে গর্ব করতেন। বলতেন, থার্ড রাইখ হাজার বছর টিকে থাকবে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে থার্ড রাইখ টিকে ছিল মাত্র ১২ বছর।

প্রথম রাইখ (সাম্রাজ্য) ছিল জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য যার সূচনা হয়েছিল ৯৬২ সালে মহান অটোর রোমের সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে এবং স্থায়ী হয়েছিল আনুমানিক এক হাজার বছর। ১৮৭১ সালে অটো ভন বিসমার্ক দ্বিতীয় রাইখ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসন ত্যাগের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় রাইখের অবসান ঘটে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ছিল ওয়েমার রিপাবলিকের আমল। ওয়েমার রিপাবলিকের স্থলে থার্ড রাইখ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে জার্মান লেখক আর্থার মুলার ভন দার ব্রাক তার একটি বইয়ের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'থার্ড রাইখ।' হিটলার এ বইয়ের শিরোনাম গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের মে পর্যন্ত নাৎসী সরকারের আমল সরকারীভাবে থার্ড রাইখ হিসেবে পরিচিত ছিল।

হিটলার ক্ষমতায় এসেই পার্শ্ববর্তী ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করেন। জার্মানী ও ইতালী জোটবদ্ধ হয়। এ জোটের নাম ছিল অক্ষজোট বা 'এক্সিস'। ১৯২৩ সালে বেনিতো মুসোলিনী প্রথম জার্মানী ও ইতালীর জোটকে 'এক্সিস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সে সময় তিনি এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, The axis of European history runs through Berlin. অর্থাৎ ইউরোপীয় অক্ষের ইতিহাস বার্লিনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে বৈঠকের পর মিলানে এক জনসভায় তিনি আবার বলেছিলেন, The vertical line between Rome and Berlin is not a partition but rather an axis round which all European states animated by the will to collaboration and peace can also collaborate. রোম ও বার্লিনের মধ্যকার শীর্ষবিন্দুর সীমান্ত রেখা কোন বিভাজন নয়, বরং এটি একটি অক্ষ যাকে কেন্দ্র করে সহযোগিতার ইচ্ছায় উজ্জীবিত সকল ইউরোপীয় দেশ আবর্তিত হচ্ছে এবং এ অক্ষ বা মেরুকে কেন্দ্র করে শান্তিও সহায়ক হতে পারে। মুসোলিনীর ভাষায় এ এক্সিস বা অক্ষশক্তিই গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে ৬ বছর সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। হিটলার ছিলেন এ মহাযুদ্ধের মহানায়ক।

www.pathagar.com

হিটলারের শান্তি প্রস্তাব

অনায়াসে একটির পর একটি দেশ পদানত হতে থাকায় চতুর হিটলার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এক ফন্দি আটেন। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে তিনি বৃটেনের কাছে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ শান্তি প্রস্তাব ছিল একটি মস্তবড় চক্রান্ত। হিটলার অনেক আগে থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে ঐ মুহূর্তে তার প্রয়োজন ছিল বৃটেনকে আরো কিছুকাল যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা। তাছাড়া মিত্রশক্তির মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও মতবিরোধ সৃষ্টি করাও ছিল তার বৃটেনের কাছে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপনের আরেকটি লক্ষ্য।

১৯৩৯ সালের আগস্টেই এ শান্তি প্রস্তাব উত্থাপনের সূচনা হয়েছিল। হিটলারের আগে থেকেই জানা ছিল যে, পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃটেন পোল্যান্ডকে রক্ষায় এগিয়ে যাবে। এ শান্তি প্রস্তাবকে উপলক্ষ করে বৃটিশ দূত স্যার নেভিল হেন্ডারসন হিটলার, গোয়েবলস ও গোয়েরিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠককালে তার কাছে হিটলারের উত্থাপিত শান্তি প্রস্তাবের রহস্য ধরা পড়ে। হিটলার স্পষ্ট জানিয়ে দেন বৃটেন যদি তার প্রস্তাবে সম্মত হয় অথবা ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা ত্যাগ করে এবং মধ্য ইউরোপে জার্মানীর প্রভুত্ব বিস্তারে কোনোরূপ বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে প্রতিদানে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। পোল্যান্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, পোল্যান্ডকে কেন্দ্র করে জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে কোনো বিরোধ তার কাম্য নয় এবং তার মতে পোল্যান্ড সমস্যা একটি স্থানীয় সমস্যা। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, বিরোধের জন্য পোল্যান্ডই একমাত্র দায়ী।

বৈঠকে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং জার্মানীর অপরাজেয় শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে বৃটিশ দূতের মনে একটি ভয়াবহ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি তাকে জানিয়ে দেন, জার্মানীর অগ্রযাত্রা দুনিয়ার কোনো শক্তি রোধ করতে পারবে না। ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত পাথরের দেয়াল বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে পড়বে এবং ফরাসীরা অচিরেই জার্মানীর কাছে পরাজিত হবে। তিনি আরো জানিয়ে দেন বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ববং বৃটেনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর এ আলোচনার পেছনে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডের সঙ্গে কোনো আপোস আলোচনায় যোগদান না করার অনিচ্ছা ব্যক্ত করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার

www.pathagar.com

সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা। জার্মানী ধারণা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে তার অনেক লাভ হবে। জার্মানীর হিসাব ছিল বৃটেন তার রসদ যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ তার জন্য উন্মুক্ত হবে। তাই কালবিলম্ব না করে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো গিয়ে উপস্থিত হন। অবিলম্বে দুই জাতির প্রতিনিধির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের কিছুদিন পরই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ চুক্তিতে জার্মানীর চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই লাভবান হয়েছে বেশী। বহু রক্তপাত ও যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পোল্যান্ড জয় করেও জার্মানী পোল্যান্ডের ষোল আনা দখল পায়নি। অন্যদিকে, জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিনা রক্তপাতে পোল্যান্ডের অর্ধেক ভাগ পেয়ে যায়। একই সময়ে জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোও সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

মিত্রশক্তিকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করাই ছিল জার্মানীর কৌশল। ১৯৩৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বার্লিনের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানায় সমবেত শ্রমিকদের উদ্দেশে গোয়েরিংয়ের ভাষণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং তার ভাষণে বলেন, 'জার্মানীর অনুসৃত যুদ্ধনীতিতে বৃটেনের কোনো ক্ষতি বা অসুবিধার কারণ নেই। বৃটেন যদি তার ভুল বুঝতে পেরে এখনো বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হয় তাহলে তা উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে এবং গ্রহণযোগ্য শান্তির শর্তে জার্মান জাতি এখনো যুদ্ধ অভিযান থেকে নিবৃত্ত থাকতে প্রস্তুত আছে। জার্মান জাতি তাদের একচ্ছত্র নেতার কর্তৃত্বাধীনে সুমহান বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প নয়।' এরপর তিনি বৃটিশ সৈন্যদের বাধা প্রদানের প্রতি তিরস্কারব্যঞ্জক সুরে বলেন, এসব সত্ত্বেও বৃটিশ শক্তি গায়ে পড়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা প্রতিজ্ঞা করেছে একজন ইংরেজ জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

এদিকে, সিগফ্রিড লাইনের আউট পোস্ট অভিমুখে ফরাসী সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে কেল্লার দেয়ালের গায়ে অসংখ্য পোস্টার দেখতে পায়। পোস্টার-গুলোতে লেখা ছিল, 'তোমরা গুলি না চালালে আমরাও গুলি চালাবো না।' দেয়ালের এ লিখন দেখার পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল জার্মান সৈন্যরা বোধ হয় তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আসলে জার্মান সৈন্যগণ ঐ ধরনের শ্লোগান ব্যবহার করে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। ঠিক সে সময় রাইনল্যান্ডের রেডিও কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় বৃটেনই জার্মানীর একমাত্র শত্রু। অতএব ফরাসী সৈন্যরা কেন গায়ে পড়ে যুদ্ধ করতে এসেছে?

১৯৩৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হিটলার তার বক্তৃতায় বলেন, 'পোল্যান্ড ও জার্মানীর মাঝে পড়ে বৃটেন যদি ঝগড়া করতে না আসতো তাহলে এ যুদ্ধ বাধতো না। একমাত্র বৃটেনই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। অবশ্যই তাতে সে জার্মানীর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কেননা রাশিয়ার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিমান জার্মান জাতি এবার বহু বছর এই যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি জার্মান জাতিকে

www.pathagar.com

এমনভাবে গড়ে তুলেছি যে, আমাদের শত্রুগণ যে সরকারকেই সমর্থন করুক না কেন, জার্মানগণ তাকেই পরিত্যাগ করবে। জার্মানীর শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালালে বাস্তবিক অর্থেই সেই আক্রমণের জন্য আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।'

যুদ্ধে বিপক্ষ শক্তিগুলোকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন, 'বৃটেন বলছে, এ যুদ্ধ তিন বছর স্থায়ী হবে। তার জবাবে আমি শুধু একথাই বলবো যে, ফ্রান্সের জন্য আমার দুঃখ হয়। তিন বছর কেন, চার, পাঁচ, ছয় অথবা সাত বছরও যদি যুদ্ধ স্থায়ী হয় তাতে জার্মানীর ভয়ের কিছু নেই। বৃটেন ইতোমধ্যেই নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের নৌ-শক্তি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন দিন হয়তো আসতে পারে যেদিন আমাদেরকে এমন গোপন ও আশ্চর্য অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে যে, সেই অস্ত্রের বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতি-আক্রমণ চলবে না।'

হিটলারের এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি যথোচিত উত্তর প্রদান করে। এ সম্পর্কে ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত হিটলারের সোভিয়েত বিরোধী উক্তির উল্লেখ করতে হয়। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'পোল্যান্ড জার্মানীর পরম বন্ধু। জার্মানী পোল্যান্ডকে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং উভয়ে উভয়ের সুহৃদ।' অথচ সেই পোল্যান্ডকেই রাশিয়ার সঙ্গে মিলে জার্মানী ভাগাভাগি করে নেয়। অবশ্য হিটলারের অপপ্রচার খুব কম লোকের মনেই বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল। অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি জার্মান জাতিকে পুনরায় একটি দুরবস্থায় নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। অতঃপর ১৯৩৯ সালের ৬ অক্টোবর হিটলার বলেন, 'যদি ইউরোপ শান্তি চায় তাহলে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রকে জার্মানী ও রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। তারা ইচ্ছে করলে পোল্যান্ডের এ রণক্ষেত্রকে শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত করতে পারে।'

এভাবে এডলফ হিটলার, গোয়েরিং ও গোয়েবলসের মতো নাৎসী নেতারা মিথ্যা শান্তি প্রস্তাবের নামে মিত্রপক্ষের মাঝে অবিশ্বাস ও অনৈক্য আনয়নের চেষ্টা করেন। তবে তারা তাদের চেষ্টায় সফল হননি।

www.pathagar.com

সমরাস্ত্র উৎপাদনের হিড়িক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র উৎপাদনে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়। মুনাফালোভীরা দেশে দেশে অস্ত্র উৎপাদন শিল্পে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে। পরবর্তীকালে অস্ত্র উৎপাদনে ভাটা পড়লেও প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকে। যুদ্ধকালে ও যুদ্ধের আগে সাবমেরিন বা ইউ-বোট ছাড়া মিত্র শক্তি অক্ষশক্তির চেয়ে অস্ত্র উৎপাদনে বহুগুণ এগিয়ে ছিল। অক্ষশক্তিভুক্ত তিনটি দেশের মধ্যে একমাত্র জার্মানীই অস্ত্র উৎপাদনে মিত্রশক্তির কাছাকাছি ছিল। অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থান ছিল খুবই শোচনীয়। নীচের পরিসংখ্যান তার প্রমাণ।

সিস্টেম	মিত্রশক্তি	অক্ষশক্তি
ট্যাংক ও সেলফপ্রপেলড গান বা এসপি	২,২৭,২৩৫	৫২,৩৪৫
কামান	৯,১৪,৬৮২	১,৮০,১৪১
মর্টার	৬,৫৭,৩১৮	১,০০,০০০
মেশিনগান	৪৭,৪৪,৪৮৪	১০,৫৮,৮৬
সামরিক ট্রাক	৩০,৬০,৩৫৪	৫,৯৪,৮৫৯
সামরিক বিমান	৬,৩৩,০৭২	২,৭৮,৭৯৫
জঙ্গীবিমান (ফাইটার)	২,১২,৪৫৯	৯০,৬৮৪
এ্যাটাক এয়ারক্রাফট	৩৭,৫৪৯	১২,৫৩৯
বোমারু বিমান	১,৫৩,৬১৫	৩৫,৪১৫
পর্যবেক্ষণ বিমান	৭,৮৮৫	৩,০৩৩
পরিবহন বিমান	৪৩,০৪৫	৫,৬৫৭
প্রশিক্ষণ বিমান	৯৩,৫৭৮	২৮,৫১৬
বিমানবাহী রণতরী	১৫৫	১৬
ব্যাটলশীপ	১৩	৭
ক্রুজার	৮২	১৫
ডেস্ট্রয়ার	৮১৪	৮৬
প্রহরাদানকারী জাহাজ	১,১০২	-
সাবমেরিন	৪২২	১,৩৩৭
বাণিজ্যিক জাহাজের পরিবহন ক্ষমতা	৩,৩৯,৯৩,২৩০	৫০,০০,০০০

www.pathagar.com

দেশওয়ারী উৎপাদন

দেশের নাম	ট্যাংক	এসপি
১. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১,০৫,২৫১	৯২,৫৯৫
২. যুক্তরাষ্ট্র	৮৮,৪১০	৭১,০৬৭
৩. জার্মানী	৪৬,৮৫৭	৩৭,৭৯৪
৪. যুক্তরাজ্য	২৭,৮৯৬	-
৫. কানাডা	৫,৬৭৮	-
৬. জাপান	২,৫১৫	-
৭. ইতালী	২,৪৭৩	-
৮. হাঙ্গেরী	৫০০	-

কামান (বিমান ও ট্যাংকবিধ্বংসী কামানসহ)

১. সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫,১৬,৬৪৮
২. যুক্তরাষ্ট্র	২,৫৭,৩৯০
৩. জার্মানী	১,৫৯,১৪৭
৪. যুক্তরাজ্য	১,২৪,৮৭৭
৫. জাপান	১৩,৩৫০
৬. কানাডা	১০,৫৫২
৭. ইতালী	৭,২০০
৮. কমনওয়েলথ	৫,২১৫
৯. হাঙ্গেরী	৪৪৭

মর্টার

১. সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪,০৩,৩০০
২. যুক্তরাষ্ট্র	১,০৫,০৫৪
৩. যুক্তরাজ্য	১,০২,৯৫০
৪. জার্মানী	৭৩,৪৮৪
৫. কমনওয়েলথ	৪৬,০১৪

মেশিনগান (সাবমেশিনগান বাদে)

১. যুক্তরাষ্ট্র	২৬,৭৯,৮৪০
২. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৪,৭৭,৪০০
৩. জার্মানী	৬,৭৪,২৮০
৪. জাপান	৩,৮০,০০০
৫. যুক্তরাজ্য	২,৯৭,৩৩৬

www.pathagar.com

৬.	কানাডা	২,৫১,৯২৫
৭.	কমনওয়েলথ	৩৭,৯৮৩
৮.	হাঙ্গেরী	৪,৫৮৩

সামরিক ট্রাক

১.	যুক্তরাষ্ট্র	২৩,৮২,৩১১
২.	যুক্তরাজ্য	৪,৮০,৯৪৩
৩.	জার্মানী	৩,৪৫,৯১৪
৪.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	১,৯৭,১০০
৫.	জাপান	১,৬৫,৯৪৫
৬.	ইতালী	৮৩,০০০

বিমান (সব ধরনের সামরিক বিমান)

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৩,২৪,৭৫০
২.	জার্মানী	১,৮৯,৩০৭
৩.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	১,৫৭,২৬১
৪.	যুক্তরাজ্য	১,৩১,৫৪৯
৫.	জাপান	৭৬,৩২০
৬.	কানাডা	১৬,৪৩১
৭.	ইতালী	১১,১২২
৮.	কমনওয়েলথ	৩,০৮১
৯.	হাঙ্গেরী	১,০৪৬
১০.	রুমানিয়া	১,০০০

ফাইটার

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৯৯,৯৫০
২.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬৩,০৮৭
৩.	জার্মানী	৫৫,৭২৭
৪.	যুক্তরাজ্য	৪৯,৪২২
৫.	জাপান	৩০,৪৪৭
৬.	ইতালী	৪,৫১০

আক্রমণকারী বিমান

১.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩৭,৫৪৯
২.	জার্মানী	১২,৫৩৯

www.pathagar.com

বোমারু বিমান

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৯৭,৮১০
২.	যুক্তরাজ্য	৩৪,৬৮৯
৩.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	২১,১১৬
৪.	জার্মানী	১৮,২৩৫
৫.	জাপান	১৫,১১৭
৬.	ইতালী	২,০৬৩

পর্যবেক্ষণ বিমান

১.	জার্মানী	৬,২৯৯
২.	জাপান	৫,৬৫৪
৩.	যুক্তরাজ্য	৩,৯৬৭
৪.	যুক্তরাষ্ট্র	৩,৯১৮
৫.	ইতালী	১,০৮০

পরিবহন বিমান

১.	যুক্তরাষ্ট্র	২৩,৯২৯
২.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৭,৩৩২
৩.	জার্মানী	৩,০৭৯
৪.	জাপান	২,১১০
৫.	যুক্তরাজ্য	১,৭৮৪
৬.	ইতালী	৪৬৮

প্রশিক্ষণ বিমান

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৫৭,৬২৩
২.	যুক্তরাজ্য	৩১,৮৬৪
৩.	জাপান	১৫,২০১
৪.	জার্মানী	১১,৫৪৬
৫.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪,০৬১
৬.	ইতালী	১,৭৬৯

বিমানবাহী রণতরী

১.	যুক্তরাষ্ট্র	১৪১
২.	জাপান	১৬
৩.	যুক্তরাজ্য	১৪

www.pathagar.com

যুদ্ধজাহাজ

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৮
২.	যুক্তরাজ্য	৫
৩.	ইতালী	৩
৪.	জাপান	২
৫.	জার্মানী	২

ক্রুজার

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৪৮
২.	যুক্তরাজ্য	৩২
৩.	জাপান	৯
৪.	ইতালী	৬
৫.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	২

ডেস্ট্রয়ার

১.	যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৯
২.	যুক্তরাজ্য	২৪০
৩.	জাপান	৬৩
৪.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৫
৫.	জার্মানী	১৭
৬.	ইতালী	৬

প্রহরাদানকারী জাহাজ

১.	যুক্তরাষ্ট্র	১,৩৩৭
২.	যুক্তরাজ্য	৪১৩
৩.	কানাডা	১৯১

সাবমেরিন

১.	জার্মানী	১,৩৩৭
২.	যুক্তরাষ্ট্র	৪২২
৩.	যুক্তরাজ্য	১৬৭
৪.	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫২
৫.	ইতালী	২৮

www.pathagar.com

বৃটেন ও ফ্রান্সের সমরায়োজন

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এক বছর আগে ১৯৩৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মিউনিখ চুক্তির পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন স্বদেশ ফিরে যান। ক্রয়ডন বিমান ঘাঁটিতে তিনি অবতরণ করেন। মিউনিখ আলোচনার ফলাফল জানার জন্য একদল লোক সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। চেম্বারলিনের চোখ মুখে আনন্দের আভা দেখে তারা আশ্বস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী চুক্তিনামা জনগণের সামনে বের করে এনে বললেন, চেকোশ্লাভাকিয়া সমস্যার মীমাংসা হওয়ায় জার্মানী সন্তুষ্ট হয়েছে এবং ইউরোপে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এবং হিটলার এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। তার এ ঘোষণা শুনে উপস্থিত জনগণের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তার এক সপ্তাহ পর হিটলার বার্লিনের স্পোর্টস প্যালেসের এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, চেকোশ্লাভাকিয়ার সুদেতান প্রদেশ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হওয়ায় আর কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার অস্তিত্ব রইলো না।

আসলে চেম্বারলিনের সঙ্গে হিটলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বিষয়টির নিষ্পত্তি তখনো হয়নি। জার্মানীর ২ কোটি মানুষের মনে হিটলারের মেইন ক্যাম্ফের স্বপ্ন দোলা দিচ্ছিল। ইউরোপের সকল জার্মান ভাষাভাষীদের নাৎসী পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল হিটলারের স্বরচিত মেইন ক্যাম্ফের উদ্দেশ্য। জার্মানী ছিল তখন ক্ষুধার্ত। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে অপহৃত ৮ কোটি পাউন্ড নিমিষে ব্যয় হয়ে যায়। আড়াই লাখ নাৎসী চর ইউরোপে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ফলে ইউরোপে আবার বিপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে হিটলার মুসোলিনীর রোম দখলের মতো অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি তার স্বপ্ন পরিমার্জন করেন। তিনি ও তার অনুগতরা ভেবে দেখলেন যে, ফরাসীদের উদ্দেশে কটূক্তি বর্ষণ এবং আলসেস লোরেনের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে দানিয়ুব বিধৌত শস্য শ্যামলা দেশগুলোর প্রতি নজর দেয়াই ভালো। অস্ট্রিয়া দখলের সময় নাৎসীরা এরকম একটি পরিকল্পনা খাড়া করে এবং জার্মান বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোয় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু জার্মানদের শ্যেন দৃষ্টির সামনে বাধা ছিল চেকোশ্লাভাকিয়া। চেকোশ্লাভাকিয়াই ছিল দানিয়ুব নদীতে প্রবেশের লৌহ দ্বার এবং ইউক্রেন ও বলকান অঞ্চলে প্রবেশের একমাত্র পথ। কাজেই চেকোশ্লাভাকিয়াকে ধ্বংস করার ফন্দি আঁটা হতে থাকে। অক্টোবরের প্রথম ভাগে পোল ও হাঙ্গেরীয়রা চেক রাষ্ট্রের অংশবিশেষ দখল করে নেয়। শ্লোভাকিয়া ও রুথানিয়াকে বিদ্রোহ করার জন্য

www.pathagar.com

ইন্ধন দেয়া হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯ নভেম্বর চেক পার্লামেন্ট বাধ্য হয়ে স্লোভাকিয়া ও রুথানিয়াকে বোহেমিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দেয়। তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ চেকদের বাসভূমি বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া জার্মান রাইখের আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের গোপন চক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল জার্মানদের প্রচারণা। চেকোশ্লাভাকিয়ায় সংখ্যালঘু জার্মানদের উপর অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী জার্মানদের মুখে মুখে ফিরছিল। ১৫ মার্চ বিকেল ৫ টায় ডা. গোয়েবলস বার্লিন থেকে বেতার যোগে ঘোষণা করেন যে, 'চেকোশ্লাভাকিয়ায় বিভীষিকার যে রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে তা অসহ্য হয়ে উঠছে।' গোয়েবলসের এ অভিযোগ সত্যি ছিল না। ১৯৩৩ সালের আগে চেকোশ্লাভাকিয়ায় চেক ও সুদেতানরা মিলেমিশে বসবাস করেছে। তখন তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

চেকদের অত্যাচারের জন্য জার্মানী বাধ্য হয়ে বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া দখল করেছে–ডা. গোয়েবলসের একথা কেউ বিশ্বাস করেনি। জার্মানীর চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের পর ১৯৩৯ সালের ১২ মার্চ মিঃ চেম্বারলিন বার্মিংহামে এক ভাষণে হিটলারকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। হিটলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সুদেতান প্রদেশ হস্তগত হওয়ার পর ইউরোপে আর কোনো ভূখণ্ডের উপর জার্মানদের দাবি থাকবে না এবং চেক রাষ্ট্রের উপরও তিনি আর হস্তক্ষেপ করবেন না। হিটলারের প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করে চেম্বারলিন আরো বলেন, 'আমি জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমি এ দেশকে নতুন কোনো অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। তবে একথা জেনে রাখা ভালো যে, বৃটেন যুদ্ধকে হৃদয়হীন ও নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে মনে করলেও এখন পর্যন্ত বৃটিশ জাতি এত মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েনি যে, যুদ্ধের আহ্বান এলে তারা প্রাণপণ শক্তিতে তা প্রতিরোধ করতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এম, দালাদিয়েরও একই দিন ফরাসী সিনেটে এক ভাষণে বলেন, আমরা ইউরোপকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমরা আজ জীবন পণ করে আক্রমণাত্মক নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

১৯৩৯ সালের জুন মাসে কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংসদের দশম অধিবেশনে বিভিন্ন জাতির সমরোপকরণ নির্মাণের যে ব্যয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হয় তাতে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালে ফ্রান্সের দেশ রক্ষা খাত ও সমরোপকরণ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ এবং ১৯৩৯ সালে তা ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়। গ্রেট বৃটেনে এ ব্যয়ের পরিমাণ ১৪ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে পৌঁছে। তবে হিসাবে দেখানো হয় যে, ১৯৩৯ সালে জার্মানী ও ফ্রান্সের সামরিক ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ এবং বৃটেনের শতকরা ১২। আসলে জার্মানীর এ হিসাব ছিল মিথ্যা। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণার পর স্থির করেন যে, বিগত ১০ বছর জার্মানী প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের অর্ধেক অর্থ সমরোপকরণ নির্মাণে ব্যয় করেছে। বৃটেনের জাতীয় আয় জার্মানীর চেয়ে বেশী হওয়ায় প্রতিরক্ষা খাতেও দেশটির ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জার্মানীর চেয়ে বেশী। রাজকীয় বিমান বহরের শক্তি বৃদ্ধি ও

www.pathagar.com

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনায় স্থির করা হয়, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আরো ৭১টি নতুন বিমান স্কোয়াড্রন গঠনের কাজ পূর্ণ করা হবে। ১৯৩৮ সালে পুনরায় স্থির করা হয়, ১৯৪০ সাল নাগাদ আরো ২৩৭০ টি প্রথম শ্রেণীর বিমান নির্মাণের কাজ শেষ হবে। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীতে ১৯৩৪ সালে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার। ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে এ সংখ্যা ১ লাখে পৌঁছে। তাছাড়া সাহায্যকারী ও রিজার্ভসহ আরো ছিল ১ লাখ। ১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মের প্রথমভাগে বৃটেনে যুদ্ধ বিমান নির্মাণে সপ্তাহে ২০ লাখ পাউন্ড ব্যয় হয়। ১৯৩৫ সালে বৃটেনের জঙ্গীবিমানের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক শ'। ১৯৩৯ সালে তা ২ হাজার ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, বিদেশেও যুদ্ধের জন্য আরো কয়েক শ' বিমান প্রস্তুত ছিল।

লর্ড নিউফিল্ডের প্রতিভায় স্পিটফায়ার বিমান আবিষ্কৃত হয়। তদানীন্তন বিশ্বে স্পিটফায়ার ছিল দ্রুতগামী বিমানগুলোর অন্যতম। এসব বিমান সাড়ে ১৭ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ঘন্টায় ৩৬২ মাইল বেগে উড্ডয়ন করতে পারতো। যুদ্ধকালে হকার হ্যারিকেন নামে আরেক ধরনের জঙ্গীবিমানও তৈরি হয়। এগুলোর গতি ছিল ঘন্টায় ৩৩৫ মাইল। হ্যাম্পডেন বিমানের গতি ছিল ঘন্টায় ২৬৫ মাইল এবং একটানা ১,৩৯০ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারতো। ওয়েলিংটন নাইট বোমারু বিমানগুলো পুরোমাত্রায় বোঝাই হয়ে মিনিটে ৫ মাইল বেগে উড়ে গিয়ে ইউরোপের যে কোনো শহরে বোমাবর্ষণ করতে পারতো। ভিকার্স ভ্যালেন্সিয়া বিমানগুলো ২২ জন এবং ব্রিস্টল বোমারু বিমানগুলো ২৪ জন সৈন্য নিয়ে উড্ডয়ন করতে পারতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বৃটেনের নৌ-শক্তিও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাদের ক্যাপিটাল শীপ ছিল ১৩ টি, ক্রুজার ৫৬ টি, ডেস্ট্রয়ার ১৭৯টি ও সাবমেরিন ৫৭টি। অন্যদিকে, জার্মানীর ক্যাপিটাল শীপ বা মূল যুদ্ধজাহাজ ছিল ৫টি, ক্রুজার ৮টি, ডেস্ট্রয়ার ২১টি এবং সাবমেরিন ৭১টি।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ফ্রান্সের মোট যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ছিল প্রায় ২শ'। তার মধ্যে 'ডানকার্ক' ও 'স্ট্রাসবুর্গ'(প্রতিটির ওজন ২৬ হাজার ৫শ' টন) নামে নবনির্মিত দু'টি জাহাজই ছিল সবচেয়ে বড়। তাছাড়া ছিল 'কুর্বে', 'প্যারি', 'বেটাগনে', 'প্রোভেন্স' ও 'লোরেইন' (প্রতিটির ওজন ২২ হাজার ১৮৯ টন) নামে আরো ৫টি পুরনো যুদ্ধজাহাজ। অন্যান্য জাহাজের মধ্যে ছিল ১৭টি ক্রুজার (প্রতিটি ১০ হাজার থেকে ৬ হাজার ৪৯৬ টন ওজনের), একটি বিমানবাহী রণতরী, একটি সী প্লেন ক্যারিয়ার, দু'টি মাইন স্থাপনকারী ক্রুজার, ৩২টি হাল্কা ক্রুজার, ২৬টি ডেস্ট্রয়ার (গড়ে ১৩৫৯ টন ওজনের), ১২টি টর্পেডো বোট এবং ৭৮টি সাবমেরিন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স আরো কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ তৈরি করে। ১৯৪০ সালে বসন্তকালের শেষভাগে ৩৫ হাজার টনের বৃহদাকার ব্যাটলশীপ 'রিখেলিউ'কে পানিতে ভাসানো হয়। 'জিনবার্ট' নামে এই শ্রেণীর আরো একটি জাহাজও পানিতে ভাসানো হয়। 'ক্লিমেন্সো' ও 'গ্যাসকোন' নামে আরো দু'টি রণতরী নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

জার্মানীর ট্যাংক উৎপাদন

পাঞ্জার বাহিনী ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমার্ধে জার্মানীর বিজয়ের মূল শক্তি। সাঁজোয়া শব্দের জার্মান প্রতিশব্দ হচ্ছে 'পাঞ্জার'। পাঞ্জার বাহিনীর মানে দাঁড়ায় সাঁজোয়া বাহিনী। সাঁজোয়া বাহিনীর মূল যান ছিল ট্যাংক। তাই সাঁজোয়া বাহিনীকে ট্যাংক সজ্জিত বাহিনী বললে অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য দেশ যেখানে সাঁজোয়া বাহিনী গড়ে তুলতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিল তখন নাৎসী জার্মানী অজেয় পাঞ্জার বাহিনী গড়ে তুলে। জার্মান পাঞ্জার বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য তুলে ধরা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে তখনকার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

প্রথম পাঞ্জার ঃ

যুদ্ধপূর্ব প্রথম পাঞ্জার ঃ যুদ্ধের আগে ১,৮৯৩ টি ট্যাংকের কাঠামো তৈরি হয়। তার মধ্যে ১,৮৬৭টি ট্যাংকে টারেট স্থাপন করা হয় এবং বাদবাকিগুলো কমান্ড অথবা প্রশিক্ষণ যান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পাঞ্জার ঃ

যুদ্ধপূর্ব দ্বিতীয় পাঞ্জার ঃ ট্যাংকের সংখ্যা ১,২২৩

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
পাঞ্জার ২	১৫	৯	২২৩	৩০২	৭৭	৭	-	৬৩৩
পাঞ্জার ২ (এফ)	-	৯০	৪২	২৩	-	-	-	১৫৫
মার্ডার ২	-	-	-	৫১১	২১২	-	-	৭২৩
ওয়াসপি	-	-	-	-	৫১৪	১৪৪	-	৬৫৮
বাইসন	-	-	-	১২	-	-	-	১২
মোট	১৫	৯৯	২৬৫	৮৪৮	৮০৩	১৫১	-	২,১৮১

ভিন্নতা ঃ

- পাঞ্জার ২ (এফ)-অগ্নিনিক্ষেপক ট্যাংক (পুরনো মডেল থেকে পরিবর্তিত)
- মার্ডার ২-পাঞ্জার ২-এর চেসিসে ৭৫ মিলিমিটার কামান সজ্জিত।
- ওয়াসপি-পাঞ্জার ২-এর চেসিসে ১০৫ মিলিমিটার হাল্কা ফিল্ড গান সজ্জিত।
- বাইসন-পাঞ্জার ২-এর চেসিসে ১৫০ মিলিমিটার ভারি পদাতিক গান সজ্জিত।

www.pathagar.com

৩৮তম পাঞ্জার (টি)

যুদ্ধপূর্ব ৩৮তম পাঞ্জার (টি)–৭৮টি ট্যাংক

ধরন	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
পাঞ্জার ৩৮ (টি)	১৫৩	৩৬৭	৬৭৮	১৯৮	-	-	-	১,৩৯৬
মার্ডার ১৩৮	-	-	-	১১০	৭৮৩	৩২৩	-	১,২১৬
গ্রাইল		-	-	-	২২৫	৩৪৬	-	৫৭১
হাউটজার	-	-	-	৩৪৪	-	১,৬৮৭	১,৩৩৫	৩,৩২২
মোট	১৫৩	৩৬৭	৬৭৮	৬৫২	১,০০৮	২,৩৫৬	১,৩৩৫	৬,৫৪৯

ভিন্নতা ঃ

* মার্ডার ১৩৮ (৩য় মার্ডার)-পাঞ্জার ৩৮ (টি)-এর চেসিসে ৭৫মিলিমিটার প্যাক ৪০ গান সজ্জিত।

* মার্ডার ১৩৯(তয় মার্ডার) মার্ডার ৩৮(টি)-এর চেসিসে অধিকৃত সোভিয়েত ৭৬ দশমিক ২ মিলিমিটার কামান সজ্জিত।

* গ্রাইল-পাঞ্জার ৩৮(টি) এর চেসিসে ১৫০ মিলিমিটার ভারি পদাতিক কামান সজ্জিত।

* হাউটজার, জাগডাপাঞ্জার ৩৮ (টি)-বৃহদাকার পাঞ্জার ৩৮ (টি)-এর চেসিসে ৭৫ মিলিমিটার এল/ ৪৮ প্যাক ৩৯ কামান সজ্জিত।

৩য় পাঞ্জার ঃ

যুদ্ধপূর্ব ৩য় পাঞ্জার ঃ ট্যাংকের সংখ্যা ৯৮

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
পাঞ্জার ৩য়						১৫৭	৩৯৬	৫৫৩
পাঞ্জার ৩য় (৫০)					৪৬৬	১,৬৭৩	২৫১	২,৩৯০
পাঞ্জার ৩য় (৫০) এল						৬৪	১,৯০৭	১,৯৭১
পাঞ্জার ৩য় (৭৫)						৪৪৯	২১৩	৬৬২
পাঞ্জার ৩য় (এফ)							১০০	১০০
স্টাগ তয়					১৯২	৫৪০	৯৩	৮২৫
স্টাগ ৩য় (১)				৬৯৫	৩,০১১	৩,৮৪৯	১,০৩৮	৮,৫৯৩
স্টাফ (৪২)				১২	২০৪	৯০৩	৯৮	১,২১৭
	১৫৭	১,০৫৪	২,২১৩	৩,৪০৭	৫,৪৩৫	৪,৭৫২	১,১৩৬	১৬,৩১১

এ হিসাবের মধ্যে পরিবর্তিত আকারে তৈরি ৩য় পাঞ্জারের হিসাব নেই।

ভিন্নতা ঃ

* ৩য় পাঞ্জার-৩৭ মিলিমিটার কামান সজ্জিত।

* ৩য় পাঞ্জার (৫০)-৫০মিলিমিটার এল/৪২ প্যাক গান সজ্জিত।

* ৩য় পাঞ্জার (৭৫)-৭৫মিলিমিটার এল/প্যাক গান সজ্জিত।

www.pathagar.com

* ৩য় পাঞ্জার (এফ)-ফ্লেইমথ্রোয়ার সজ্জিত।
* ৩য় স্টাগ-৭৫ মিলিমিটার এল/২৪ গান সজ্জিত।
* ৩য় স্টাগ (১)-৭৫মিলিমিটার এল/৪৩ গান সজ্জিত।
* স্টাহ (৪৩)-১০৫ মিলিমিটার লাইফ ফিল্ড হাউটজার সজ্জিত।

চতুর্থ পাঞ্জার ঃ

যুদ্ধপূর্ব চতুর্থ পাঞ্জার– ট্যাংকের সংখ্যা ২১১

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
চতুর্থ পাঞ্জার(শর্ট)	৪৫	২৬৮	৪৬৭	১২৪	-	-	-	৯০৪
চতুর্থ পাঞ্জার (লং)				৮৭০	৩,০১৩	৩,১২৬	৩৮৫	৭,৩৯৪
চতুর্থ স্টাগ					৩০	১,০০৬	১০৫	১,১৪১
জাগডাপাঞ্জার(চতুর্থ)						৭৬৯	-	৭৬৯
জাগডাপাঞ্জার (৭০)						৭৬৭	৪৪১	১,২০৮
৪র্থ স্টর্মপাঞ্জার					৬৬	২১৫	১৭	২৯৮
হোরনিসি					৩৪৫	১৩৩	১৬	৪৯৪
হামে (১)					৩৬৮	২৮৯	৫৭	৭১৪
মোবেলওয়াগান						২০৫	৩৫	২৪০
ওয়ারবেলউইন্ড						১০০	৬	১০৬
অস্টউইন্ড						১৫	২৮	৪৩
মোট	৪৫	২৬৮	৪৬৭	৯৯৪	৩,৮২২	৬,৬২৫	১,০৯০	১৩,৩১১

পঞ্চম পাঞ্জার (টাইগার)

	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
প্যান্থার	১,৮৪৩	৩,৭৭৭	৫০৭	৬,১৩২
জাগডপ্যান্থার	১	২২৬	১৯৪	৪৩২
মোট	**১৮৪৪**	**৪,০০৩**	**৭০১**	**৬,৫৬৪**

* প্যান্থার (পঞ্চম পাঞ্জার)-এর ট্যাংকগুলো ছিল ৭৫ মিলিমিটার কামান সজ্জিত।
* জাগডপ্যান্থার- এ বহরের ট্যাংক ডেস্ট্রয়ার ছিল ৮৮ মিলিমিটার কামান সজ্জিত।

৬ষ্ঠ পাঞ্জার (টাইগার)

	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
ফার্স্ট টাইগার	৭৮	৬৪৯	৬২৩	-	১,৩৫০
সেকেন্ড টাইগার	-	১	৩৭৭	১১২	৪৯০
জাগডটাইগার	-	-	৫১	২৮	৭৯
স্টার্মটাইগার	-	-	১৮	-	১৮
মোট	**৭৮**	**৬৫০**	**১,০৬৯**	**১৪০**	**১,৯৩৭**

* টাইগার ১-এ শ্রেণীর ট্যাংকগুলোতে ৮৮ মিলিমিটার ব্যাসের কামান ছিল।
* টাইগার ২-এ ট্যাংকে ৮৮ মিলিমিটার এল/৭১ ব্যাসের কামান সজ্জিত ছিল।

www.pathagar.com

ভিন্নতা

* জাগডটাইগার ঃ ১২৮ মিলিমিটার এল/৫৫ প্যাক ৪৪ গানে সজ্জিত ছিল এ ট্যাংক ডেস্ট্রয়ার।

* স্টর্মটাইগার ঃ টাইগার ওয়ানের চেসিসে ৩৮০ মিলিমিটার ব্যাসের মর্টার স্থাপন করা হয়।

এলিফ্যান্ট ঃ

১৯৪৩

৯০

* এ ট্যাংকের চেসিসে ৮৮ মিলিমিটার ব্যাসের এল/৭১ গান সজ্জিত ছিল।

মোট ট্যাংক উৎপাদন ঃ

	যুদ্ধপূর্ব	যুদ্ধকালে	মোট
পাঞ্জার ১	১,৮৯৩	-	১,৮৯৩
পাঞ্জার ২	১,২২৩	২,১৮১	৩,৪০৪
পাঞ্জার ৩৮ (টি)	৭৮	৬,৫৪৯	৬,৬৭২
পাঞ্জার ৩	৯৮	১৬,৩১১	১৬,৩০৯
পাঞ্জার ৪	২১১	১৩,৩১১	১৩,৫১১
পাঞ্জার ৫ (প্যান্থার)		১,৯৩৭	১,৯৩৭
পাঞ্জার ৬ (টাইগার)			৯০
এলিফ্যান্ট	৯০	৩,৫০৩	৫০,৪৩৯

www.pathagar.com

জার্মানী ও মিত্রদেশের যুদ্ধ বিমান তৈরির হিসাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ উভয় প্রয়োজনে বিমান তৈরিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এসব বিমানের মধ্যে ছিল বোমারু, জঙ্গী, পরিবহন ও প্রহরাদানকারী বিমান। নীচের ছকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর থেকে শেষ বছর পর্যন্ত মিত্রপক্ষের কয়েকটি দেশ ও জার্মানীর বিমান উৎপাদনের হিসাব উল্লেখ করা হলো।

দেশ	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
যুক্তরাজ্য	৭,৯৪০	১৫,০৪৯	২০,০৯৪	২৩, ৬৭২	২৬,২৬৩	২৬,৪৬১	১২,০৭০
যুক্তরাষ্ট্র	২,১৪১	৬,০৮৬	১৯,৪৩৩	৪৭,৮৩৬	৮৫,৮৯৮	৯৬,৩১৮	৪৬,০০১
রাশিয়া	১০,৩৪২	১০,৫৬৫	১৫,৭৩৫	২৫,৪৩৬	৩৪,৯০০	৪০,৩০০	২০, ৯০০
জার্মানী	৮,২৯৫	১০,৮২৬	১২,৪০১	১৫,৪০৯	২৪,৮০৭	৪০,৫৯৩	৭,৫৪০
জাপান	৪,৪৬৭	৪,৭৬৮	৫,০৮৮	৮,৮৬১	১৬,৬৯৩	২৮,১৮০	৮,২৬৩

বছরওয়ারী জার্মানীর বিমান উৎপাদনের তালিকা ঃ

বোমারু বিমান

ধরন	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
এ্যারাডো এআর-২৩৪	-	-	-	-	১৫০	৬৪	-	২১৪
ডোর্নিয়ার ডিও-১৭	২১৫	২৬০	-	-	-	-	-	৪৭৫
ডোর্নিয়ার ডিও-২১	৭ ১	২০	২৭৭	২৬৪	৫০৪	-	-	১,৩৬৬
হেইঙ্কেল এইচই-১১১	৪৫২	৭৫৬	৯৫০	১,৩৩৭	১,৪০৫	৭৩৫	-	৫,৬৫৬
হেইঙ্কেল এইচই-১৭৭	-	-	-	১৬৬	৪১৫	৫৬৫	-	১,১৬৬
জার্কার্স জেইউ-৮৮৬৯		১,৮১৬	২,১৪৬	২,২৭০	২,১৬০	৬৬১	-	৯,১২১
জার্কার্স জেইউ-১৮৮		-			১৬৫	৩০১	-	৪৬৬
জার্কাস জেইউ-৩৮৮	-	-	-	-	-	৪	-	৪

জঙ্গীবিমান

ধরন	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
ডোর্নিয়ার ডিও ১৭		৯	-	-	-	-	-	৯
ডোর্নিয়ার ডিও ২১৭			-	-	-	১৫৭	২০৭	৩৬৪
ডোর্নিয়ার ডিও ৩৩৫			-	-	-	৭	৪	১১

www.pathagar.com

ফোকি-ওয়াফ এফডব্লিউ১৯০ -	-	২২৮	১৮৫০	২১৭১	৭৪৮৮	১৬৩০	১৩,৩৭৬
ফোকি-ওয়াফ টিএ১৫২	-	-	-	-	৩৪	?	১৫০
ফোকি-ওয়াফ টিএ১৫৪	-	-	-	-	৮	-	৮
হেইঙ্কেল এইচই১৬২		-	-	-	-	১১৬	১১৬
হেইঙ্কেল এইচই২১৯	-	-	-	১১	১৯৫	৬২	২৬৮
জার্কার্স জেইউ৮৮	৬২	৬৬	২৫৭	৭০৬	২৫১৩	৩৫৫	৩৯৬৪
মেসার্সমিট এমই১০৯ ৪৪৯	১,৬৬৭	২,৭৬৪	২,৬৫৭	৬,০১৩	১২,৮০৭	২,৭৯৮	২৯,১৫৫
মের্সাসমিট এমই১১০	১৫৬	১০০৬	৫৯৪	৫০১	৬৪১	১২৮	৩,২৮
মের্সাসমিট এমই১৬৩					৩২৭	৩৭	৩৬৪
মেসার্সমিট এমই২১০		৯২	৯৩	৮৯	৭৪	৩৭	৩৪৮
মেসার্সমিট এমই২৬২					৫৬৪	৭৩০	১,২৯৪
মেসার্সমিট এমই৪১০					২৭১	৬২৯	৯১০

গ্রাউন্ড এ্যাটাক বিমান ঃ

ধরন	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
ফোকি-ওয়াফ এফডব্লিউ১৯০	-		৬৮	১,১৮৩	৪,২৭৯	১,১০৪	৬,৬৩৪
হেইনশেল এইচএস১২৯	-	৭	২২১	৪১১	৩০২	-	৮৪১
জাঙ্কার্স জেইউ৮৭১৩৪	৬০৩	৫০০	৯৬০	১,৬৭২	১,০১২	-	৪,৮৮১
জাঙ্কার্স জেইউ৮৮	-	-	-	-	৩	-	৩

পর্যবেক্ষণ বিমান

ধরন	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
ডোর্নিয়ার ডিও১৭	১৬	-	-	-	-	-	১৬
ডোর্নিয়ার ডিও২১৫	৩		৯২	৬	-	-	১০১
ফোকি-ওয়াফ এফডব্লিউ১৮৯	৬	৩৮	২৫০	৩২৭	২০৮	১৭	৮৪৬
ফোকি-ওয়াফ এফডব্লিউ২০০	১	৩৬	৫৮	৮৪	৭৬	৮	২৬৩
হেইনশেল এইচএস১২৬	১৩৭	৩৬৮	৫	-	-	-	৫১০
জার্কাস জেইউ৮৮	৩৩০	৫৬৮	৫৬৭	৩৯৪	৭২	-	১,৯১১
জার্কাস জেইউ১৮৮	-	-	-	১০৫	৪৩২	৩৩	৫৭০
জার্কাস জেইউ২৯০	-	-	-	-	২৩	১৮	৪১
জার্কাস জেইউ৩৮৮	-	-	-	-	৮৭	১২	৯৯
মেসার্সমিট এমই১০৯	-	১২৬	৮	১৪১	৯৭৯	১৭১	১,৩২৮
মেসার্সমিট এমই১১০	৭৫	১৯০	৭৯	১৫০	-	-	৪৯৪
মেসার্সমিট এমই২১০	-	-	২	২	-	-	৪
মেসার্সমিট এমই৪১০	-	-	-	-	২০	৯৩	১১৩

উভচর বিমান ঃ

ধরন

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
এ্যারাডো এ আর১৯৬	২২	১০৪	৯৪	১০৭	১০৪	-	-	৪৩৫
ব্লোহম এন্ডভস বিটি১৯৬	-	-	-	-	৪	-	-	৪
ব্লোহম এন্ডভস বিটি ১৩৮	৩৯	৮২	৮৫	৭০	-	-	-	৪৩৫
ডোর্নিয়ার ডিও১৮	২২	৪৯	-	-	-	-	-	৭১
ডোর্নিয়ার ডিও২৪	-	১	৭	৪৬	৮১	-	-	১৩৫
হেইঙ্কেল এইচএ১১৫	৫২	৭৬	-	-	১৪১	-	-	২৬৯

পরিবহন বিমান

ধরন

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	মোট
গোথা জিও২৪৪		-	-	-	৪৩	-	-	৪৩
জাঙ্কার্স জেইউ৫২		১৪৫	৩৮৮	৫০২	৫০৩	৮৮৭	৩৮৯	২,৮০৩
জাঙ্কার্স জেইউ২৫২		-	-	-	১৫	-	-	১৫
জাঙ্কার্স জেইউ৩৫২		-	-	-	-	১	৪৯	৫০
মের্সাসমিট এমই ৩২৩		-	-	-	২৭	১৪০	৩৪	২০১

www.pathagar.com

জার্মান সশস্ত্র বাহিনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমার্ধে রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনী ছিল অজেয়। কয়েক বছরের মধ্যে তারা ব্লিৎসক্রীগ গতিতে অভিযান চালিয়ে দু'চারটি নিরপেক্ষ দেশ বাদে গোটা ইউরোপ দখলে সক্ষম হয়। সামরিক ইতিহাসে সাফল্যের রেকর্ডে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছাড়া আর কেউ হিটলারের সমকক্ষ নন। তিনি কিভাবে একটি মৃতপ্রায় জাতিকে মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে এনে গোটা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, মানুষের প্রচলিত জ্ঞানেরও অতীত। হিটলারের নেতিবাচক দিকগুলোই শুধু আমরা জানি। জানি না কেবল তার অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলী ও অতুলনীয় দেশপ্রেম।

ক্ষমতায় এসেই হিটলার তার জাতিকে ভার্সাই চুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি যে এ চুক্তি লংঘন করে জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করবেন তা অনুমান করা মোটেও কষ্টকর ছিল না। হিটলার তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মেইন ক্যাফ-এ বার বার ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে খেদ প্রকাশ করেন। তিনি তার প্রতিটি ভাষণে এ চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। হিটলার তার ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতিতে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির শর্ত অমান্য করবেন। এ চুক্তি বলবৎ থাকায় জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন ১ লাখের বেশী বাড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই হিটলার কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি নাৎসী দলের কট্টর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠন করেন স্টর্ম এ্যাবটেইলাং (Sturm Abteilung) বা এসএ। ১৯৩৪ সালের মধ্যে এ মিলিশিয়াদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫ লাখে। এসএ'র গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা নাৎসী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে পড়েন। জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসারগণও শংকিত হয়ে পড়েন। জার্মান সেনা অফিসারগণ ভাবছিলেন, আর্নেস্ট রোহম ও এসএ অতি সত্বর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। কিন্তু হিটলার তাদের আশংকা অমূলক বলে প্রমাণ করেন। এক রাতে তার নির্দেশে এসএ'র ৪ শ' কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। সে রাতকে বলা হয় 'নাইট অব দ্য নাইভস।' এসএ'কে নেতৃত্বহীন করে হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীকে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠার সুযোগ করে দেন।

ভার্সাই চুক্তিতে দুর্বলতাও ছিল। এ চুক্তিতে জার্মান নৌ-বাহিনীতে সাবমেরিন নিষিদ্ধ করা হলেও একথা উল্লেখ করা হয়নি যে, জার্মানী বিদেশে সাবমেরিন ক্রুদের প্রশিক্ষণ দিতে কিংবা নিষিদ্ধ জার্মান লুফটওয়াফে বা বিমান বাহিনীর পাইলটরা বেসামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না। ভার্সাই চুক্তির এসব অস্পষ্টতার

www.pathagar.com

সুযোগে হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনে বদ্ধপরিকর হন। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন তিন গুণ বৃদ্ধি করে ৩ লাখে উন্নীত করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি জার্মান বিমান মন্ত্রণালয়কে ১ হাজার যুদ্ধবিমান তৈরির নির্দেশও দেন। প্রথম দু'বছর অত্যন্ত গোপনে জার্মানীর সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে। ১৯৩৫ সালে ইউরোপ জানতে পারলো যে, নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা আড়াই হাজার এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৩ লাখে পৌঁছেছে। সমরাস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যায় ফ্রান্স ছিল জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ এগিয়ে। তাই হিটলার ভারসাম্য রক্ষায় ফ্রান্সের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রস্তাব দেন যে, সামরিক শক্তিতে হয়তো ফ্রান্সকে জার্মানীর সমপর্যায়ে নেমে আসতে হবে। নয়তো জার্মানীকে ফ্রান্সের সমপর্যায়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে হবে। ফ্রান্স জার্মানীর এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে হিটলার জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের নির্দেশ দেন। সে বছর থেকে জার্মান সেনাবাহিনীতে বছরে ৩ লাখ লোককে রিক্রুট করা শুরু হয়। ১৯৩৮ সাল নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়। ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮টি।

জার্মান বিমানবাহিনী প্রধান ও হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিল্ড মার্শাল হ্যারমেন গোয়েরিং

বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার বিরুদ্ধে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণও ছিল। সে সময় বৃটেন মহামন্দায় বিধ্বস্ত তার অর্থনীতি পুনর্গঠনে ব্যস্ত ছিল। তার পক্ষে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, ফরাসীরা সম্ভাব্য জার্মান হামলার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার উপর জোর দেয়। দেশটি দু'দেশের সীমান্তের মাঝখানে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে তার

www.pathagar.com

সময় ও অর্থ ব্যয় করে নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল ভার্সাই চুক্তির শর্ত লংঘনে জার্মানীর কার্যকলাপে বৃটেনের মৌন সম্মতি ছিল। ভার্সাই চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, জার্মান নৌ-বাহিনীতে কোনো সাবমেরিন থাকবে না এবং তাদের নৌ-বহরে যুদ্ধজাহাজ থাকবে মাত্র ৬টি। তবে যুদ্ধজাহাজগুলোর কোনোটির ওজন ১০ হাজার টনের বেশী হবে না।

১৯৩৫ সালের জুনে এ্যাংলো-জার্মান নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি জার্মানীকে বৃটিশ নৌ-বহরের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ নৌ-শক্তি গড়ে তোলার সুযোগ দেয়। তাছাড়া, জার্মানী বৃটেনের সমান সাবমেরিন তৈরির সুযোগও পেয়ে যায়। জার্মানীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরে বৃটেনের কয়েকটি যুক্তি ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, যে কোনো মূল্যে জার্মানী তার নৌ-বহরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে। তাই বৃটেন মনে করছিল, দু'টি দেশের মধ্যে নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। অন্যদিকে, বৃটেনের কোনো কোনো মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো খুব কঠিন এবং এসব শর্ত শিথিল করা প্রয়োজন। বৃটেন বিশ্বাস করতো, ইউরোপে মিলেমিশে বসবাস করতে হলে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। এটাও মনে করা হতো, চুক্তি হলে হিটলার সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ইউরোপ উপকৃত হবে। বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে জার্মানী ইউরোপে নিজেকে কোণঠাসা ভাববে না। ইউরোপ স্থিতিশীল হবে এবং জার্মানীর ক্ষোভ দূর হবে। তাছাড়া, জার্মানী চুক্তি মেনে চললে দেশটির নৌ-বাহিনীর আকার ও আয়তন সম্পর্কে বৃটেনের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণকালে জার্মান সেনাবাহিনীতে ডিভিশন ছিল ৯৮টি। এসব ডিভিশনের কয়েকটির অস্ত্রশস্ত্রের মান তত উন্নত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকরাও নতুন করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। এসব ঘাটতি সত্ত্বেও তখন জার্মান সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ করার মতো ১৫ লাখ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। পাঞ্জার বাহিনী ছিল জার্মান বাহিনীর মূল স্তম্ভ। জার্মান ভাষায় সাঁজোয়া বাহিনীকে বলা হতো 'পাঞ্জার' বাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীতে সাঁজোয়া বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। জার্মানরাই সেনাবাহিনীতে প্রথম পাঞ্জার বাহিনী সংযোজন করে। ট্যাংক ছিল পাঞ্জার বাহিনীর মূল অস্ত্র। হাজার হাজার ট্যাংকের সাহায্যে পাঞ্জার ডিভিশন গঠন করা হয়। জার্মান সেনাবাহিনীতে তখন কি পরিমাণ ট্যাংক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ১৯৪৩ সালেই জার্মানীতে ১৩ হাজার ট্যাংক তৈরি হয়।

নাৎসী জার্মানীতে সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হতো ওয়ারম্যাট। তাছাড়া ওয়াফেন-এসএস-ও ছিল সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৩৯ সাল নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীতে ৯টি পাঞ্জার ডিভিশন গড়ে উঠে। এসব পাঞ্জার ডিভিশনের প্রতিটিতে ট্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩২৮টি, সহায়ক ব্যাটালিয়ন ছিল ৮ টি এবং আরো ছিল ৬ টি আর্টিলারি ব্যাটারি।

www.pathagar.com

১৯৪০ সালে জার্মান সেনাবাহিনী যখন পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়াইয়ে জড়িত হয়ে পড়ে তখন তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ এবং ট্যাংক ছিল আড়াই হাজার। অন্যদিকে, ফরাসী সেনাবাহিনী তখন রণাঙ্গনে ৫০ লাখ লোক নিয়োজিত করার সামর্থ্য রাখতো। বিমান বাহিনী ও যান্ত্রিক সহায়তাপুষ্ট ২৫ ডিভিশন সৈন্যের ফরাসী বাহিনী অনায়াসে বিজয়ী হতে পারতো। কিন্তু জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিযানকালে জার্মান সেনাবাহিনী আরো শক্তিশালী হয়। রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর ২ লাখ সৈন্যসহ ৪০ লাখ জার্মান সৈন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপারেশন বারবারোসায় অংশ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জার্মান পদাতিক ডিভিশনের সংখ্যা ছিল ১৪২টি, পাঞ্জার ডিভিশন ছিল ১৭ টি এবং ট্যাংক ছিল ৪ হাজার। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন বারবারোসা এবং ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের নরমান্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণকালে বিপুল প্রাণহানি সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী নাগাদ জার্মান সেনাবাহিনীতে ১৬৮ ডিভিশন পদাতিক সৈন্য ও ২৫ ডিভিশন পাঞ্জার ছিল। ওয়াফেন-এসএস'র ছিল ৭ টি সাঁজোয়া ডিভিশনসহ ২৩টি ডিভিশন।

হিটলার শূন্য হাতে দেশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে জার্মান সেনাবাহিনীতে কোনো পাঞ্জার ডিভিশন ছিল না। সে সময় পদাতিক ডিভিশন ছিল ৭ টি, ১ লাখ ১৭ হাজার ৩৫০ টন পরিবহন ক্ষমতার মধ্যে যুদ্ধজাহাজ সীমিত ছিল। নৌ-বাহিনীতে কোনো সাবমেরিন ছিল না। বিমান বাহিনীতে কোনো যুদ্ধবিমানও ছিল না। নৌ-সৈন্য ছিল ১৫ হাজার। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে পাঞ্জার ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি, পদাতিক ডিভিশনের সংখ্যা ২১৪, নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলোর সম্মিলিত পরিবহন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৬৩ হাজর ১৭১ মেট্রিক টন, সাবমেরিন ১৮৯ টি এবং যুদ্ধবিমান ৪০ হাজার।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান বিমান বাহিনীতে যেসব যুদ্ধবিমান তৈরি হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) এ্যারাডো এ আর (১৭ প্রকার), (২) ব্লোহম ইউন্ড ভস বিভি (৭ প্রকার), (৩) ব্যাচেম বা ন্যাটার, (৪) ডোর্নিয়ার, (৫) ফিসেলার, (৬) ফকে, (৭) হেইঙ্কেল (৮) হেইনশেল (৪ প্রকার) (৯) জাংকার্স (১৪ প্রকার) ও (১০) মেসার্সমিট (১৮ প্রকার)।

শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠনে ভার্সাই চুক্তি একটি অনতিক্রম্য বাধা বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও নাৎসী জার্মানী সাবমেরিন বহর গঠন করে। জার্মান সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজকে সংক্ষেপে বলা হতো ইউ-বোট। জার্মান ভাষায় ইউ-বোট বা Undersee Boat ছিল শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজের জন্য একটি ভয়ংকর অস্ত্র। আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর সাগরে ১৯৪১ সালের ৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ দিনের যুদ্ধে একটি জার্মান সাবমেরিনের বিপরীতে ১৬ টি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হয়। ভাসমান অবস্থায় ইউ-বোট আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য হলেও এটি পানির নীচে ডুব দিলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতো। ১৯৩৫-৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানী ২৬ প্রকার ইউ-বোট তৈরি

www.pathagar.com

করে। ভার্সাই চুক্তি বলবৎ থাকায় ১৯৩৯ সালে মাত্র ৫৭ টি উপকূলীয় ও সমুদ্রগামী ইউ-বোট নিয়ে জার্মানীকে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়। যুদ্ধের শেষ বছরে জার্মান ইউ-বোট উৎপাদন চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে।

কমিউনিস্ট রেড আর্মির হামলা থেকে জার্মান শহরগুলো রক্ষায় হিটলার সেনাবাহিনীকে সমর্থনদানে গণমিলিশিয়াও গঠন করেছিলেন। নিয়মিত সার্ভিসের জন্য প্রবীণ ও তরুণদের নিয়ে এ গণমিলিশিয়া গঠন করা হয়। অর্থনীতিতে বিপুল চাপ পড়ায় এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদা পূরণে হিমশিম অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এ গণবাহিনী ছিল অর্ধসজ্জিত।

বিশাল জার্মান বাহিনীতে ছিলেন ১৭ জন ফিল্ড মার্শাল। যুদ্ধকালে তাদের মধ্যে ১০ জনকে কমান্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে হিটলারকে হত্যার চক্রান্তে জড়িত থাকার দায়ে ৩ জন ফিল্ড মার্শালের মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিযানকালে নিহত হন ২জন ফিল্ড মার্শাল। একজন মিত্রবাহিনীর কাছে বন্দী হন এবং আরেকজন গোটা যুদ্ধের সময় নির্বিবাদে দায়িত্ব পালন করেন। ৩৬ জন ছিলেন পূর্ণাঙ্গ জেনারেল। তাদের মধ্যে ২৬ জনকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ৩ জন জেনারেলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২ জনকে অসম্মানজনকভাবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ৭ জন যুদ্ধে নিহত হন। তবে শৃঙ্খলাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া ছাড়া সসম্মানে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন মাত্র ৩ জন জেনারেল।

জার্মান সেনাবাহিনীর আয়তন ছিল বিশাল। এতে ছিল ২৯টি আর্মি গ্রুপ (হেরসগ্রুপেন), আর্মি ছিল ৩৩ টি (আর্মি ওভারকমান্ডো), সাঁজোয়া গ্রুপ ৯ টি (পাঞ্জার গ্রুপ), কোর ৮৬ টি। প্রতিটি কোরে ছিল অন্তত ৮টি ডিভিশন। প্রতিটি ডিভিশনে সৈন্য ছিল প্রায় ১৬ হাজার। শৃংখলা ছিল কিংবদন্তীতুল্য।

১৯৩৫ সালে ওয়ারম্যাট রাইখওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯২৩ সালে রাইখওয়ার গঠন করা হয়েছিল। আক্ষরিকভাবে জার্মান শব্দ 'ওয়ারম্যাট' বলতে বুঝায় কোনো একটি দেশের পুরো সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেলবার্গের মৃত্যু হলে সকল সৈন্যকে হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে নির্দেশ দেয়া হয়। ঐতিহাসিক রুডিগার ওভারম্যান্সের মতে, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান ওয়ারম্যাটে সক্রিয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮২ লাখ। তার মধ্যে ৫৩ লাখ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং আনুমানিক ১ কোটি ১০ লাখ সৈন্য শত্রুর হাতে আটক হয়। তবে আটক সৈন্যদের মধ্যে কতজন মারা যায় তার সংখ্যা জানা যায়নি।

আইনগতভাবে জার্মান চ্যান্সেলার ছিলেন ওয়ারম্যাটের সর্বাধিনায়ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রশাসন ও সামরিক কর্তৃত্ব ছিল ওয়ার মিনিস্ট্রির আওতায়। ওয়ার্নার ভন ব্লুমবার্গ ছিলেন এ মিনিস্ট্রির প্রধান। ১৯৩৮ সালে তিনি পদত্যাগ করলে ওয়ার মিনিস্ট্রি বিলুপ্ত করে দিয়ে উইলহেম কিটেলের অধীনে সশস্ত্র বাহিনী হাই কমান্ড গঠন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো 'ওভারকমান্ডো দার ওয়ারম্যাট' বা সংক্ষেপে ওকেডব্লিউ। ওকেডব্লিউ সকল সামরিক তৎপরতায় সমন্বয় সাধন করতো। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ছিল নিজস্ব হাই কমান্ড। সেনাবাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো

www.pathagar.com

'ওভারকমান্ডো দার হেরস' (ওকেএইচ), নৌ-বাহিনীর হাই কমান্ডকে 'ওভারকমান্ডো দার মেরিন' (ওকেএম) এবং বিমান বাহিনীর হাই কমান্ডকে বলা হতো 'ওভারকমান্ডো দার লুফটওয়াফে' (ওকেএল)। প্রতিটি হাই কমান্ডের ছিল নিজস্ব জেনারেল স্টাফ। নাৎসী আমলে জার্মান সেনাবাহিনী হের, বিমান বাহিনী লুফটওয়াফে এবং নৌ-বাহিনী ক্রিগসমেরিন হিসেবে পরিচিত ছিল। এডলফ হিটলার একসময় সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত থাকায় এবং পরে সেনাবাহিনী প্রধান পদ অলংকৃত করায় তাকে হের হিসেবে সম্বোধন করা হতো।

ওকেডব্লিউ (সশস্ত্র বাহিনী হাই কমান্ড) ঃ

সুপ্রীম কমান্ডের প্রধান—ফিল্ড মার্শাল উইলহেম কিটেল

অপারেশন স্টাফ প্রধান—কর্নেল জেনারেল আলফ্রেড জোডল।

ওকেএইচ (আর্মি হাই কমান্ড)

কমান্ডার-ইন-চীফ

কর্নেল জেনারেল ওয়ার্নার ভন ফ্রিটস (১৯৩৫-১৯৪১)

ফিল্ড মার্শাল ওয়ালথার ভন ব্রাউশিটস (১৯৩৮-১৯৪১)

ফুয়েরার ও রাইখ চ্যান্সেলার এডলফ হিটলার (১৯৪১-১৯৪৫)

ফিল্ড মার্শাল ফার্ডিনান্ড শোরনার (১৯৪৫)

ওকেএম (নৌ-হাই কমান্ড)

নেভি কমান্ডার্স- ইন–চীফ

গ্র্যান্ড এডমিরাল এরিখ রীডার (১৯২৮-১৯৪৩)

গ্রান্ড এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিটস (১৯৪৩-১৯৪৫)

জেনারেল এডমিরাল হ্যান্স জর্জ ভন ফ্রিডবার্গ (১৯৪৫)

ওকেএল (এয়ার ফোর্স হাই কমান্ড)

কমান্ডার-ইন-চীফ

রাইখ মার্শাল হেরম্যান গোয়েরিং (---১৯৪৫)

ফিল্ড মার্শাল রবার্ট রিটার ভন গ্রেইম (১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু জার্মানীর ভৌগলিক সীমানায় বসবাসকারী জার্মানরাই নয়, অন্যান্য দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মানরাও ওয়ারম্যাটে সার্ভিসে ছিল। তাছাড়া ওলন্দাজ, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয় ও স্ক্যান্ডেনেভীয়দের কোনো কোনো গ্রুপ বা গোষ্ঠীও জার্মান সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে। রাশিয়া অভিযানকালে জার্মানদের সঙ্গে ভিন্নমতাবলম্বী রুশরা যোগ দেয়। এসব রুশকে নিয়ে গঠন করা হয় 'রুশ লিবারেশন আর্মি।' অরুশদের একটি অংশও জার্মানদের সঙ্গে যোগ দেয়। এসব অরুশরা 'অসটেলেজিয়ন' গঠন করে। জেনারেল আর্নেস্ট আগস্ট কস্ট্রিং এসব ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন। জার্মান সেনাবাহিনীতে অনুগত বিদেশীদের সংখ্যা ছিল ৫ শতাংশ।

www.pathagar.com

জার্মান সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিদেশী সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতামত। সোভিয়েত রেড আর্মির লেঃ জেনারেল খোজিন তার '১৯৪৩ সালে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের কৌশল ও ট্যাকটিকস' নামে গ্রন্থে বলেছেন, 'ব্যাপকভাবে দাবি করা হয়, জার্মান সেনাবাহিনী অজেয়। কিন্তু এ দাবি সত্যি নয়। ১৯৩৯-৪০ সালে জার্মান সেনাবাহিনী যেসব দেশ দখল করেছে সেসব দেশ দখলে তারা চক্রান্ত ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, বিজিত ফরাসী সরকারের বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে জার্মান এজেন্টদের সম্পর্ক ছিল। জার্মানরা যেখানেই প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে সেখানে তারা তাদের সংখ্যাধিক্য ও সমরাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে তা গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৩৯ সালে নাৎসীরা ৪৫টি ডিভিশন নিয়ে পোল্যান্ডে হামলা চালায়। প্রতিটি জার্মান পদাতিক ডিভিশনে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। অন্যদিকে, পোল্যান্ডের ছিল ৪০ ডিভিশন সৈন্য। তাদের প্রতিটি ডিভিশনে সৈন্য ছিল সাড়ে ১০ হাজার। জার্মানদের ভারি কামানের সংখ্যা ছিল পোলিশদের তুলনায় দ্বিগুণ। পোল্যান্ডের ৬শ' কামানের বিপরীতে জার্মান কামানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪শ'। পোল্যান্ডের ২ হাজার ৪ শ' হাল্কা কামানের বিপরীতে জার্মানদের ছিল ৩ হাজার ১ শ'। পোল্যান্ডের ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ছিল ৬ শ'। পক্ষান্তরে, জার্মানদের ছিল ৪ হজার ৭৯০টি। পোল্যান্ডের ৯১০টি ট্যাংকের বিপরীতে জার্মানদের ছিল ৩ হাজার ৩৫০টি এবং ১ হাজার ২ শ' বিমানের বিপরীতে আড়াই হাজার বিমান। সমরাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও জার্মানীর রাইনহার্ড ট্যাংক ডিভিশন ওয়ারশতে বিধ্বস্ত হয়।'

জেনারেল খোজিন আরো লিখেছেন, ' ১৯৪০ সালের ১০ মে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গে মিত্রবাহিনীর মূল হামলার বিরুদ্ধে জার্মানরা ১০৭ টি পদাতিক ও ১০টি ট্যাংক ডিভিশন ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, মিত্রবাহিনী ব্যবহার করেছিল ৬৩ টি পদাতিক ডিভিশন, ৪ টি হাল্কা যান্ত্রিক ও ৬ টি ক্যাভালরি ডিভিশন। বৃটিশ, বেলজীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজ আর্মি নিয়ে মিত্রবাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনী কোনো একক কমান্ডে ছিল না। অপারেশন ও যুদ্ধের কৌশল নিয়ে ছিল আবার তাদের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরবিরোধী মতামত। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক সুরক্ষিত অবস্থানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার মতো কোনো অভিজ্ঞতা জার্মান সেনাবাহিনীর ছিল না। পোল্যান্ডের পশ্চিম ফ্রন্ট ছিল পুরোপুরি অরক্ষিত এবং ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল অতিমাত্রায় দুর্বল। জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্সের চমৎকার রাস্তাগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যাজিনো লাইন অতিক্রমে সক্ষম হয়।'

www.pathagar.com

জার্মানীর আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা

নাৎসী জার্মানী যুদ্ধকালে আণবিক বোমা তৈরির জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তবে তারা তাদের প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছিল তা কারো পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। আত্মসমর্পণের পূর্বাহ্নে জার্মানরা তাদের আণবিক বোমা সংক্রান্ত দলিলপত্র ও প্যাটেন্ট ধ্বংস করে ফেলে। তা সত্ত্বেও মিত্রবাহিনী কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষম হয়। তাতে দেখা গেছে যে, জার্মানী আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল পিছিয়ে। আলোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ১৯৪৩ সাল থেকে যুদ্ধের গতি জার্মানীর বিপক্ষে চলে না গেলে তারাই হতো পৃথিবীর প্রথম আণবিক শক্তি। এটা স্বীকৃত যে, জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান ও ফ্রিটস স্ট্রাসম্যানের গবেষণার মধ্য দিয়ে আণবিক যুগের সূচনা হয়। বিজ্ঞানী অটো হান ছিলেন নিউক্লিয়ার ফিশনের সহযোগী আবিষ্কারক।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বের প্রথম আণবিক শক্তির অধিকারী দেশ বলে দাবি করে থাকে। আমাদের অনেকেই তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, শত্রু জার্মানী থেকে পাচারকৃত আণবিক কাঁচামাল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আণবিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। যে ম্যানহাটন প্রকল্প থেকে আমেরিকার আণবিক বোমা তৈরি হয়েছে সে প্রকল্পে আণবিক অস্ত্র তৈরির মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এসেছিল জার্মানী থেকেই। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্রিটিকাল মাস গ্রন্থের লেখক কার্টার হাইড্রিক লস আলামোসের ব্রাডবেরী বিজ্ঞান জাদুঘরে তার পুস্তকের প্রকাশনা উৎসবে দাবি করেছেন, নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণের ১১ দিন পর মার্কিন মেরিনদের প্রহরায় ৫৬০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এবং আণবিক বোমা তৈরির অন্যান্য সরঞ্জাম বোঝাই ইউ-২৩৪ নম্বরের একটি জার্মান সাবমেরিন নিউ হ্যাম্পশায়ারে নৌ-বাহিনীর একটি পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছে। এসব সামগ্রী পরে ম্যানহাটন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হয়। জার্মানী থেকে আনীত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আণবিক বোমা তৈরি করতে সক্ষম হন। এ আণবিক বোমাই পরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করছেন, নাৎসী জার্মানীই প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০৫ সালে বার্লিনের ঐতিহাসিক রেইনার কার্লসাচ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত তার 'হিটলার্স বোম্বি' নামে পুস্তকে দাবি করেছেন, নাৎসী জার্মানী থুরিঙ্গিয়ায়

www.pathagar.com

ওরড্রাফের কাছে রুজেন দ্বীপে এসএস'র তত্ত্বাবধানে অপরিশোধিত একটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ফলাফল পরীক্ষার জন্য বেছে নেয়া হয় যুদ্ধ বন্দীদের। আণবিক বোমা বিস্ফোরণে অজ্ঞাতসংখ্যক বন্দী নিহত হয়। ঐতিহাসিক রেইনার তার বক্তব্যের পক্ষে জোরালো প্রমাণও দিয়েছেন। তার প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি জার্মান পত্রিকায় নাৎসী আমলে আণবিক বিস্ফোরণের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক রেইনারের পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, নাৎসীরা একটি রেডিওলজিক্যাল বোমা (ডার্টি বোমা) তৈরিতে সফল হয়েছিল। তবে বোমাটি নিউক্লিয়ার ফিশন শক্তিসম্পন্ন সত্যিকার আণবিক বোমা ছিল না। হিটলার্স বোম্বি পুস্তকের প্রকাশক বলেছেন, ১৯৪১ সালে জার্মানীর প্লুটোনিয়াম প্যাটেন্ট তৈরি এবং এ প্লুটোনিয়াম প্যাটেন্ট পরীক্ষার প্রমাণও রেইনার পেশ করেছেন। প্রকাশক বলেন, ঐতিহাসিক রেইনার তার দাবির স্বপক্ষে বিস্ফোরণের একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিস্ফোরণে নিহতদের লাশ প্রত্যক্ষকারী আরেকজন সাক্ষীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। রেইনার দাবি করেছেন, তিনি বিস্ফোরণ স্থলের মাটির রেডিওএ্যাকটিভ নমুনা সংগ্রহ করে নাৎসী জার্মানীর অপরিশোধিত আণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। অন্যদিকে, ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে কৌসুলিরা জার্মান সমরাস্ত্রমন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ারকে নাৎসীদের সন্দেহভাজন আণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জার্মানীর ডার্টি বোমা পরীক্ষার শিকার লোকজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করার জন্য কৌসুলীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

জার্মানীর আণবিক বোমা কর্মসূচির জনক বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ

www.pathagar.com

মূল স্রোতের মার্কিন বিজ্ঞানীরা নাৎসী জার্মানীর আণবিক বোমা তৈরির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে অন্যরা দ্বিমত পোষণ করে অধ্যাপক কুর্ট দিয়েবনারের একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, অধ্যাপক দিয়েবনারের প্রকল্প ছিল ড. ওয়ার্নার হাইসেনবার্গের প্রকল্পের চেয়ে বহু উন্নত। আমেরিকার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মার্ক ওয়াকার ফিজিক্স টুডে নামে একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে লিখেছেন, 'জার্মানরা ফিউশনের (হাইড্রোজেন বোমা) উপর গবেষণা চালিয়েছে, তারা প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে বোমা তৈরির ব্যাপারে ছিল সচেতন এবং তারা কোনো না কোনো ধরনের ডিভাইসের পরীক্ষা চালিয়েছিল। প্লুটোনিয়াম ডিভাইস প্রাপ্তি সে কথাই প্রমাণ করে।'

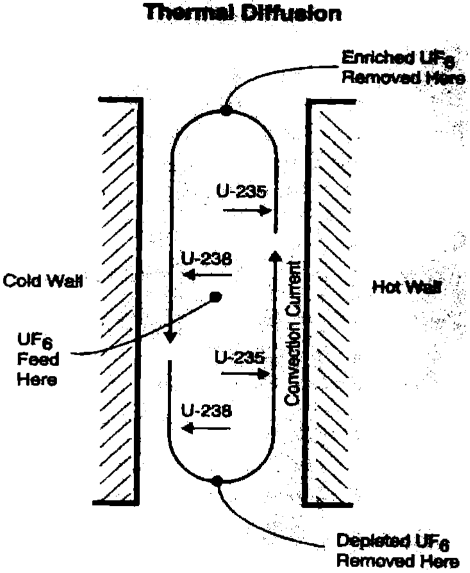

জার্মানীর আণবিক বোমা তৈরির একটি নকশা

আমেরিকার ম্যানহাটন প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও প্রশাসকগণ স্বীকার করেছেন, তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আণবিক বোমা তৈরিতে জার্মানীর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। নাৎসী জার্মানীর আণবিক বোমা ব্যবহারের আতংকে বৃটিশ সরকার 'বৃটিশ টিউব এ্যালোয়েস' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পই পরবর্তীতে ড. ওপেনহেইমারের তত্ত্বাবধানে আমেরিকার আণবিক বোমা কর্মসূচী ম্যানহাটন প্রকল্পে পর্যবসিত হয়। যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হচ্ছে জার্মানরা যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তেও ব্যবহারোপযোগী একটি বোমা তৈরির কাছাকাছি পৌছতে পারেনি। মিত্রবাহিনীর কৌশলবিদগণ যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে ইউরোপে প্রেরিত 'আলসোস' গোয়েন্দা মিশনের সাহায্যে এতটুকুই জানতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানেও আণবিক বোমা তৈরির কর্মসূচী ছিল। তবে তাদের কর্মসূচী বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে বার্লিনে আণবিক বোমা তৈরির মৌলিক প্রক্রিয়া ফিশন (পরমাণু বিভাজন) উদ্ভাবন করা হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ১০ মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে এ সংবাদ এসে পৌঁছে যায়। এতে ওয়াশিংটনে গভীর উদ্বেগের জন্ম হয়। ফিশন উদ্ভাবনে জার্মানীর সাফল্যের সংবাদে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার নিশ্চিত হয় যে, এ ধরনের একটি বোমা বানানো সম্ভব এবং ভবিষ্যতের তুলনাহীন এ ভয়াবহ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জার্মানী তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আলবার্ট আইনস্টাইন, এনরিকো ফারমি ও লিও সিজিলার্ডের মতো যেসব বিজ্ঞানী নাৎসীদের ভয়ে ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন তারা জার্মানীর সম্ভাব্য আণবিক হুমকি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রকে সজাগ করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জার্মানীতে বিজ্ঞান ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, আণবিক বোমা তৈরির মতো বিশাল একটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার যোগ্যতা তাদের আছে। কেননা যুদ্ধকালে জার্মানরাই ছিল প্রথম জাতি যারা জেট জঙ্গীবিমান (এমই-২৬২ এস), ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র (ভি-১ এস) এবং ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (ভি-২ এস) উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৩ সালে জার্মান বিমান বাহিনীর নিয়মিত সার্ভিসে সংযোজিত মেসার্সমিট-২৬২ জঙ্গীবিমান তখনকার দিনে মিত্রবাহিনীর যে কোনো দ্রুতগামী বিমানকে অতিক্রম করতে পারতো। আজকের প্রজন্ম এটাই জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আণবিক বোমা তৈরিতে বিজয়ী হয়েছে। তবে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের শুরুর দিকে বোমা তৈরি করা দূরে থাকুক, এ ব্যাপারে তাদের অগ্রগতি মোটেও স্পষ্ট ছিল না।

১৯৩৯ সালের এপ্রিলে বার্লিনে একটি গোপন বৈঠকে জার্মানীর আণবিক বোমা নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়। সেদিন থেকে 'জার্মান ম্যানহাটন প্রকল্প' যাত্রা করে। আণবিক বোমা তৈরির গবেষণার জন্য এ বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এ মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণা এবং অন্যান্য দেশে ইউরেনিয়াম রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একই মাসে জার্মান রসায়নবিদ পল হার্টিক এক পত্রে জার্মানীর ওয়ার অফিসকে আণবিক অস্ত্রের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে মন্তব্য করেন যে, 'প্রচলিত অস্ত্রের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী কোনো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলে ব্যবহারকারী দেশ এমন একটি কৌশলগত সুবিধা অর্জন করবে যা অন্য কারো পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।' জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী হ্যান্স গেইগার রসায়নবিদ হার্টিকের মন্তব্যকে যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, 'ভয়াবহ ধ্বংস ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অস্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে।' বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ার করে দেয়ায় জার্মান ওয়ার অফিস ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণার অনুমতি দেয়। সম্ভাব্য আণবিক অস্ত্রের হুমকি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পত্র মারফত সতর্ক করে দেয়ার ৫ মাস আগে জার্মানীতে আণবিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জার্মানীতে দু'টি পক্ষ আণবিক গবেষণা চালায়। একটি পক্ষ ছিল সামরিক এবং আরেকটি ছিল বেসামরিক। সামরিক টীমের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দিয়েছেন কুর্ট দিয়েবনার এবং বেসামরিক টীমের নেতৃত্ব দিয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। একই মাসে জার্মান ওয়ার অফিসের ফিশন গবেষণা প্রধান কুর্ট দিয়েবনার বিজ্ঞানী গেইগার ও অটোহানকে আণবিক বোমার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য বার্লিনে এক বৈঠকে তলব করেন। সে মাসের দ্বিতীয় বৈঠকে হাইসেনবার্গকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ বৈঠকে জার্মান বিজ্ঞানীগণ পাইল ডিজাইন (ভূগর্ভস্থ ভিত), আইসোটোপ বিভাজন, দ্রুত নিউট্রন ফিশন এবং আণবিক বোমা নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হন। বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জার্মানীর ইউরেনিয়াম গবেষণা এগিয়ে যেতে থাকে। এসময় পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনীর সাফল্য এ গবেষণাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। বেলজিয়ামে জার্মান সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম আটক করে। ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও ও তার সাইক্লোট্রন এবং নরওয়ের নোরস্ক হাইড্রো প্লান্ট জার্মানীর অধিকারে আসে। নরওয়ের নোরস্ক হাইড্রো প্লান্ট ছিল তখনকার বিশ্বে হেভি ওয়াটার উৎপাদনকারী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। ডেনমার্কে জার্মানরা পদার্থবিজ্ঞানী নেইলস বোহরকে আটক করে। ডেনমার্কে জার্মান অভিযানকালে সেখানকার মার্কিন দূতাবাস বোহরকে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বদেশে নাৎসী বিরোধী প্রতিরোধ লড়াই গড়ে তুলতে সহায়তা করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে হাইসেনবার্গ কাইজার-উইলহেম ইন্সটিটিউটে বেশ কয়েকটি পাইল পরীক্ষা চালান। তিনি এ ইন্সটিটিউটে যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী ফারমি-ও একই গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন। তখন জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক গবেষণা চলছিল সমান গতিতে। আণবিক বোমা তৈরির গবেষণায় জার্মানীর অগ্রগতি সম্পর্কে জানার কোনো উপায় না থাকলেও ধারণা করা হচ্ছিল যে, ১৯৪১ সালের দিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা তাদের জার্মান প্রতিপক্ষের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। সে বছরের জানুয়ারীতে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বোথে একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। তার ভুলে জার্মানী ভুলবশতঃ মডারেটর হিসেবে গ্রাফাইটের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। হাঙ্গেরী থেকে পালিয়ে আসা বিজ্ঞানী লিও সিজিলার্ড মার্কিন বিজ্ঞানীদের তাদের গবেষণার ফলাফল গোপন রাখতে রাজি করান। ফলে উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় জার্মান বিজ্ঞানীরা তাদের ভুল শোধরানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্ধকারে পথ হাতড়ে তারা পাইলের জন্য ব্যয়বহুল হেভি ওয়াটারকে একমাত্র স্থায়ী মডারেটর হিসেবে শনাক্ত করেন। তারা এ উপসংহারে পৌছান যে, পুনঃবিক্রিয়াজাত পাইল ব্যবহার করা হলে প্লুটোনিয়াম বোমা নির্মাণ করা সম্ভব। জার্মান বিজ্ঞানীগণ অকার্যকর থারমাল ডিফিউশন পদ্ধতিতে আইসোটোপ বিযুক্তকরণে তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেন। এ প্রক্রিয়া পরিত্যক্ত হওয়ার পর তারা অভিমত দেন যে, বিপুল ব্যয়সাপেক্ষে সাফল্যের কোনো নিশ্চয়তা

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে আণবিক বোমায় ব্যবহারোপযোগী ইউরেনিয়াম তৈরি করা সম্ভব। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি জার্মান বিজ্ঞানীগণ যে কোনো ধরনের আণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। সাফল্যের নিশ্চয়তা ছাড়া বিপুল ব্যয়ে অন্য কোনো উপায়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্ভব বলে তারা যে অভিমত দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক। যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি অঙ্গরাজ্যের ওয়াক রিজ প্লান্টে একটি আণবিক বোমার জন্য পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমৃদ্ধকরণে বছরের পর বছর ব্যাপক ব্যয়বহুল কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। বিজ্ঞানীদের হতাশায় জার্মান আণবিক বোমা গবেষণায় স্থবিরতা নেমে আসে। ১৯৪১ সালে জার্মান আর্মি রিসার্চ অফিস হাইসেনবার্গের গবেষণার বাইরে আরেকটি গবেষণায় আলাদাভাবে তহবিল যোগাচ্ছিল। ফ্রিটজ হুটারম্যান নামে একজন পদার্থবিদ এ গবেষণায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জার্মান উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তিনি যেসব তথ্য পেতেন সেগুলো তিনি যতদূর সম্ভব গোপন রাখতেন। প্লুটোনিয়াম নিয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করতে সম্ভবত তিনি তথ্য গোপন রাখতেন। হুটারম্যান ছিলেন একজন অস্ট্রীয় ইহুদী কমিউনিস্ট। নাৎসীদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি ছিল না। যুদ্ধের পর হাইসেনবার্গসহ অনেক জার্মান বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে, আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টায় তারা আন্তরিক ছিলেন না। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে নাকি নাৎসী সরকারের পক্ষে নিজেদের সার্ভিসের যৌক্তিকতা প্রমাণে তারা এ দাবি করেছিলেন ঐতিহাসিকদের কাছে আজো তা একটি অমীমাংসিত বিষয়।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে একটি সুইডিশ দৈনিকে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, আমেরিকা একটি শহর ধ্বংসে সক্ষম আণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করছে। পদার্থবিজ্ঞানী হাইসেনবার্গের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও জার্মান স্টেট সেক্রেটারী আর্নেস্টের ছেলে ফ্রেডারিক ভন ওয়াইসেকার সুইডিশ দৈনিকের এ খবর অবিলম্বে তার পিতার নজরে আনেন। জার্মান সামরিক হাই কমান্ডকে তিনি লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করলে হাই কমান্ড দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। হাই কমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাইসেনবার্গ ও ভন ওয়াইসেকার সুইডেনের রাজধানী কোপেনহেগেনে যান। সেখানে তাদের সফর কোনো বৈজ্ঞানিক সফর ছিল না। গোয়েন্দা মিশনেই তারা সেখানে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী নেইলস বোহর ছিলেন হাইসেনবার্গের পুরনো বন্ধু ও বিশ্বস্ত সহযোগী। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যই তিনি কোপেনহেগেন যান। হাইসেনবার্গ সন্দেহ করতেন যে, বোহরের সঙ্গে মিত্রপক্ষের যোগাযোগ রয়েছে। তাই তিনি তার কাছ থেকে আমেরিকার বোমা তৈরির তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিত্রপক্ষকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্য বোহরকে একথা জানান যে, তিনি আণবিক বোমা তৈরির জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং এ ব্যাপারে সবকিছু তার নখদর্পণে। নিজের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়ার জন্য তিনি বোহরের কাছে জার্মান পাইলসের একটি নকশা হস্তান্তর করেন। ১৯৪৩ সালে বোহর ডেনিশ আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সহায়তায় বৃটেনে পালিয়ে যান। গেস্টাপো তাকে গ্রেফতার করার কয়েকদিন আগে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বোহর সঙ্গে করে হাইসেনবার্গের দেয়া নকশা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হাইসেনবার্গকে জার্মান আণবিক বোমা কর্মসূচীর জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি তিন ধরনের আণবিক বোমা তৈরির চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। একটি ছিল বিশুদ্ধ ইউ-২৩৫ বোমা, আরেকটি ছিল বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম রিএ্যাক্টর বোমা এবং তৃতীয়টি ছিল প্লুটোনিয়াম বোমা। তার পক্ষে প্লুটোনিয়াম বোমা তৈরির সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। কারণ প্লুটোনিয়াম উৎপাদন ছিল সময়সাপেক্ষ। তাই আণবিক বোমা তৈরিতে রিএ্যাক্টরকে একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হয়। রিএ্যাক্টরের সাহায্যে আণবিক বোমা তৈরির পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব ছিল। তাই রিএ্যাক্টর বোমা তৈরিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। হাইসেনবার্গ বরাবর বিশ্বাস করতেন যে, তার তত্ত্ব ও গবেষণা মিত্রপক্ষের চেয়ে উন্নত। তাই তিনি মিত্রপক্ষের ইউরেনিয়াম বোমা তৈরির প্রচেষ্টার খবরে শংকিত হয়ে উঠার কোনো কারণ খুঁজে পাননি। ইউ-২৩৫ বোমা সম্পর্কে হাইসেনবার্গের ধারণা ছিল এ ধরনের বোমা তৈরির বিষয়টি নিউট্রনের দ্রুত বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য ক্রিটিক্যাল মাস হিসেবে কতটুকু ইউ-২৩৫ প্রয়োজন সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সন্দিহান। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হাইসেনবার্গ ফিশনের উপর ব্যাপক কারিগরি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে তিনি তার সহকর্মীদের কাছে এ বোমা তৈরির একটি হিসাবও হস্তান্তর করেছিলেন।

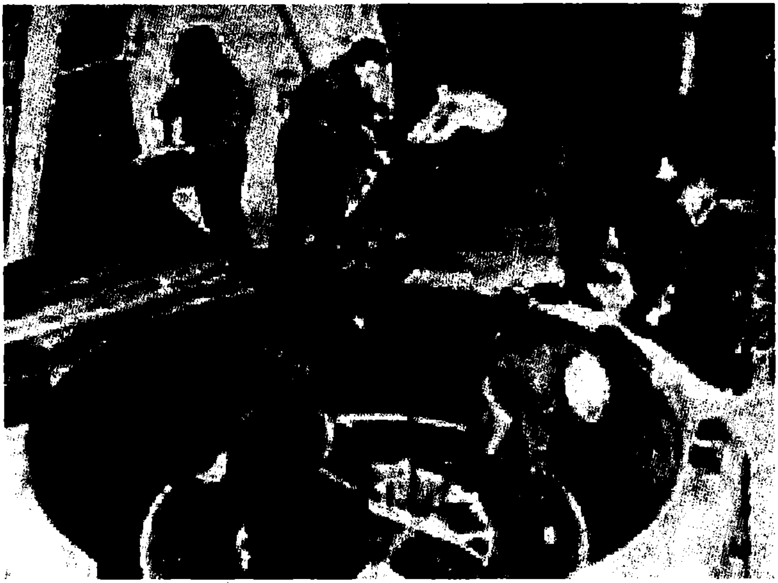

আণবিক বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে বার্লিনে ভূগর্ভস্থ একটি জার্মান পাইল

১৯৪২ সালের পরবর্তীকালে জার্মান আণবিক বোমা কর্মসূচীতে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য অগ্রগতি ঘটে। হাইসেনবার্গসহ শীর্ষ জার্মান বিজ্ঞানীগণ অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার

www.pathagar.com

যুদ্ধের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণে প্রচলিত সমরাস্ত্রের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। নরওয়েতে হেভি ওয়াটার পাইলস ধ্বংস হওয়া নাগাদ জার্মান পাইল ওয়ার্ক অব্যাহত ছিল। মার্কিন জঙ্গীবিমানের বোমাবর্ষণ এবং বৃটিশ কমান্ডো ও নরওয়েজীয় গেরিলাদের উপর্যুপরি হামলায় নোরস্ক হেভি ওয়াটার প্লান্ট বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধের শেষ বছরে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণ এবং তাদের অগ্রাভিযানে জার্মানদের আণবিক গবেষণা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানীর আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও সে দেশের গবেষকগণ একটি পাইলসের সাহায্যে ক্রিটিক্যাল মাস-এ পৌঁছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। জার্মান বিজ্ঞানীগণ তখন যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী ফারমি ১৯৪২ সালে মেট ল্যাব-এ এ কাজে প্রথম সফলতা অর্জন করেন। যুদ্ধের অধিকাংশ সময় মিত্রপক্ষ আণবিক গবেষণায় জার্মানীর সফলতা কিংবা ব্যর্থতা সম্পর্কে খুব কমই জানতো। মিত্রপক্ষ এতটুকু জানতো যে, জার্মানী আণবিক গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করছে এবং নরওয়ের হেভি ওয়াটার প্লান্ট সম্পর্কে তারা খুব উৎসাহী। তার বাইরে তারা যা জানতো সেগুলোর সবই ছিল গুজব। নেইলস বোহর জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গের সঙ্গে তার সংলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লস আলামোসে মার্কিন বিজ্ঞানীদের অবহিত করেন। বোহর ব্যাপক তথ্য ফাঁস করা সত্ত্বেও পাইলস নিয়ে জার্মানীর গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হতে পারেনি। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে মিত্র সৈন্যরা অবতরণ করলে জার্মানীর আণবিক গবেষণার আলামত সংগ্রহে মার্কিনীরা অবারিত সুযোগ পায়। 'আলসোস' মিশনের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মার্কিন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা লেঃ কর্নেল বরিস টি, পাশ আলসোস টীমের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ টীমের সদস্যদের নো-ম্যান্স ল্যান্ড এমনকি জার্মান প্রতিরক্ষা লাইনের পেছনে গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করতো হতো। আলসোস টীমকে ম্যানহাটন প্রকল্প সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। ম্যানহাটন প্রকল্প সম্পর্কে তাদেরকে অন্ধকারে রাখার উদ্দেশ্য ছিল যাতে জার্মানদের হাতে ধরা পড়লে তারা কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করতে না পারে। ইতালী থেকে এ মিশন শুরু করা হয়। আলসোস টীমের সদস্যরা মিত্র সৈন্যদের পেছনে পেছনে অবস্থান করতো। জার্মানদের আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা নিষ্ফল বলে প্রমাণ করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এ টীম জার্মানীসহ গোটা ইউরোপের মাটি মাসের পর মাস চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানফোর্ড অথবা ওক রিজের মতো কোনো জার্মান প্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলসোস টীমের সদস্যরা জার্মানীর আণবিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম না করার জোরালো প্রমাণ খুঁজে পায়। আত্মসমর্পণের কয়েক সপ্তাহ আগে জার্মানীর বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুদ আটক করা হয়। এ মজুদ আটক করার আগ পর্যন্ত মিত্রবাহিনী জার্মানীর সন্দেহভাজন আণবিক আতংকে ভুগতো। যুদ্ধের পর জার্মান আণবিক গবেষণা সংস্থার শীর্ষ ১০ বিজ্ঞানীকে ফার্ম হলে বৃটিশ গোয়েন্দাদের একটি নিরাপদ ঘাঁটিতে ৬ মাস আটক রাখা হয়। আঁড়িপাতার যন্ত্রপাতি স্থাপন করে গোপনে তাদের কথোপকথন রেকর্ড করা হয়। তারা নিজেদের মধ্যে কি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন তা আজো রহস্যঘেরা। তবে

www.pathagar.com

তাদের কথোপকথনে যুদ্ধের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি ব্যবহারোপযোগী আণবিক বোমা তৈরি করা থেকে জার্মানী কতটুকু পিছিয়ে ছিল তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফার্ম হলে আটক জার্মান বিজ্ঞানীরা হিরোশিমায় যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের সংবাদ শুনতে পান। এ সংবাদ শুনে বিজ্ঞানী অটো এত হতাশ হয়ে পড়েন যে, তার আত্মহত্যা করার মতো অবস্থা হয়েছিল। বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গের প্রতিক্রিয়াও ছিল অনুরূপ। তিনি আটক বিজ্ঞানীদের জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমায় যে ধরনের আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে তিনি ঠিক সে ধরনের আণবিক বোমাই তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি তার প্রচেষ্টা সম্পর্কে বন্দী বিজ্ঞানীদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন।

জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর জাপান সম্ভাব্য আণবিক হুমকি হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। জাপানী পদার্থ বিজ্ঞানীগণ যুদ্ধের আগে ফিশন আবিষ্কারের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, তারা অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে অনুরূপ হুমকি সম্পর্কে জাপানী সশস্ত্র বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কয়েকজন গবেষক টোকিও'র একটি গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। তবে এক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি ছিল সামান্য। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে একদল জাপানী বিজ্ঞানী এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাই তাদেরও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তারা বলেছিলেন, এতে তাদের ১০ বছর অথবা তার চেয়েও বেশী সময় লাগতে পারে। কিয়োটোতে একটি সাইক্লোট্রন নির্মাণ করা ছাড়া আণবিক জ্বালানি উদ্ভাবনে জাপান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে খুব সামান্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রযুক্তিগত বিপ্লব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে দু'টি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অধিকাংশ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। কোনো কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূলে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটায় বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় নিজ নিজ সামরিক বাহিনীকে প্রযুক্তিতে সজ্জিত করে তুলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সামরিক বাহিনীর এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেখানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেনি। যুদ্ধের পর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো সাইবারনেটিং ও কম্পিউটার বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা সহায়তা প্রদানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো প্রাপ্ত সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) যুদ্ধাস্ত্র ঃ যুদ্ধজাহাজ, সামরিক যানবাহন, বিমান, কাঁধে বহনযোগ্য অস্ত্র, কামান, রকেট, রাসায়নিক, জীবাণু ও আণবিক অস্ত্র। (২) লজিসটিক্যাল সহায়তা দানঃ সৈন্য ও সামরিক সাজসরঞ্জাম পরিবহন উপযোগী যানবাহন। যেমন—ট্রেন, ট্রাক ও বিমান। (৩) যোগাযোগ ও গুপ্তচরবৃত্তি ঃ নৌ-আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস। (৪) চিকিৎসা ঃ শৈল্য চিকিৎসা পদ্ধতি, রাসায়নিক ওষুধ ও কলাকৌশল। (৫) শিল্প ঃ কলকারখানা ও উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প।

সমরাস্ত্র ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সামরিক অস্ত্র নির্মাণে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার উষালগ্নে অধিকাংশ সেনাবাহিনী প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সেনাবাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা ও কৌশল আঁকড়ে ধরে রাখে। পোলিশরা হচ্ছে তার উদাহরণ। পুরনো আমলের ল্যান্সার ছিল পোলিশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্যাভালরি, ট্রেঞ্চ ও প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধজাহাজ নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু মাত্র ৬ বছরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী জেট জঙ্গীবিমান, ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও আণবিক বোমা তৈরি করে ফেলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনে স্বল্প ও দূরপাল্লার অপারেশনে বিমান বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ১৯৪০ সালে পশ্চিম ইউরোপে জার্মান বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সেনাবাহিনীর দ্রুত বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ফরাসী বিমান বাহিনীকে মারাত্মকভাবে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করা হয়। সামরিক নেতৃত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুরূপ যুদ্ধ মোকাবিলায় স্থল বাহিনী ও স্থায়ী প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। এ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করায় ১৯৪০ সাল নাগাদ ৮ হাজার ২৫০টি জার্মান জঙ্গী ও বোমারু বিমানের বিপরীতে ফরাসী বিমান বাহিনীতে ছিল ৭৪০টি জঙ্গী ও ১৪০টি বোমারু বিমান। ফ্রান্সের অধিকাংশ বিমানঘাঁটি ছিল দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই এসব বিমানঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে, বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীতে স্পিটফায়ার ও হ্যারিকেনের মতো কিছু উন্নতমানের বিমান ছিল। কিন্তু সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণকারী স্থল সৈন্যদের বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল না এবং বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সঙ্গে যে ক'টি বিমান ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়। ১৯৪০ সালে লুফটওয়াফে ফ্রান্সের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করায় জার্মান সামরিক বাহিনীর টহল ও গোয়েন্দা মিশনে বিরাট অগ্রগতি ঘটে। ফ্রান্সের আকাশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জার্মান বিমান বাহিনী বৃটিশ শহরগুলোতে কৌশলগত বোমাবর্ষণে সক্ষম হয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফ্রান্স বিদায় নেয়ায় ইংলিশ চ্যানেলের নিকটবর্তী ঘাঁটিতে মোতায়েন জার্মান বিমান ব্লিৎসক্রিগ অপারেশনে সাফল্যের সঙ্গে লন্ডন ও অন্যান্য বৃটিশ শহরে বোমাবর্ষণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনীতিবিদ ও সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুচ্ছ বোমাবর্ষণ বা বোম্বার ড্রিম নামে খ্যাত কৌশল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান বিমান বাহিনীতে বোমারু বিমানের বহর গড়ে উঠে। ১৯৩০-এর দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং সাংহাই বোমাবর্ষণের মতো ঘটনাগুলোয় কৌশলগত বোমা-বর্ষণের কার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিভিন্ন ইউরোপীয় ও মার্কিন বিমান বাহিনী নিজেদের ইচ্ছা মতো বোমা মেরে শত্রুকে বশ্যতা স্বীকারের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শত্রু পক্ষের বোমারু বিমানের ভীতি বিমান প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে। জার্মানী ধারণা করেছিল যে, মাঝারি ট্যাকটিক্যাল বোমারু বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর হবে। তাই তারা ব্যাপকভাবে দূরপাল্লার কৌশলগত বোমারু বিমান তৈরি করেনি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে শত্রু পক্ষের সৈন্য সমাবেশ ধ্বংসে জার্মান স্ট্রাইকার ডাইভ বোমাবর্ষণ একটি কার্যকর উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়। অতএব স্টুকার মতো ক্ষুদ্রায়তনের বোমারু বিমান নির্মাণে সম্পদ ও তহবিল যোগান দেয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালে লুফটওয়াফে ভারি বোমায় সজ্জিত মাঝারি পাল্লার হেইঙ্কেল ও ডোর্নিয়ার বোমারু বিমানের সাহায্যে লন্ডনে বোমাবর্ষণে বাধ্য হয়। দুঃখজনকভাবে এসব বোমারু বিমান ছিল খুব ধীরগতিসম্পন্ন। জার্মান প্রকৌশলীগণ বৃহদায়তনের পর্যাপ্ত পিস্টন ইঞ্জিন তৈরিতে ব্যর্থ হয়। যেসব ইঞ্জিন উৎপাদন করা হয়েছিল সেগুলো উচ্চতাপে বিস্ফোরিত হয়ে যেতো। বৃটেনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মান বোমারু বিমানগুলো ছিল ক্ষুদ্রায়তনের। জার্মানি বিমানগুলো দূরপাল্লার কৌশলগত মিশনে রওনা হওয়ার আগে এবং মিশন থেকে ফেরার পর বোমারু বিমানগুলোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বহন করতে পারতো না। এ কারণে জার্মান বোমারু বিমান ব্যাপক

www.pathagar.com

সংখ্যায় ভূপাতিত হতে থাকে। বৃটিশ নগর ও জনপদে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে বৃটেনকে রণক্ষেত্র থেকে বিদায়ে জার্মান পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

১৯৩৯ সালের আগে কৌশলগত উড্ডয়নের জন্য শর্ট স্টার্লিং-এর মতো দূরপাল্লার বৃটিশ বোমারু বিমান তৈরি এবং এসব বিমান অস্ত্রসজ্জিত করা হয়। কিন্তু এসব বিমানের প্রযুক্তিতে অসংখ্য ক্রটি ছিল। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী বা আরএএফ'র বহুল ব্যবহৃত স্বল্পপাল্লার ও ক্ষুদ্রায়তনের বোমারু ব্রিস্টল ব্লেনহেইমের প্রতিরক্ষার জন্য ছিল হাইড্রোলিক চালিত মাত্র একটি মেশিনগান টারেট। কার্যকর বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ মেশিনগান টারেট জার্মান জঙ্গী বিমান বহরের বিরুদ্ধে একটি বেদনাদায়ক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বি-১৭-এর মতো বোমারু বিমানগুলো তখনকার বিশ্বে ছিল দূরপাল্লার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিমান। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল উপকূল রক্ষায় এসব বিমান তৈরি করা হয়। কমপক্ষে ৬টি মেশিনগান টারেট থাকায় এসব বিমান ৩৬০ ডিগ্রি বা চারদিক থেকে ছিল সুরক্ষিত। বহুসংখ্যক বোমারু বিমান একসঙ্গে উড্ডয়ন করলেও জঙ্গীবিমানের প্রহরা ছাড়া বি-১৭ ছিল অরক্ষিত।

বোমারু বিমানে মিত্রশক্তির সামর্থ্য সত্ত্বেও তাদের বোমাবর্ষণে জার্মানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে মিত্রপক্ষের নিক্ষিপ্ত বোমা টার্গেট থেকে বহু মাইল দূরে পতিত হয। নেভিগেশনাল প্রযুক্তি দুর্বল হওয়ায় মিত্রপক্ষের বৈমানিকেরা রাতে তাদের টার্গেট খুঁজে বের করতে পারতো না। মিত্রপক্ষের ব্যবহৃত বোমাগুলো ছিল অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ। তবে প্রেসিশন বোমাগুলো প্রায়ই ভেজা থাকায় সেগুলো বিস্ফোরিত হতো না। মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ১৯৪০-৪৫ সালে জার্মানীর শিল্পোৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শত্রুদের বোমাবর্ষণে জার্মান সরকারের উপর মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়তো। কখনো কখনো মিত্রপক্ষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটে আঘাত হানলে জার্মানী জঙ্গীবিমানের মতো বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উৎসাহিত হতো। যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানরা কার্যকর জেট জঙ্গীবিমান মেসার্সমিট এমই-২৬২ নির্মাণে সক্ষম হয়। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও আকাশে মিত্রপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় জার্মান জঙ্গীবিমান বিমানঘাঁটি কিংবা ঘাঁটির অদূরে বিধ্বস্ত হতো। বৃটিশ গ্লোস্টার মেটিউর টাইপের বিমানগুলো একে অপরকে চিনতে পারতো না। আকাশ যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে এবং যুদ্ধে বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে যুদ্ধকালে বিমান তৈরিতে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ককপিট খোলা বিমান থেকে শুরু করে নানা ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হয়। সামরিক যানবাহন নির্মাণ বন্ধে ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও ১৯২০ ও ১৯৩০-এর গোটা দশক জুড়ে জার্মান অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ও জার্মান সেনাবাহিনী গোপনে ট্যাংক উৎপাদন করতো। চুপি চুপি এসব সামরিক যান তৈরি হতো বলে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হওয়া নাগাদ ইউরোপীয় মিত্রশক্তির কাছে এগুলোর কার্যকারিতা ও দক্ষতা ছিল অজানা। জার্মান সৈন্যরা বেনিলাক্সভুক্ত (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গের সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম ইউরোপের একটি অর্থনৈতিক জোট। জোটে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নামের

www.pathagar.com

আদ্যাক্ষর অনুসারে তার নামকরণ করা হয় বেনিলাক্স) দেশ এবং ১৯৪০ সালের মে'তে ফ্রান্সে অভিযান চালালে তাদের সমরাস্ত্রের প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা মিত্র শক্তির চেয়ে অকল্পনীয়ভাবে শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত হয়।

জলাভূমির মধ্য দিয়ে একটি মার্কিন ট্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে

ফরাসী সেনাবাহিনীর ট্যাংকগুলোতে ছিল মারাত্মক কারিগরি ত্রুটি। ১৯১৮ সালে নির্মিত ফরাসী রেনল্ট ছিল তখনকার বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম ট্যাংক। এ ট্যাংক আকারে ছোট হলেও এটি তাদের বৃটিশ, জার্মান ও আমেরিকান প্রতিপক্ষের তুলনায় ছিল বহু অগ্রসর। শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী ট্যাংকের উন্নয়নে নেমে আসে স্থবিরতা এবং ১৯৩৯ সাল নাগাদ ফরাসী ট্যাংকের মান ১৯১৮ সালের মান অতিক্রম করতে পারেনি। ফরাসী ও বৃটিশ জেনারেলরা বিশ্বাস করতেন যে, ১৯১৪-১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল পরবর্তীতে একই কৌশলে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে। এ বিশ্বাস থেকে উভয় দেশ গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত ভূমি এবং গোলাবর্ষণের মুখে পরিখা অতিক্রমে ভারি ও সুরক্ষিত সাঁজোয়া যান নির্মাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। একই সময়ে বৃটিশরা শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইনের পেছনে গোলাবর্ষণে দ্রুতগামী ও হাল্কা ক্রুজার ট্যাংক তৈরি করে। অন্যদিকে, পদাতিক বাহিনীকে তছনছ করে সামনে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে জার্মান সেনাবাহিনী দ্রতগামী ও হাল্কা ট্যাংক নির্মাণে তহবিল যোগায়। জার্মান ট্যাংকগুলো পরিখা যুদ্ধে অকার্যকর হলেও যান্ত্রিক যুদ্ধে এগুলো ফরাসী ও বৃটিশ ট্যাংককে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হতো। ১৯১৮ সালে নির্মিত ফরাসী রেনল্ট ট্যাংকের ডিজাইন অনুসরণে জার্মান ট্যাংক নির্মিত হয়। অত্যাধুনিক কাঠামোর এ ট্যাংকের ঘূর্ণায়মান টারেটে বসানো থাকতো কামান। এ সুবিধার জন্য জার্মান

www.pathagar.com

ট্যাংকগুলো তাদের প্রতিটি সাঁজোয়া যানকে রণক্ষেত্রে টেনে আনতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, মাত্র ৩৫ শতাংশ ফরাসী ট্যাংক ছিল মেশিনগান সজ্জিত। ফরাসী ও জার্মান ট্যাংক মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হলে ফরাসী ট্যাংক মেশিনগান থেকে গুলীবর্ষণ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারতো না। কিন্তু মেশিনগানের গুলী জার্মান ট্যাংকের বর্ম্য ভেদ করতে পারতো না। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ফরাসী ট্যাংকে রেডিও সংযোগ ছিল। উঁচু-নীচু ভূমিতে চলাচল করতে গেলে এসব ট্যাংকের রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। পক্ষান্তরে, জার্মান ট্যাংকগুলো ছিল রেডিও সজ্জিত। ফলে যুদ্ধের মাঠে প্রতি মুহূর্তে তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো। ফরাসী কমান্ডাররা কদাচিৎ নিজেদের ট্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন। পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা দানে বৃটেনের মাটিল্ডা এমকে-১ ট্যাংক তৈরি করা হয়। তাদের বর্ম্য ছিল সুরক্ষিত। তবে এ ট্যাংক পরিখা বা ট্রেঞ্চ যুদ্ধের জন্য মোটেও উপযোগী ছিল না। খোলা ময়দানে এদের গতি ছিল অস্বাভাবিক মন্থর। এসব ট্যাংকের কামান ও মেশিনগান জার্মান ট্যাংকের কোনো মারাত্মক ক্ষতি করতে পারতো না। আক্রান্ত হলে এ ট্যাংকের ক্রুরা ভস্মীভূত হয়ে প্রাণ হারাতো। দ্বিতীয় সংস্করণের বৃটিশ মাটিল্ডা ট্যাংকও যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়। জার্মান গোলাবর্ষণে এসব ট্যাংকের তেমন কোনো ক্ষতি হতো না এবং এগুলো জার্মান ট্যাংকের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারতো। বিমান বাহিনীর সহায়তাপুষ্ট জার্মান সাঁজোয়া হামলার মুখে ফরাসী ও বৃটিশ ট্যাংক বিস্তর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতো। ১৯৪০ সালে জার্মানীর ফ্রান্স অভিযানকালে সাঁজোয়া সমর্থনের ঘাটতি মিত্রবাহিনীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ যেখানে যান্ত্রিক বহর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ দেশ যান্ত্রিক বহরে সজ্জিত হওয়া ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করে। এমনকি গর্বিত জার্মান পাঞ্জারও অনেকাংশে মোটর বর্হিভূত সহায়তার উপর নির্ভর করতো। জার্মানী যান্ত্রিক বহরের কেন্দ্রীভূত ব্যবহারের গুরুত্বকে স্বীকার এবং যান্ত্রিক বহরের সক্ষমতা প্রদর্শন করলেও প্রচলিত ইউনিটের স্থলে যান্ত্রিক বহরের সংযোজন ঘটানোর মতো তাদের হাতে পর্যাপ্ত মোটর যান ছিল না। বৃটিশরা যান্ত্রিক বহরের গুরুত্বকে স্বীকার করলেও তাদের মতে এটি ছিল সীমিত জনশক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি করার একটি উপায়। আমেরিকাও একটি যান্ত্রিক বহর গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাদের কাছে যান্ত্রিক বহর গড়ে তোলা সীমিত জনশক্তির ঘাটতি পূরণের কোনো প্রয়াস ছিল না। শক্তিশালী শিল্প ভিত্তিকে কাজে লাগানো ছিল তাদের যান্ত্রিক বহর গড়ে তোলার আরেকটি লক্ষ্য।

যান্ত্রিক বহরে মূল সাঁজোয়া যান ছিল ট্যাংক। গোলাবর্ষণের সামর্থ্য এবং দুর্ভেদ্য বর্ম্য ট্যাংককে স্থল যুদ্ধে মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত করে। যান্ত্রিক বহরে সংযোজিত অন্যান্য যানবাহনের মধ্যে ছিল বিপুল সংখ্যক ট্রাক ও হাল্কা যান।

নৌ-বহরের মূল জাহাজ হিসেবে বিমানবাহী রণতরীর আবির্ভাব এবং উত্তরোত্তর বিকাশমান জার্মান ইউ-বোট বা সাবমেরিনের তৎপরতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। মিত্রপক্ষের সৈন্যদের কাছে আটলান্টিকের ওপারে যুক্তরাষ্ট্র ও

www.pathagar.com

কানাডা থেকে পাঠানো সম্পদ আটক ও ধ্বংস করাই ছিল ইউ-বোটের প্রাথমিক কাজ। উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় নতুন নতুন যুদ্ধ জাহাজের সংযোজন ঘটেছিল খুবই সামান্য। তবে পুরনো জাহাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে।

কামান, মর্টার, রকেট, বোমা ও অন্যান্য ডিভাইস নরহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে ব্যবহৃত হতো। টার্গেট ধ্বংসে এগুলো ছিল বৈচিত্র্যময়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুদ্ধকালে এসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও বহু অস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। শত্রুকে আঘাত করে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো বস্তুর নাম যদি অস্ত্র হয় তাহলে আমেরিকার বিশাল শিল্প শক্তিও অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। কেননা, আমেরিকার অপরিমেয় শিল্প শক্তি অক্ষশক্তির যতটুকু ক্ষতিসাধন করতে পেরেছিল অন্য কোনো অস্ত্র ততটুকু ক্ষতি করতে পারেনি। যুদ্ধকালে আরো যেসব অস্ত্র উদ্ভাবন করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) পদাতিক অস্ত্র : বাজোকা, রকেটচালিত পাঞ্জার্সক্রেক গ্রেনেড ও ট্যাংক বিধ্বংসী পায়াট এবং এ্যাসল্ট রাইফেল। (২) নৌ-বাহিনীর অস্ত্র ঃ নৌ-যুদ্ধে বিমানবাহী রণতরী প্রধান যুদ্ধজাহাজ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং প্রচলিত যুদ্ধজাহাজগুলো সেকেলে হিসেবে গণ্য হয়। (৩) সাঁজোয়া অস্ত্র ঃ ট্যাংক ডেস্ট্রয়ার, স্পেশালিস্ট ট্যাংক, মাইন অপসারণকারী ফ্লেইল ট্যাংক, ফ্লেইম ট্যাংক ও সাবমারসিবল। (৪) বিমান ঃ জেট জঙ্গীবিমান, গ্লাইড বোমা (প্রথম স্মার্ট বোমা)। (৫) ক্ষেপণাস্ত্রঃ পালস জেটচালিত ভি ও উড়ন্ত বোমা ছিল বিশ্বের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র। তাছাড়া রকেটেও অসামান্য উন্নতি হয়। যেমন—ভি-২ রকেট, কাতুশা রকেট এবং বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত রকেট। (৬) কম্পোনেন্ট হীট ও ট্যাংক বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র হেস। শেল, বোমা ও রকেটের জন্য প্রক্সিমিটি ফিউস। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে তা ধ্বংস করার জন্য প্রক্সিমিটি ফিউস তৈরি করা হয়। (৭) বিস্ফোরক ঃ আণবিক বোমা।

হাল্কা অস্ত্রের উন্নয়ন ঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে হাল্কা অস্ত্রের বিরাট অগ্রগতি ঘটে। শত্রুর উপর সজোরে আঘাত হানা, উড়িয়ে দেয়া এবং ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে প্রয়োজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধকালে হাল্কা অস্ত্রের উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং তখন এ প্রচেষ্টায় এমন একটি ভয়াবহ অস্ত্র তৈরি হয় যা সামরিক বাহিনী কখনো কল্পনা করতে পারেনি। এ অস্ত্রের নাম হলো ফ্রান্সের শচট লাইট মেশিনগান। সৌভাগ্যক্রমে স্টেন এমপি-৪০ ও এম-৩ গ্রীস গান সাবমেশিনগানের মতো নির্ভরযোগ্য অস্ত্র উৎপাদন পদ্ধতিও যথেষ্ট এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বস্ত আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেলও ব্যবহার করা হয়। সত্যিকার এ্যাসল্ট রাইফেলের ব্যবহারও তখনি শুরু হয়। জার্মানরা হচ্ছে এ্যাসল্ট রাইফেল বা স্টর্মগেউইহার-এর প্রথম নিমার্তা ও ব্যবহারকারী। ব্রাউনিং অটোমেটিক রাইফেলের মধ্যেই এ্যাসল্ট রাইফেল তৈরি করার বীজ নিহিত ছিল। জার্মানরাই প্রথম তাদের ছত্রী সেনাদের জন্য ফলসচার্মজাগারগেউইহার বা সংক্ষেপে এফজি-৪২ উদ্ভাবন করে। পরে তা থেকেই জন্ম নেয় প্রকৃত এ্যাসল্ট রাইফেল স্টর্মগেউইহার ৪৪ (এসটিজি-৪৪)। মেশিনগেউইহার-৪২ (এমজি-৪২) বা মেশিনগানের প্রযুক্তি উন্নয়নের চরমে

www.pathagar.com

পৌঁছে। তখনকার দিনে এটি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেশিনগান। স্নায়ুযুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে মেশিনগানের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করে। জার্মান বুন্ডেসউইহার এমজি-৩ সহ অন্যান্য মেশিনগান এখনো সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। এ প্রজন্মের মেশিনগান ব্যবহারের ধারাবাহিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে জি-৩। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত এম-৬০ মেশিনগান তৈরিতে মার্কিন সামরিক বাহিনী জার্মানীর তৈরি এফজি-৪২-এর অপারেটিং সিস্টেম নকল করেছিল।

যুদ্ধকালে জার্মানদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রযুক্তি ছিল অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে বহু গুণ উন্নত। তাদের অগ্রগতির ছাপ আজকের বিশ্বের সর্বত্র অস্ত্রের নকশা তৈরি এবং নির্মাণে পরিদৃষ্ট হয়। বহু অস্ত্র নির্মাতা জার্মানদের পরাজয়ের ছাই ভস্ম থেকে উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। হেকলার এন্ড কোচ, এসআইজি, ফেব্রিক ন্যাশনাল প্রভৃতি অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। এ বিষয়ে যারা আগ্রহী ছিলেন না তারাও তাদের স্বীকৃতি দেয়। শুধু আগ্নেয়াস্ত্র নয়, জেট প্রযুক্তি ও মহাকাশ প্রতিযোগিতায়ও জার্মানীর প্রযুক্তিগত প্রতিভার ছাপ পড়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইলেক্ট্রনিক্সের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। যুদ্ধের আগে স্বল্পসংখ্যক ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হতো। যুদ্ধের মাঝামাঝিতে উদ্ভাবিত রাডার ও এএসডিআইসি'র মতো যন্ত্রপাতিগুলো নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। নিজেদের প্রয়োজনে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং শত্রু পক্ষের যোগাযোগের বার্তা ধরার জন্য সাজসরঞ্জাম তৈরির প্রচণ্ড তাগিদ দেখা দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণায় ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স বিরাট অবদান রাখে। আধা গোপনীয় এনিয়াক এবং অতি গোপনীয় কলোসাস প্রমাণ করে যে, হাজার হাজার ভাল্‌ভ ব্যবহারকারী ডিভাইস প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এ প্রযুক্তি যুদ্ধোত্তরকালে কম্পিউটার প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করে রাখার পথ খুলে দেয়।

নতুন নতুন সাজসরঞ্জামের দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি এসব সাজসরঞ্জাম তৈরি এবং সেনাবাহিনীকে এসব সরঞ্জামে সজ্জিত করে তোলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেসব দেশ তাদের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল এবং যথাসময়ে তাদের সৈন্যদের সমরাস্ত্রে সজ্জিত করতে পেরেছিল তারাই অধিক সফল হয়। সিনথেটিক রাবার উৎপাদনের সামর্থ্য ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে প্রাকৃতিক রাবারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং সমরাস্ত্র উৎপাদনে সহায়ক হয়। সিনথেটিক উৎপাদনের সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

মানব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বিধ্বংসী যুদ্ধ আর কোনোটাই নয়। এমন কোনো দেশ নেই যে দেশ এ যুদ্ধে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এ যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল জার্মানী, জাপান ও ইতালী। তাদেরকে বলা হতো অক্ষশক্তি। অন্যদিকে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, কানাডা প্রভৃতি দেশকে নিয়ে গঠিত সামরিক জোট মিত্রপক্ষ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট ৫ কোটি লোক নিহত হয়। তাদের মধ্যে ১ কোটি ৯০ লাখ ছিল সৈন্য। উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ এবং ইউরোপ থেকে এশিয়া গোটা পৃথিবীটাই ছিল একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। জার্মানীর পোল্যান্ড দখলের ঘটনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। জার্মানীর একনায়ক এডলফ হিটলারকে এ যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু এ দু'টি দাবির কোনোটাই সত্যি নয়।

১৯৩০'র দশকে জার্মানীর অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়া, জাপানের মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালীর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ। তবে দীর্ঘস্থায়ী কারণগুলোর মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি ছিল মূল। ভার্সাই চুক্তির একটি অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত তৎকালীন জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা এবং জার্মানীর উপর প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের অশুভ আকাঙ্ক্ষাও ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে দায়ী করার আগে দায়ী করতে হবে জার্মানীর তৎকালীন পরিস্থিতিকে। এ পরিস্থিতিতে হিটলার ছাড়া অন্য কারো উত্থান ঘটতে পারতো। সেক্ষেত্রে ফলাফল দাঁড়াতো একই।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী শক্তিগুলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অদূরে ভার্সাই নামে একটি বিশাল প্রাসাদে জার্মানীকে ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি চুক্তি করে। পরাজিত জার্মানীকে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে বাধ্য করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্সু ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসন। এ তিন বিশ্ব নেতা জার্মানীকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে রাখার স্বার্থে ভির্সাই চুক্তিতে কতগুলো হীন শর্ত জুড়ে দেন। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যেসব অবমাননাকর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়

www.pathagar.com

সেগুলো হচ্ছে (১) জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা ১ লাখের বেশী হবে না এবং (২) বিমান, সামমেরিন ও ট্যাংক থাকবে না। (৩) ৬টি থাকবে ক্রুজার এবং ১২টি থাকবে ডেস্ট্রয়ার। তবে যুদ্ধজাহাজের ওজন ১০ হাজার টনের বেশী হবে না। (৪) কোনো জেনারেল স্টাফ থাকবে না এবং নতুন করে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা যাবে না। ভার্সাই চুক্তিতে আরো বলা হয় (ক) জার্মানীর আলসেস লোরেণের নিয়ন্ত্রণ থাকবে ফ্রান্সের হাতে (খ) ইউপেন ও মালমেডি নিয়ন্ত্রণ করবে বেলজিয়াম (গ) উত্তর সুইজউইগ নিয়ন্ত্রণ করবে ডেনমার্ক (ঘ) হাল্টসিন ও সুদেতানল্যান্ড থাকবে চেকোশ্লাভাকিয়ার হাতে (ঙ) পশ্চিম প্রুশিয়া, পোজেন ও আপার সাইলেশিয়া থাকবে পোল্যান্ডের হাতে।

সার, মামেল ও ডানজিগকে তৎকালীন জাতিপুঞ্জের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। জার্মানীর বিদেশী উপনিবেশগুলোর নিয়ন্ত্রণও জাতিপুঞ্জের কাছে অর্পণ করা হয়। ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাশিয়া যে ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়েছিল তাও তাকে পুনরায় ফেরত দিতে বলা হয়। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর কাছ থেকে মোট ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভূমি কেড়ে নেয়া হয়। এ ভূমির পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার বর্গমাইল।

জার্মানী ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে অনেক আপত্তি করেছিল। কিন্তু তার আপত্তি অগ্রাহ্য করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের দায় দায়িত্ব দেশটির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ৩২ কোটি মার্ক ক্ষতিপূরণ প্রদানে দেশটিকে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে জার্মানী দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯২১ সালে ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি ২৫ কোটি ডলার পরিশোধ করায় জার্মান অর্থনীতিতে ধস নামে। ফলে জার্মান সরকার পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করে। জার্মানীর এ অক্ষমতার প্রতিশোধ গ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স দেশটির অসামরিক অঞ্চল সার দখল করে নেয় এবং সেখানে সামরিক আইন জারি করে। প্রথম মহাযুদ্ধের শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে প্রতি তিনজন জার্মানের একজন বেকার হয়ে পড়ে। চারদিকে ক্ষোভ, হতাশা। ভার্সাই চুক্তি ছিল জার্মানদের কাছে অসহ্য। ওয়েমার সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। দ্রুত এ সরকারের পতন ঘটে। হিটলার তার জাতির অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাদেরকে ভার্সাই চুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার আশার বাণী শোনান। জার্মানরা তাকে আস্থায় নেয়। ১৯৩৩ সালে তিনি ক্ষমতায় আসেন। ১৯৩৬ সালে প্রথমেই তিনি ফ্রান্সের কবল থেকে উর্বরা সার অঞ্চল পুনর্দখল করেন। পরে ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়ার অংশবিশেষ এবং চেকোশ্লাভাকিয়া কেড়ে নেন।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অস্ট্রীয় যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ আততায়ী গাভরিলো প্রিন্সিপের গুলীতে নিহত হলে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ হত্যাকাণ্ড ছিল প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের বারুদ ঘরে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ যুদ্ধের দাবানলে গোটা ইউরোপ তছনছ হয়ে যায়। শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়। ইউরোপ ঋণী হয়ে পড়ে। আমেরিকা ছাড়া কারো পক্ষে ঋণ দেয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রদত্ত মার্কিন ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার। অথচ যুদ্ধের আগে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ বিলিয়ন।

www.pathagar.com

প্রথম মহাযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখা দেয় মহামন্দা। ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক স্টক মার্কেটে ধস নামা থেকে মহামন্দা শুরু হয়। আমেরিকার ৫ হাজার ও অন্যান্য দেশের আরো বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। জাপান প্রচুর রেশম উৎপাদন করতো। এ রেশমের ৯০ শতাংশ রপ্তানি করা হতো যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু মহামন্দা দেখা দেয়ায় রেশমের এ বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন একটি নয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। দেশে দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত বেধে যাওয়ায় অস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটে। মুনাফালোভীরা সামরিক শিল্পে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করে। সমরাস্ত্র ক্রয় ও উৎপাদন সহজলভ্য হওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। অস্ত্র উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও জার্মানী নিশ্চেষ্ট ছিল না। গোপনে গোপনে চলতে থাকে সমরাস্ত্র উৎপাদন। অস্ত্র তৈরিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েই দেশটি তার অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রতি মনযোগী হয়। প্রথমেই সে দৃষ্টিপাত করে ডানজিগের প্রতি।

ডিনজিগ ছিল একটি ঐতিহাসিক নগরী। ভিশ্চুলা নদীর মোহনায় অবস্থিত এ নগরীর অর্থনৈতিক মূল্য ছিল প্রচুর। ইউরোপে এ শহরের খ্যাতি ছিল প্রায় হাজার বছর। ১৩০৮ সাল থেকে এ শহর টিউটনিক যোদ্ধাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। টিউটনিক যোদ্ধাদের পতনের পর এ শহর পোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনো ডানজিগের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৭৭২ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া পোল্যান্ডকে ভাগাভাগি করে নেয়ার সময়ও স্বাধীন নগরী হিসেবে ডানজিগের মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৭৯৩ সালে দ্বিতীয় বার পোল্যান্ড ভাগাভাগি করার সময় ডানজিগ প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ সালে এ শহর পশ্চিম প্রুশিয়ার রাজধানী হিসেবে গণ্য হয়।

ভিশ্চুলা নদী নবগঠিত পোলিশ রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ হওয়ায় তার মোহনা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয় এবং ডানজিগকে আবার স্বাধীন নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯২০ সালের শেষভাগ থেকে ডানজিগ নতুন জীবন পেতে শুরু করে। রাজনৈতিক দিক থেকে ডানজিগ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডানজিগ ও পোল্যান্ডের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত করা হয়। ডানজিগ ও পোল্যান্ড একই শুল্ক ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়। ডানজিগ বন্দরে পোল্যান্ডের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং স্থির হয় যে, এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পোল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। ডানজিগ নগর রাষ্ট্রের কাছে ছিল পোমেজে প্রদেশ বা পোলিশ করিডোর। অতীতেও এ অঞ্চলে পোলিশদের বসবাস ছিল। ১৪০ বছর জার্মানদের দমন নীতির আওতায় বসবাস করেও পোলগণ তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করেনি।

১৯২০ সালে প্রথম ডানজিগে হাইকমিশনার আগমন করেন এবং পোল্যান্ড ও পোলিশ করিডোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ডানজিগে জার্মানদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাই এ বন্দর নিরাপদ মনে না করে পোল্যান্ড করিডোরের শেষ মাথায় ডিনিয়া নামে একটি বন্দর স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই বন্দরটি ইউরোপের অন্যতম প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। এ কারণে বন্দরটি জার্মানীর চক্ষুশূলে পরিণত হয়। ডিনিয়া

www.pathagar.com

স্থাপিত হওয়ায় ডানজিগ বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল। ডানজিগ ও করিডোরের ক্ষতি জার্মানীকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল। জার্মান জনগণ ও সরকার ভার্সাই চুক্তির এ অবমাননার বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ করে যাচ্ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর পোল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৩৪ সালের ২৬ জানুয়ারী তিনি পোল্যান্ডের সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি করেন। অন্যদিকে, ডানজিগবাসী জার্মানীর সঙ্গে একীভূত হতে জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। একটি নাৎসীদল গঠিত হয়। এ দল সরকার গঠন করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে।

হিটলার পোল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হলেও করিডোর ও ডিনজিগ-বাসীরা জার্মানীর প্রতি দুর্বলতা ত্যাগ করতে পারেনি। আলবার্ট ফরস্টারের নেতৃত্বে ডানজিগের নাৎসী দল হাইকমিশনারকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ডায়েটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় নাৎসীরা অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করতে থাকে। জার্মানীর তৃতীয় রাইখের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য জোর আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ পর্যায়ে গণতন্ত্রের সমর্থকদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। অনেককে গুলী করে হত্যা এবং বন্দী শিবিরে আটক করা হয়। ইহুদী বণিক ও ব্যাংকারদের সর্বস্বান্ত করে বিতাড়িত করা হয়।

১৯৩৭ সালে ডানজিগ স্বাধীন নগর রাষ্ট্রে পুরোপুরি নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের শুরুতেই ফস্টার ঘোষণা করেন যে, বার্লিন ডানজিগের বৈদেশিক নীতির ভার গ্রহণ করেছে। নাৎসী নেতা গলিটার আলবার্ট ফরস্টার ডানজিগের শান্তিপ্রিয় জার্মানদের হৃদয়েও পোলবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করতে সক্ষম হন। পোলিশ কমিশনার ও কৃতি রাজনীতিক এম চোডাকির চেষ্টায় বেশ কয়েক বার পোলবিরোধী আইন-কানুন প্রত্যাহার করা হয়। ডানজিগ সিনেটের প্রেসিডেন্ট হের গ্রীসারও কম যাননি। ১৯৩৬ সালে তিনি জেনেভায় জাতিপুঞ্জের বৈঠকে জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে ডানজিগে জাতিপুঞ্জের শাসনের অবসান কামনা করেন।

নাৎসীদের নৈরাজ্যের মুখে পোল্যান্ড অসহায় পড়ে। ১৯৩৮ সালে কয়েকটি আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পোল্যান্ড ডানজিগে রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগে সম্মত হয়। কিন্তু হেমন্তকালে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফরস্টার ঘোষণা করেন যে, অস্ট্রিয়া ও সুদেতানল্যান্ডের মতো ডানজিগের জার্মানগণও রাইখের সঙ্গে মিলিত হবে।

১৯৩৯ সালের শেষভাগে ঘোষণা করা হয়, পোলিশ বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষায় ডানজিগের পুলিশ বাহিনীর সদস্যা সংখ্যা ১,৫০০ থেকে ৪ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। জাহাজঘাট থেকে পোল শ্রমিকদের বিতাড়ন, শুল্ক বিভাগীয় পোল কর্মচারীদের উপর অত্যাচার এবং নাৎসী ঝটিকা সৈন্যদের গুলিতে একজন পোল কর্মচারী নিহত হলে পোল্যান্ডের সঙ্গে ডানজিগের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। যতই দিন যাচ্ছিল ততই ডানজিগের সঙ্গে পোল্যান্ডের মতবিরোধ তীব্র হচ্ছিল। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, জার্মানগণ যদি ডানজিগকে রাইখের

www.pathagar.com

সঙ্গে একীভূত করতে জিদ বজায় রাখে তাহলে পোল্যান্ড অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হবে এবং এ যুদ্ধ পোল্যান্ডের কাছে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবেই বিবেচিত হবে।

জুলাই গত হয়ে আগস্ট এলো। কিন্তু কোনোরূপ শান্তি বা মীমাংসার চিহ্ন দেখা যায়নি। অতীতে হিটলার তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন আবার তিনি একই কৌশল অবলম্বন করতে উদ্যত হন। ফলে ইউরোপে সমরানল প্রজ্জলিত হওয়ার উপক্রম হয়। এ যুদ্ধ যাতে বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। হিটলার তথা নাৎসী জার্মানীর সাম্রাজ্য ক্ষুধা ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারের সৈন্যদল করিডোরে প্রবেশ করে এবং ঐদিন সকালেই নাৎসী নেতা ফরস্টার ডানজিগবাসীদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন, '২০ বছর ধরে তোমরা যে সুদিনের অপেক্ষায় ছিলে আজ সেদিন উপস্থিত হয়েছে। আজ থেকে ডানজিগ জার্মান রাইখে প্রত্যাবর্তন করলো।' এভাবে ডানজিগ জার্মানীর সঙ্গে একীভূত হয়।

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউরোপে মহাসংকট দেখা দেয়। জার্মানী সদম্ভে ঘোষণা করে, 'রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পোল্যান্ড বিনা বাধায় জার্মানীর দাবি পূরণে বাধ্য হবে। জার্মানী বিনা যুদ্ধেই ডানজিগ ও করিডোর ফিরে পাবে। পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স কখনো জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস পাবে না।'

জার্মানীর এ আত্মবিশ্বাস ছিল ভুল। রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জার্মানীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জার্মানীতে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার নেভিল হেন্ডার্সন বার্লিন থেকে বিমান যোগে বার্চটেসগাডেনে উপস্থিত হয়ে হিটলারকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। হিটলার স্যার নেভিলের হাতে জার্মানীর জবাব হস্তান্তর করেন। হিটলার স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন যে, বৃটিশ প্রতিশ্রুতির জন্য জার্মানীর পক্ষে তার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া সম্ভব নয়। এ সময় বৃটিশ লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বেতার যোগে পৃথিবীর ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলোর অবগতির জন্য প্রচার করেন যে, 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৃটেনের স্বভাব বিরুদ্ধ।' লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ঘোষণার পর বিশ্ববাসী বুঝতে পারলো, যুদ্ধ তাদের দ্বারপ্রান্তে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মহামান্য পোপ ও বেলজিয়ামের রাজা শান্তির জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাদের আবেদন উপেক্ষিত হয়। সমরায়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলো পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিষোদগারে মুখর হয়ে উঠে। বৃটেন তবুও আশা করতে লাগলো যে, প্রজ্ঞা ও যুক্তির জয় হবে। ১৯৩৯ সালের ২৪ আগস্ট কমন্স সভায় মিঃ চেম্বারলিন ঘোষণা করলেন, জার্মানীর কার্যকলাপে বৃটেনের স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে উঠছে। বৃটেন এখনো শান্তির আশা করছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব পালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদিকে, হিটলার ত্বরিত গতিতে বার্লিন ফিরে এসে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ও নাৎসী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ডানজিগের শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করে নাৎসী নেতা ফরস্টারকে ডানজিগ রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানীতে যেসব বৃটিশ প্রজা ছিল তাদেরকে ফিরে

www.pathagar.com

আসার নির্দেশ দেয়া হয়। ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও তুরস্কের রিজার্ভ সৈন্যদের যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর কাছে বার্তা প্রেরণ করে শান্তি স্থাপনের অনুরোধ জানান। ১৯৩৯ সালের ২৫ আগস্ট হিটলার বৃটেনের কাছে গোপন বার্তা পাঠান। বৃটেন হিটলারের বার্তা উপেক্ষা করে সমরায়োজন অব্যাহত রাখে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এম দালাদিয়ের বেতার যোগে ইঙ্গ-ফরাসী ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জার্মানী ও পোল্যান্ডের প্রতি অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে ডানজিগে জার্মান সৈন্য অবতরণ করে। জাপান ইউরোপীয় সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালের ২৬ আগস্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভা হিটলারের বার্তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। জার্মানী নুরেমবার্গে নাৎসী দলের শান্তি কংগ্রেস বন্ধ করে দেয়। ডানজিগ বন্দরে জার্মানীর শ্লেসউইস নামে ক্রুজার এসে পৌঁছায়। পোল্যান্ড প্রত্যেক শহরে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পরিখা খননের নির্দেশ দেয়। পোল্যান্ডের স্থানীয় সংগ্রামের পরিবর্তে জার্মানী যে ব্যাপক ইউরোপীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে জার্মান জনগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। পোল্যান্ড সীমান্তে অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ২৭ আগস্ট হিটলার ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে জানিয়ে দেন, 'ডানজিগ ও করিডোরের দাবি প্রত্যাহার করা অসম্ভব। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি ২০ লাখ লোকের মায়া ত্যাগ করতে পারে না।'

অন্যদিকে, বৃটিশ নৌ-বিভাগ বাণিজ্য জাহাজ নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। অনেক জাহাজ গতি পরিবর্তন করে ফিরে আসে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আবার শান্তির প্রস্তাব পাঠান। হিটলাার তার শান্তি প্রস্তাবের কোনো জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবে পোল্যান্ড আপোষের মনোভাব প্রকাশ করে। ইংল্যান্ডের গীর্জায় গীর্জায় শান্তির জন্য প্রার্থনা শুরু হয়। রাজা স্বয়ং ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবেতে প্রার্থনায় যোগদান করেন। ইউরোপে ১ কোটি সৈন্য যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। ১৯৩৯ সালের ২৮ আগস্ট রাত ১০টা ২০ মিনিটে স্যার নেভিল হেন্ডার্সন বৃটিশ জবাবসহ বার্লিন চ্যান্সেলারিতে উপস্থিত হন। হিটলার মৌখিক জবাব দেন এবং সে রাতেই তা লন্ডন পাঠানো হয়।

বৃটিশ নৌ-বিভাগ ভূমধ্যসাগর ও বাল্টিক সাগরে বৃটিশ জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে ফ্রান্স জার্মান সীমান্ত বন্ধ ঘোষণা করে। পোল্যান্ড সীমান্তের জেলাগুলো থেকে লোকজনকে স্থানান্তরিত করে। একইদিন রাতে জার্মান সৈন্যরা শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে থাকে। শ্লোভাক সরকার জার্মান সৈন্য প্রবেশে বাধা দানে অক্ষমতা প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালের ২৯ আগস্ট সন্ধ্যা সোয়া ৭ টায় বার্লিনে স্যার নেভিল হেন্ডার্সনের কাছে জার্মানীর জবাব হস্তান্তর করা হয়। জার্মানী বার্তায় পরদিন রাত ১২ টার আগে আলোচনা চালানোর পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে একজন পোল দূতকে বার্লিন পাঠানোর দাবি জানায়। এই উত্তর তার যোগে লন্ডনে পাঠানো হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। জার্মানীকে জবাব দানের জন্য একটি খসড়া চিঠি তৈরি করা হয়। একইদিন মস্কো থেকে খবর আসে যে, সুপ্রীম সোভিয়েতে (পার্লামেন্ট) জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুমোদিত হয়নি। সুপ্রীম সোভিয়েতের

www.pathagar.com

অধিবেশন দু'দিনের জন্য মুলতবি করা হয়েছে। এদিনে জার্মানী সমগ্র স্লোভাকিয়া দখল করে নেয়।

১৯৩৯ সালের ৩০ আগস্ট রাত ২টায় বৃটিশ মন্ত্রিসভা এক তার বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেয় যে, 'আজ আমাদের পক্ষে বার্লিনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' উভয়পক্ষই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জার্মানী পোল-স্লোভাক সীমান্তে ৪ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে। পরে জার্মান সৈন্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। পোল্যান্ড শেষ রিজার্ভ সৈন্যসহ মোট ২৮ লাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। মধ্য রাতে বৃটিশ দূত বৃটিশ জবাব নিয়ে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে হাজির হন। বৃটিশ জবাব পাঠ করে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ রাগে কাঁপতে লাগলেন। এসময় তিনি বৃটিশ দূতকে একটি দলিল পড়ে শোনান। দলিল পাঠ করে তিনি বললেন, এখন আর আলোচনা করার সময় নেই। পোল দূতের আসার সময় পেরিয়ে গেছে। পোলরা কিন্তু জার্মানদের দাবি-দাওয়া কিছুই জানতে পারেনি।

১৯৩৯ সালের ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার মস্কোতে সুপ্রীম সোভিয়েত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অনুমোদন করে। ঐ দিনই বেতার যোগে জার্মানী পোল্যান্ডের কাছে ১৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ডানজিগ ফেরত দান এবং গণভোটের মাধ্যমে সেখানে নাৎসীবাদ কায়েম।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানী প্রথম পোল্যান্ডের কাটোবিস, ক্রাকাউ ও টেস্কেন শহরের উপর তীব্র আগুনে বোমা নিক্ষেপ করে। পোল্যান্ডে জার্মানী বোমাবর্ষণ করায় লন্ডন শহরে শিশুদের অপসারণ শুরু হয়। বেলা ৭ টা ৩৫ মিনিটে ফরস্টার ডানজিগ রাইখের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। বেলা ৮ টায় পোল্যান্ডে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। করিডোরের উভয় দিক এবং পূর্ব প্রুশিয়া থেকে আক্রমণ চলতে থাকে। জার্মান বোমারু বিমানগুলো ডিনিয়া বন্দরের উপরও বোমাবর্ষণ করে।

বেলা ৯ টায় লন্ডনে যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় কমন্স সভার অধিবেশন ডাকা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন শেষবারের মতো জার্মানীকে সতর্ক করে দেন। হিটলারকে লক্ষ্য করে বলা হয়, অবিলম্বে পোল্যান্ড থেকে জার্মান সৈন্য প্রত্যাহার করা না হলে বৃটেন পোল্যান্ডকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য হবে। ২ সেপ্টেম্বর বৃটেনের অধিবাসীগণ ঘুম থেকে জেগেই শুনতে পায় যে, হিটলার কোনো জবাব দেননি। তাদের ধারণা ছিল হিটলারকে জবাব দানের জন্য কোনো সময় বেঁধে দেয়া হয়নি বলে তিনি বিলম্ব করছেন।

পোল্যান্ডে ভীষণ লড়াই শুরু হয়। অনেক উন্মুক্ত শহরেও বোমা পড়তে লাগলো। সন্ধ্যায় কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আর্থার গ্রীনউড সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কঠোর নিন্দা করে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ৩ সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার জার্মানীর কাছে চরমপত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, বেলা ১১টার মধ্যে উত্তর না এলে বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। জার্মানী বৃটেনের এ চরমপত্রের কোনো জবাব দেয়নি। বেলা ১১টা ১০মিনিটে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন বেতার যোগে ঘোষণা করেন যে,

www.pathagar.com

জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং যুদ্ধে পশু শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়নীতি জয়লাভ করবে। বিকেল ৬ টায় মহামান্য রাজা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছে যুদ্ধের সংবাদ প্রেরণ করেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৯ জন সচিবকে নিয়ে একটি সমর পরিষদ গঠন করা হয়। মিঃ চার্চিল নৌ সচিব হিসেবে সমর পরিষদে যোগদান করেন। মিঃ এন্থনি ইডেন ডোমিনিয়ন সচিব নিযুক্ত হন। জার্মানীর বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করা হয়। বৃটিশ জাহাজে নিষিদ্ধ পণ্য বহন করা হচ্ছে কিনা তা তল্লাশি করে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়। বিকেল ৫ টায় ফ্রান্সের দেয়া চরমপত্রের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং ফ্রান্সও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য হিটলার পূর্ব সীমান্তে যান। লন্ডন শহরের সকল সিনেমা ও থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়। স্থায়ীভাবে নিষ্প্রদীপ মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যে আগুন নিভে গিয়েছিল আবার সে আগুন জ্বলে উঠে। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

www.pathagar.com

রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার আগে মিউনিখ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, এ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির জবাবে রুশ-জার্মান সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। দূরদর্শী স্টালিন বুঝতে পারেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারকে লেলিয়ে দেয়াই এ চুক্তির উদ্দেশ্য। তাই তিনি একই তাস নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর মিউনিখ শহরে সোভিয়েত কমিউনিজমের ভীতি মোকাবিলার উপায় নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। এ সম্মেলনে জার্মানীর দাবির কাছে এসব দেশ নতি স্বীকার করে। জার্মানী, ইতালী, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স মিউনিখ প্যাক্টে সই করে। মিউনিখ প্যাক্ট ছিল একটি সোভিয়েত বিরোধী আঁতাত। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার নেভিল চেম্বারলিন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও স্টালিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মিউনিখ চুক্তির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত শত্রু জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। নাৎসী-সোভিয়েত গোপন চুক্তি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশের স্বার্থের ভিত্তিতে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও রুমানিয়াকে বিভক্ত করার একটি গোপন প্রটোকল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এ প্রটোকলের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, উভয় পক্ষ এ প্রটোকলকে অত্যন্ত গোপনীয় দলিল হিসেবে বিবেচনা করবে। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট মস্কোয় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাচেস্লাভ মলোটভ ও জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বয়ং স্টালিনও উপস্থিত ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হতো। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান হামলা নাগাদ এ চুক্তি বলবৎ ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে অনাক্রমণ চুক্তি বলে পরিচিত এটি একটি আগ্রাসী সামরিক চুক্তিতে পরিণত হয়। চুক্তিতে যেসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয় সেসব দেশে হয়তো উভয়েই আগ্রাসন চালিয়েছে নয়তো এককভাবে রাশিয়া কিংবা জার্মানী। এক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'বার ফিনল্যান্ডে হামলা চালায়। কিন্তু দেশটি সাফল্যের সঙ্গে সোভিয়েত হামলা মোকাবিলা করে। তবে তাকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হয়।

১৯১৮ সালে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক (১৯১৮ সালের ৩ মার্চ ব্রেস্ট-লিটোভস্ক নামে একটি স্থানে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি) চুক্তির আওতায় নয়া বলশেভিক দুর্বল রাশিয়াকে সেন্টাল পাওয়ার্সের (প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়া। এসব দেশ পূর্বদিকে রাশিয়া এবং পশ্চিমে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ছিল এদেরকে সেন্ট্রাল পাওয়ার্স বলা হতো) কাছে নতি স্বীকারে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের (আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার অংশবিশেষসহ) উপর প্রভাব বিস্তার ও সার্বভৌমত্বের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। মিটেলিউরোপা নীতি (জার্মান শব্দ। প্রথম মহাযুদ্ধে সেন্ট্রাল পাওয়ার্সের অনুসৃত নীতি) অনুসারে এসব দেশ জার্মান সাম্রাজ্যের স্যাটেলাইট বা অধীনস্ত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হয়। এসব স্যাটেলাইট রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে জার্মান কাইজারের অধীনে ডিউক অথবা রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পটভূমিতে এসব দেশের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে দেশগুলো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রক্সি হিসেবে কাজ করে। বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেন ছাড়া বাদবাকি দেশ পুরোপুরি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২০-এর দশকে রাশিয়া ও কমিউনিজমের ভয়ে তথাকথিত বোর্ডার স্টেটসগুলো (রুশ বিপ্লবকালে যেসব দেশ রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন– ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, বাইলোরাশিয়া, ইউক্রেন ও রুমানিয়া) নিজেদের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির পেছনে ১৯২০-এর দশকে ইউরোপে বিরাজিত এ পরিস্থিতির প্রভাবও কাজ করে। ইউরোপে স্থিতাবস্থা ছিল সোভিয়েত স্বার্থের পরিপন্থী। তাই দেশটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল না। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত শুধু সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল নয়, বরং এ সংঘাত কমিউনিজম বিস্তারেও সহায়ক হবে। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সোভিয়েতদের হিসাব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৩৫ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রান্সও ছিল চুক্তির একটি অংশীদার। চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, সম্ভাব্য জার্মান হামলায় ফ্রান্স এগিয়ে এলে সোভিয়েত ইউনিয়নও সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে। ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় জার্মান অভিযানকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী দেশটিকে সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু চেকোশ্লাভাকিয়ার এ্যাগ্রেরিয়ান পার্টি সোভিয়েত সৈন্য প্রেরণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে

www.pathagar.com

থাকে। দলটি এ হুমকিও দেয় যে, সোভিয়েত সৈন্যরা চেকোশ্লাভাকিয়া সীমান্ত অতিক্রম করলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। ১৯২৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লাভিকায়ার আরেকটি পৃথক চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা দু'টি চুক্তির কোনোটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অর্থহীন।

মস্কোয় রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াসিন ভন রিবেনট্রপ। পাশে সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন

১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর একটি অনাগ্রাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের মার্চে এ চুক্তি বাতিলে হিটলারের ঘোষণাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সমন্বয়ে জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের অঙ্গীকার সম্বলিত একটি জোট গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে সৈন্য প্রেরণের অধিকার দাবি করায় বৃটিশ সরকার এ প্রস্তাবে সম্মতি দানে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়। এদিকে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ১৯৩৯ সালের ২৪ মার্চ পোল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেন। ফ্রান্সও একই নিশ্চয়তা দেয়। ২৫ এপ্রিল তিনি পোল্যান্ডের সঙ্গে প্যাক্ট অব মিউচ্যুয়াল এসিস্ট্যান্স-এ সই করেন। বৃটেন ও পোল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর করায় স্টালিনের মন থেকে এ আশংকা দূর হয়ে যায় যে, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশ্চাত্য তাকে নিংসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করবে। তবে তিনি এ সম্ভাবনাও দেখতে পেলেন যে, জার্মানী ও

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করা নাগাদ তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও বৃটেনের সমন্বয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি জোট গঠনের আলোচনা পারস্পরিক অবিশ্বাসে স্থবির হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমর্থনের নিশ্চয়তা দাবি করে এবং পশ্চিম সীমান্ত বরাবর দেশগুলোতে আক্রমণকারী শক্তির অনুকূলে বিদ্যমান নীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকারের স্বীকৃতি চায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ দাবিতে বৃটিশ ও ফরাসীরা শংকিত হয়ে উঠে। তারা বুঝতে পারে যে, বৈদেশিক হামলার ঝুঁকি না থাকলেও এ গ্যারান্টি প্রদান করা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

জার্মানী পোল্যান্ডের কাছে ভূখণ্ডগত ছাড় দাবি করলে যুদ্ধের হুমকি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে টেলিগ্রাম বার্তা বিনিময় হতে থাকা সত্ত্বেও ১১ আগস্ট নাগাদ পাশ্চাত্যের সামরিক মিশন মস্কো এসে পৌঁছায়নি। পাশ্চাত্যের সামরিক মিশন মস্কো এসে পৌঁছলেও কোনো চুক্তি করার কর্তৃত্ব তাদের ছিল না। পোল্যান্ড সংকট ছিল খুবই জটিল। সোভিয়েত সরকার বিতর্কিত ভূখণ্ড ক্রেসি গ্রাস করতে চায় বলে পোলিশ সরকার আশংকা করতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে পোলিশ-সোভিয়েত যুদ্ধে এ ভূখণ্ড পোল্যান্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়। পোলিশ সরকার সোভিয়েত সৈন্যদের তার ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং জার্মানীর সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানায়। পোলিশ সরকারের এ মনোভাবের প্রেক্ষিতে রেড আর্মির জন্য পোল্যান্ড দখল করা ছাড়া জার্মানীকে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও মতবিরোধে আলোচনা ভেঙ্গে যায়। ক্রেমলিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো তাদেরকে এমন এক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিচ্ছে যেখানে যুদ্ধ কেবল জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে সোভিয়েত অবস্থানের সমর্থকরা বলছেন যে, ১৯৩৮সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিখ চুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। তারা উল্লেখ করেন, মিউনিখ চুক্তিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পশ্চিমা শক্তিগুলো অক্ষশক্তিকে তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করছে এবং তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নাৎসী বিরোধী জোট গঠনে আগ্রহী নয়। তাছাড়া এ উদ্বেগও দেখা দেয় যে, জার্মানী হামলার সূচনা করলে বৃটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকবে এই আশা নিয়ে যাতে বিবদমান রাষ্ট্র দু'টি একে অপরের শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ধ্বংস হয়।

স্টালিন বিশ্বাস করতেন, বৃটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে এবং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো চাচ্ছে জার্মানী কমিউনিস্ট

www.pathagar.com

রাশিয়ায় হামলা করুক এবং তাদের হামলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে যাক। অথবা দু'টি দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে ধ্বংস হোক। তিনি মনে করতেন, এ দুরভিসন্ধি থাকায় বৃটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে প্রস্তাবিত নাৎসী বিরোধী জোটে শামিল হচ্ছে না। স্টালিনের জীবনীকাররা বলছেন, মিউনিখ চুক্তি উপলক্ষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ও এডলফ হিটলার বৈঠকে মিলিত হলে স্টালিনের অবিশ্বাস আরো জোরালো হয়।

সোভিয়েত অবস্থানের সমর্থকরা উল্লেখ করছেন যে, ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অবস্থায় না থাকায় সময় ক্ষেপণে জার্মানীর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়। তারা বলছেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমপক্ষে ৩ বছরের প্রয়োজন ছিল। স্টালিনের সমালোচকদের অভিমতের সঙ্গে তাদের অভিমতের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্টালিনের সমালোচকরা বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকার কারণ ছিল ১৯৩৬-৩৮সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনীতে স্টালিনের ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান। শুদ্ধি অভিযানকালে সশস্ত্র বাহিনীর অধিকাংশ দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নির্মূল করা হয়। এটা সুবিদিত সত্যি কথা যে, বিদেশী ও সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার উপর্যুপরি আগাম হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নে হামলা চালানোর সময় রেড আর্মি এ ধরনের একটি যুদ্ধের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সামরিক হুমকি মোকাবিলায় স্টালিনের সদিচ্ছা নিয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছেন। তারা বলছেন, ১৯৩৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামরিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছিল। জার্মান হামলা শুরু হওয়া নাগাদ এ সহযোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা জার্মানীকে মিত্রবাহিনীর নৌ-অবরোধ বিকল করে দিতে সহায়তা করেছে।

১৯৩৯ সালের ৩ মে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জোসেফ স্টালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে মলোটভকে মাক্সিম লিটভিনভের স্থলাভিষিক্ত করেন। ফলে জার্মানীর সঙ্গে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। লিটভিনভ ইতিপূর্বেকার নাৎসী বিরোধী জোট গঠনের নীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং ক্রেমলিনের মানদণ্ডে তিনি পশ্চিমাপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মলোটভ ঘোষণা করেন যে, তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানীর সঙ্গে সকল ইস্যুর নিষ্পত্তিকে স্বাগত জানাবেন।

১৯৩৯ সালে আগস্টের শেষ দু'সপ্তাহে জাপান-সোভিয়েত সীমান্ত যুদ্ধ তুঙ্গে পৌঁছে। এ পর্যায়ে হিটলারের পরামর্শে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ১৯ আগস্ট মস্কো সফর করেন। তার সফরকালে মস্কো ও বার্লিনের মধ্যে ৭ বছর মেয়াদী একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, ২০ কোটি জার্মান মার্কের ঋণের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীতে পেট্রোল, আকরিক লৌহ, খাদ্যশস্য, তুলা,

www.pathagar.com

ফসফেট ও কাঠ রপ্তানি করবে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ নিজেদের ভৌগলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে অতিরিক্ত একটি প্রটোকল স্বাক্ষরের প্রস্তাব দেন। অনেকেই বলছেন যে, মলোটভ অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষরের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট স্টালিনের ভাষণে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। সেদিন স্টালিন তার ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্ব বিপ্লব প্রসারে পাশ্চাত্যের শক্তিগুলোর মধ্যে একটি মহাযুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

২৩ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ১০ বছর মেয়াদী একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো পক্ষ কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে আলাপ-আলোচনা অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে তার নিরসন করা হবে। কোনো পক্ষ তৃতীয় কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অন্য পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। কেউ কোনো পক্ষের প্রতি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বৈরি অন্য কোনো গ্রুপের সদস্য হবে না। চুক্তির গোপন অনুচ্ছেদে বলা হয়, উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়া হবে। উত্তরাঞ্চলে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া এবং নারেভ, ভিশ্চুলা ও সান নদীর পূর্বাংশ দখল করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমাংশ দখল করবে জার্মানী। পূর্ব প্রুশিয়ার নিকটবর্তী লিথুয়ানিয়া যাবে জার্মান নিয়ন্ত্রণে। চুক্তিতে রুমানিয়ার বেসারাবিয়ায় সোভিয়েত স্বার্থ এবং জার্মানীর অনাগ্রহ স্বীকার করে নেয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত চুক্তি ছাড়া আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার একটি ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত সীমান্ত ও মৈত্রী চুক্তি এবং আরেকটি ছিল ১৯৪১ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাক্ষরিত পৃথক অন্য একটি গোপন চুক্তি। ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি কোনো পক্ষ কখনো প্রকাশ অথবা স্বীকার করেনি। তারপরেও ঘটনাক্রমে বিভিন্ন চ্যানেলে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। জার্মান কূটনীতিক হ্যান্স ভন হারওয়ার্থ ২৪ আগস্ট তার মার্কিন সহকর্মী চার্লস বোহলেনকে এ গোপন চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। তবে এ তথ্যটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ডেস্কে যাবার আগেই থেমে যায়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিন সোভিয়েত ও জার্মান পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত খবর ও প্রকাশ্য বিষয়বস্তু প্রকাশিত হলে ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। শুরু থেকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল যে, যতটুকু প্রকাশ করা হয়েছে চুক্তিটির সীমা তার চেয়ে অনেক বেশী। এস্তোনীয় জেনারেল স্টাফের একজন কমকর্তা ২৬ আগস্টের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ চুক্তিতে সোভিয়েত ও জার্মান স্বার্থের অনুকূলে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে ভাগ করা হয়েছে এবং এস্তোনিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। লাটভিয়ার কূটনৈতিক সার্ভিসও চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই বিষয়বস্তু জানতে পেরেছিল। অন্যদিকে, গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, জার্মানী লাটভিয়াকে রাশিয়ার কাছে অর্পণ করেছে।

কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও স্টালিন ও মলোটভ মস্কোয় বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় এসব দেশকে চাপ প্রয়োগে বশ্যতা স্বীকারের কৌশল হিসেবে জার্মানীর সঙ্গে গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়বস্তু ফাঁস করে

www.pathagar.com

দেন। মস্কো আলোচনায় যেসব বাল্টিক নেতা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাউজাস আর্থিস ও লিথুয়ানীয় সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল স্টাসিস রাসটি কিস ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এ দু'জনসহ আরো সূত্র এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

সোভিয়েতেরা বাল্টিক মন্ত্রীদের কাছে চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করে আবার সে কথা জার্মানদেরও অবহিত করে। এতে জার্মানী চরম ক্ষুব্ধ হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ বাল্টিক নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এ চুক্তির গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেন। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর এ কেনাবেচার সংবাদ পাশ্চাত্য জানতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ তাদের কাছে বিষয়টি ছিল অজ্ঞাত। ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রথম জানাজানি হয় এবং পরে তা বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালের ১০ আগস্ট এস্তোনীয় দৈনিক রাহভা হা'ল-এ রুশ-জার্মান গোপন প্রটোকলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, মূল কপিটি বন-এ জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মোহাফেজখানায় রক্ষিত ছিল। তদানীন্তন সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাস'র প্রধান ভ্যালেন্তিন ফালিন মস্কোতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুনরুক্তি করে বলেন, এ প্রটোকলের মূল কপি কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মি. ফালিন সত্যি কথাই বলেছিলেন। যুদ্ধের পর দখলীকৃত জার্মান দলিলপত্র সংরক্ষণ ও ফটোকপি করার প্রকল্পে নিয়োজিত আমেরিকান পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন যে, রাইখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রের অধিকাংশের মূল কপি পাওয়া যায়নি।

১৯৪৫ সালে মিত্রবাহিনীর ভয়াবহ বোমা হামলার মুখে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মোহাফেজখানা বার্লিন থেকে বন-এ সরিয়ে ফেলা হয় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দলিলের ফটো কপি করার নির্দেশ দেন। রাইখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান দোভাষী পল অটো স্মিট এ কাজ সম্পন্ন করেন। স্মিটের সহকারী কার্ল ভন লোয়েচ ফিল্মগুলো বাক্সে বোঝাই করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। এভাবে নাৎসীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রক্ষা পায়। ১৯৪৫ সালে মে মাসের শেষদিকে ভন লোয়েচ বৃটিশ ডকুমেন্ট টীমের প্রধান লেঃ কর্নেল আর, সি, থমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে ফিল্মগুলো হস্তান্তর করেন এবং তার হস্তান্তরিত দলিলপত্র দখলীকৃত জার্মান রেকর্ড প্রকল্পের অংশে পরিণত হয়। রিবেনট্রপের ফাইলের ভেতর ২৩ আগস্ট ও ২৮সেপ্টেম্বরের চুক্তি দু'টির ফিল্ম পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এ গোপন চুক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। তবে সে বছর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আলেক্সান্ডার নিকোলায়েভিচ ইয়াকোলেভ এ চুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ১৯৯২ সালে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হলেও মূল কপি প্রকাশ করা হয়নি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ রুশ-জার্মান গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে পাশ্চাত্যের জালিয়াতি বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাদের দাবি ছিল অসার। রুশ-জার্মান গোপন চুক্তির ফটো কপি যে জাল নয় তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। ১৯৩৯-৪১ সালে রুশ-জার্মান পত্র বিনিময় এবং তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিও প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে অনুরূপ চুক্তি ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৩৯ সালের শরতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বাল্টিক নেতৃবৃন্দের কাছে এ চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে, চুক্তি স্বাক্ষরের বাস্তব লক্ষণ ফুটে উঠায় জার্মানরা তার সত্যতা অস্বীকার করতে পারেনি। ১৯৩৩-৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান সরকারের আচরণেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ভৌগলিক সুবিধা অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপ ভাগাভাগি করার একটি গোপন চুক্তি তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া হয় যে, চুক্তির ফটো কপি জাল তাহলে এ চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত শত শত দলিলপত্রও জাল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এসব দলিলের সত্যতা নিয়ে কেউ কোনোদিন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। সহায়ক অসংখ্য দলিলে রুশ-জার্মান গোপন চুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং পূর্ব ইউরোপ ভাগাভাগিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে যে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। চুক্তি হওয়ার রটনা মিথ্যা হয়ে থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়নও সহজেই প্রমাণ করতে পারতো। কিন্তু দেশটি তার মোহাফেজখানায় কখনো কাউকে প্রবেশ করতে দেয়নি। এমনকি নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধানীদের নয়। এতেই বুঝা যায় যে, চুক্তির ফটো কপি জাল নয়। ১৯৮৮ সালে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির ৫০তম বার্ষিকীতে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে এক বিশাল সমাবেশে সে দেশের খ্যাতনামা কবি জাস্টিকাস মারকিনকেভিকিয়াস উদাত্ত কণ্ঠে এ গোপন চুক্তির সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

স্টালিন এ ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন যে, চুক্তির এ গোপন ধারায় হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তার পরিণাম হচ্ছে যুদ্ধ। তাই তিনি প্রকাশ করেননি।

১৯৪০ সালের এপ্রিলে জার্মান সৈন্যরা ডেনমার্ক ও নরওয়ে এবং ১৯৪০সালের জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু রুমানিয়ার বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা দখল করে নিলে এ চুক্তির ধস শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট দু'টি পক্ষ চুক্তিতে বর্ণিত তাদের সীমা লংঘন করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে স্টালিন স্বীকার করেন যে, হিটলার আগ্রহী হলে জার্মানীর সঙ্গে কাজ করে যেতে তার কোনো আপত্তি ছিল না। স্টালিনের এ উক্তি অযথার্থ ছিল না। কারণ বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেয়ে জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি অধিক লাভবান হতেন। ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার-এর মতে, স্টালিন বিশ্বাস করতেন, জার্মানরা এত বোকা নয় যে, তারা দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করবে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে জার্মানরা লড়াই চালিয়ে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট উপকার হতো বলে তিনি ধারণা করতেন। চুক্তি স্বাক্ষরের এক দশক আগে সোভিয়েতরা বিভিন্ন পন্থায় নাৎসীদের

www.pathagar.com

বিরোধিতা এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করছে। তবে এ বাস্তবতার গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর জন্য সোভিয়েত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সোভিয়েত প্রচার মাধ্যমেও বহু প্রচারণা চালানো হয়। তবে তারা এব্যাপারে সচেতন ছিল যাতে তাদের প্রচারণা জার্মানপন্থী বলে বিবেচিত না হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি অনাক্রমণ চুক্তি হলেও এটি আঁতাত গঠনের চুক্তি ছিল কিনা সে ব্যাপারে মলোটভের একটি উক্তির উল্লেখ করা হয়। জার্মানদের পুনরায় আশ্বস্ত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে 'ফ্যাসিবাদ একটি উপভোগ্য বিষয়' (Facism is a matter of taste) বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের বিনিময়ে আশপাশের দেশগুলো দখল করে নিয়েছিল। এসব দেশ দখল জার্মান হামলাকালে তার বিপর্যয় রোধে কতটা সহায়ক হয়েছিল চুক্তির মূল্যায়নে তা একটি অমীমাংসিত বিষয়। সোভিয়েত সূত্র দাবি করছে যে, মস্কোর কয়েক কিলোমিটার দূরে জার্মান অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হয়। অতএব এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ভূখণ্ডের ভূমিকা ছিল গৌন। তবে অন্যারা বলছেন যে, পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি শুধু পশ্চিম ইউরোপ নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান হামলায়ও ছিল একটি পূর্বশর্ত।

১৯৩৯-৪১ সালে নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সহযোগিতাকালে একযোগে দু'টি ঘটনা ঘটে। একটি ছিল মিডল জোনে জার্মানীর সম্প্রসারণ এবং আরেকটি ছিল রুশ অগ্রযাত্রার সূচনা। তবে ১৯৪১সালে জার্মান অভিযান শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বদিকে বহুদূরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে চূড়ান্ত অগ্রযাত্রা শুরু করে। এতে দেশটি ১৯৩৯ সালে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তিতে প্রদত্ত সুবিধার চেয়ে বেশী লাভবান হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র এক সপ্তাহ পর ১ সেপ্টেম্বর জার্মান হামলায় পোল্যান্ডের বিভক্তির পালা শুরু হয়। ১৭সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বদিক থেকে হামলা শুরু করলে দেশটির চতুর্থ দফা বিভক্তি সম্পন্ন হয়। তথাকথিত কার্জন লাইনের পশ্চিমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংলগ্ন মলোটভ-রিবেনট্রপ লাইন নামে পরিচিত পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের একটি সীমান্ত নির্ধারণের প্রস্তাব দিলে পোল্যান্ড তা প্রত্যাখ্যান করে। মলোটভ-রিবেনট্রপ লাইনে প্রায় ৪০ লাখ পোলিশের বসবাস ছিল। তবে এখানে বসবাসকারী জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল ইউক্রেনীয়, রুশ ও বেসারাবীয়। একারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে 'মাদার রাশিয়া' হিসেবে আবির্ভূত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডগত দাবি হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া অথবা পোল্যান্ডের অনুরূপ ছিল না। তার দাবির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী আকাংখাও কাজ করতো। এক বছর আগে ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে পোলরা জাতিগত ইস্যু উত্থাপন করে চেকোশ্লাভাকিয়ার কাছ থেকে টেশেন দখল করে

www.pathagar.com

নেয়। রুশরা একইভাবে পোলিশ অধীনতা থেকে 'জ্ঞাতি ভাইদের মুক্ত করার' শ্লোগান দিতে থাকে। উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে গণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিস্ট, অথবা কমিউনিস্ট যাই হোক না কেন, প্রতিটি সরকারের কাছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলে জাতিগত ইস্যু ছিল একটি সুবিধাজনক অজুহাত।

রুশ-জার্মান চুক্তি পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর মধ্যে গভীর অস্বস্তির জন্ম দেয়। তারা চুক্তির পরিণাম নিয়ে শংকিত হয়ে উঠে। কমিউনিস্টদের মধ্যে আতংকের মাত্রা ছিল আরো বেশী। অধিকাংশ কমিউনিস্ট তাদের নাৎসী শত্রুদের সঙ্গে মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের এসব কার্যকলাপকে কমিউনিজমের আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করতেন। ১৯৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড-এ কার্টুনিস্ট ডেভিড লোর একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রে দেখানো হয় যে, হিটলার ও স্টালিন পোল্যান্ডের মৃতদেহের উপর একে অপরকে অভিবাদন করছেন। হিটলার মৃত পোল্যান্ডকে দেখিয়ে বলছেন,'এই দেখুন বিশ্বের আর্বজনা।' জবাবে স্টালিন বলেন, 'শ্রমিকদের নিকৃষ্ট আততায়ী।'

১৯৩৯ সালের ২৮সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রকে প্যাক্ট অব ডিফেন্স এন্ড মিউচ্যুয়াল এসিস্ট্যান্স নামে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের নির্দেশ দেয়। এ চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ দেয়। একইদিন একটি সম্পূরক জার্মান-সোভিয়েত প্রটোকলের আওতায় লিথুয়ানিয়ার অধিকাংশ এলাকা জার্মান নিয়ন্ত্রণ থেকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করা হয়। অনুরূপ দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ৩০ নভেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা ফিনল্যান্ডে হামলা চালায়। 'উইন্টার ওয়ার'-এ ৩ মাস প্রচণ্ড যুদ্ধ ও ক্ষয়ক্ষতির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটির ১০ শতাংশ ভূখণ্ডের বিনিময়ে লড়াই বন্ধ করে।

১৯৪০ সালের ১৫-১৭ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে সেগুলো একীভূত করে নেয়। একই সময়ে দেশটি রুমানিয়ার বেসারাবিয়া, বুকোভিনা ও হারৎজা অঞ্চলকে চরমপত্র দেয়। সোভিয়েতদের এ উদ্যোগে শংকিত হয়ে ২৫ জুন রিবেনট্রপ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো তার জবাবে রুমানিয়ায় জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তার জবাবে এ নিশ্চয়তা দেন যে, রুমানিয়াকে রণাঙ্গনে পরিণত করা হবে না। তাছাড়া তিনি দাবি করেন, বেসারাবিয়ায় বসবাসকারী ১ লাখ সংখ্যালঘু জার্মানের বিশ্বাস ও ভবিষ্যত প্রশ্নে জার্মানী উদ্বিগ্ন।

সেপ্টেম্বরে রুশ-জার্মান জনসংখ্যা স্থানান্তর চুক্তির অংশ হিসেবে বেসারাবিয়া থেকে সংখ্যালঘু জার্মানদের অধিকাংশকে জার্মানীতে পুর্নবাসিত করা হয়। রুমানিয়ার উপর সোভিয়েত চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। ফ্রান্সের পতনে দেশটি আরো বেশী ঘাবড়ে যায়। অন্যদিকে, সোভিয়েত দাবি মেনে নেয়ার জন্য জার্মানী রুমানিয়াকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। অগত্যা ইতালীয় সরকারের পরামর্শে রুমানিয়া সোভিয়েত দাবির কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯৪০সালের আগস্টে সোভিয়েত ভীতির মুখে দেশটি আরো ভূখণ্ড হারায়।

www.pathagar.com

সোভিয়েত অধিকৃত ভূখণ্ডগুলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। অধিকৃত ভূখণ্ডের জনসংখ্যার ভেতর সোভিয়েত বিরোধী শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং নয়া সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। এসব ভূখণ্ডের লাখ লাখ লোককে হত্যা কিংবা দূরপ্রাচ্য অথবা গুলাগ শ্রম শিবিরে পাঠানো হয়। সেখানে বহু লোকের মৃত্যু হয়। পরে দখলীকৃত ভূখণ্ডগুলো জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে কাজ করে।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের মাঝ বরাবর জার্মানী ও সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যায়ে নাৎসী-সোভিয়েত সম্পর্ক আবার শীতল হতে থাকে। ওয়ারম্যাট (জার্মান সশস্ত্র বাহিনী) ও রেড আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের লক্ষণ ফুটে উঠে। অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের জনগণের কাছে রুশ-জার্মান সংঘাত ছিল কাংখিত। ২০/২২ বছর আগে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের প্রতি তাদের ঘৃণা ছিল তখনো তুঙ্গে। প্রাচ্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে হিটলার দেশ ও বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা আশা করেছিলেন এবং বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চালান। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে হিটলারকে যুদ্ধের উস্কানি দিতো। এই উস্কানিতে তিনি পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গন খুলে বসেন। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার আগে তার কৌশলগত মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলেন। একই সঙ্গে দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করতে গিয়ে অজেয় জার্মান সৈন্যরা হেরে যায়। সেই সঙ্গে ঘটে বিশ্ব ত্রাস হিটলারের পতন।

www.pathagar.com

পোল্যান্ডে জার্মান ব্লিৎসক্রিগ

হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পোল্যান্ড আক্রমণের প্রাক্কালে হিটলার বিশ্বাস করতেন, বৃটেন ও ফ্রান্স এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে এবং তারা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হবে। পোল্যান্ড আক্রমণে হিটলারের সিদ্ধান্ত ছিল জুয়াখেলার সমতুল্য। দু'টি কারণে তিনি বিশ্বাস করতেন সংক্ষিপ্ত সময়ে পোল্যান্ড অভিযান সফল হবে। এক, হিটলার মনে করতেন বিশ্বে প্রথমবার মোতায়েনকৃত সাঁজোয়া কোর ব্লিৎসক্রিগ গতিতে হামলা চালিয়ে পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীকে দ্রুত পরাজিত করতে সক্ষম হবে। দুই, তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড দালাদিয়েরকে দুর্বল মনে করতেন। তিনি আরো মনে করতেন বৃটিশ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দোদুল্যমানতায় ভোগে যুদ্ধে নামার পরিবর্তে বরং শান্তি চুক্তি করবেন।

হিটলারের এ বিশ্বাসের পেছনে কারণও ছিল। তার চাপের মুখে বৃটেন ও ফ্রান্স ভার্সাই চুক্তি সংশোধনে রাজি হয়। এ দু'টি দেশ ১৯৩৫ সালে জার্মানীর পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার অধিকার মেনে নেয়। পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে জার্মানী ১৯৩৬ সালে তার হৃত ভূখণ্ড রাইনল্যান্ড উদ্ধার করে এবং ১৯৩৮ সালের মার্চে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়। রাইনল্যান্ড উদ্ধার এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একীভূত হওয়া ছিল ভার্সাই চুক্তির লংঘন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে পরাজিত জার্মানীর উপর হীন শর্ত আরোপ করা হয়। হিটলারের মনোবল বৃদ্ধির পেছনে পাশ্চাত্যের অনুকূল জনমতও কাজ করেছিল। পাশ্চাত্যের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য নাৎসীবাদ নয়, বরং কমিউনিজমকে হুমকি হিসেবে গণ্য করতো। শুধু তাই নয়, তারা ভার্সাই চুক্তিকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতো। এ প্রেক্ষাপটে অনেকে পুনরায় জার্মানীর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠায় আনন্দিত হয়। তারা মনে করতো কমিউনিস্ট সোভিয়েত হুমকির বিরুদ্ধে জার্মানী হচ্ছে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিখে বৃটেন ও ফ্রান্স অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাতিগত সুদেতানল্যান্ডকে চেকোশ্লাভাকিয়া থেকে জার্মানীর কাছে বলপ্রয়োগে হস্তান্তরে সম্মতি দেয়। এ সময় হিটলার প্রবল সামরিক শক্তি ব্যবহার বিশেষ করে ব্যাপক বিমান হামলার হুমকি দিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক গেইমস অনুষ্ঠান এবং ডিউক অব উইন্ডসর ও সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের সফরের প্রেক্ষিতে হিটলার পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকাগুলোর অনুকূল সমর্থন ভোগ করছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালের মার্চে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটে। পূর্ববর্তী সফলতায় উৎসাহী হয়ে হিটলার চেকোশ্লাভাকিয়া দখলে জার্মান সৈন্যদের নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি লিথুয়ানিয়ার কাছ থেকে মামেল প্রদেশ কেড়ে নেন এবং পূর্ব প্রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যোগাযোগের উন্নয়নে পোল্যান্ড ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে নয়া সড়ক পথ ও রেলওয়ে লাইন নির্মাণে পোল্যান্ডের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।

১৯১৯ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ড গঠনের প্রয়োজনে রাশিয়া ও জার্মানীর সীমান্ত পুনর্গঠনকালে মিত্র শক্তি বাদবাকি জার্মানী থেকে পূর্ব প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৭৯৫ সালে রাশিয়ার জার ও প্রুশিয়া পোলিশ ভূখণ্ডকে ভাগাভাগি করে নিলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ড তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

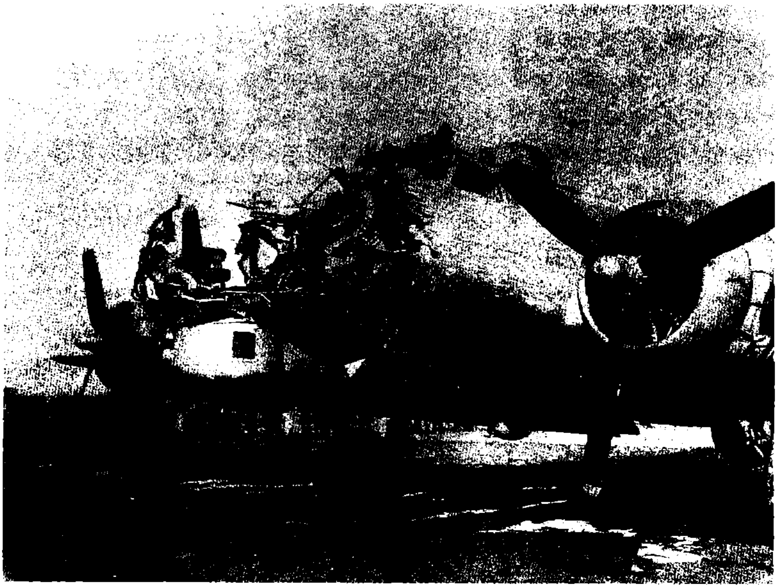

পোলান্ডে জার্মান অভিযানে বিধ্বস্ত একটি পোলিশ জঙ্গীবিমান

চেকোশ্লাভাকিয়া গ্রাস করা ছিল ১৯৩৮ সালে মিউনিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের কাছে হস্তান্তরিত হিটলারের লিখিত গ্যারান্টির লংঘন। চেকোশ্লাভাকিয়া দখল করে হিটলার ঘোষণা করেন, ইউরোপে আর কোনো ভূখণ্ডের উপর তার দাবি নেই। তাই ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চ চেম্বারলিন পোল্যান্ড সীমান্তের আনুষ্ঠানিক গ্যারান্টি দাবি করে বলেন। তিনি আশা করেছিলেন, হিটলার তার দাবি পূরণ করবেন।

কিন্তু হিটলার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে ১৯৩৯ সালের ৩ এপ্রিল জার্মান সৈন্যদের পোল্যান্ড আক্রমণের নির্দেশ দেন। পোল্যান্ড অভিযানের পূর্বাহ্নে ওয়ারম্যাট (জার্মান সেনাবাহিনী) একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে, জার্মান অর্থনীতি ছিল শান্তিকালীন উৎপাদনের পর্যায়ে। এ কারণে জেনারেলগণ শংকিত হয়ে উঠেন। হিটলারের নেতৃত্বের প্রতি

www.pathagar.com

অসন্তোষ দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ সেনানায়কদের কেউ কেউ পোল্যান্ড আক্রমণে তার পরিকল্পনা বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে ফাঁস করে দেয়।

জেনারেলগণ সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দেন এবং পশ্চিম দিক থেকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় 'ওয়েস্ট ওয়াল'-এর প্রতিরক্ষা জোরদারে আরো সময় চান। এ সময় জার্মান সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু হিটলার জেনারেলদের উদ্বেগ নাকচ করে দেন এবং তার সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য কামনা করেন। হিটলারের একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল, পোল্যান্ডে আকস্মিক হামলায় স্টালিন শংকিত হয়ে উঠতে পারেন এবং এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। স্টালিন জার্মান হামলার আশংকা করতেন এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে নাৎসীবিরোধী একটি জোট গঠনে দীর্ঘদিন চেষ্টা চালান। কিন্তু ১৯৩৯ সালের জুলাই নাগাদ বৃটেন ও ফ্রান্স নাৎসীবিরোধী জোট গঠনে চুক্তির শর্তের ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। অন্যদিকে, পোল্যান্ডও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জোট গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং জার্মানীর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মোকাবিলায় পোলিশ ভূখণ্ডে লাল ফৌজ মোতায়েনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। হিটলার এটাকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তিনি তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য মস্কো পাঠান। এর ফলে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় স্বার্থ এবং ১৯১৯ সালের পূর্ববর্তী সীমান্ত পুনরুদ্ধারে হিটলার ও স্টালিন পারস্পরিক বৈরিতা ভুলে যান।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জার্মান সৈন্যরা পোল্যান্ডে অভিযান চালায়। সেদিন ভোরে উইলান নামে একটি অরক্ষিত শহরে বিমান হামলার মাধ্যমে এ অভিযানের সূচনা করা হয়। এ বিমান হামলায় প্রায় ১২ শ' লোক নিহত হয়। ভোর ৪ টা ৪৭ মিনিটে জার্মান যুদ্ধজাহাজ শ্লেসউইস-হোলস্টেইন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাটি বর্ষণ করা হয়। যুদ্ধজাহাজ শ্লেসউইস পোল্যান্ডে এক কথিত শুভেচ্ছা সফরে ছিল। ডানজিগ বন্দরের পোতাশ্রয়ে যুদ্ধজাহাজটি নোঙ্গর ফেলে। ১ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৪ টায় এটি ডানজিগ বন্দরের পোতাশ্রয় থেকে ধীরে ধীরে একটি খালের ভেতর প্রবেশ করে এবং ওয়েস্টারপ্লেটের বিপরীত দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় 'ফায়ার' বলে গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়। পুরো ঘটনাটিই ছিল পরিকল্পিত। শ্লেসউইস পোলিশ সীমান্তের কাছে গ্লেইউইজের কাছে নিজেদের একটি রেডিও স্টেশনে গোলাবর্ষণ করে। পোলিশ সৈন্যরাই এ হামলা চালিয়েছে—এটা প্রমাণ করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একদল জার্মান বন্দীকে পোলিশ সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ ওই রেডিও স্টেশনের আশপাশে ফেলে রাখা হয়। তৎক্ষণাৎ পোলিশভাষী একজন জার্মান ঘোষক রেডিও থেকে ঘোষণা করে যে, এ রেডিও স্টেশনে পোল্যান্ডের গোলাবর্ষণে কয়েকজন জার্মান নিহত হয়েছে। এ সাজানো ঘটনার এক ঘন্টা পর জার্মান ইউনিট পোল্যান্ড সীমান্ত অতিক্রম করে।

পোলিশ নৌ-বাহিনীর একটি গোলাবারুদ মজুদ এবং ডানজিগে (বর্তমান গদানস্কে) ওয়েস্টারপ্লেট সেনা ছাউনিতে গোলাবর্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম লড়াই। ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় ফ্রান্স ও বৃটেনের কাছে পোল্যান্ড জরুরি সামরিক

www.pathagar.com

সহায়তা কামনা করে। ৩ সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে বৃটেনের আগে বিকেল ৫ টায়। বৃটেন কিছুটা বিলম্ব করছিল এ আশায় যে, হিটলার মিত্র পক্ষের দাবি মেনে নেবেন এবং যুদ্ধ বন্ধে রাজি হবেন।

পাশ্চাত্যের সামরিক কমান্ডারগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণকৌশলের উপর পুরোপুরি নির্ভর করছিলেন এবং পোল্যান্ডে জার্মানীর ব্লিৎসক্রীগ (ঝটিকা গতিতে হামলা) অভিযানের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ধারণা করছিলেন, পোলিশ প্রতিরক্ষা লাইনে কয়েক সপ্তাহ বোমাবর্ষণের পর জার্মানী পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু করবে। যে মুহূর্তে জার্মান পাঞ্জার পোল্যান্ডের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল তখন ফরাসী সৈন্যরা জার্মান ওয়েস্ট ওয়াল-এ ম্যাপিং ও স্কাউটিংয়ে ব্যস্ত ছিল। এ সময় তারা বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্স (বিএফএফ) মোতায়েন এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশের অপেক্ষায় ছিল। ফ্রান্স আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতীক্ষা করায় কোনো আক্রমণাত্মক কৌশল প্রণয়ন করা হয়নি। আক্রমণাত্মক রণকৌশল না থাকায় ফরাসীরা ম্যাজিনো লাইনে শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। অন্যদিকে, বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণের পরিবর্তে শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে শুধু লীফলেট বর্ষণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সালের ২৬ আগস্ট জার্মানীর পোল্যান্ড অভিযানের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু হিটলারের মিত্র মুসোলিনী জানান যে, ইতালী যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত নয়। তাই তিনি ২৫ আগস্ট ভোর পৌনে ৫ টায় এ পরিকল্পনা স্থগিত করেন। পরে ইতালীর সমর্থন নিশ্চিত হলে ৩১ আগস্ট বিকেল ৪ টায় পোল্যান্ডে হামলার নির্দেশ দেয়া হয়। পোল্যান্ড অভিযানে ইতালী কোনো সামরিক সহায়তা দেয়নি। তবে দেশটির সমর্থনের রাজনৈতিক ও সামরিক মূল্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অভিযান শুরুর আগে হিটলার পোলিশ-জার্মান চুক্তিকে অন্তঃসারশূন্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু হওয়ার আগে পোল্যান্ড সীমান্তে জার্মানী অসংখ্য উস্কানিমূলক তৎপরতা চালায়। ৬২ টি জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন পোল্যান্ড দখলে অংশ নেয়।

জেনারেল ওয়ালথার ভন ব্রাউসিটসের নেতৃত্বে ৫ টি আর্মি গ্রুপ (প্রতিটি আর্মি গ্রুপ গঠিত হতো অন্তত কয়েক লাখ সৈন্য নিয়ে) ও রিজার্ভ (চতুর্দশ পদাতিক, প্রথম পাঞ্জার ও দ্বিতীয় মাউন্টেন ডিভিশন) নিয়ে আক্রমণকারী বাহিনী গঠন করা হয়। জার্মানরা মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী সাইলেসিয়া, ওয়েস্টার্ন পোমেরানিয়া ও পূর্ব প্রুশিয়া -এ তিন দিক থেকে হামলা চালায়। কর্নেল জেনারেল গার্ড ভন রুনডেস্টাডের আর্মি গ্রুপ সাউথে ছিল জেনারেল ব্লাসকোভিজের অষ্টম, জেনারেল ভন রেইচেনাউয়ের দশম ও কর্নেল জেনারেল লিস্টের নেতৃত্বাধীন চতুর্দশ আর্মি। সব মিলিয়ে আর্মি গ্রুপ সাউথে ছিল অষ্টাদশ পদাতিক, চতুর্থ স্লোভাক পদাতিক, ফার্স্ট মাউন্টেন ডিভিশন, দ্বিতীয় যান্ত্রিক, চতুর্থ হাল্কা যান্ত্রিক ও চতুর্থ পাঞ্জার ডিভিশন। আর্মি গ্রুপ সাউথ মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী সাইলেসিয়ার মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। এতে ছিল ২ হাজারের অধিক ট্যাংক ও ৮শ' সাঁজোয়া যান। কর্নেল জেনারেল ফেডার ভন বকের আর্মি গ্রুপ নর্থ (অষ্টম পদাতিক, দ্বিতীয় যান্ত্রিক ও প্রথম পাঞ্জার ডিভিশন) এর একটি অংশ এবং জেনারেল গুন্থার ভন ক্লাউসের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ আর্মি পশ্চিম পোমেরানিয়ার

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। কর্নেল জেনারেল ফেডার ভন বকের নেতৃত্বাধীন আর্মি গ্রুপ নর্থ (একাদশ পদাতিক ও প্রথম পাঞ্জার) এর আরেকটি অংশ জেনারেল জর্জ ভন কুচলারের নেতৃত্বাধীন থার্ড আর্মির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পূর্ব প্রুশিয়ার মধ্য দিয়ে হামলা চালায়। আর্মি গ্রুপ নর্থে ছিল ৬ শ' ট্যাংক ও ২শ' সাঁজোয়া যান। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ এবং ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিমে অবস্থানরত পোলিশ সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করাই ছিল এ ত্রিমুখী আক্রমণের লক্ষ্য। মোট ১৮ লাখ জার্মান সৈন্য, ৩ হাজার ১ শ'র বেশি ট্যাংক, ১০ হাজার কামান এবং লুফটওয়াফে (জার্মান বিমান বাহিনী)'র দু'টি বহরের ২ হাজার ৮৫ টি জঙ্গীবিমান এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। আক্রমণকারী বাহিনীতে আরো ছিল ক্রিগসসেরিনের প্রথম 'ওস্ট'(পূর্ব) গ্রুপ। এ গ্রুপ পোলিশ নৌ-বাহিনীকে মোকাবিলা করে এবং জার্মান স্থল বাহিনীকে সহায়তা দেয়। একযোগে তিনদিক থেকে পোল্যান্ড আক্রমণের সামর্থ্য থাকা ছিল আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা। জার্মানদের ছিল একটি সুসংগঠিত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। তাছাড়া পোল্যান্ডে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মানদের সহায়তার উপরও তারা নির্ভর করতে পারতো। জার্মানরা পোল্যান্ডের রেল লাইন ও সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট থাকায় সে দেশের রেল ও সড়ক যোগাযোগ সম্পর্কে তাদের চমৎকার ধারণা ছিল।

আক্রান্ত পোলিশ বাহিনীতে ছিল ৭ টি আর্মি গ্রুপ। এগুলো হলো জেনারেল ক্রুকুভিচ প্রেসড্রিমিরস্কির নেতৃত্বাধীন মোডলিন আর্মি, জেনারেল ব্রন্টোনোভিস্কির নেতৃত্বাধীন পোমোরজি আর্মি, জেনারেল কুটরেঝবার নেতৃত্বাধীন পোজন্যাম আর্মি, জেনারেল রোমেল ক্রাকোউয়ের নেতৃত্বাধীন লোডজ আর্মি, জেনারেল সাজিলিংয়ের নেতৃত্বাধীন ক্রাকোউ আর্মি, জেনারেল পিস্করের নেতৃত্বাধীন লুবলিন আর্মি ও জেনারেল ফাব্রিসির নেতৃত্বাধীন কারপাটি আর্মি। এছাড়া ছিল সিঙ্গেল অপারেশনাল গ্রুপ ও কয়েকটি রিজার্ভ গ্রুপ। পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড মার্শাল স্মিগলি রীজ। পোলিশ সেনাবাহিনী অন্যান্য ইউনিটসহ ৩৯টি পদাতিক ডিভিশন, ১১ টি এলিট ক্যাভালরি ব্রিগেড, ৩টি মাউন্টেন ব্রিগেড ও ২টি সাঁজোয়া যান্ত্রিক ব্রিগেড মোতায়েন করে। আর্মি লোডজ, ক্রাকোউ ও কারপাটিতে ছিল ২৪১ টি ট্যাংক ও ৩২ টি সাঁজোয়া যান। আর্মি পোমোরজি ও পোজন্যাম, মোডলিন ও চতুর্থ অপারেশনাল গ্রুপে ছিল ২৩৪ টি ট্যাংক ও ৫২ টি সাঁজোয়া যান। রিজার্ভ বাহিনীতে ছিল ১৮৫ টি ট্যাংক।

যুদ্ধের জন্য পোলিশ সেনাবাহিনী ছিল অপ্রস্তুত। পোলরা ১৬ শ' কিলোমিটারব্যাপী অগ্রবর্তী ফ্রন্টে জার্মান হামলার জবাব দিচ্ছিল। তারা পাল্টা হামলা চালাতে এবং শিল্প কেন্দ্রগুলো রক্ষায় আক্রমণকারী বাহিনীকে মোকাবিলার চেষ্টা করছিল। জার্মানরা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে হামলা চালাতে পারে, পোলিশ কৌশলবিদগণ তার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন। তবে তারা জানতেন যে, মিত্রদের পাল্টা হামলা চালানোর সুযোগ করে দেয়ার স্বার্থে তারা অগ্রসরমান জার্মানদের অগ্রাভিযানে বাধা দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না। শত্রুর হামলা মোকাবিলায় জেনারেল রোমেল ক্রাকোউয়ের নেতৃত্বে ওয়ারশজাওয়া ও জেনারেল ক্লীবার্গের নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপারেশনাল গ্রুপ

www.pathagar.com

গঠন করা হয়। ৩১ আগস্ট পোলিশ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। শুরুতে ছিল ১০ লাখ সৈন্য এবং পরে সৈন্য সংখ্যা সাড়ে ১৩ লাখে পৌঁছে।

৯ শ' ট্যাংক, ৪ হাজার ৩ শ' কামান ও ৪৩৫ টি বিমানের সমাবেশ ঘটানো হয়। পোলিশ নৌ-বাহিনীর অধিকাংশকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়ায় বাল্টিক সাগরে এডমিরাল সোয়ারস্কির নেতৃত্বে নৌ-বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ উপস্থিত ছিল মাত্র। অবশিষ্ট এ পোলিশ নৌ-বাহিনীর মূল দায়িত্ব ছিল গাদাইনিয়া, ওকসিয়িভিই, ওয়েস্টারপ্লেট ও হেল-এর প্রতিরোধকারীদের সহযোগিতা করা এবং সুইডেন, এস্তে ানিয়া ও ফিনল্যান্ডে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। পোল্যান্ড ১৯৩৬ সালে আধুনিকায়ন ও সমরসজ্জা প্রক্রিয়া শুরু করায় দেশটির সমর সম্ভারের এক ক্ষুদ্র অংশ ছিল আধুনিক এবং বাদবাকি বিশাল অংশ ছিল সেকেলে। পোলিশ সেনাবাহিনীতে মোটরচালিত যানবাহনের ব্যাপক ঘাটতি থাকায় তাদেরকে পদাতিক ও ঘোড়ায় টানা যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু পোলিশ বাহিনীকে পুরোপুরি সমাবেশ করা সম্ভব হয়নি এবং তারা ছিল ৩ হাজার কিলোমিটার ব্যাপী সীমান্ত বরাবর তিনদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত।

১ ও ২ সেপ্টেম্বর পোলিশ সেনাবাহিনী পূর্বদিকে পিছু হটে গিয়ে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলতে এবং হামলাকারীদের অগ্রাভিযান বিলম্বিত করতে প্রচণ্ড লড়াইয়ে জড়িত হয়ে পড়ে। প্রথমদিন অধিকাংশ পোলিশ বিমান মুখ থুবড়ে থুবড়ে পড়ায় পোল্যান্ডের আকাশে জার্মানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জার ডিভিশনের অগ্রভাগে উড়ে গিয়ে জার্মান জাঙ্কার্স জেইউ-৮৭ বোমারু বিমানগুলো (স্টুকা) গোলন্দাজ বাহিনীকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে এবং জার্মানদের অগ্রাভিযানের পথে সকল বাধা গুঁড়িয়ে দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর পোলিশ বাহিনী পোলিশ করিডোর বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একইদিন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে তারা পোল্যান্ডকে সরাসরি সহায়তা দানে কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালায়নি। পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত পোলিশ বাহিনী পিছু হটতে ব্যর্থ হয় এবং জার্মান পাঞ্জার ইউনিট ও যান্ত্রিক বহরের উপর্যুপরি ধাওয়ার মুখে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। বহু পোলিশ ইউনিট এমনকি আর্মি গ্রুপ জার্মান হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে অথবা পিছু হটতে গিয়ে হয়তো ঘেরাও হয় নয়তো ধ্বংস হয়। অন্যূন ৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ পোলিশ হাই কমান্ড উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর এবং মিত্রবাহিনীর সহায়তা ছাড়া তাদের টিকে থাকার কোনো আশা নেই। বহু ইউনিট পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তারা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। উত্তর দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে আর্মি ক্রাকোউ পূর্বদিকে প্রত্যাহার করলে জার্মানরা ক্রাকোউ শহরে প্রবেশ করে। একইদিন আর্মি প্রাসি পুরোপুরি অবস্থান গ্রহণ করতে না পারায় পোলিশদের পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফলে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পিয়েট্রাকাউ ট্রিবুনালস্কি ঘেরাও হয়ে পড়ে। জার্মানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে ৭ দিন মরণপন লড়াইয়ের পর ৭ সেপ্টেম্বর মেজর সুচারস্কির নেতৃত্বে ওয়েস্টারপ্লেটে মোতায়েন পোলিশ নৌ-বাহিনী ও গ্যারিসন আত্মসমর্পন করে। একইভাবে প্রচণ্ড ও প্রাণপন লড়াই করে জার্মানরা ৮

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ওয়ারশ পৌঁছে। ওয়ারশ দখলে জার্মানরা ১৩৭ টি বিমান হারায়। ৯ সেপ্টেম্বর পোলিশ অভিযানে রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়। বাজুরায় পোলিশ অভিযান ছিল ওয়ারশ রক্ষায় একটি পাল্টা হামলা এবং কুটনো, লোয়িজ ও সোচাসজিউ এলাকায় এ লড়াই সংঘটিত হয়। আর্মি পোমোরজি ও পোজন্যাম এ লড়াই চালায়। এ দু'টি পোলিশ আর্মি গ্রুপকে জার্মান অষ্টম আর্মি প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। প্রথমদিকে পোলিশরা সফল হয় এবং আকস্মিক হামলা চালিয়ে জার্মানদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এমনকি তারা জার্মানদের পিছু হটতেও বাধ্য করে। তবে খাদ্য ও গোলাবারুদের ঘাটতি এবং অন্যান্য ফ্রন্টের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠায় তারা এ ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। অন্যদিকে, জার্মান ইউনিটগুলোর ক্ষিপ্রগতির সামনে পোলিশ অপারেশন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফরাসী মার্শাল মরিস গেমেলিন উপর্যুপরি আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ফরাসী সৈন্যরা পুরোপুরিভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ফরাসী সৈন্যদের ম্যাজিনো লাইনের পেছনে হটে যাবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ থেমে যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মানরা পোলিশদের উত্তরদিকে হটিয়ে দেয়। জেনারেল তাদিউস কুত্রজিবার নেতৃত্বে পোলিশ বাহিনী ওয়ারশর পতন কিছুকাল বিলম্বিত করতে সক্ষম হলেও তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায়। বাজুরা লড়াইয়ে চতুর্থ, অষ্টম ও দশম আর্মির ১৪ টি জার্মান ডিভিশন অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে দু'টি পোলিশ আর্মি। মাত্র কয়েকটি পোলিশ ইউনিট শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে লড়াই করতে করতে ওয়ারশ পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১০ সেপ্টেম্বর আর্মি পোজন্যাম শহর থেকে পিছু হটে গেলে জার্মানরা সেখানে প্রবেশ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর তোমাসজাউ লুবেলিস্কিতে বৃহত্তম ট্যাংক লড়াই সংঘটিত হয়। এখানে প্রায় ৮০ টি পোলিশ ট্যাংক জার্মান ট্যাংকের মোকাবিলা করে। ৭ সেপ্টেম্বর জার্মান চতুর্থ পাঞ্জার ডিভিশন ওয়ারশর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ৯ সেপ্টেম্বর ওয়ারশর উপর জার্মানদের প্রথম হামলা হয়। তবে ২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ পোলিশরা জার্মানদের সকল হামলা প্রতিহত করছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর জার্মানরা শহরের উপর একযোগে স্থল ও বিমান হামলা শুরু করে। সেদিন থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়ারশ দখলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পোলিশ সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়ারশর পতন ঘটে। তবে একই সময়ে ১০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেনারেল ভিক্টর টমির নেতৃত্বাধীন মোডলিন ঘাঁটিতে জার্মানরা নিষ্ফল হামলা চালায়। ওয়ারশর পতন ঘটায় এবং সরবরাহ না থাকায় ২৯ সেপ্টেম্বর এ ঘাঁটির পতন ঘটে। ১৭ সেপ্টেম্বর লুবলিন জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

১৬ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মস্কোয় নিযুক্ত পোল রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি নোট অর্পণ করেন। নোটে তিনি লিখেছিলেন, 'সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোল্যান্ডে এখন কোনো সরকার নেই। সেজন্য দেশটির সঙ্গে যেসব চুক্তি করা হয়েছে সেগুলোর অবসান ঘটেছে। পোল্যান্ডে বহু শ্বেত রুশ ও ইউক্রেনীয়দের বসবাস। নাৎসীদের স্বৈরাচারের মুখে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তাদেরকে রক্ষায় এবং সোভিয়েতের আত্মরক্ষায়

পোল্যান্ডে সামরিক অভিযান চালানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পোল রাষ্ট্রদূত এ নোট গ্রহণ করেননি। পোলিশ সরকার মস্কো থেকে তার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে।

১৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৪ টায় পূর্ব পোল্যান্ডে বসবাসকারী বাইলোরুশ ও ইউক্রেনীয়দের 'রক্ষা' ও 'মুক্ত' করতে সোভিয়েত লাল ফৌজ পূর্ব দিক থেকে পোল্যান্ড আক্রমণ করে। সোভিয়েত লাল ফৌজের এ অপ্রত্যাশিত অভিযানে অবশিষ্ট পোলিশ সৈন্যদের পুনর্গঠিত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। লাল ফৌজের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ভরেশিলভ স্বয়ং অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পোল্যান্ডে সোভিয়েত অভিযান ছিল ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট স্বাক্ষরিত রিবেনট্রপ- মলোটভ চুক্তির অংশ। এ চুক্তিতে অনাক্রমণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও একটি গোপন আঁতাতও স্থান পায়। গোপন আঁতাতে পোল্যান্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে ভাগাভাগি করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। তাছাড়া এ চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

সোভিয়েত সৈন্যরা দু'টি ফ্রন্টে এগিয়ে আসে। একটি ছিল জেনারেল তিমোসজেনকোর নেতৃত্বাধীন ইউক্রেনীয় আর্মি এবং আরেকটি ছিল জেনারেল কোওয়লোউর নেতৃত্বাধীন বাইলোরুশ আর্মি। উভয় ফ্রন্টে প্রায় ১৫ লাখ সোভিয়েত সৈন্য ছিল। দু'টি ফ্রন্টে ছিল ৬ হাজার ১৯১টি ট্যাংক, ১ হাজার ৮ শ' যুদ্ধবিমান ও ৯ হাজার ১৪০টি কামান। ভয়ংকর লড়াইয়ের পর ১৮ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা উইলনো দখল করে নেয়। পরে ২২ সেপ্টেম্বর তারা গ্রোদনো ও লাওয়ো দখল করে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর বাগ নদীর তীরে পৌঁছে যায়। পোলিশ হাই কমান্ড সোভিয়েত রেড আর্মির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হতে সৈন্যদের নির্দেশ দেয়। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ নির্দেশ সকল ইউনিটে পৌঁছেনি। প্রথমদিকে পোলিশ সৈন্য ও জনগণ উভয়ে ধারণা করেছিল সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সহায়তা করতে এসেছে। এ উপলব্ধি থেকে তারা সোভিয়েতদের বাধা দেয়নি। তবে দ্রুত তারা বুঝতে পারে যে, সোভিয়েতরাও আক্রমণকারী। ফলে তাদের সঙ্গে পোলিশদের রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়। পোলিশদের প্রচণ্ড বাধার মুখে সোভিয়েতরা বাগ নদীর ভাটিতে পূর্ব প্রুশিয়া অভিমুখী একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহে থামতে বাধ্য হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর রাতে পোলিশ প্রেসিডেন্ট ও হাইকমান্ড রেনাল্ট আর ৩৫ সজ্জিত মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন সঙ্গে নিয়ে রুমানিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে তাদের আটক করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ব্রীসিচ ও বুগিয়েমে জার্মান ও সোভিয়েতদের পারস্পরিক সাক্ষাত হয় এবং তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ২ অক্টোবর হেল-এ রিয়ার এডমিরাল আনরাগের অধীনস্থ পোলিশ সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। ২ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে তারা শেষবারের মতো লড়াই করে। ১৯৩৯ সালের ৬ অক্টোবর শুক্রবার শেষ পোলিশ সৈন্যটি আত্মসর্মপণ করে।

জার্মান সাঁজোয়া ইউনিটে ছিল ৭ টি পাঞ্জার, ৪ টি হাল্কা ও ৪ টি যান্ত্রিক পদাতিক ডিভিশন। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মান পাঞ্জার বাহিনীতে ছিল ১ হাজার ৪৪৫টি ভারি ট্যাংক, ১ হাজার ২২৩ টি হাল্কা ট্যাংক ও ৯৮টি থার্ড এবং ২১১টি ফোর্থ

www.pathagar.com

মিডিয়াম ট্যাংক। তাছাড়া ছিল আরো ২১৫টি কমান্ড ট্যাংক ও ২০২ টি এক্স-চেক সহ অন্যান্য ধরনের সাঁজোয়া যান। ট্যাংক ছাড়াও ছিল ৩০৮টি ভারি ও ৭১৮ টি হাল্কা সাঁজোয়া যান। আরো ছিল ৬৮টি মাঝারী আকারের আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার।

যুদ্ধে জার্মান পক্ষে নিহত হয় ৮,০৮২ থেকে ১০,৫৭২ সৈন্য। আহত হয় ২৭,২৭৮ থেকে ৩০,৩২২ জন। এছাড়া নিখোঁজ হয় ৩,৪০৪ থেকে ৫,০২৯। অন্যদিকে, পোলিশ পক্ষে নিহত হয় ৬৬,৩০০ এবং আহত হয় ১,৩৩,৭০০ সৈন্য। বন্দী হয় ৪২,০০০। যুদ্ধে পোল্যান্ড তার মোট ৪৩৫টি বিমানের মধ্যে ৩২৭টি হারায়। ৯৮টি রুমানিয়া পালিয়ে যায়। ২৬,০০০ বেসামরিক পোলিশও নিহত হয়। জার্মানরা ৯৯৩ থেকে ১,০০০ সাঁজোয়া ও ১১,০০০ মোটর যান হারায়। তাছাড়া তাদের কামান খোয়া যায় ৩৭০ থেকে ৪০০টি। বিমান খোয়া যায় ৬৯৭ থেকে ১,৩০০। পোল্যান্ড জার্মানীর দু'টি ডেস্ট্রয়ার, দু'টি মাইনলেয়ার ও শ্লেসউইস—হোলস্টেইনসহ আরো কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, জার্মানরা পোলিশ ডেস্ট্রয়ার 'উইচার', মাইনলেয়ার 'গ্রিল', ও গোলন্দাজ প্রশিক্ষণ জাহাজ 'মাজুর' ডুবিয়ে দেয়। সোভিয়েতরা এ যুদ্ধে ৭৭৩ জন সৈন্য হারায়। আহত হয় ১,৮৫৯ সৈন্য। এছাড়া সোভিয়েতরা ৪২ টি ট্যাংকও হারায়। সোভিয়েতদের হাতে ২,৪২,০০০ পোলিশ সৈন্য বন্দী হয়। অন্যদিকে, ৭০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ সৈন্য হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া এবং আরো ২০,০০০ সৈন্য লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় পালিয়ে যায়।

পোল্যান্ড অভিযান ছিল জার্মানীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এ অভিযানের মাধ্যমে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের গতি ও ক্ষিপ্রতা ফুটে উঠে। এ যুদ্ধে একথাও প্রমাণিত হয় যে, বিশাল পদাতিক ও ক্যাভালরি নিয়ে গঠিত বাহিনীর দিন ফুরিয়ে গেছে। যুদ্ধে সাঁজোয়া বহর ব্যবহারে জার্মানদের দক্ষতার প্রমাণও হয় এ যুদ্ধে। জার্মানরা এ শিক্ষা অর্জন করে যে, সুরক্ষিত এলাকায় ট্যাংক ব্যবহার উপযোগী নয়। ওয়ারশ দখলের লড়াইয়ে এটা প্রমাণিত হয়।

পোল্যান্ড দখল নিঃসন্দেহে জার্মানীর একটি সামরিক বিজয়। কিন্তু এ বিজয় পরবর্তীতে তার পরাজয় ডেকে আনে। পোল্যান্ডে জার্মান অভিযানের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ৬ বছর ধরে এ যুদ্ধ চলে। সত্যি হিটলার পোল্যান্ড নিয়ে জুয়া খেলছিলেন। এ খেলায় তিনি চূড়ান্তভাবে হেরে যান।

www.pathagar.com

ডেনমার্ক ও নরওয়েতে জার্মান অভিযান

মহাযুদ্ধের দাবানল উত্তর ইউরোপে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। কয়েক ঘন্টার জার্মান অভিযানে ডেনমার্কের পতন ঘটে। পরে জার্মানী গোটা নরওয়ে দখল করে নিয়ে উত্তর সাগরের পূর্ব সীমান্ত অবরোধ করে। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষভাগে সমগ্র স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। মিত্রপক্ষ বিপন্ন ফিনল্যান্ডকে রক্ষায় সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেন নিজ নিজ এলাকার মধ্য দিয়ে মিত্রপক্ষকে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে অসম্মতি প্রকাশ করলেও স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় যুদ্ধ বেধে যায়নি। কিন্তু পরে আপন স্বার্থে মিত্রপক্ষ শান্তিপ্রিয় স্ক্যান্ডেনেভিয়াকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

সুইডেন ছিল লৌহ খনির জন্য জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট লৌহ সুইডেনেই পাওয়া যেতো। জার্মানীতে ছিল লৌহের প্রচণ্ড অভাব। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য লৌহের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। জার্মানী সুইডেন থেকে লৌহ ও পিতল আমদানি করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছিল। উত্তর নরওয়ের নার্ভিক বন্দর থেকেই সুইডিশ লৌহ ও পিতল বৃটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। জার্মানী বছরে যে ৬০ লাখ টন সুইডিশ লৌহ আমদানি করতো তার অর্ধেক আসতো নার্ভিক বন্দর দিয়ে। বৃটেন ছিল জার্মানীর এ লৌহ আমদানি বন্ধে বদ্ধপরিকর। নরওয়ের সমুদ্রপোকূলে বৃটিশ নৌ-বহরের কড়া প্রহরা বসানো হয়। কিন্তু জার্মানী কম শেয়ানা ছিল না। তারা লৌহ বোঝাই জাহাজগুলো বিমানের ছত্রছায়ায় নরওয়ে উপকূলের পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বৃটিশ রণতরী দেখা মাত্রই তাতে জার্মান বিমানগুলো বোমবর্ষণ করতো এবং এই ফাঁকে জার্মান জাহাজগুলো নরওয়ে উপকূলে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করতো। এ পরিস্থিতিতে বৃটেন নরওয়ে উপকূলে মাইন স্থাপন করে। জার্মানী আগে থেকেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল। লৌহ আমদানির পথ নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে জার্মানী গোটা স্ক্যান্ডেনেভিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা স্থির করে। বৃটেন মাইন স্থাপন করায় জার্মানী নাটকীয় গতিতে নরওয়ের বড় বড় বন্দর ও শহরগুলো দখল করে নেয়। ৯ এপ্রিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঝটিকা হামলায় ডেনমার্কের পতন ঘটে। ডেনিশ সীমান্ত অতিক্রম করে ৪০ হাজার জার্মান সৈন্য দেশটিতে প্রবেশ করে। ডেনমার্ক অভিযানে যেসব জার্মান সেনা ইউনিট অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে ছিল ১৭০, ১৯৮ ও ২১৪তম পদাতিক ডিভিশন। জার্মান সৈন্যরা প্রবেশের দেড় ঘণ্টা পর ডেনিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সমবেতভাবে ঘোষণা করে যে, প্রতিরোধ করার চেষ্টা হবে নিষ্ফল। কাজেই তারা বাধা দানের কোনো চেষ্টা করবে না। বলতে গেলে বিনা

www.pathagar.com

যুদ্ধে ডেনমার্ক পরাজিত হয়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী জার্মান জেনারেল কাউশিপ কয়েকদিন পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন,'অভিযানে ডেনমার্কের পক্ষে নিহত হয়েছে ১০ জন এবং আহত হয়েছে কয়েকজন। জার্মানদের পক্ষে নিহত হয়েছে এক এবং আহত ১০ জন।' অভিযানের প্রথম মুহূর্তে কয়েক স্থানে ডেনিশ সৈন্যরা জার্মানদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করায় সংঘর্ষ হয়। জার্মানরা ডেনমার্কে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর ডেনিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়, দক্ষিণ জুটল্যান্ডের সেন্ডারবার্গ, আবেনরা, টোয়েনডার ও হাডারস্লেভে সংঘর্ষ চলছে। রাজধানী কোপেনহেগেনে নাৎসী সৈন্যরা আমালিয়েনবুর্গে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি হলে রয়াল গার্ডরা তাদের উপর গুলী চালায়। তবে শিগগির রয়াল গার্ডরা পরাজিত হয়। ভেয়ার লোয়েজেতে ডেনিশ বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করা হয় এবং মাত্র একটি বিমান উড়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে জার্মান বিমানে আকাশ ছেয়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেনিশ বিমানটি গুলীতে বিধ্বস্ত হয়। ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হের স্টনিং জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। সেদিন থেকে ডেনমার্কে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়।

দুর্বল ডেনমার্ক জার্মানীকে সামান্য বাধা দান না করেই বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তবে নরওয়ে আগ্রাসী শক্তির কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিল না। জার্মানীর এ আকস্মিক হামলায় মিত্রপক্ষ মোটেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়নি। বৃটেন তার দুর্জয় নৌ-শক্তি নিয়ে নরওয়ে উপকূলে জার্মানীর উপর পাল্টা হামলা চালায়। ফ্রান্স ২০টি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে বৃটিশ বহরের শক্তি বৃদ্ধি করে। বাল্টিক সাগরের প্রবেশপথে স্কাগারাকে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড নৌ-যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে জার্মানীর অগণিত জঙ্গীবিমান অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশি।

জার্মানী যেদিন ডেনমার্ক অধিকার করে ঠিক একইদিন নরওয়ের বিভিন্ন বন্দরেও জাহাজযোগে জার্মান সৈন্য অবতরণের সংবাদ প্রচারিত হয়। দিনটি ছিল ১৯৪০ সালের ৯ এপ্রিল। তার আগের দিন নরওয়ের অদূরে বৃটিশ সাবমেরিনের আঘাতে একটি জার্মান সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হয়। এ সময় জার্মান নৌ-বহর স্কাগারাক অতিক্রম করে নরওয়ে অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ঠিক তার দু'দিন আগে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী তার নিরপেক্ষতা রক্ষা করার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। ৮ এপ্রিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলো যে, জার্মান জাহাজগুলো সুইডেনের লৌহা নিয়ে যাতে নরওয়ের সামুদ্রিক এলাকার মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে না পারে সেজন্য তারা নরওয়ে উপকূলের তিনটি অঞ্চলে মাইন স্থাপন করেছে। পরদিন ভোরে জার্মান বাহিনী নরওয়ে আক্রমণ করে। জার্মানী ঘোষণা করে যে, নিরপেক্ষতা রক্ষা করার অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার জন্য তারা নরওয়ে রক্ষার ভার গ্রহণ করেছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা ছিল না।

নাৎসীরা অনেক আগেই যে নরওয়ে দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের ঘোষণা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ৯ এপ্রিল অপরাহ্নে কমন্স সভায় ভাষণে বলেন, নরওয়েতে এ ধরনের সর্বাত্মক অভিযান এবং কয়েকটি বন্দরে একযোগে সৈন্য অবতরণের ঘটনা একদিনের প্রচেষ্টার ফল হতে

www.pathagar.com

পারে না। এজন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা এবং আমাদের হাতে যেসব সংবাদ এসে পৌঁছছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, নরওয়ে দখলে কেবল পরিকল্পনা নয়, উপরন্তু নরওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় মাইন স্থাপনের আগেই জার্মানরা যুদ্ধযাত্রা করেছে। অন্যদিকে, জার্মানদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ৮ এপ্রিল ভোরে মিত্রপক্ষ নরওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় মাইন স্থাপন করায় তারা জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

ডেনমার্ক অভিযানের পর কোপেনহেগেনে হিটলার

৯ এপ্রিল ভোর ৫ টায় অসলোতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর কোহটের সঙ্গে সাক্ষাত করে জানান যে, নরওয়েকে জার্মান সামরিক শাসনের অধীনে আসতে হবে এবং জার্মান অধিকারে বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টা যেন তারা না করে। জার্মান রাষ্ট্রদূত তার দেশের দাবির স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, তারা নরওয়ে অধিকার করে না নিলে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা নরওয়ে দখল করে নেবে। এজন্য জার্মানী নরওয়ে দখল করে নিতে চায়। জার্মান রাষ্ট্রদূতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নরওয়ে সরকার জরুরি বৈঠকে বসে এবং সামান্য আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়, নরওয়ে জার্মানদের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। নরওয়ের এ জবাব দানের আগেই নরওয়েতে ব্যাপক জার্মান সৈন্য সমাবেশের আদেশ জারি করা হয়। জার্মান রাষ্ট্রদূত সকাল ৫ টায় চরমপত্র দাখিল করলেও ভোর রাত ৩ টায়ই জার্মানরা নরওয়ের বিভিন্ন বন্দরে সৈন্য নামায়। জার্মান রণতরীগুলো অসলো ঘাঁটিতে প্রবেশ করে এবং ভোর ৪ টায় অস্কারবুর্গ দুর্গে নরওয়েজীয় সৈন্যদের সঙ্গে জার্মানদের প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। একটি জার্মান ক্রুজার চরায় আটকে যায় এবং নাইসেনো নামে আরেকটি ক্রুজার নিমজ্জিত হয়।

www.pathagar.com

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে জার্মান অভিযানের সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ লোকজনকে অপসারণ করা শুরু হয়। নরওয়েতে পরিচালিত জার্মান সামরিক অভিযানের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন ওয়েসেরুবাং।' এ অভিযানে জার্মান কমান্ডার ছিলেন একাদশতম কোর কমান্ডার লেঃ জেনারেল নিকোলাস ভন ফকেনহর্স্ট। জেনারেল ফকেনহর্স্ট ছিলেন জেনারেল জোডলের স্টাফ। তার সুপারিশেই হিটলার তাকে নরওয়ে অপারেশনের কমান্ডার পদে নিয়োগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায় তাকে এ পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। ১৯৪০ সালের ৭ মার্চ হিটলার নরওয়ে অপারেশনের জন্য থার্ড মাউন্টেন ডিভিশন, ৬৯, ১৬৩, ১৬৯ ও ১৮তম পদাতিক ডিভিশন এবং একাদশতম মোটরচালিত রাইফেল ব্রিগেডকে নরওয়ে অপারেশনের জন্য বরাদ্দ করেন। অপারেশন শুরু হলে সরকার ও নরওয়ের রাজা হাকন এবং রাজপরিবার অসলোর ৮০ মাইল উত্তরে হামারে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসলোর উপর জার্মান বোমাবর্ষণ আরম্ভ হয়। বেলা ৩ টায় জার্মান সৈন্যরা অসলোর উপকেণ্ঠে পৌছে যায় এবং তার এক ঘণ্টা পর রাজধানী তাদের করায়ত্ত হয়। অসলোর পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি জায়গায় জার্মান সৈন্যরা বিনা বাধায় অবতরণ করে। সমুদ্র ও আকাশপথে জার্মান সৈন্যরা আসতে থাকে। নরওয়ের পশ্চিম উপকূলে বার্গেল বন্দরে জার্মান সৈন্যরা ব্যবসায়ী, ভ্রমনকারী প্রভৃতি ছদ্মবেশে নরওয়েজীয়ানদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। প্রত্যূষে বার্গেল বন্দর তাদের দখলে চলে যায়। ৩শ' মাইল দূরে স্ট্যাভাঙ্গার বন্দরও জার্মানরা দখল করে। ক্রিস্টিয়ান সুণ্ড, সুইডেনের লৌহ রপ্তানির বন্দর নার্ভিক এবং দক্ষিণের ইগার সুণ্ড বন্দরও নাৎসীদের করায়ত্ত হয়।

নরওয়েতে জার্মান অগ্রাভিযানের সংবাদে বৃটেন মর্মাহত হয়। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করেন যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যদের অবিলম্বে নরওয়েতে পাঠানো হবে। তার এ ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উত্তর সাগর ও স্কাগারাক কাটেগাট অঞ্চলে ভীষণ নৌ-যুদ্ধ শুরু হয়।

এদিকে, নরওয়ের জার্মানপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতায় অসলোয় একটি পাল্টা সরকার গঠিত হয়। মেজর ভিডকুল হন এ সরকারের প্রধান। অন্যদিকে, রাজা হাকন জার্মানদের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। ১৫ এপ্রিল সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ইংরেজ, ফরাসী ও কানাডীয় সৈন্যরা নরওয়ের কয়েকটি বন্দরে অবতরণ করেছে। জার্মান পক্ষ থেকেও এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলা হয়, নার্ভিক থেকে ৩০ মাইল দূরে বৃটিশ সৈন্যরা অবরতরণ করেছে।

উত্তর সুইডেনের যে অংশে লৌহ উৎপন্ন হতো সেখান থেকে নার্ভিক বন্দর পর্যন্ত একটি রেল পথ ছিল এবং নার্ভিক পর্যন্ত রেল যোগে লৌহ এনে পরে তা জার্মানীতে নিয়ে যাওয়া হতো। বৃটেন জার্মানীতে লৌহ পাচার বন্ধেই নার্ভিকের নিকটবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে মাইন স্থাপন করেছিল। তাই নার্ভিকের দখল নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। এই সংগ্রাম কিরূপ ভয়ংকর ছিল আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের খবর থেকে তা আঁচ করা সম্ভব। ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিক রোডস বলেছেন, নার্ভিক বন্দরের তলদেশে তিনি সহস্রাধিক জার্মান, নরওয়েজীয়ান ও বৃটিশ সৈন্যের

www.pathagar.com

মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ঐ বন্দরে প্রায় ৪০টি জার্মান, বৃটিশ ও নরওয়েজিয়ান যুদ্ধজাহাজের সলিল সমাধি হয়েছে।

ইংরেজরা জার্মানদের আগেই নরওয়েতে পৌঁছে যায় এবং তারা সে দেশের বিমান ঘাঁটিগুলো দখল করে নেয়। নরওয়েতে জার্মান সৈন্য সংখ্যা ছিল মিত্রপক্ষের চেয়ে বেশি। মিত্রবাহিনী জার্মানদের উত্তর অভিমুখে অগ্রাভিযান রোধে প্রাণপন চেষ্টা চালায়। দু'সপ্তাহ প্রচণ্ড গতিতে বাধা দিয়েও বৃটিশদের পিছু হটতে হয়। ৩ মে মিত্র পক্ষের সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠায় সৈন্য প্রত্যাহার করা ছাড়া বৃটেনের গত্যন্তর ছিল না।

৭ মাস পর আকস্মিকভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ৯ এপ্রিল ভোর ৪ টায় জার্মান বাহিনী ডেনিশ সীমান্ত অতিক্রম করে। জার্মান রণতরীগুলো থেকে ডেনমার্কের বিভিন্ন বন্দরে সৈন্য নামানো হতে থাকে। মোট ৪০ হাজার সৈন্য অবতরণ করে। জার্মান হামলার মাত্র দু'দিন আগে ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু জার্মানী দাবি করে যে, ডেনমার্ক তার নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারছে না। মিত্রপক্ষ তাদের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপ করছে। আরো জানানো হয় যে, ডেনমার্ক ও নরওয়েকে মিত্রপক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। ডেনমার্কের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ হাজার। তাদের দেশরক্ষা করার উপযোগী সমরোপকরণও ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে ডেনমার্ককে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বয়ং এডলফ হিটলার। ৬ মাস বিতর্কের পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল কোনোভাবেই যুদ্ধের ফলাফলে কোনো অবদান রাখেনি– একথা সত্যি। তবে এ দু'টি স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশে জার্মান অভিযান ছিল ইতিহাসে আধুনিক সামরিক বাহিনীর ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনের একটি মাইল ফলক। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পর সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে সম্মিলিতভাবে নিজেদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এসব দেশ এ নীতি অনুসরণ করে আসছিল। ১৯৩৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর জার্মানী স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসলোতে একটি চিঠি পাঠায় এবং সতর্ক করে দেয়া হয় যে, জার্মানী আশা করছে তারা তাদের অবিভাজ্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং কোনো তৃতীয় পক্ষকে এ নিরপেক্ষতা লংঘন করতে দেবে না। ৯ অক্টোবর যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত এক স্মারকলিপিতে বলা হয়, নরডিক রাষ্ট্রগুলো ভবিষ্যতে যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করবে সে নিশ্চয়তা নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই জার্মান নৌ-বাহিনীতে এমন একটা ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, নরওয়েতে জার্মান নৌ-ঘাঁটি থাকলে নৌ-যুদ্ধের চেহারা হতো অন্যরকম। পোল্যান্ড দখল সম্পন্ন হওয়ার পর জার্মান নেভির কমান্ডার-ইন-চীফ গ্রান্ড এডমিরাল এরিক রীডার নরওয়ের কোন্ কোন্ জায়গায় উপযুক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করা যায় তা খুঁজে বের করার জন্য একটি তদন্তের নির্দেশ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানী ও

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মিলিত কূটনৈতিক চাপে শান্তিপূর্ণভাবে নরওয়ের নৌ-ঘাঁটিগুলো দখল করা সম্ভব হবে। এ সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, ট্রন্ডহ্যাম ও নার্ভিক হচ্ছে উত্তম স্থান এবং ট্রন্ডহ্যাম হবে সাবমেরিন যুদ্ধের জন্য অনস্বীকার্য। ৯ অক্টোবর ৬ নং আদেশে হিটলার ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের উত্তরাংশে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যতটুকু প্রবেশ করা যায় ততটুকু দখল করে নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেন। পরদিন নেভাল কমান্ডার-ইন-চীফ রীডার হিটলারকে জানান যে, সাবমেরিন যুদ্ধের জন্য বেলজীয় বন্দর দখল কোনো কাজে আসবে না। তিনি নরওয়ে উপকূলের ঘাঁটিগুলো দখলের ইঙ্গিত দেন। হিটলার তার মতামতে বলেন, বৃটেনের কাছাকাছি ঘাঁটিগুলো দখল করাই বিমান বাহিনীর জন্য অপরিহার্য। তবে তিনি নরওয়ের ঘাঁটি দখলের চিন্তা ভবিষ্যতে বিবেচনার জন্য তুলে রাখেন। পরবর্তী সপ্তাহগুলোয় ফ্রান্স ও ইউরোপের ভাটি এলাকার দেশগুলো দখলের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি নরওয়ের কথাটি ভুলে যান। রীডারও ছিলেন চুপচাপ। কিন্তু ২৫ নভেম্বর রীডার নেভাল স্টাফকে জানান যে, নেদারল্যান্ডে জার্মানী হামলা চালালে বৃটেন নরওয়ে উপকূলে ত্বরিত গতিতে অবতরণ করবে এবং সেখানকার একটি ঘাঁটি দখল করে নিতে পারে। দু'দিন পর তিনি নরওয়ে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী জায়গায় চলাচলকারী যুদ্ধজাহাজগুলোর উপর হামলা চালানোর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তবে তিনি একথাও বলেন, নরওয়ে উপকূল থেকে বিদায় নেয়া যুদ্ধজাহাজগুলোকে ধাওয়া করা কঠিন হবে। ৮ ডিসেম্বর হিটলারের সঙ্গে বৈঠকে তিনি তার ইতিপূর্বের বক্তব্য থেকে সরে আসেন এবং বলেন, নরওয়ে দখল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডিসেম্বরে নরওয়ে ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টির নেতা ভিডকন কুইসলিংয়ের সঙ্গে রীডারের যোগযোগ হয়। নরওয়ের ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি ছিল জার্মানীর নাৎসী দলের অনরূপ এক দল। কুইসলিং ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে নরওয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে তিনি নরওয়েতে জার্মান দখলদারিত্বের পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কুইসলিং ছিলেন নাৎসী দলের বৈদেশিক রাজনৈতিক অফিসের প্রধান রেইচেসলিটারের একজন ক্রীড়নক। ১১ ডিসেম্বর তিনি রীডারকে নরওয়েতে বৃটিশ দখলদারিত্বের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জানান, নরওয়ে সরকার গোপনে বৃটিশ দখলদারিত্ব মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। পরদিন রীডার বিষয়টি হিটলারকে অবহিত করে বলেন, নরওয়ে হাতছাড়া হয়ে গেলে সুইডেনে বৃটিশ প্রভাব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাল্টিক সাগরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে আটলান্টিক ও উত্তর সাগরে জার্মান নৌ-যুদ্ধ কঠিন হবে। ১৪ ডিসেম্বর কুইসলিংয়ের সঙ্গে হিটলারের বিস্ত ারিত আলোচনা হয়। তার সঙ্গে আলোচনার পর হিটলার নরওয়ে কিভাবে দখল করা যায় তা খতিয়ে দেখতে সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ডকে নির্দেশ দেন। ১৮ ডিসেম্বর কুইসলিংয়ের সঙ্গে হিটলারের আবার দেখা হয়। তিনি তাকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন। কুইসলিং প্রতিদান দিতে ভুল করেননি। তিনি রোজেনবার্গের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করতেন। তবে একসময় তাকে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয় এবং তার সঙ্গে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। ৩০ নভেম্বর ফিনল্যান্ডে

www.pathagar.com

সোভিয়েত হামলা হলে আক্রান্ত দেশটির প্রতি স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলোর সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। শুধু স্ক্যান্ডেনেভীয় নয়, বৃটিশ ও ফরাসীদের হস্তক্ষেপের আশংকাও দেখা দেয়। জার্মানীর মনে এ দুশ্চিন্তা ঢুকে যায়, ফিনল্যান্ডকে সহায়তা করতে এসে বৃটিশরা নরওয়েরও দখল করে নিতে পারে। তবে ১৪ ফেব্রুয়ারীর একটি ঘটনা নরওয়েতে জার্মান অভিযান ত্বরান্বিত করে। সেদিন ৩শ' বৃটিশ বন্দী নৌ সেনাসহ জার্মান ট্যাংকার 'আল্টমার্ক' স্বদেশে ফেরার পথে নরওয়ের জলসীমায় প্রবেশ করে। নরওয়ে কর্তৃপক্ষ সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও জার্মান ট্যাংকারকে বন্দরে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেয়। অন্যদিকে নরওয়ের আপত্তি সত্ত্বেও বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার 'কোসাক' ফিজর্ড বন্দরে প্রবেশ করে এবং জার্মান ট্যাংকারের উপর হামলা করে বৃটিশ যুদ্ধ বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ ঘটনা নরওয়ে দখলে জার্মানীকে সরাসরি প্ররোচিত করে।

১ এপ্রিল হিটলার স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চিত হন যে, বাল্টিক সাগরে তুষারপাতে যুদ্ধজাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না এবং বিমান উড্ডয়নের জন্য আবহাওয়াও হবে অনুকূল। এরপর তিনি ৯ এপ্রিলকে 'ওয়েসার ডে' হিসেবে নির্ধারণ করেন। ৩ এপ্রিল সরবরাহকারী জাহাজগুলো প্রথম নরওয়ের উদ্দেশে যাত্রা করে এবং ৬ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে যুদ্ধজাহাজগুলো জার্মান বন্দর থেকে রওনা হয়।

নরওয়ে অভিযান ছিল রক্তক্ষয়ী। এ যুদ্ধে ১ হাজার ৩১৭ জন জার্মান সৈন্য নিহত এবং ১ হাজার ৬০৪ জন আহত হয়। ২ হাজার ৩৭৫ জন জার্মান সৈন্য হয়তো পানিতে নিমজ্জিত অথবা অন্য কোনোভাবে নিখোঁজ হয়। নরওয়ের নিহত হয়েছিল ১ হাজার ৩৩৫ জন সৈন্য। এছাড়া, বৃটিশ সৈন্য নিহত হয় ১ হাজার ৮৬৯ জন এবং নিখোঁজ বা নিমজ্জিত হয় ২ হাজার ৫শ'। ৫৩০ জন ফরাসী ও পোলিশ সৈন্যও নিহত হয়।

www.pathagar.com

বেলজিয়ামের পতন

১৯৪০ সালের ১০ মে ভোরে নাৎসী বাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করে। এ সময় ন্যূনতম ৪ লাখ বেলজীয় সৈন্য জার্মান হামলা প্রতিহত করতে সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করে। তোড়জোর শুরু হয়েছিল কিছুদিন আগে থেকেই। জানুয়ারীতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে বেলজীয় বাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। সীমান্তবর্তী ইউপেন ও মালমেডি প্রভৃতি জায়গা থেকে লোকজনকে স্থানান্তরিত করা হয়। জার্মান হামলা শুরু হলে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড সীমান্তে গিয়ে স্বহস্তে সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। জেনারেল স্টাফের কর্মকর্তা মেজর জেনারেল মিচিয়েলস তার উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের যে সামরিক শক্তি ছিল ১৯৪০ সালে ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রথম মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩০ হাজার। কিন্তু ১৯৪০ সালে বেলজিয়াম বাহিনীতে মোট সৈন্য সংখ্যা ৬ লাখে পৌঁছে। যুদ্ধাস্ত্র ও সমরোপকরণের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাই সবাই ধারণা করেছিলেন যে, বেলজিয়ামে জার্মান বাহিনী প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু সবার আশাবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম সীমান্তে এসে উপস্থিত হলে বেলজীয় সৈন্যরা মাসট্রিখটের সেতু ধ্বংস করতে ব্যর্থ হওয়ায় জার্মানদের বিশেষ সুবিধা হয়। বেলজীয় বাহিনী সীমান্ত থেকে সরে এসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মিউজ নদীর উভয় তীরে সমবেত হতে লাগলো। যেদিন বেলজিয়াম আক্রান্ত হয় ঠিক সেদিন রাজা লিওপোল্ড মিত্রবাহিনীর সহায়তা কামনা করেন। বৃটিশ ও ফরাসীরা এ আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। আধা ঘন্টার মধ্যেই বৃটিশ ও ফরাসী বিমানগুলো জার্মান বোমারু বিমানের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বেলজিয়ামে এসে উপস্থিত হয়। বৃটিশ অভিযানকারী সৈন্য বাহিনী ও ফরাসী প্রথম বাহিনীর কয়েকটি ডিভিশনও উত্তর ফ্রান্সের ঘাঁটি ত্যাগ করে বেলজিয়ামে এসে পৌঁছে এবং ১৪ মে নাগাদ তারা বেলজীয় বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশের শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু জার্মান বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বেলজিয়াম অতিক্রম করে বিদ্যুৎগতিতে মিউজ নদীর তীরে ফরাসী ঘাঁটি সিডান অভিমুখে ধাবিত হওয়ায় এক নয়া বিপদ দেখা দেয়। জার্মান বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা প্রদানে সিডানে অবস্থানকারী সৈন্যদের বেলজিয়ামে প্রেরণ করায় সিডান অনেকটা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। জার্মান সৈন্যদের সিডান অভিমুখী অগ্রযাত্রায় ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ শংকিত হয়ে উঠে। কিন্তু তখন আর করার কিছুই ছিল না। ১৪ মে জার্মান বাহিনী সিডানে এসে উপস্থিত

www.pathagar.com

হয় এবং সামান্য লড়াইয়ের পর ফ্রান্সে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। সিডানের যুদ্ধে ফরাসী নবম বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জার্মান বাহিনী বোমারু বিমান, ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনীর সহযোগিতায় পশ্চিমে সমুদ্র তীর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকায় ফ্রান্সের মূল বাহিনীর সঙ্গে ফ্লান্ডার্সের রণক্ষেত্রে অবস্থানরত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য দলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠায় বেলজিয়াম থেকে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী প্রত্যাহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং মিত্রপক্ষ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড তাতে আপত্তি জানান। ফলে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহারে বিলম্ব ঘটে। সৈন্য প্রত্যাহারে বিলম্ব ঘটায় মিত্রবাহিনীকে পরে অনেক মূল্য দিতে হয়।

জার্মান বাহিনীর পশ্চিম দিকে অগ্রযাত্রায় বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে অবস্থিত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২১ মে জার্মান সৈন্যরা ফরাসী উপকূলের আবেভিলেতে উপনীত হলে ফ্লান্ডার্সে অবস্থানকারী ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর জার্মান বাহিনী উপকূলভাগ দিয়ে বোলোন, ক্যালে এবং শেষ পর্যন্ত ডানকার্ক দখলের জন্য মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হলে ফ্লান্ডার্সে অবস্থানরত ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। ২৬ মে প্যারিস থেকে প্রকাশিত ইস্তেহারে স্বীকার করা হয় যে, ন্যূনধিক ১০ লাখ সৈন্য ফ্লান্ডার্সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বেলজীয় বাহিনী ক্রমেই জার্মান অগ্রাভিযান প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৭ মে জার্মানরা ২৬ বছর পর আবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে প্রবেশ করে এবং অ্যান্টোয়ার্পেরও পতন ঘটে। এ সময় বেলজিয়ামের সৈন্য হতাহত হয়ে ২ লাখে এসে ঠেকে। তিন শ' বিমানের মধ্যে মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট রইলো। জার্মান বিমান বাহিনীর আক্রমণে তাদের বহু কামান অকেজো হয়ে যায়। খাদ্য ও রসদের অভাব দেখা না দিলেও সৈন্যরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিপর্যয় সত্ত্বেও বেলজীয় বাহিনীর কৃতিত্ব কম ছিল না। তারা লিজ ও নামুরের কয়েকটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়া সত্ত্বেও অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। এ সময় আরেকটি অঘটনের জন্য পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে। ২৫ মে অকস্মাৎ জার্মান বাহিনীর কাছে বেলজীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণের দৃঢ় সংকল্পের খবর প্রচারিত হয়। এ সংবাদ শুনে গোটা ইউরোপ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে সিডানে ৮০ হাজার সৈন্যসহ প্রুশিয়ানদের কাছে রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের পর থেকে ইউরোপে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি। অবশ্য রাজা লিওপোল্ডের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে দু'টি কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। একটি ছিল হয়তো তিনি জার্মানদের বেপরোয়া বোমবর্ষণে অগণিত নরনারী নিহত হওয়ায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন অথবা মিত্রপক্ষের শক্তি বিশেষতঃ বেলজিয়ামে তাদের সামরিক শক্তি দেখে তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। তবে কারণ যাই হোক, রাজা লিওপোল্ড তার সংকল্পে অটল ছিলেন। ২৫ মে সোমবার সকালে বেলজীয় মন্ত্রী এম, পিয়েরলট ও পররাষ্ট্র সচিব এম, স্পাক আরো দু'জন মন্ত্রীসহ থাউরাউটের কাছে শ্যাটো হিবনেনডেলে রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে শেষবারের

www.pathagar.com

মতো সাক্ষাত করেন। রাজা যদি জার্মানদের হাতে বন্দী হন অথবা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন- এ আশংকায় মন্ত্রীরা প্রস্তাব করেন যে, লিওপোল্ড মন্ত্রীদের মনোনীত কোনো সেনাপতির উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার অর্পণ করে স্বয়ং ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করুন। রাজা লিওপোল্ড সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মন্ত্রীরা যেদিন রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গে সাক্ষাত করেন সেদিন সন্ধ্যায় ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এম, রেনোঁ বেলজীয় মন্ত্রী পিয়েরলটকে জানান যে, রাজা লিওপোল্ড বৃটিশ ও ফরাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্ধত হয়েছেন বলে তার কাছে প্রমাণ রয়েছে। পিয়েরলট তখন তাকে জানান, রাজা যাই করুন না কেন, বেলজীয় সরকার তাদের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই অব্যাহত রাখবে এবং মিত্রপক্ষের পাশে থাকবে। কিন্তু ততক্ষণে বেলজিয়ামের রাজা আত্মসমর্পণে মন স্থির করে ফেলেছেন। ২৮ মে বেলজিয়ামের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এক নির্দেশ পত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। সৈন্য চলাচল স্থগিত, যুদ্ধাস্ত্র ও সমরোপকরণ ধ্বংস এবং রাস্তার পাশে শ্বেত পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। জেনারেল স্টাফ প্রধান মিচিয়েলস এ নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দানে অসম্মতি জানান। ২৮ মে বেলজীয় বাহিনী রাজার নির্দেশ মান্য করে অস্ত্রত্যাগ করে। রাজাকে গ্রেফতার ও বন্দী করা হয়। পরে তাকে অস্ট্রিয়া ও সবেশেষে জার্মানীতে স্থানান্তর করা হয়। জেনারেল আলেক্সান্ডার ভন ফাকেনহাউজেন বেলজিয়ামে জার্মানীর সামরিক গভর্নর নিযুক্ত হন। নাৎসীবাদী রেক্সিস্ট পার্টি জার্মানীর তল্পিবাহক সরকারকে সমর্থন দেয়। যুদ্ধের পর হিটলারের সহযোগী হিসেবে রাজা লিওপোল্ডকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে বেলজিয়ামে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

বেলজীয় বাহিনীর অবমাননাকর আত্মসমর্পণের জন্য রাজার দুর্বুদ্ধি ও নৈরাশ্যকর ভূমিকাই সর্বাধিক দায়ী ছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বেলজিয়ামের ভাব গতিতে মিত্রপক্ষ চিন্তিত হয়ে উঠে। তার মূল কারণ ছিল যে, প্রকৃত ম্যাজিনো লাইন বেলজিয়ামের দক্ষিণ পাশে গিয়ে শেষ হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে চেক সংকট দেখা দিলে মিউনিখে এ সমস্যার সাময়িক সমাধান করা হয়। কিন্তু স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় যুদ্ধের আশংকা থেকে যায়। এ অবস্থায় ফ্রান্স বেলজিয়াম সীমান্তের কাছাকাছি নিজের ভূখণ্ডে প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন নামে পরিচিত। এ লাইন এক বছরের মধ্যে তড়িঘড়ি করে নির্মাণ করায় তা শক্তিশালী করা সম্ভব ছিল না। তাই সম্ভাব্য জার্মান হামলায় এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ার আশংকা গোড়াতেই ছিল। এটাও স্পষ্ট ছিল যে, জার্মানরা ম্যাজিনো লাইন ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া বেলজিয়ামে প্রবেশ করতে পারবে না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ফ্রান্সের পক্ষ থেকে রাজা লিওপোল্ডকে এ আশংকার কথা অবহিত করা হলেও তিনি গরজ দেখাননি। তিনি তখন হিসাব করে বুঝতে পারেন যে, ম্যাজিনো লাইন জোরদারের পদক্ষেপ নেয়া হলে তার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে এবং তাকে মিত্রপক্ষের অংশীদার হিসেবে গণ্য করে জার্মানী বেলজিয়ামে হামলা করবে।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালের নভেম্বরে বেলজিয়াম আক্রান্ত হওয়ার জোর গুজব উঠলে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার রাজা লিওপোল্ডকে দেশরক্ষায় মিত্রপক্ষের সামরিক বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি এ অনুরোধে সাড়া দেননি। আবার জানুয়ারীতে একই সংকট দেখা দিলে মিত্রপক্ষ তাকে পুনরায় একই অনুরোধ জানায়। এবারও লিওপোল্ডের মাথায় দুর্বুদ্ধি চেপে বসে। তিনি ফরাসী ও বৃটিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত হলে মিত্রপক্ষ বেলজিয়ামকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেয় যে, আজ হোক কাল হোক সে আক্রান্ত হবেই। মিত্রপক্ষ আলবার্ট খাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু লিওপোল্ড মিত্রপক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানান যে, হিটলার তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রক্ষা করা হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

বেলজিয়াম আক্রান্ত হলে ফরাসী জেনারেল স্টাফ প্রধান জেনারেল জর্জেস বললেন যে, বেলজিয়ামের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় সেখানে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রেরণ না করাই যুক্তিযুক্ত। বেলজিয়ামে সৈন্য পাঠালে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। বরং ফরাসী সীমান্তে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষায় মিত্রপক্ষের সৈন্য মোতায়েন করাই হবে উত্তম।

প্যারিসের সামরিক মহল জর্জেসের এ অভিমত সমর্থন করে। ফরাসীরা তাদের এ ইচ্ছার কথা বৃটিশদের অবহিত করলে তারা তাতে তীব্র আপত্তি জানায়। বৃটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে, জার্মানরা চ্যানেল উপকূলে পৌঁছতে পারলে বৃটেনের উপর জার্মানীর বিমান আক্রমণ সহজ হবে। ফরাসী জেনারেল গেমেলিনও বৃটিশদের এ অভিমত সমর্থন করেন। ফলে জেনারেল জর্জেসের অভিমত বাতিল হয়ে যায়। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। রাজার অনুরোধে নয়, সামরিক প্রয়োজনেই মিত্রপক্ষ বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছিল। তবে একথাও সত্যি যে, বেলজিয়ামে মিত্রপক্ষের সৈন্য মোতায়েনে বেলজিয়ামের স্বার্থ ছিল এবং রাজা লিওপোল্ডও সৈন্য মোতায়েনে অনুরোধ করেছিলেন।

ফ্লান্ডার্স থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে মিত্রবাহিনীর সিদ্ধান্তের বিষয় জানতে পেরে রাজা লিওপোল্ড উপলব্ধি করেন যে, আক্রান্ত হলে তাকে জার্মানদের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করতে হবে। তবে একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে মোতায়েন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সুপ্রীম কমান্ডার পদে ফরাসী জেনারেল গেমেলিনকে নিযুক্ত করার নীতি রাজা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কাজেই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা ছাড়া অস্ত্র পরিত্যাগে তার অধিকার ছিল না। বেলজিয়ামের আত্মসমর্পণে ফ্রান্সের পতন ত্বরান্বিত হয়। জার্মান বাহিনী সমুদ্র পথে অগ্রসর হওয়ায় ফ্লান্ডার্সে অবস্থানরত ইঙ্গ-ফরাসী-বেলজীয় বাহিনী ফ্রান্সের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে মিত্রপক্ষের সাড়ে তিন লাখ সৈন্য বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়। দিন রাত জার্মান বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে ডানকার্ক থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহারের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

ডানকার্ক থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য অপসারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর ৮ লাখ সৈন্য বেলজীয় সৈন্যদের সহায়তা করতে গিয়ে ডানকার্কে অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের উদ্ধারে যে বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালানো হয় তা এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বিপর্যয় সত্ত্বেও মিত্রবাহিনী ডানকার্কে তাদের অভিযানকে সফল হিসেবে দাবী করে। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের নির্দেশে তার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করায় বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের উভয় পার্শ্ব এবং পিছু হটার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। আত্মসমর্পণের আগে বেলজিয়ামের রাজা মিত্রবাহিনী এমনকি তার মন্ত্রিসভার সঙ্গেও পরামর্শ করেননি। অথচ রাজার অনুরোধে সাড়া দিয়েই বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা তার দেশে প্রবেশ করেছিল। যুদ্ধের শুরুতে বেলজিয়ামের রাজা কথিত নিরপেক্ষতার নামে মিত্রশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে মিত্রবাহিনী শুধু বেলজিয়াম নয়, হল্যান্ডও রক্ষা করতে পারতো। বেলজিয়াম আক্রান্ত হলে রাজা মিত্রবাহিনীর সহায়তা কামনা করেন। ততক্ষণে পানি অনেকদূর গড়িয়ে যায়।

বেলজিয়ামের প্রায় ৫ লাখ দক্ষ ও সাহসী সৈন্য ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যদের পূর্ব পার্শ্ব রক্ষা করতে থাকে। ফলে তাদের সমুদ্রে পিছু হটার পথ ছিল খোলা। কিন্তু মিত্রবাহিনীর অনুমতি কিংবা তাদের মতামত না নিয়ে রাজা ও তার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করায় মিত্রবাহিনীর অবস্থান এবং সমুদ্রে পিছু হটার রাস্তা উভয়ই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। বেলজীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করায় সংক্ষিপ্ত নোটিশে বৃটিশ সৈন্যদেরকে ৩০ মাইলের বেশী প্রশস্ত সমুদ্র অভিমুখী একটি করিডোর রক্ষা করতে হয়। নয়তো এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। এ করিডোর রক্ষা করতে গিয়ে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে দু'টি কোরের সমন্বয়ে গঠিত ফ্রান্সের ফার্স্ট ফ্রেন্স আর্মির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে মিত্রবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্যের উপকূলে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে উঠে। জার্মানরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে মিত্রবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানরা সমুদ্র ও প্রণালীগুলোতে চৌম্বকীয় মাইন স্থাপন করে এবং একটির পর একটি বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। কখনো কখনো তারা কোনো একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে প্রয়োজনের তুলনায় ১শ' গুণ বেশী শক্তি ব্যবহার করতো। জার্মান ইউ বোট ও মটর লঞ্চগুলোও যুদ্ধে অংশ নেয়। একটি ইউ বোট ডুবে যায়।

১৯৪০ সালের ২৮ মে ভোর ৪ টায় বেলজীয় সৈন্যরা রাজা লিওপোল্ডের আদেশে আত্মসমর্পণ করে। পরদিন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কমন্স সভায় বেলজিয়ামের রাজার কঠোর সমালোচনা করে এক ভাষণে বলেন, বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী এখন জীবন পণ

www.pathagar.com

লড়াইয়ে নিয়োজিত রয়েছে। শত্রু সৈন্যরা তিন দিক থেকে তাদের উপর স্থলপথে হামলা চালাচ্ছে এবং বিমান আক্রমণ চলতে থাকায় তাদের অবস্থা খুবই শংকটাপন্ন হয়ে উঠছে। এটুকু বলে তিনি কমন্স সভার সদস্যদের আরো দুঃসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

১৯৪০ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে মিউজ নদীর তীরে সিডানে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমিয়েন্স ও তার দক্ষিণে দ্রুত পিছু হটে আসাই ছিল কেবলমাত্র বৃটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনীকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। তবে এ কৌশলগত পশ্চাদপসরণের গুরুত্ব তাৎক্ষণিক উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। ফরাসী হাইকমান্ড বিশ্বাস করতো যে, তারা বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে তাদের ফাঁক পূরণে সক্ষম হবে। বেলজিয়ামের উত্তরে অবস্থানকারী মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ছিল তাদের কমান্ডের আওতায়। যুদ্ধে গতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জেনারেল ওয়েগাঁকে জেনারেল গেমেলিনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মিত্রপক্ষের দু'টি বাহিনীর পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অর্থ ছিল সুসজ্জিত ২০ ডিভিশন বেলজীয় সৈন্যের ধ্বংস এবং বেলজিয়ামকে পরিত্যাগ করা। জার্মানীর অগ্রাভিযান আসন্ন হয়ে উঠার সময় ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যরা বেলজীয় সেনাবাহিনীর দক্ষিনপার্শ্ব রক্ষায় একটি উদ্যোগ নেয়। একই সঙ্গে মিত্রবাহিনী নবগঠিত ফ্রেন্স আর্মির কাছে নিজেদের দক্ষিণ বাহু রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে। কথা ছিল যে, নবগঠিত এ ফরাসী আর্মি পূর্ণ শক্তিতে সোম-এ বরাবর অগ্রসর হবে। এসময় জার্মানরা ঝড়ের গতিতে ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যদের পেছনে এমিয়েন্সের দক্ষিণে এসে উপস্থিত হয়। জার্মানদের সঙ্গে ছিল ৯টি সাঁজোয়া ডিভিশন। প্রতিটি ডিভিশনে ছিল ৪শ' ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান। এসব ডিভিশন আবার ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত ছিল। জার্মান সাঁজোয়া ডিভিশনগুলো এমিয়েন্সের মধ্য দিয়ে আবেভিলের দিকে এগিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তারা ফরাসী উপকূল বোলোন ও ক্যালে এবং ডানকার্ক পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

জার্মান সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক ডিভিশনকে পদাতিক ডিভিশনগুলো অনুসরণ করে। লরিতে করে পদাতিক সৈন্যরা এগিয়ে আসে। মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা কিছু সময়ের জন্য বোলোনে জার্মান অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করে। পরে তারা পিছু হটে। এক ব্যাটালিয়ন বৃটিশ ট্যাংক এবং ১ হাজার ফরাসী সৈন্যের সহায়তায় সিক্সটি রাইফেলসের (কুইন ভিক্টোরিয়া রাইফেল) ৪ হাজার সৈন্যের রাইফেল ব্রিগেড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যালে রক্ষার চেষ্টা করে। ক্যালে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বৃটিশ ব্রিগেডিয়ারকে আত্মসমর্পণের জন্য এক ঘন্টা সময় দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। ৪ দিনের তীব্র লড়াইয়ে জার্মানরা ক্যালে দখল করে নেয়। বৃটিশ নৌ বাহিনী মাত্র ৩০জন বৃটিশ সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারে সক্ষম হয়। জার্মানদের অগ্রযাত্রা রোধে গ্রেভলাইন প্লাবিত করে দেয়া হয় এবং এভাবে ফরাসী সৈন্যরা ডানকার্ক রক্ষার চেষ্টা করে। মূল ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় এমিয়েন্সের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হওয়ায় বেলজিয়ামের উত্তরে মোতায়েন বৃটিশ বাহিনীর জন্য তখন একটাই পথ খোলা ছিল। তা হলো পিছু হটে যাওয়া। এদিকে, বেলজীয় ও ফরাসী সৈন্যরা অবরুদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। একটি মাত্র বন্দর এবং পার্শ্ববর্তী সমুদ্র সৈকত ছিল তাদের পিছু হটার একমাত্র সুযোগ। চারদিক থেকে তাদের উপর ভারি গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল। তাদের বিমান বাহিনীর শক্তি ছিল নগন্য।

এসময় জার্মানরা দাবী করে যে, তারা বেলজিয়ামে বৃটিশ এবং উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে এবং এসব সৈন্য অচিরেই বিধ্বস্ত হবে। জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত ফরাসী বাহিনী এবং বৃটিশ সৈন্যরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। জার্মান বাহিনী দ্রুত দক্ষিণ-পূর্ব বেলজিয়াম অতিক্রম করে মিউজ নদীর তীরবর্তী সিডানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ১৫ মে তারা সিডানের কিয়দংশ ভেদ করে ফ্রান্সে প্রবেশ করে। ফ্রান্সে প্রবেশ করেই জার্মান বাহিনী পশ্চিমে সমুদ্রপোকূল অভিমুখে অগ্রসর হয়।

২১ মে জার্মানদের অভিসন্ধি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বেলজিয়ামে জার্মানরা সেন্টের দক্ষিণে শেলডটে উপনীত হয়। একই সময়ে তারা দক্ষিণে সিডান ভেদ করে আরাসে পৌঁছে যায়। আরাসে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলে তারা উত্তর-পশ্চিমে সেন্ট-পোলে উপনীত হয়। জার্মানরা সেন্ট পোলে পৌঁছে গেলেও মিত্রবাহিনী তাদের প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। জার্মান বাহিনী সেন্ট পোলে তাদের অবস্থান সংহত করে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ফরাসী উপকূলের দিকে ধাবিত হয়। হাজার হাজার লোককে হত্যা এবং অসংখ্য শহর-নগর অতিক্রম করে তারা দু'দিন পর ফরাসী উপকূলে পৌঁছে। ২১ মে তারা আবেভিলেতে পৌঁছে যায়। বোলোন বন্দরে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। জার্মান সৈন্যরা ক্যালে বন্দর অবরোধ করে। তারপর তারা ডানকার্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৪ মে জার্মানরা বোলোন দখল করে নেয়। জার্মান সাঁজোয়া বহর উপকূলের সর্বত্র অবস্থান গ্রহণ করে। এসময় বেলজিয়ামের উপর প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়। ফ্লান্ডার্সে অবস্থান গ্রহণকারী বৃটিশ বাহিনী ও ফরাসী সৈন্যদেরকে জার্মানরা চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। ঘেরাও হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা বেলজিয়ামের সাহায্যে এগিয়ে যায়। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা যখন বেলজিয়ামের সাহায্যে এগিয়ে যায় ঠিক তখন রাজা লিওপোল্ডের নির্দেশে বেলজীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে এবং তারা বিনা প্রতিরোধে জার্মানদের সমুদ্রপোকূলে এগিয়ে যেতে দেয়। জার্মান সৈন্যরা ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ক্যালে বন্দরে এগিয়ে গেলে ফ্লান্ডার্সে অবস্থানরত বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা ফ্রান্সের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করায় জার্মান সৈন্যরা অবরুদ্ধ বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের উপর বিপরীত দিক থেকে হামলা করার সুযোগ পায়।

জার্মান অগ্রাভিযানের মুখে ফ্লান্ডার্সে অবস্থান গ্রহণকারী বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী নির্মূল হয়ে যাবার পর্যায়ে পৌঁছে। ঠিক তখন দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের একটি কামরায় ২০ জনের মতো বৃটিশ অফিসার একটি ফন্দি আঁটেন। এসব অফিসার ও বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ বোলোন থেকে বিপন্ন সৈন্যদের জাহাজযোগে উদ্ধার করে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসার দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিকেল ৫ টা থেকে রাত ৩টার মধ্যে ৬টি ডেস্ট্রয়ারের সাহায্যে বোলোন থেকে ৬ হাজার সৈন্যকে উদ্ধার করা হয়। পরে আরো

www.pathagar.com

৩০ হাজার সৈন্য প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বৃটিশ নৌ বহর ২০ জন অফিসার ও ১৮০ জন নৌ সেনা পাঠায়। ডোভারে প্রাপ্ত জাহাজগুলো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অভিযানে অংশগ্রহণকারী নৌ সেনাদের যে কোনো মূল্যে অবরুদ্ধ সৈন্যদের উদ্ধারে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে উদ্ধারকারীরা এগিয়ে যেতে থাকে। গোলাবর্ষণে ডানকার্ক জ্বলতে থাকে। উদ্ধারকারীদের প্রচেষ্টা সফল হয়। ৬ টি উদ্ধারকারী জাহাজযোগে হাজার হাজার অবরুদ্ধ সৈন্য উদ্ধার করা হয়। ডোভার থেকে প্রেরিত এ উদ্ধারকারী মিশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভাইস এডমিরাল এইচ বি রামসে। অভিযান সফল হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, কেবল বৃটিশ সৈন্যদেরই নয়, উত্তর ফ্রান্সে অবস্থানকারী ফরাসী সৈন্যদেরও সরিয়ে আনা হয়েছে।

এরপর ব্যাপকভাবে সৈন্য অপসারণ শুরু হয়। ভাইস এডমিরাল রামসে পরে একসময় বলেছিলেন, 'এ অভিযানের সাফল্য দেখে আমার মনে এমন আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, আমরা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বড় কোনো অভিযান চালালেও আমরা সফল হবো। তাই আমরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যতগুলো সম্ভব ততগুলো নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ যোগাড় করতে বললাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য সাড়া পাওয়া যায়। ২২২টি স্টীমার ও ছোটবড় সব মিলিয়ে ৬৬৫টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। জেলে, বজরার মাঝি, নৌকার মাঝি-যার পক্ষে যতদূর সম্ভব ততগুলো নৌকা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। প্রমোদ বিহারে নিয়োজিত স্টীমার, দাঁড়টানা নৌকা কিছুই বাদ পড়েনি। তারপর সমবেত নৌ-বহর ডানকার্ক অভিমুখে যাত্রা করে। তখন একদিকে আবহাওয়া ছিল বিরূপ এবং অন্যদিকে ছিল বিরামহীন জার্মান বোমাবর্ষণ। সমুদ্রে পোঁতা ছিল মাইন ও টর্পেডো।'

ডানকার্ক উপকূলের ১৫ মাইলের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা অবস্থান করছিল। জার্মান গোলাবর্ষণে জাহাজের ডকগুলো চুরমার হয়ে যায়। জাহাজ ভেড়ানোর কোনো জো ছিল না। এ পরিস্থিতিতে ছোট ছোট নৌকাগুলোকে একেবারে কূলে নিয়ে ভেড়ানো হয়। বড় বড় জাহাজগুলো গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করতে থাকে। ডানকার্ক উপকূল ছিল অগভীর। প্রণালীগুলোও ছিল সংকীর্ণ। এ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বেগে বাতাস বইতে থাকে। সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে প্রথম দিন ১৩ হাজার সৈন্য উদ্ধার করা হয়। পরদিন ২০ হাজার সৈন্য ইংল্যান্ডে পৌঁছে। তৃতীয় দিন আরো ৪৫ হাজার সৈন্য উদ্ধার করা হয়। তারপর একদিনে ৬৬ হাজার সৈন্যকে জাহাজে তোলা হয়।

অন্যদিকে, জার্মানদের আক্রমণও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। উপকূলে পা রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ রাতের অন্ধকারে জেটি থেকে সৈন্যদের জাহাজে তোলার নির্দেশ দেয়। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা একই সংকীর্ণ স্থান দিয়ে জাহাজে আরোহন করতে লাগলো। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা যে স্থান দিয়ে সরে যাচ্ছিল জার্মানরা সেখানে প্রচণ্ড গোলা ছুঁড়তে থাকে। জাহাজগুলোর উপর বৃষ্টির মতো গোলা পড়ছিল। ডানকার্কে খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। জার্মানরা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের কেবলমাত্র রাতে বাইরে

www.pathagar.com

বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। জার্মানদের গোলাবর্ষণে মাথা সোজা করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। পর্বত প্রমাণ বিপত্তি সত্ত্বেও পরদিন রাত্রে আরো ৩০ হাজার সৈন্য উদ্ধার করা হয়। ছোট বড় ১ হাজার জাহাজে ৩ লাখ ৩৫ হাজার সৈন্য উদ্ধার করা হয়। মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের অপসারণকালে জার্মান বিমান বাহিনী প্রবল বাধা দেয়। আকাশে জার্মান বিমানের সঙ্গে বৃটিশ রাজকীয় বিমানের মোকাবিলা হয়। তবে তাদের শক্তির অনুপাত ছিল ৪ঃ১। অর্থাৎ একটি বৃটিশ জঙ্গীবিমানের বিপরীতে ছিল ৪টি জার্মান জঙ্গীবিমান। ডানকার্কে যেসব বৃটিশ জঙ্গীবিমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে ছিল স্পিটফায়ার, হ্যারিকেন ও ডিফায়েন্স।

ফরাসীদের সঙ্গে সমঝোতা হয় যে, প্রত্যেকবার জাহাজে সৈন্য তোলার সময় বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যকে সমান অনুপাতে উদ্ধার করা হবে। উদ্ধারকারী দলের অসামান্য দৃঢ়তা ও প্রচেষ্টায় ডানকার্কে অবরুদ্ধ সকল সৈন্যকে উদ্ধার করা হয়। বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ এক ইস্তাহারে ঘোষণা করে যে, '৩ লাখ ৩৫ হাজার সৈন্যের জীবন রক্ষা করা হয়েছে। আমাদের পক্ষে খোয়া গেছে ৬ টি ডেস্ট্রয়ার ও ২৪টি ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজ। এছাড়া সৈন্য অপসারণকালে কিছু সৈন্যও নিহত হয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ সৈন্য উদ্ধার করা হয়েছে তার তুলনায় এ ক্ষতি নগণ্য।'

৪ জুন বিকেলে ডানকার্ক থেকে শেষ বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজটি বিদায় নেয়। ফ্লান্ডার্সে (বর্তমান বেলজিয়ামের উত্তরাঞ্চল) সংগ্রামের এক অধ্যায় শেষ হয়। ডানকার্কে বৃটিশদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এখান থেকে অবরুদ্ধ সৈন্য উদ্ধারে ৩০ হাজার বৃটিশ সৈন্যকে জীবন দিতে হয়। এছাড়া, তাদের ১ হাজার কামান, অসংখ্য মেশিনগান, লরী, ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও সমরোপকরণ জার্মানদের হস্তগত হয়। মিত্রবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলবর্তী ফরাসী বন্দরগুলো থেকে বিতাড়িত হয়।

বেলজীয় বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর পশ্চাদপরণ সত্ত্বেও ডানকার্ক অভিযান পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শিবিরের জন্য একটি বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। জার্মানরা ঘোষণা করেছিল যে, ফ্লান্ডার্সে তারা ১০ লাখ সৈন্যকে বন্দী করবে। কিন্তু এ সংখ্যা প্রথমে ৮ লাখ এবং পরে ৩ লাখে পরিণত হয়।। এক পর্যায়ে জার্মানরা স্বীকার করে যে, তারা ডানকার্কে ৮০ হাজার বৃটিশ, ফরাসী ও বেলজীয় সৈন্যকে বন্দী করেছে।

ডানকার্ক অভিযান শেষে বৃটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী এন্থনী ইডেন বলেছিলেন, আমাদের ইতিহাসে তার চেয়ে বড় আর কোনো বীরত্বের উপাখ্যান নেই। প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল কমন্স সভায় ঘোষণা করেন, ডানকার্কে যে অভিযান চালানো হয়েছে তা একদিকে যেমন দীর্ঘ তেমনি ভয়াবহ।

www.pathagar.com

রুশ-ফিনিশ সংগ্রাম

পোল্যান্ডের সংগ্রাম পরিসমাপ্তির পর ইউরোপে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায়। এক পর্যায়ে ইঙ্গ-ফরাসী সীমান্তে মাঝে মাঝে সামান্য সংঘর্ষ, জঙ্গীবিমানের ঘোরাফেরা এবং কচিৎ কখনো বোমাবর্ষণ এই ধরনের ব্যাপার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। উভয়পক্ষের সৈন্যদল নিজ নিজ সীমান্তে দুর্গের পেছনে সুযোগের অপেক্ষায় সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে যখন এই অবস্থা তখন রাশিয়ার উত্তর সীমান্তে সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠে। জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে নেয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার কাছে কতগুলো নৌ ও বিমানঘাঁটি দাবি করে বসে। এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে এসব দাবি আদায়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডের কাছেও অনুরূপ দাবি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডকে জানিয়ে দিল যে, ক্রনস্টাটে ১নং সোভিয়েত নৌ-ঘাঁটির নিরাপত্তার জন্য ফিনল্যান্ডকে হ্যাঙ্গো দ্বীপে তাদের সুরক্ষিত ঘাঁটি এবং ফিনল্যান্ডের উপসাগরে আরো কয়েকটি দ্বীপ ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া ফিনল্যান্ডের সর্বোত্তম অংশে অবস্থিত রাইবাচী উপদ্বীপও ইজারা দিতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আর্কটিক সাগরে ফিনল্যান্ডের যে সমস্ত বন্দর ছিল সেগুলোর মধ্যে একমাত্র লিনাহামারী বন্দরে বছরে কখনো বরফ জমতো না। কাজেই ফিনল্যান্ডের জন্য এ বন্দর ছেড়ে দেয়া ছিল খুবই কঠিন। আরো দাবি করা হলো ফিনল্যান্ডকে ফিনিশ উপসাগর ও লাডোয়া হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত সংকীর্ণ ভূখণ্ড কারেলিয়ান যোজকের ১২ কি ১৫ মাইল ভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছেড়ে দিয়ে ফিনিশ সীমান্তবর্তী সৈন্যদের পেছনে সরিয়ে নিতে হবে। তার বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডকে কারেলিয়ান যোজকের আরেক অংশে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দেবে এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থও দেয়া হবে।

এখানে সোভিয়েত দাবির ব্যাপারে ক'টি কথা বলা দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘদিন থেকেই তার উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছিল। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাংশের প্রতিরক্ষা ছিল দুর্বল। ফিনিশ সীমান্ত থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব মাত্র ৩২ কিলোমিটার হওয়ায় জোসেফ স্টালিনের মনে একটা ভীতি কাজ করতো। তিনি আশংকা করতেন যে, পশ্চিমা মিত্রবাহিনী যে কোনো সময় ফিনল্যান্ড দখল করে দ্রুত লেনিনগ্রাদে পৌঁছে যেতে

www.pathagar.com

পারে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ পশ্চিমা মিত্রপক্ষকে সুস্পষ্টরূপে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে জার্মানীর সঙ্গে তাদের বিরোধ বেধে গেলে রুশ-ফিনিশ সীমান্ত দিয়ে জার্মানরা উত্তর রাশিয়া আক্রমণে যদি ফিনল্যান্ডকে ব্যবহার করে তাহলে নাৎসী সৈন্যরা প্রায় একদিনের মধ্যেই লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছে যাবে। ধারণা করা হয়, এ বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীকালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ মলোটভের সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার নিরাপত্তার জন্য ৩টি বাল্টিক রাষ্ট্র ও ফিনল্যান্ডের উপর হস্তক্ষেপ করার অবাধ অধিকার মেনে নেন।

ফিনরা সোভিয়েতদের প্রবল চাপে তাদের দাবির কিয়দংশ পূরণে রাজি হয়। তারা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলো যে, তারা কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মিলিত হবে না এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সকল বিরোধ আপোসে মীমাংসা করা হবে। ফিনিশ উপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ তারা ছেড়ে দিতে রাজি হয়। কিন্তু হ্যাঙ্গো দ্বীপ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়নি। কেননা হ্যাঙ্গো দ্বীপ ছেড়ে দিলে রাজধানী হেলসিংকি অভিমুখী জাহাজগুলোকে সোভিয়েত ঘাঁটির সম্মুখভাগ অতিক্রম করে যেতে হতো। ফিনরা কারেলিয়ান যোজকেরও কিয়দংশ ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। কিন্তু সোভিয়েতদের দাবি পুরোপুরি মেনে নেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েতদের দাবি পুরোপুরি মেনে নিলে সীমান্তবর্তী ম্যানারহিম প্রতিরক্ষা লাইন তাদের হাতছাড়া হওয়ার আশংকা ছিল। উভয়পক্ষের মতবিরোধের মধ্য দিয়ে বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠে।

শেষ পর্যন্ত একটা ছুঁতা ধরে সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯৪০ সালের ২৬ নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় সোভিয়েত সামরিক বিভাগের লেনিনগ্রাদ ডিস্ট্রিক্টের হাই কমান্ড এই মর্মে অভিযোগ করে যে, ফিনরা সোভিয়েত-ফিন সীমান্তে অবস্থানরত লাল ফৌজের উপর গোলাবর্ষণ করেছে। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। লাল ফৌজের উপর ফিনিশ সৈন্যদের গোলাবর্ষণের অভিযোগ ছিল একটি অজুহাত মাত্র। ফিনিশ সৈন্যরা ঘটনাস্থল মেইনিনয় নামে ওই ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে এত দূরে অবস্থান করছিল যে, তারা গোলাবর্ষণ করলেও তা লাল ফৌজের উপর পতিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফিনিশ সৈন্যরা ২৬ নভেম্বর সীমান্তের ওপারে কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটার শব্দ শুনতে পায়। বিস্ফোরণের এসব শব্দ ছিল সাজানো। সোভিয়েত সৈন্যরাই এসব বিস্ফোরণ ঘটায়। ফিনল্যান্ডে হামলা চালানোর জন্য কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের এ প্রতারণা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পরে অবশ্য ১৯৯০ সালে এ প্রতারণার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছে।

সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, মলোটভ ফিনল্যান্ডের কাছে এক নোট পাঠিয়ে জানান যে, অবিলম্বে কারেলিয়ান যোজক থেকে ফিনিশ সৈন্যদের ১২ থেকে ১৬ মাইল পেছনে সরিয়ে নিতে হবে। তিনি তার নোটে উল্লেখ করেন যে, সেখানে ফিনিশ সৈন্যদের উপস্থিতির ফলে লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ফিনরা

www.pathagar.com

লাল ফৌজের উপর গোলাবর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং পশ্চাদপসরণে অসম্মতি জানায়। ২৬ নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফিনল্যান্ডকে চরমপত্র দেয়া হয় যে, ৩০ নভেম্বর ভোর রাত তিনটার মধ্যে আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হলে হেলসিংকিকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়া যুদ্ধ শুরু হয়। ৩০ নভেম্বর ভোরে সোভিয়েত লাল ফৌজ ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে। ২ হাজার ট্যাংক নিয়ে ২৩ ডিভিশনে বিভক্ত ৪ টি সোভিয়েত আর্মির ৪ লাখ ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী ফিনল্যান্ডের ১২শ' কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে এগিয়ে আসে। রাজধানী হেলসিংকির উপর সোভিয়েত বিমান হামলা শুরু হয়। শত্রুর অগ্রযাত্রায় বাধাদানে ১ লাখ ৬০ হাজার ফিনিশ সৈন্য অবস্থান গ্রহণ করে। ম্যানারহিম লাইনে লাল ফৌজের অগ্রযাত্রা থেমে গেলেও তিন মাসের প্রতিরোধ লড়াইয়ে ফিনল্যান্ডের ২০ শতাংশ সৈন্য নিহত হয়। সোভিয়েতদের লক্ষ্য ছিল বছরের শেষ নাগাদ ফিনল্যান্ড দখল করা এবং মস্কো সমর্থিত টেরিযোকি সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে ফিরে আসা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোভিয়েত-ফিনিশ বিরোধে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি পাঠান। এ চিঠি সেদিনই ক্রেমলিনে পৌঁছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। মধ্যরাতে ফিনিশ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং নয়া আরেকটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এদিকে, উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হওয়ার একটি গুজব উঠে। কিন্তু তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। যেদিন যুদ্ধ শুরু হয় সেদিন নব গঠিত ফিনিশ মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী রাইটী এক ঘোষণায় জানান যে, ফিনল্যান্ড প্রাণপনে সোভিয়েত হামলা মোকাবিলা করবে। তবে সম্মানজনক শর্তে সন্ধির আলোচনায়ও তারা প্রস্তুত রয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ফিনল্যান্ডে একটি পাল্টা সরকার গঠন করা হয়। কারেলিয়ান যোজকের সামান্য পেছনে টেরিযোকি সরকারের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। এম, কুনসিনেল নামে একজন ফিনিশ বিপ্লবী নয়া সরকারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। রিস্টো রাইটীর অধীনে জাতীয় সরকারকে মেনে নিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বীকৃতি জানায় এবং কুনসিনেলের সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

যুদ্ধ চলতে লাগলো। রাইটী সরকার এ সংকটে হস্তক্ষেপ করার জন্য জাতিপুঞ্জের কাছে অনুরোধ জানায়। রাইটী সরকারের অনুরোধে জাতিপুঞ্জের অধিবেশন বসে এবং ১৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডের উপর হামলা করে একটি সদস্য রাষ্ট্রের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর জাতিপুঞ্জের সদস্যপদে বহাল থাকতে পারে না।

সোভিয়েত-ফিনিশ যুদ্ধের বিস্ময়কর গতি দেখে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে যায়। কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, তদানীন্তনকালে ৩৬ লাখ লোকের একটি ক্ষুদ্র জাতি ১৮ কোটি লোকসংখ্যা অধ্যুষিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। ফিনদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪ লাখ এবং বিমানের সংখ্যা ছিল ২শ'র মতো। এ সামান্য শক্তি নিয়ে ফিনল্যান্ড তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। যার রণনৈপুণ্যে ফিনরা লড়াই করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়েছিল তিনি ছিলেন ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহিম। এই মার্শাল ম্যানারহিম-ই ২০ বছর আগে ট্যাম্পিয়ারের যুদ্ধে রুশ বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। সোভিয়েত-ফিন সীমান্তে দুর্ভেদ্য দুর্গ 'ম্যানারহিম লাইন' তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েতদের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। এ অপরিহার্যতাকে সামনে রেখে তিনি ধীরে ধীরে ফিনিশ বাহিনীকে গড়ে তুলেছিলেন।

সোভিয়েতদের সঙ্গে লড়াইয়ে কাবু হয়ে পড়ায় বৃটেন ও ফ্রান্স ফিনল্যান্ডকে সমরোপকরণ দিয়ে সহায়তা করতে লাগলো। যুক্তরাষ্ট্রও সহানুভূতি প্রকাশ করে। বৃটিশ, ফরাসী, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান ও মার্কিন তরুণগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ফিনল্যান্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এমনকি বৃটিশ মন্ত্রিসভার মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আওয়াজ উঠে। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় বৃটিশ সমরমন্ত্রী হোর বেলিশা মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা দেন। ফিনল্যান্ডে সমরোপকরণ ও স্বেচ্ছাসেবক আসতে লাগলো ঠিকই। কিন্তু আরেকটি অসুবিধা দেখা দেয়। নরওয়ে ও সুইডিশ সরকার নিজ নিজ ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে সমরোপকরণ ও স্বেচ্ছাসেবক যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শত্রু অধ্যুষিত বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্য দিয়েও সমরোপকরণ সরবরাহ করা ছিল অসম্ভব। ফলে ফিনল্যান্ডের বিপদ আরো ঘণীভূত হয়। তিন মাস যাবৎ ফিনিশ সৈন্যরা প্রাণপণে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে আসছিল। কোইভিস্টো দুর্গের পতনের পর ম্যানারহিম লাইনের পশ্চিম অংশ থেকে ফিনিশ সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করা হলে সোভিয়েত সৈন্যরা ভিপুরিতে প্রবেশ করে। ভিপুরি ও হেলসিংকির মধ্যবর্তী কয়েকটি জায়গায়ও সোভিয়েত সৈন্যরা অবতরণ করে। ফলে দক্ষিণে ফিনদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন কমন্স সভায় বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন যে, উভয় রাষ্ট্র সমবেতভাবে ফিনল্যান্ডের সাহায্যে অগ্রসর হবে। চেম্বারলিনের এ ঘোষণায় নরওয়ে ও সুইডেন ভয় পেয়ে যায়। এ দু'টি দেশ হিসাব করে দেখতে পেলো যে, বৃটিশ ও ফরাসীদের হস্তক্ষেপের অজুহাতে জার্মানী দক্ষিণ সুইডেন, নরওয়ে এবং সম্ভবত ফিনল্যান্ডেও আক্রমণ চালাতে পারে। এজন্য এ দু'টি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য ফিনল্যান্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে।

তারপর সত্যি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। ১০ মার্চ রাতে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধির কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে একটি ফিনিশ প্রতিনিধি দল মস্কো গিয়েছে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাইটী, প্যাসিকিভি, জেনারেল ওয়ালডেন ও ভোয়োনা। ক্রেমলিনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। সকলেই আশা করেছিলেন যে, এবার বোধ হয় সোভিয়েতদের দাবি একটু নরম হবে। তারা তাদের আগের দাবি মেনে নিতে পীড়াপীড়ি করবে না। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা শুনে সারা পৃথিবী বিস্মিত হয়। চুক্তিতে ফিনল্যান্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়।

www.pathagar.com

চুক্তিতে বলা হয়, ফিনল্যান্ডকে কারেলিয়ান যোজক ছেড়ে দিতে হবে এবং ম্যানারহিম লাইন ও ভিপুরিও সোভিয়েতদের করায়ত্ত হবে। লাডোগা হ্রদের সমগ্র উপকূল, সাল্লার নিকটবর্তী খানিকটা জায়গা এবং রাইবাচী উপদ্বীপের অংশবিশেষ সোভিয়েতদের ছেড়ে দিতে হবে। হ্যাঙ্গো দ্বীপ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ৩০ বছরের জন্য ইজারা দিতে হবে। কার্যতঃ ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা বলতে কিছু রইলো না। যে স্বাধীনতার জন্য তারা ১০৪ বছর লড়াই করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। সন্ধি শর্তের বিরুদ্ধে ফিনিশ পার্লামেন্টে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। কিন্তু এ বিরোধিতার কোনো মূল্য ছিল না। ১৩ মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়, ফিনল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো।

জারের আমল থেকেই ফিনল্যান্ড স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল। কিন্তু বলশেভিকদের অত্যাচারে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গুস্টাভ ম্যানারহিমের অধিনায়কত্বে ফিনরা সাফল্য লাভ করে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৯২০ সালে ডোরপাটের সন্ধিপত্রে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেয়। স্বয়ং লেনিন ১৯১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানান।

ডোরপাট সন্ধির পর উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক কয়েক বছর নিরূপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ ছিল। এজন্য উভয়ে ১৯৩২ সালের ২১ জানুয়ারী অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৩৩ সালের ২৪ মে তৎকালীন জাতিপুঞ্জ আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ঐ বছরই এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডকে আক্রমণের এ নতুন ব্যাখ্যা মেনে নিতে অনুরোধ করে। ফিনল্যান্ড এ নতুন ব্যাখ্যা মেনে নেয়। স্থির হয় যে, নতুন ব্যাখ্যা অনুযায়ী এসব কার্যকলাপ আক্রমণাত্মক বলে গণ্য হবে। (১) অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। (২) যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে সশস্ত্র আক্রমণ। (৩) অন্য রাষ্ট্রের এলাকা, জাহাজ ও বিমানের উপর স্থল, নৌ ও বিমান হামলা। (৪) অন্য রাষ্ট্রের বন্দর বা উপকূলের বিরুদ্ধে নৌ- অবরোধ। (৫) অন্য রাষ্ট্রের এলাকায় আক্রমণে উদ্যত নিজ এলাকার সশস্ত্র দস্যুদলকে প্রশ্রয় দান বা আক্রান্ত রাষ্ট্রের অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ সশস্ত্র দলকে নিরস্ত করার যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

ফিনল্যান্ড সন্ধির সকল শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এমনকি ১৯৩৭ সালে নিজে অগ্রনী হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন রক্ষার চেষ্টা করতে চেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিযোগ করে যে, ফিনল্যান্ড জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে ক্রেমলিনের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অভিযোগ করায় তদানীন্তন ফিনিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, হোলস্টি স্বয়ং মস্কোতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, লিটভিনভকে জানান যে, এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে তিনি ব্যাপারটি ভুলে যেতে অনুরোধ করেন। মস্কো তার অনুরোধে নিরুত্তর থাকে। এ নীরবতা অর্থহীন ছিল না। ফিনল্যান্ডে হামলা করার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তখন কোনো জবাব দেয়নি।

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে ইতালী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীর যোগদান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতালীর একনায়ক সিনর মুসোলিনী নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে সামরিক আঁতাত গঠন করলে জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যরা মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। ইতালীর যোগদানের আগে বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ছিলেন মূলত নিঃসঙ্গ। ইতালী ও জার্মানীর সামরিক ঐক্যের পিছনে একদিকে ছিলেন হিটলার এবং অন্যদিকে ছিলেন মুসোলিনী। এ দু'টি নাম একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাদের দু'জনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শ ছিল একই। উভয়ের জীবনে ছিল অদ্ভূত মিল। দু'জনে সামান্য অবস্থা থেকে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হন। সেনাবাহিনীর কর্পোরাল ছিলেন দু'জনই।

১৮৮৩ সালে ইতালীর ফেরিলিতে মুসোলিনী জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল শিক্ষক হিসেবে অল্প কিছুদিন কাজ করার পর সামরিক বাহিনীতে ভর্তি এড়াতে ১৯০২ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। ১৯০৪ সালে তিনি ইতালীতে ফিরে আসেন এবং পরবর্তী ১০ বছর তিনি সাংবাদিকতা করেন। একসময় তিনি এ্যাভান্তির নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হন। সোসালিস্ট মুভমেন্টে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেন। কিন্তু ইতালীয় সরকার ত্রিপক্ষীয় আঁতাতকে (১৮৮২ সালে ইতালী, জার্মানী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় আঁতাত) সমর্থন দানে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ডানপন্থী হয়ে যান। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর প্রতি ইতালীর সমর্থনের প্রতিবাদে ১৯১৫ সালে তিনি সোসালিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি একজন সৈনিক হিসেবে ইতালীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন এবং কর্পোরাল পদে উন্নীত হন। যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে মিলানে ফিরে আসেন। বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দলের সমন্বয়ে তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২২ সালে রাজা তৃতীয় ইমান্যুয়েল ইতালীতে কমিউনিস্টদের অভ্যুত্থান রোধে তাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ফ্যাসিস্ট ও জাতীয়তাবাদী একটি কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুসোলিনী দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজের অবস্থান মজবুত করে তোলেন। ১৯২৪ সালে গিয়াকমো মিত্তিওতির হত্যাকাণ্ড নাগাদ সংসদীয় পদ্ধতির জোট ক্ষমতায় ছিল। মুসোলিনী বামপন্থী দলগুলোর উপর পীড়ন চালাতে থাকেন এবং ১৯২৯ সালে ইতালীতে একদলীয় ফ্যাসিস্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে জার্মানী ও ইতালী একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। শিগগির দু'টি দেশ একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক চুক্তি (দ্য প্যাক্ট অব স্টীল) সম্পাদন করে। ১৯৪১ সালে ইতালী পুরোপুরি জার্মানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মুসোলিনী যে

www.pathagar.com

নীতিতে দেশ পরিচালনা করছিলেন তাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গালিজো সিয়ানো কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি মুসোলিনীর সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

১৯৪০ সালের ১০ জুন বিকেলে বিপুলসংখ্যক লোক রোমে পরলোকগত পোপ দ্বিতীয় পলের জন্য নির্মিত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ প্যালাজো দ্য ভেনিজিয়ার সামনে এসে সমবেত হয়। বেনিতো মুসোলিনী তাদের সামনে এসে হাজির হওয়া মাত্র তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠে। জনকোলাহলের মধ্যে মুসোলিনী ঘোষণা করলেন যে, ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করবে। লোকজন আবার গগণভেদী চিৎকার দিয়ে মুসোলিনীর প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে।

ইটালীর একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১০ মাস পর্যন্ত ইতালী নিরপেক্ষ থাকলেও সে এসময়ে জার্মানীর প্রতি তার অনুরুক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনে কার্পণ্য করেনি। ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণার আশংকায় ফ্রান্স ও বৃটেন ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকা ও নিকটপ্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েনে বাধ্য হয়। তাই ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণায় কেউ বিস্মিত হয়নি। ইতালীর জঙ্গীবিমানের সংখ্যা ছিল ৪ থেকে ৬ হাজার, আরো ছিল ৭ লাখ ১৭ হাজার টনের রণতরী এবং সৈন্যসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০ লাখ। পক্ষান্তরে, মিসরের সুয়েজ খাল ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্র রক্ষায় এ অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ হাজার। বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভূমধ্যসাগর, সুয়েজখাল, আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকূল পর্যন্ত রণাঙ্গনের পরিধি বিস্তৃত হয়। ২১ জুন যেদিন জার্মান

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ ফরাসী প্রতিনিধি দলের কাছে যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী অর্পণ করে ঠিক সেদিন ইতালীয় সৈন্যরা ফ্রান্সের আল্পস সীমান্তে আঘাত হানে। উপায়ান্তর না দেখে ফরাসী জেনারেল হান্টিজার ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। ইতালীয় সৈন্যরা ফরাসী ভূখণ্ডের ভেতর মাত্র দু'মাইল অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ইতালীয়রা বৃটিশ অধিকৃত মাল্টায় বিমান আক্রমণ চালায়। বিমান আক্রমণে ইতালীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বৃটেনের চেয়ে বেশী। মাল্টা আক্রান্ত হওয়ায় বৃটেন ভূমধ্যসাগরে সতর্কতা ও টহলদারির মাত্রা বৃদ্ধি করে। ভারত থেকে পাশ্চাত্যগামী জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরীয় গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে যাতায়াত শুরু করে। ৯ জুলাই ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ কমান্ডার-ইন-চীফ এডমিরাল স্যার এন্ড্রু কানিংহামের নেতৃত্বে বৃটিশ নৌ-বহরের সঙ্গে ইতালীয় নৌ-বহরের সংঘর্ষ হয়। ইতালীয় নৌ-বহরে ছিল দু'টি রণতরী, বেশ কয়েকটি ক্রুজার ও ২৫টি ডেস্ট্রয়ার। ভোরে উভয়পক্ষের লড়াই শুরু হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ইতালীয়রা ধুম্রজালের সৃষ্টি করে সরে পড়ে। বৃটিশ নৌ-বহর তাদের ইতালীয় উপকূল পর্যন্ত ধাওয়া করে। ১০ দিন পর আবার ইতালীয় নৌ-বহরের সঙ্গে বৃটিশ নৌ-বহরের সংঘর্ষ হয়। অন্যদিকে, অস্ট্রেলীয় যুদ্ধজাহাজ 'সিডনী' আরো কয়েকটি ডেস্ট্রয়ারের সহায়তায় ক্রীট দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে দু'টি ইতালীয় ক্রুজারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ গতিপথ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃটিশ জাহাজগুলো তাদের উপর চড়াও হয়। সিডনীর অব্যর্থ গোলাবর্ষণে ৬ ইঞ্চি কামানবিশিষ্ট ইতালীয় ক্রুজার 'বার্টোলোমিও কলিওলি' জখম হওয়ায় সেটি গতি হ্রাসে বাধ্য হয়। এসময় বৃটিশ জাহাজগুলো হামলা করে এই ইতালীয় ক্রুজারকে ধ্বংস করে দেয়। দ্বিতীয় ক্রুজারটির উপরও গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু সেটি দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ায় রক্ষা পায়। বার্টোলোমিও কলিওলি নিমজ্জিত হলে বৃটিশ জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে ৫৪৫ জন ইতালীয় নৌ-সেনাকে উদ্ধার করা হয়।

ইতালী যেদিন যুদ্ধ ঘোষণা করে তার পরদিন বৃটিশ বোমারু বিমানগুলো ইতালীর অধিকৃত আসমারা (বর্তমানে ইরিত্রিয়ার রাজধানী) বিমানঘাঁটি ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী মাসোয়া বন্দরের উপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে। ঐ দিন রাতে লিবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি তাব্রুকের উপরও বোমাবর্ষণ করা হয়। আবিসিনিয়া-কেনিয়া সীমান্তের কাছে ক্ষুদ্র শহর ময়েলও আক্রান্ত হয়। এসব হামলায় দক্ষিণ আফ্রিকার বোমারু বিমানগুলো সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। লিবিয়া সীমান্তে ইঙ্গ-ইতালীয় সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ১৭ জুন দক্ষিণ সোল্লামে উভয়পক্ষের লড়াইকালে ১২টি ট্যাংক ও ৭টি কামান বৃটিশদের হস্তগত এবং ৬ শ' ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটিশ সোমালিল্যান্ড রক্ষার ভার ছিল মূলতঃ ফরাসীদের উপর। কিন্তু ফরাসীরা অস্ত্র সংবরণ করায় বৃটিশ সোমালিল্যান্ড রক্ষায় নতুন কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ইতালীয়রা সোমালিল্যান্ড দখল

www.pathagar.com

করে নেয়। আবিসিনিয়া-কেনিয়া সীমান্তের কাছে ময়েলও ইতালীয়রা অধিকার করে নেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশ বাহিনী মিসর সীমান্ত অতিক্রম করে লিবিয়ায় প্রবেশ করে এবং সাড়ে তিন হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে নেয়। পরে একসময় বৃটিশ বাহিনীকে কিছুটা পিছু হটতে হয়। ইতালীয়রা মিসরে প্রবেশ করে সীমান্তের অদূরবর্তী সিরি বারানী দখল করে। এশিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ইতালীয়রা এডেনের উপর আক্রমণ করে এবং তারা বাহ্‌রাইনের উপরও বোমাবর্ষণ করে।

ইয়াল্টা সম্মেলনে (বাঁ দিক থেকে) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ও সোভিয়েত নেতা স্টালিন

ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া ছিল আগে থেকেই ইতালীর দখলে। পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়া বা বর্তমান ইথিওপিয়া দখলে ইতালীয়দের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়। বেনিতো মুসোলিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইথিওপিয়া দখলের মাধ্যমে তার সরকারের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে তিনি জেনারেল পিয়েত্রো বাদোগলিওকে ইথিওপিয়া দখলের জন্য প্রেরণ করেন। তৎকালীন জাতিপুঞ্জ ইতালীয় আগ্রাসনের নিন্দা জানায় এবং নভেম্বরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইতালী থেকে যেসব দেশ অস্ত্র, রাবার ও অন্যান্য ধাতু ক্রয় করছিল সেসব দেশের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চেষ্টা করা হয়। কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ফরাসী ও বৃটিশ রাজনীতিক ইতালীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এ নিষেধাজ্ঞায় রুষ্ট মুসোলিনী এডলফ হিটলারের সঙ্গে সামরিক আঁতাত গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

৪ লাখ ইতালীয় সৈন্য ইথিওপিয়ায় লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। আধুনিক বিমান বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ট্যাংক সজ্জিত ইতালীয় বাহিনীর সঙ্গে হাল্কা ও সেকেলে অস্ত্রে

www.pathagar.com

সজ্জিত ইথিওপীয় বাহিনীর কোনো তুলনাই হতো না। ইতালীয়রা স্থানীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করে এবং ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবা দখল করে নেয়। ১৯৩৬ সালের মে মাসে ইতালীয়রা ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসিকে বৃটেনে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

১৯৩৯ সালে ইতালী আলবেনিয়ায় আগ্রাসন চালায়। ১৯৪০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মার্শাল রোডলফো গ্রাজিয়ানির নেতৃত্বে ৫টি ইতালীয় ডিভিশন মিসরে প্রবেশ করে। কিন্তু মারসা ক্রুতে মূল বৃটিশ প্রতিরক্ষা লাইনে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হয়। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে মুসোলিনী গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে গ্রীস দখলে ইতালীয় সৈন্যদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকায় ইতালীয়দের বিপর্যয় ঘটে। জেনারেল আর্চিবল্ড ওয়াভেল (পরবর্তীতে ভারতের ভাইসরয়) ১৯৪০ সালের ৯ ডিসেম্বর বৃটিশ সৈন্যদের ইতালীয়দের উপর পাল্টা হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইতালীয়দের বিপুল প্রাণহানি ঘটে এবং তাদেরকে ৫শ' মাইল পিছনে হটিয়ে দেয়া হয়। পরে বৃটিশ সৈন্যরা ভূমধ্যসাগরের উপকূল বরাবর এগিয়ে যেতে থাকে এবং ১৯৪১ সালের ২২ জানুয়ারী তারা ইতালীয়দের লিবিয়ার তব্রুক থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় এক শীর্ষ সম্মেলনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট কৌশলে ইতালীকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত রাখার উপায় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ লক্ষ্য হাসিলে ইতালীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলিতে সামরিক অভিযান চালানো হবে। সিসিলিতে অভিযানের পক্ষে যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়, এ দ্বীপ দখল করে নেয়া হলে মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হবেন। আরো উল্লেখ করা হয়, সিসিলিতে অভিযান সফল হলে হিটলার ইস্টার্ন ফ্রন্ট থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হবেন। তখন রুশ রেড আর্মির উপর চাপ হ্রাস পাবে। সিসিলি অপারেশনের সার্বিক কমান্ড ন্যস্ত করা হয় জেনারেল ডুয়িট আইসেনহাওয়ারের উপর। জেনারেল হ্যারল্ড আলেক্সান্ডার স্থল অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত হন। জেনারেল আলেক্সান্ডারের নেতৃত্বাধীন পঞ্চদশ আর্মি গ্রুপে ছিল জেনারেল জর্জ প্যাটনের নেতৃত্বাধীন সপ্তম মার্কিন আর্মি এবং জেনারেল বার্নার্ড মন্টগোমারীর নেতৃত্বাধীন অস্টম বৃটিশ আর্মি। নৌ-অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এডমিরাল এন্ড্রু কানিংহামের উপর এবং বিমান বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি পান এয়ার মার্শাল আর্থার টেডর।

১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই বৃটিশ অস্টম আর্মি সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ৫টি পয়েন্টে এবং মার্কিন সপ্তম আর্মি বৃটিশ সৈন্যদের অবস্থানের পশ্চিমে তিনটি বেলাভূমিতে অবতরণ করে। মিত্রবাহিনী সামান্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় এবং জেনারেল প্যাটনের সৈন্যরা দ্রুত গেলা, লিসাতা ও ভিতোরিয়া দখল করে নেয়। বৃটিশদের অবতরণে কোনো বাধা আসেনি। একই দিন মিত্রবাহিনী সিরাকিউস দখল

করে নেয়। ১১ জুলাই পালাজ্জলো, ১৩ জুলাই অগাস্টা এবং ১৫ জুলাই ভিজনির পতন ঘটে। ১৪ জুলাই মার্কিন সৈন্যরা বিসকানি বিমানক্ষেত্র ও নিসছেমিতে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। জেনারেল প্যাটন সিসিলি দ্বীপের পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান। অন্যদিকে জেনারেল ওমর ব্রাডলি এগিয়ে যান উত্তরে। ফলে জার্মান আর্মি সিমেটো নদীর পেছনে হটতে বাধ্য হয়। ২২ জুলাই প্যাটন প্যালারমো দখল করেন এবং দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থানরত ৫০ হাজার ইতালীয় সৈন্যকে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এদিকে, ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিংয়ের নেতৃত্বে জার্মান সৈন্যরা ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীর নেতৃত্বাধীন বৃটিশ অস্টম আর্মির গতিরোধ করে। মিত্রবাহিনী জার্মানদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য বেশ কয়েকটি উভচর হামলা চালায়। কিন্তু তারা ইতালীর মূল ভূখণ্ড মেসিনা উপদ্বীপে জার্মান সৈন্যদের প্রত্যাহারে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। পিছু হটে যাওয়া বাহিনীতে ছিল ৪০ হাজার জার্মান ও ৬০ হাজার ইতালীয় সৈন্য। তাছাড়া এ বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার জার্মান সামরিক যান এবং ৪৭টি ট্যাংক।

সিসিলির পতন মুসোলিনীর জন্য গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। এ দ্বীপের পতনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মিত্রবাহিনী ইতালীর মূল ভূখণ্ডে হামলা চালাতে এটিকে একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে। ২৪ জুলাই ফ্যাসিস্ট গ্রান্ড কাউন্সিলের বৈঠকে গ্যালিজ্জো সিয়ানো মিত্রপক্ষের সঙ্গে একটি পৃথক চুক্তি করার প্রস্তাব উত্থাপন করলে উপস্থিত কাউন্সিলরগণ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরদিন রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনীকে জানান যে, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মুসোলিনীর উত্তরসূরি পিয়াত্রো বাদোগলিও সামরিক আইন জারি করেন এবং মুসোলিনীকে গ্রেফতার করেন।

১৯৪৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জেনারেল মন্টগোমারীর নেতৃত্বে অস্টম বৃটিশ আর্মি রেগিওতে অবতরণ করে। তাদের অবতরণে বাধা আসে সামান্য। একইদিন দিনের শেষভাগে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ থেকে ফার্স্ট প্যারাশূট ডিভিশন অবতরণ করে। ৬ দিন পর ষষ্ঠ মার্কিন কোর সালারনোতে এসে পৌছায়। তাদের উপর জার্মানরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। ২০ সেপ্টেম্বর নাগাদ তারা সৈকতের অগ্রভাগ দখল করতে পারেনি। ইতালীতে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের অবতরণকালে হিটলার মুসোলিনীকে উদ্ধারে অটো স্কোরজেনির নেতৃত্বে একদল ছত্রী কমান্ডো সেনা পাঠান। মুসোলিনী তখন আব্রুজি এ্যাপেনিনেসে বন্দী ছিলেন। মুসোলিনী মুক্ত হন এবং স্কোরজেনী তাকে নিরাপদ স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যান। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাকে জার্মান অধিকৃত উত্তরাঞ্চলীয় ইতালীর গারগাগনোতে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ফ্যাসিস্ট সালো প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইতালীর প্রধানমন্ত্রী পিয়েত্রো বাদোগলিও ও আইসেন-হাওয়ার মাল্টার অদূরে যুদ্ধজাহাজ 'নেলসন'-এ ইতালীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এসময় জার্মান সৈন্যরা দক্ষিণাঞ্চলীয় ইতালীতে ভয়ংকর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে ইতালীর রাজধানী রোমের দিকে মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা মন্থর হয়ে পড়ে। ৩১ অক্টোবর মিত্রবাহিনী নেপলস দখল করে নেয় এবং একই দিন বৃটিশ অষ্টম আর্মি ফোজিয়া বিমানক্ষেত্র কব্জা করে।

www.pathagar.com

জার্মান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে বোদোগলিও এবং ইতালীয় রাজপরিবারের সদস্যরা প্যাসকারায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেখানে মিত্রবাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি অনুগত সরকার গঠন করা হয়। ১৩ অক্টোবর এ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে, জার্মান ফিল্ড মার্শাল আলব্রিখট কেসেলরিং রোমের দক্ষিণে গুস্তাভ লাইনে সৈন্য প্রত্যাহার করেন। ১৫টি জার্মান ডিভিশন এ প্রতিরক্ষা লাইন নিয়ন্ত্রণ করছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে মিত্রবাহিনী এ প্রতিরক্ষা লাইনে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মঠ দখল করতে গিয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সে বছরের জানুয়ারীতে আইসেনহাওয়ার ও ইতালীতে মোতায়েন মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল হ্যারল্ড আলেক্সান্ডার ইতালী উপকূলের পশ্চিমে ক্ষুদ্র বন্দর আনজিওতে উভচর হামলাসহ ক্যাসিনোতে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। জার্মান ১০ম আর্মির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং গুস্তাভ লাইন থেকে তাদের পিছু হটিয়ে দেয়াই ছিল এ অপারেশনের মূল লক্ষ্য। ১৭ জানুয়ারী মন্টি ক্যাসিনোতে হামলা হলে জার্মান রিজার্ভ সৈন্যরা গুস্তাভ লাইনে এগিয়ে আসে। অন্যদিকে, ২২ জানুয়ারী জেনারেল জন লুকাসের নেতৃত্বে মিত্র সৈন্যরা আনজিওতে অবতরণ করে। জেনারেল লুকাস আলবান পাহাড়ে সরাসরি এগিয়ে না যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এতে জার্মান জেনারেল হেইনরিচ ভিয়েতিনগোফ চতুর্দশ আর্মিকে এ এলাকায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন এবং তিনি আনজিও সেতুতে মার্কিন ষষ্ঠ কোরকে আটকে ফেলেন। ১২ ফেব্রুয়ারী 'নিউজিল্যান্ড কোর' ক্লান্ত ও অবসন্ন মার্কিন কোরের স্থলাভিষিক্ত হয়। জেনারেল আলেক্সান্ডার এসব নতুন সৈন্যের সহায়তায় ক্যাসিনো দখলের সিদ্ধান্ত নেন। পদাতিক অপারেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত জেনারেল বার্নার্ড ফ্রেবার্গ ওই মঠের ওপর বোমাবর্ষণের আহ্বান জানান। অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন সৈন্যরা দাবি করছিল যে, প্রাচীন কালের ওই মঠ থেকে কোনো গোলাগুলী আসছিল না। তা সত্ত্বেও জেনারেল আলেক্সান্ডার মঠ গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ১৯৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণে এটি ধ্বংস হয়। এতে কৌশলগতভাবে জার্মান সৈন্যরা লাভবান হয়। তারা মঠের ধ্বংসস্তূপের আড়ালে চমৎকারভাবে অবস্থান নেয়। ১৮ মে ফরাসী কোর কমান্ডার আলফেনসিন জুয়িন ও পোলিশ জেনারেল ভ্লাদিস্লাভ এ্যান্ডার্সের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা মন্টি ক্যাসিনো দখল করে নেয়। মন্টি ক্যাসিনো মিত্রবাহিনীর জন্য একটি করিডোর খুলে দেয় এবং ২৪ মে তারা আনজিওতে পৌঁছে। মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড চাপে জার্মান প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে পড়তে থাকে। জেনারেল হ্যারল্ড আলেক্সান্ডার পশ্চাদপসরণকারী জার্মান ১০ম আর্মিকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করে দিতে জেনারেল মার্ক ক্লার্ককে নির্দেশ দেন। জেনারেল ক্লার্ক এ নির্দেশ অমান্য করেন এবং তিনি রোমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। ৪ জুন তিনি ইতালীর রাজধানী রোম মুক্ত করেন। রোমের পতন হলে পিয়েত্রো বোদোগলিও পদত্যাগ করেন এবং ইনভানো বোনোমি নয়া সরকার গঠন করেন। মুসোলিনীর প্রতি জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলতে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করেন।

www.pathagar.com

মিত্রবাহিনী জার্মান ১০ম আর্মিকে বিতাড়িত করে এবং ১৬ জুন গ্রোসেতো দখল করে নেয়। ১৮ জুন এ্যাসিনি, ২৯ জুন পেরুগিয়া, ১২ আগস্ট ফ্লোরেন্স, ২১ সেপ্টেম্বর রিমিনি ও ১১ অক্টোবর লরেঞ্জো দখল করে নেয়া হয়। এদিকে শীত এসে পড়ে। এসময় অপারেশনে বিরতি দেয়া হয়। শীত বিদায় নেয়ার পর ২৩ এপ্রিল বৃটিশ অস্টম আর্মি মান্তয়ায় পো নদী অতিক্রম করতে থাকে। জার্মান প্রতিরোধ দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। পারমা ভেরোনা দখল করে নেয়া হয়। মিলান ও জেনোয়ায় গণঅভ্যুত্থান ঘটে। মিত্রবাহিনী এগিয়ে আসতে থাকলে মুসোলিনী ও তার রক্ষিতা ক্লারা প্যাত্তাসি সুইজারল্যান্ড পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিল ইতালীয় সৈন্যরা লেক কমোতে তাদের গ্রেফতার করে। পরদিন তাদের গুলী করে হত্যা করা হয় এবং মিলানে তাদের লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ২৯ এপ্রিল জার্মান প্রতিরোধ নিঃশেষ হয়ে আসে। সেদিন ক্যাস্ট্রোয় জার্মান জেনারেল কার্ল উলফ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেন। তার আগে তিনি কয়েকদিন ধরে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। দু'দিন পর ইতালীতে জার্মান বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল হেইনরিচ ভিয়েতিনগোফ আত্মসমর্পণের শর্তে সম্মতি দেন।

www.pathagar.com

ব্যাটল অব আল-আমিন

উত্তর আফ্রিকার মরুময় প্রান্তর আল-আমিনে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে যে দু'জন সেনানায়ক নেতৃত্ব দেন তাদের একজন হলেন বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী এবং আরেকজন হলেন জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল। বর্তমান মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ১৫০ মাইল পশ্চিমে আল-আমিন রণাঙ্গনে ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক প্রথমে বৃটিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। পরে ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আল-আমিনে মিত্রবাহিনী বিজয়ী হওয়ায় ১৯৪৩ সালের মে মাসে উত্তর আফ্রিকায় জার্মান আফ্রিকা কোর পশ্চাদপসরণ করে এবং জার্মান সৈন্যরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আল-আমিনে সংঘটিত লড়াই 'ব্যাটল অব আল-আমিন' নামেই ইতিহাসে সমধিক পরিচিত।

১৯৪২ সালে মিত্রবাহিনী গোটা ইউরোপে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত 'অপারেশন বারবারোসা'য় দেশটি কোণঠাসা হয়ে যায়। আটলান্টিকের যুদ্ধে জার্মান ইউ-বোট বৃটেনের বিরাট ক্ষতিসাধনে সক্ষম হলে পশ্চিম ইউরোপে কার্যতঃ পুরোপুরি জার্মান আধিপত্য কায়েম হয়। এ কারণে আফ্রিকার মরু রণাঙ্গনে লড়াইয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ফিল্ড মার্শাল রোমেলের নেতৃত্বাধীন আফ্রিকা কোর সুয়েজ খাল দখলে সক্ষম হলে মিত্রবাহিনীর সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতো। সেক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর কাছে সরবরাহ পৌঁছানোর একমাত্র বিকল্প পথ ছিল আফ্রিকা উপকূলীয় উত্তমাশা অন্তরীপ। আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে সরবরাহ পৌঁছানো শুধু ঝুঁকিপূর্ণই হতো না, তা হতো দীর্ঘ সময়সাপেক্ষও। সুয়েজ খাল ও উত্তর আফ্রিকা পতনের ফলাফল হতো গুরুতর। উত্তর আফ্রিকার লড়াইয়ে বিজয়ী হলে জার্মানরা তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশের অবাধ সুবিধা পেয়ে যেতো। আল-আমিন ছিল উত্তর আফ্রিকায় মিত্রবাহিনীর সর্বশেষ ভরসা। এ অখ্যাত শহরের উত্তরে ছিল ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে 'কাটারা ডিপ্রেশন'। মার্শাল রোমেলের রণকৌশল ছিল পেছন থেকে ঝড়ের গতিতে শত্রুর উপর হামলা করে দ্রুত বিজয় লাভ করা। কিন্তু আল-আমিন এত সংকীর্ণ ছিল যে, এখানে তিনি তার এ রণকৌশল কাজে লাগাতে পারেননি। প্রতিপক্ষের সমরনায়ক হয়েও মিত্রবাহিনীতে মার্শাল রোমেল ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। এ সময় মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক। মার্শাল ক্লদ অচিনলেক তার বাহিনীর মধ্যে মোটেও জনপ্রিয় ছিলেন না। নিজের অজনপ্রিয়তাকে দূর করার জন্য তিনি সিনিয়র অফিসারদের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠাতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

১৯৪২ সালের আগস্টে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিল বিজয় লাভে ছিলেন মরিয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন, বৃটিশ জনগণের মনোবল ভেঙে পড়েছে। প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই মর্মে শংকিত হয়ে উঠেন যে, চলমান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে হাউস অব কমন্সে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। স্বচক্ষে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে চার্চিল দীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করে মিসর সফরে যান। তিনি বৃটিশ স্থল বাহিনীর কমান্ড স্ট্রাকচারে পরিবর্তন আনয়নের সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে তিনি জেনারেল হ্যারল্ড আলেক্সান্ডারকে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্থল বাহিনীর কমান্ডার পদে নিযুক্তি দেন। একইভাবে তিনি ফিল্ড মার্শাল অচিনলেককে বরখাস্ত করে বার্নার্ড মন্টগোমারীকে বৃটিশ অষ্টম আর্মির কমান্ডার নিযুক্ত করেন। মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা 'মন্টি'কে শ্রদ্ধা করতো। তিনি ছিলেন শৃগালের মতো ধূর্ত। মার্শাল মন্টগোমারী সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক মনোবলের উপর বেশি জোর দিতেন। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাদের আস্থা পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চালান। তবে সর্বোপরি তিনি জানতেন, যে কোনো উপায়ে তাকে আল-আমিনে বিজয়ী হতে হবে।

১৯৪২ সালের জুলাইয়ে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের নেতৃত্বাধীন ইতালীয়-জার্মান পাঞ্জার আফ্রিকা কোর ছিল মিসরের আলেক্সান্ড্রিয়া থেকে মাত্র ৭০ মাইল দূরে। রোমেল দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেন। তিনি তার আগের যুদ্ধগুলোতেও একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য মন্টগোমারী পূর্বাহ্নে তার পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, ব্লেচলি পার্কে রোমেলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত সৈন্যদের কাছ থেকেও তিনি মূল্যবান সহায়তা পেয়েছিলেন। ব্লেচলি পার্কে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা রোমেলের পরিকল্পনা চুরি করে। ফলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী শুধু রোমেলের পরিকল্পনাই জানতেন তা নয়, তার কাছে কোন্ কোন্ পথে সরবরাহ পাঠানো হবে তাও জানতে পেরেছিলেন। এজন্য রোমেল ১৯৪২ সালের আগস্ট নাগাদ তার প্রয়োজনীয় রসদের মাত্র ৩৩ শতাংশ লাভ করেন। সুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগরে মিত্রবাহিনী নিরংকুশ প্রাধান্য অর্জন করায় ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীর কাছে বিপুল সরবরাহ এসে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে রোমেল তীব্র রসদ ঘাটটিতে ভুগছিলেন। এ কৌশলগত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে রোমেল পূর্ণভাবে সজ্জিত হওয়ার আগেই দ্রুত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে আগস্টের শেষ নাগাদ মন্টগোমারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। অক্টোবর নাগাদ বৃটিশ অষ্টম আর্মির সৈন্য সংখ্যা ১ লাখ ৯৫ হাজারে পৌঁছে। এছাড়া তাদের ট্যাংকের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৫১ এবং কামানের সংখ্যা ১৯শ'। ট্যাংকের মধ্যে ছিল শেরম্যান এম-৪ এবং গ্রান্ট এম-৩। মন্টগোমারী জানতেন, রোমেল তীব্র জ্বালানী ঘাটতিতে ভুগছেন এবং জার্মানরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম নয়।

১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট মার্শাল রোমেল আলম-আল হালফায় হামলা চালান। কিন্তু বৃটিশরা তার হামলা ব্যর্থ করে দেয়। মন্টগোমারী ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে

www.pathagar.com

দুর্ভেদ্য 'কাটারা ডিপ্রেশন' বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন জোরদারে সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে জার্মান হামলার জবাব দিয়েছিলেন। এ নির্দেশ দিয়ে তিনি মিসরের দিকে রোমেলের অগ্রাভিযান অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী ৬ সপ্তাহে মন্টগোমারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল মজুদ গড়ে তোলেন, যাতে আক্রান্ত হলে তার রসদের অভাব না ঘটে। রোমেল যে মুহূর্তে হামলা চালিয়েছিলেন, ঠিক তখন মন্টগোমারী ছিলেন ঘুমন্ত। ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকে হামলার কথা জানানো হলে তিনি উল্লসিত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'ভারি চমৎকার'। এ কথা বলে তিনি আবার ঘুমাতে যান।

মিসরের আল-আমিনে সাঁজোয়া যানে চড়ে জার্মান অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আরউইন রোমেল রণাঙ্গন পরিদর্শন করছেন

মিত্রবাহিনী আল-আমিনের দক্ষিণে আলম আল-হালফায় অগণিত মাইন পুঁতে রেখেছিল। এতে বিপুল জার্মান ট্যাংক মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং বাদবাকিগুলোর অগ্রযাত্রা থেমে যায়। আটকেপড়া জার্মান ট্যাংকগুলো মিত্রবাহিনীর অনবরত হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। রোমেলের আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং মনে হচ্ছিল তার নেতৃত্বাধীন আফ্রিকা কোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে তিনি তার অধীনস্থ ট্যাংক বাহিনীকে উত্তরদিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। এ সময় প্রকৃতি তাকে সহায়তা করে। প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ শিলাবৃষ্টিতে জার্মান ট্যাংকগুলো হামলাকারী বৃটিশ বোমারু বিমানের নজর এড়াতে সক্ষম হয়। শিলাবৃষ্টি থেমে গেলে রোমেলের বাহিনীর উপর আবার বৃটিশ হামলা শুরু হয়। বৃটিশ বোমারু বিমানগুলো জার্মান আফ্রিকা কোরের ট্যাংকের উপর বোমাবর্ষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় রোমেল পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। তখনকার দিনে পিছু হটে যাওয়া সৈন্যদের ধাওয়া করা ছিল প্রতিষ্ঠিত সামরিক রীতি। এজন্য রোমেল নিশ্চিত আশঙ্কা করছিলেন

www.pathagar.com

যে, বৃটিশ অষ্টম আর্মি তাকে পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মন্টগোমারী জার্মান আফ্রিকা কোরকে পিছু ধাওয়া করতে ব্যর্থ হন। তিনি পাল্টা আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি তার অধীনস্থ অষ্টম আর্মিকে থেমে যাবার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে বৃটিশ অষ্টম আর্মি চূড়ান্ত আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। মরুভূমির লড়াইয়ে অতি প্রয়োজনীয় কোনো বস্তুর জন্য মন্টগোমারী অপেক্ষা করছিলেন। যে বস্তুর জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন, সৈন্যরা সাংকেতিক ভাষায় সেগুলোকে 'সোয়ালো' বলে উল্লেখ করতো। আসলে বস্তুগুলো ছিল শেরম্যান ট্যাংক। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় অতিরিক্ত ৩শ' শেরম্যান ট্যাংক পাঠানো হয়। শেরম্যান ট্যাংকের ৭৫ মিলিমিটার ব্যাসের কামান থেকে ৬ পাউন্ড ওজনের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি গোলা ২ হাজার মিটার দূর থেকে জার্মান ট্যাংক ঘায়েল করতে পারতো। এজন্য এসব ট্যাংক মন্টগোমারীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীর বিপরীতে জার্মান পক্ষে ছিল ৫শ' ট্যাংক ও ১ লাখ ১০ হাজার সৈন্য। জার্মান ট্যাংকগুলোর অধিকাংশই ছিল ইতালীর তৈরি নিম্নমানের ট্যাংক। নয়া শেরম্যান ট্যাংকের সঙ্গে এসব ট্যাংকের কোনো তুলনাই হতো না। জার্মানদের জ্বালানি ঘাটতিও ছিল। মিত্রবাহিনীতে সৈন্য ছিল ২ লক্ষাধিক এবং ট্যাংক ছিল সহস্রাধিক। এছাড়া তারা ৬ পাউন্ডার আর্টিলারিতেও সজ্জিত ছিল। এসব আর্টিলারি বা কামান ১৫শ' মিটার দূর থেকে কার্যকরভাবে গোলাবর্ষণ করতে পারতো। দু'টি সেনাবাহিনীর মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম ছিল 'ডেভিল গার্ডেন'। ৫ মাইল প্রশস্ত ডেবিল গার্ডেন মূলত ছিল একটি মাইন ক্ষেত্র। এখানে জার্মানরা বিপুলসংখ্যক ট্যাংক ও মানববিধ্বংসী মাইন পুঁতে রেখেছিল। এ ধরনের দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ অতিক্রম করা ছিল মিত্রবাহিনীর জন্য একটি দুঃস্বপ্ন।

রোমেলকে ধোঁকা দিয়ে তাকে তার শক্ত অবস্থান থেকে হটিয়ে দিতে মন্টগোমারী 'অপারেশন বারট্রাম' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বৃটিশ অষ্টম আর্মি দক্ষিণে তাদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করবে—তাকে এটা বুঝানোর জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নকল ট্যাংক মোতায়েন করা হয়। আস্তে আস্তে একটি নকল পাইপ লাইনও তৈরি করা হতে থাকে যাতে রোমেল মনে করেন যে, আফ্রিকা কোরের উপর হামলা চালাতে বৃটিশদের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। রোমেলকে বিভ্রান্ত করার জন্য আরো পরিকল্পনা করা হয় যে, মন্টির অষ্টম আর্মি উত্তর দিক থেকে 'অদৃশ্য' হয়ে যাবে। বেসামরিক লরির মতো করে দেখানোর জন্য ট্যাংকগুলোকে আবরণে ঢেকে দেয়া হয়। অপারেশন বারট্রাম ফল দিতে শুরু করে। রোমেল বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, দক্ষিণ থেকেই তার উপর হামলা হবে। সত্যিকার হামলা শুরু হলে মন্টগোমারী অষ্টম আর্মির সকল সৈন্যদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, 'অপারেশন লাইটফুট' ছদ্মনামে রোমেলের বাহিনীর উপর মিত্রবাহিনীর হামলা শুরু হবে। হামলার এ ধরনের ছদ্মনাম দেয়ার কারণও ছিল। লাইট বা হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক (ফুট সোলজার্স) সৈন্যদের এ অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে তার নামকরণ করা হয় 'অপারেশন লাইট ফুট'। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দক্ষিণ দিক

www.pathagar.com

থেকে ডিভিশন আকারের একটি হামলা চালিয়ে রোমেলের সৈন্যদের ৫০ শতাংশকে ব্যস্ত রাখতে হবে। তবে মূল হামলা চালানো হবে উত্তর দিক থেকে। এখানে হামলার স্থায়িত্ব হবে মাত্র এক রাত। হামলার সূচনা করবে পদাতিক বাহিনী। ট্যাংকবিধ্বংসী মাইনক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পদাতিক সৈন্যদের দৌড়ে যেতে হবে। পদাতিক হামলা শুরু হলে প্রকৌশল রেজিমেন্ট পিছনের ট্যাংকগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি পথ মাইনমুক্ত করবে। কেবলমাত্র একটি ট্যাংক অতিক্রমে যতটুকু জায়গার প্রয়োজন ততটুকু পথ মাইনমুক্ত করতে হবে। যার প্রস্থ হবে ২৪ ফুট। প্রকৌশল বাহিনীকে ডেভিল গার্ডেনে ৫ মাইল ব্যাসার্ধের একটি জায়গাও পরিষ্কার করতে হবে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মন্টি তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আরেকটি বার্তা প্রচার করেন। আফ্রিকা রণাঙ্গণে জার্মানদের উপর হামলাকালে ফিল্ড মার্শাল আরউইন রোমেল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছুটি নিয়ে অস্ট্রিয়া চলে যান। জেনারেল জর্জ স্টিউমকে রোমেলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। জার্মান প্রতিরক্ষা লাইনে একসঙ্গে ৯শ' কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জেনারেল স্টিউম মারা যান। পরে জেনারেল রিটার ভন থমা স্টিউমের স্থলাভিষিক্ত হন। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠায় হিটলার অবিলম্বে রোমেলকে মিসর ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। রোমেল ফিরে এসে ২৭ অক্টোবর কিডনি ডিপ্রেশন নামে একটি জায়গায় বৃটিশদের উপর পাল্টা হামলা চালান। এমন কথাও শোনা গেছে যে, মিত্রবাহিনীর কামানের গর্জন এত ভয়ংকর ছিল যে, সৈন্যদের কানে তালা লেগে যায়। জার্মান প্রতিরক্ষা লাইনে গোলাবর্ষণ শুরু হলে পদাতিক হামলা শুরু হয়। প্রকৌশল ডিভিশনের সৈন্যরা মাইন পরিষ্কারে নেমে যায়। মাইন নিষ্ক্রিয়করণের কাজটি ছিল এত ঝুঁকিপূর্ণ যে, তারের সাহায্যে একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় একটি মাইন বিস্ফোরিত হলে অসংখ্য মাইন বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল। ট্যাংক চলাচলের জন্য যে সংকীর্ণ করিডোর পরিষ্কার করা হয়, তা মন্টগোমারীর জন্য উভয় সংকট হয়ে দেখা দেয়। একটি অচল ট্যাংক পুরো ট্যাংক বহরের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়ার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভাব্য যানযট বৃটিশ ট্যাংকগুলোকে জার্মান গানারদের ৮৮ মিলিমিটার ব্যাসের কামানের গোলা ছুঁড়ে ঘায়েল করে দেয়ার সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এক রাতে সবগুলো ট্যাংক পার করিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় রাতের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার জন্য মন্টি ট্যাংক ডিভিশনের চীফ লাম্বসডেনকে দোষারোপ করেন। তাকে এগিয়ে যাবার চরম পত্র দেয়া হয়। বলা হয় যে, ব্যর্থ হলে সাহসী অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হবে। মিত্রবাহিনীর বিপুল সৈন্য হতাহত হতে থাকায় অপারেশন লাইটফুট স্থগিত করা হয়। কমান্ডার লাম্পসডেন নয় স্বয়ং মন্টগোমারী বৃটিশ ট্যাংক প্রত্যাহারে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল বিশ্বাস করতেন যে, মন্টগোমারী বিজয় লাভ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তা না শুনে তিনি বিপর্যের সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হন। তিনি মন্টগোমারীকে ভীরু বলেও আখ্যায়িত করেন। মন্টগোমারী তার বিরুদ্ধে সকল সমালোচনা অগ্রাহ্য করেন এবং 'অপারেশন সুপারচার্জ' নামে একটি নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মন্টগোমারী প্রণীত অপারেশন লাইটফুট পরিত্যক্ত হলেও এতে রোমেল ও তার আফ্রিকা কোরের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি। মিত্রবাহিনীর ৯শ'র অধিক ট্যাংকের বিপরীতে তার হাতে তখন ছিল মাত্র ৩শ' ট্যাংক। আল-আমিনে বিপর্যয়ের পর মন্টি

www.pathagar.com

ভূমধ্যসাগরের দিকে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। এ সময় অস্ট্রেলীয় ইউনিট জার্মানদের উপর ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে হামলা করে। অস্ট্রেলীয়দের হামলা মোকাবিলায় রোমেলকে তার ট্যাংকগুলোকে উত্তর দিকে সরিয়ে নিতে হয়। অস্ট্রেলীয়দের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও তারা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। রোমেল বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি এলাকায় মন্টগোমারীর পক্ষ থেকে মূল আঘাত আসবে। এ আশংকা থেকে তিনি তার আফ্রিকা কোরের একটি বিরাট অংশ সেখানে স্থানান্তর করেন। অস্ট্রেলীয়রা ভয়াবহ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

আল-আমিনে ট্যাংকে চড়ে রণাঙ্গন পরিদর্শন করছেন ব্রিটিশ অষ্টম আর্মির অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী

বিপুল প্রাণহানি ঘটায় রোমেল তার এক মন্তব্যে এ অঞ্চলকে 'রক্তের নদী' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এদিকে, অস্ট্রেলীয়রা মন্টগোমারীকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। তিনি 'অপারেশন সুপারচার্জ' বাস্তবায়নে হাত দেন। এটা ছিল বৃটিশ ও নিউজিল্যান্ডের পদাতিক সৈন্যদের একটি যৌথ অভিযান। অস্ট্রেলীয় নবম ডিভিশনের সৈন্যরা হামলার সূচনা করলে রোমেল বিস্মিত হন। নবম সাঁজোয়া ব্রিগেডের ১২৩টি ট্যাংক জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহে হামলা করে। আবারো আরেকটি শিলাবৃষ্টি রোমেলকে রক্ষা করে। জার্মান গোলন্দাজদের ৮৮ মিলিমিটার কামানের গোলাবর্ষণে নবম ব্রিগেডের ৭৫ শতাংশ ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। মিত্রবাহিনীর ট্যাংকের সংখ্যা ছিল অগণিত। তাই জার্মানদের মনে এমন একটা ধারণা কাজ করছিল যে, গুটিকয়েক এসব বৃটিশ ট্যাংক লড়াই অব্যাহত রেখেছে মাত্র। তাদের সাহায্যে আরো ট্যাংক আসবে। এ ধারণা থেকে রোমেল ট্যাংকের বিরুদ্ধে ট্যাংক মোতায়েন করেন। কিন্তু তার জনবল ছিল খুবই কম। ১৯৪২ সালের ১ নভেম্বর মন্টগোমারী কিডনি রীজে আফ্রিকা কোরের উপর আঘাত

www.pathagar.com

হানেন। প্রাথমিকভাবে এ হামলা মোকাবিলা করে রোমেল স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রতিরক্ষা লাইন বজায় রাখার মতো রসদ তার নেই। এডলফ হিটলার শেষ সৈন্যটি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু রোমেল এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান। ঘেরাও হয়ে যাবার ভয়ে তিনি ৪ নভেম্বর পিছু হটতে থাকেন। ইতালীয় সৈন্যসহ প্রচুর পদাতিক সৈন্য দ্রুত পালাতে অক্ষম হওয়ায় বন্দী হয়। ক্ষণিকের জন্য মনে হচ্ছিল যেন বৃটিশরা রোমেলের বাহিনীকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু ৬ নভেম্বর আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে মরুভূমিতে চোরাবালি তৈরি হয়। পিছু ধাবমান বৃটিশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা মন্থর হয়ে যায়। ফলে রোমেল মাত্র ২০টি ট্যাংক নিয়ে মিসর-লিবিয়া সীমান্তের সলুমে পৌঁছতে সক্ষম হন। ৮ নভেম্বর আরউইন রোমেল মার্কিন জেনারেল ডুয়িট ডি আইসেন- হাওয়ারের নেতৃত্বে মরক্কো ও আলজেরিয়ায় মিত্রবাহিনীর আক্রমণের কথা শুনতে পান। এতে তার বিধ্বস্ত বাহিনীকে দু'টি ফ্রন্টে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। ১২ নভেম্বর বৃটিশ সেনাবাহিনী তাবরুক পুনরুদ্ধার করে। আল-আমিন অভিযানে রোমেলের ১ লাখ সৈন্যের অর্ধেক নিহত, আহত অথবা বন্দী হয়। তিনি ৪৫০টি ট্যাংক ও ১ হাজার কামান হারান। অন্যদিকে, বৃটিশ অষ্টম আর্মির সাড়ে ১৩ হাজার সৈন্য হতাহত ও ৫শ' ট্যাংক ধ্বংস হয়। তার মধ্যে সাড়ে তিন শ' ট্যাংক মেরামতের পর লড়াইয়ে নিয়োজিত করা হয়। উইন্সটন চার্চিল বিশ্বাস করছিলেন যে, আল-আমিনের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এ বিশ্বাস থেকে তিনি গোটা বৃটেনের সকল গীর্জায় ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দেন। আল-আমিনের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব কতটুকু ছিল চার্চিলের একটি উক্তিই তার প্রমাণ। তিনি একসময় মন্তব্য করেছিলেন, আল-আমিনের আগে আমরা কোথাও বিজয়ী হইনি এবং আল-আমিনের পর আমরা কোথাও পরাজিতও হইনি।

জার্মানীর অবিসংবাদিত সামরিক প্রতিভা ফিল্ড মার্শাল আরউইন রোমেল ও তার মহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সামরিক ব্যক্তিত্ব ফিল্ড মার্শাল বার্নার্ড মন্টগোমারী জড়িত না হলে মিসরের অখ্যাত আল-আমিন ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করতো কিনা সন্দেহ। দু'জনের লড়াই ছিল শেয়ানে শেয়ানে। এ লড়াইয়ে দেশ হিসেবে জার্মানীর পরাজয় ঘটলেও সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে রোমেলের পরাজয় ঘটেনি। তিনি শত্রুপক্ষের বিপুলসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে 'ডেজার্ট ফক্স' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৃটিশ কমান্ডার মন্টগোমারীও কম যাননি। শত্রু জার্মানরাও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। রোমেলের অনুপস্থিতিতে আল-আমিনে আফ্রিকা কোরের নেতৃত্বদানকারী জার্মান সেনানায়ক উইলহেম ভন থমা বাসিল লিডেল হার্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। লিডেল হার্ট তার 'পাহাড়ের অপর পিঠ' নামে একটি পুস্তক রচনায় ভন থমার এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। জেনারেল উইলহেম ভন থমা যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি মনে করি তার (মন্টগোমারী) শক্তির বিশাল শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনায় তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। তবে তিনিই হলেন একমাত্র ফিল্ড মার্শাল যিনি সকল লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আধুনিক যুদ্ধে কৌশল মূল বিষয়বস্তু নয়। যুদ্ধের গতি বজায় রাখতে নিজের সম্পদকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানোই হচ্ছে বিজয়ের চূড়ান্ত উপাদান।'

www.pathagar.com

চুয়াল্লিশ দিনে জার্মানীর ফ্রান্স দখল

আজকে যে ফ্রান্সকে আমরা একটি বিশ্ব শক্তি হিসেবে জানি, সে দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা মাত্র ৪৪ দিনে দখল করে নিয়েছিল। ফ্রান্স তার পূর্ব সীমান্তে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণ করে নিশ্চিন্ত ছিল। ম্যাজিনো প্রতিরক্ষা লাইন ছিল তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা লাইন। ফরাসীরা মনে করতো জার্মানরা কখনো ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে ফ্রান্স দখলে সফল হবে না। অথচ এ অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল। জার্মানীর দুর্ধর্ষ পাঞ্জার ডিভিশন ম্যাজিনো লাইন পাশ কাটিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে পৌছে। ফলে গোটা ফ্রান্সের পতন ঘটে। পরে মিত্রবাহিনী ফ্রান্স মুক্ত করে। এগুলো আজ সবই ইতিহাস।

ফ্রান্সের পতনে জার্মানদের সামরিক কৃতিত্ব যতটুকু, ফরাসী বিশ্বাসঘাতকদের ভূমিকা তার চেয়ে মোটেও কম ছিল না। এসব বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সরকারের ভেতর লুকিয়ে ছিল। তারা ছিল জার্মানীর ভাড়াটে এজেন্ট। এসব এজেন্ট ফরাসী সেনাবাহিনীকে এমনভাবে পরিচালনা করেছিল, যাতে জার্মানদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটে। ১৯৪০ সালের ১০ মে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে মূল হামলায় জার্মানরা যেখানে ব্যবহার করেছিল ১০৭ ডিভিশন পদাতিক ও ১০ ডিভিশন ট্যাংক, সেখানে মিত্রবাহিনী ব্যবহার করেছিল মাত্র ৬৩ ডিভিশন পদাতিক, ৪টি হাল্কা যান্ত্রিক ও ৬টি ক্যাভালরি ডিভিশন। ফরাসী, বৃটিশ, বেলজীয় ও ওলন্দাজ—এ চারটি পৃথক সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত হয়েছিল মিত্রবাহিনী। এসব বাহিনী একটি একক কমান্ডের আওতায় না থাকাও ছিল ফ্রান্সের পতনের আরেকটি কারণ। ৪টি দেশের সৈন্যদের মধ্যে ছিল গভীর রাজনৈতিক মতভেদ। তাছাড়া সামরিক অপারেশন ও কৌশল প্রণয়নেও ছিল তাদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ফ্রান্সকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, ফ্রান্স আক্রান্ত হলে বৃটিশ রাজকীয় বোমারু বিমানগুলো এ হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে। পুরোপুরি যুদ্ধ বেধে গেলে ফরাসী হাই কমান্ডের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বৃটিশ বোমারু বিমানের সকল স্কোয়াড্রন ব্যবহার করা হবে। শুধু ফ্রান্সে মোতায়েন স্বল্পপাল্লার এ্যাডভান্সড এয়ার স্ট্রাইকিং ফোর্সের বোমারু নয়, ইংল্যান্ডে মোতায়েন দূরপাল্লার বোমারু বিমান ব্যবহারের আশ্বাসও দেয়া হয়। তবে ফ্রান্সকে এ আশ্বাস দেয়া হলেও বৃটিশরা জানতো যে, ফরাসীদের তুলনায় জার্মানদের যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা অনেক বেশি। মূল রণাঙ্গন থেকে বৃটিশ ঘাঁটিগুলো ছিল বহুদূরে। রাইন নদীর পূর্বতীরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে বৃটিশ

www.pathagar.com

রাজকীয় বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করে। তবে এসব বোমাবর্ষণ নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ফরাসীরা তখনো আশা করতো বৃটিশরা জার্মান প্রতিরক্ষা লাইনের পেছনে রেলওয়েতে বোমাবর্ষণ করবে।

নরওয়ে অভিযানে বিপর্যয় দেখা দেয়ায় স্যার নেভিল চেম্বারলিনের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সরকার ছিল সংকটে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ক্রমওয়েলের বিরুদ্ধে বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে পার্লামেন্ট সদস্য লিওপোল্ড আমরে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিপ্লবের হুমকি দেন। তার মতো অন্যান্য পার্লামেন্ট সদস্যের হুমকির প্রেক্ষিতে যুদ্ধ চলাকালে শ্রমিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের সমন্বয়ে একটি নয়া সরকার গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন শংকিত হয়ে উঠেন। ফার্স্ট লর্ড অব দ্য অ্যাডমিরাল্টি হিসেবে নরওয়ে বিপর্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের ১০ মে চার্চিলকে বাকিংহাম প্রাসাদে তলব করা হয় এবং তাকে একটি নয়া সরকার গঠন করতে বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে চার্চিল ১৩ মে পার্লামেন্টে উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, 'রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘাম ছাড়া আমার দেয়ার আর কিছু নেই।'

প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের সামনে এডলফ হিটলার

চার্চিল যেদিন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই জ্বালাময়ী ভাষণ দেন, ঠিক সেদিন ভোরে জার্মানরা হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গে প্রবেশ করে এবং বেলজিয়ামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বেলজিয়াম যুদ্ধে নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে এবং বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্সকে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্স বেলজীয় নির্দেশ অমান্য করে বেলজিয়াম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

তবে বৃটিশদের এ উদ্যোগ নিরর্থক বলে প্রমাণিত হয়। জার্মান ছত্রী সেনারা ফোর্ট ইবান ইমায়েলে মূল প্রতিরক্ষা লাইনের শীর্ষে সরাসরি অবতরণ করে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য ফোর্ট ইবান ইমায়েলের উপর উড়ন্ত বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে ২৭ মে বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করে। ম্যাজিনো লাইনের শক্ত অবস্থান থেকে ফরাসীরা জার্মানদের উপর পাল্টা হামলা চালাবে না-এ ধারণা থেকে জার্মানরা দূরতিক্রম্য বলে বিবেচিত আর্দেনিসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ১৩ মে পাঞ্জার ডিভিশনগুলো মিউজ নদী অতিক্রম করার সময় পদাতিক বাহিনী এ করিডোর ব্যবহার করে। জার্মান ট্যাংক এগিয়ে এলে আল্পসের বনভূমিতে জার্মানীর মূল লড়াই শুরু হয়। জার্মানীর ব্লিৎসক্রিগ অপারেশনের সামনে পোল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের পতন ঘটে এবং পরে এ অভিযান পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। লুক্সেমবার্গ বিনা প্রতিরোধে জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হল্যান্ড প্রচলিত রীতিতে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে ওলন্দাজ সৈন্যেরা একটি বিরাট এলাকা প্লাবিত করে এবং সেতু উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ১৪ মে জার্মান লুফটওয়াফের (বিমান বাহিনী) বোমারু বিমানগুলো রটারডামে বোমাবর্ষণ করে। জার্মান বোমাবর্ষণে ৮শ' লোক নিহত ও ৭৮ হাজার লোক গৃহহীন হয়। ওলন্দাজ সরকার ও রাজা লন্ডনে পালিয়ে যান। পরদিন অন্যান্য শহর ও জনপদ রক্ষায় হল্যান্ড আত্মসমর্পণ করে।

১৯৩৯ সালে এরিক ভন ম্যানস্টেইন ও ফ্যাঞ্জ হ্যালডারসহ জার্মান সেনাবাহিনীর একদল উর্ধ্বতন অফিসার উত্তরাঞ্চলীয় ফ্রান্সে ফরাসী সেনাবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। 'ম্যানস্টেইন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ম্যাজিনো লাইন এড়িয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে আক্রমণ চালানো। এ পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া এবং ফরাসী সরকারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। ১৯৪০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এডলফ হিটলার ম্যানস্টেইন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। তবে একই বছরের ১০ মে নাগাদ এ পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। এডলফ হিটলার তার ১৩ নং নির্দেশে বলেন, উত্তরাঞ্চলে মোতায়েন আমাদের বাহিনীর সুসমন্বিত আক্রমণ এবং দ্রুত ইংলিশ চ্যানেল দখলের মাধ্যমে আরটোয়িস ও ফ্লান্ডার্সে অবরুদ্ধ ফরাসী, ইংরেজ ও বেলজীয় বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই আমাদের অপারেশনের পরবর্তী লক্ষ্য। সেদিন লুটওয়াফে ওলন্দাজ ও বেলজীয় বিমানক্ষেত্রে বোমাবর্ষণ করে এবং জার্মান সেনাবাহিনী মোয়ারদিজিক ও রটারডাম দখল করে নেয়।

ফেডার ভন বক ও ৯ম পাঞ্জার ডিভিশন ব্লিৎসক্রিগ রণকৌশলের আশ্রয় নিয়ে দ্রুতবেগে নেদারল্যান্ডের দিকে এগিয়ে যায়। বেলজিয়ামও আক্রান্ত হয়। এ সময় ফরাসী ৭ম আর্মি ওলন্দাজ ও বেলজীয় বাহিনীকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। আরউইন রোমেলের নেতৃত্বে ৭ম পাঞ্জার ডিভিশন ও হেইঞ্জ গুদেরিয়ানের নেতৃত্বে ১৯তম পাঞ্জার কোর এবং গার্ড ভন রুন্ডেস্টাডের নেতৃত্বে ৬ষ্ঠ ও ৮ম পাঞ্জার ম্যাজিনো লাইনের উত্তর দিকে ঘন জঙ্গলে আবৃত আধা পাহাড়ি আর্দেনিজ এলাকা ধরে এগিয়ে

www.pathagar.com

যায়। ফরাসী সেনাবাহিনী ভুলক্রমে বিশ্বাস করতো যে, আর্দেনিজ এলাকার মধ্যে দিয়ে ট্যাংক চলাচল করা অসম্ভব। কিন্তু ফরাসীদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ কর ১২ মে'র মধ্য ৭টি পাঞ্জার ডিভিশন দিনায় মিউজ নদীর তীরে পৌঁছে যায় এবং পরদিন ফরাসী সরকারকে প্যারিস ত্যাগে বাধ্য করে। পল ভন ক্লিয়েস্ট, আরউইন রোমেল, হেইঞ্জ গুদেরিয়ান ও গার্ড ভন রুন্ডেস্টাডের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনী ইংলিশ চ্যানেলের দিকে অগ্রসর হয়। ১৭ মে মন্টকোরনেট এবং ২৭-২৯ মে লিঁওতে জেনারেল শার্লে দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্সের ৪র্থ সাঁজোয়া ডিভিশন জার্মান বাহিনীর উপর পাল্টা হামলা চালায়। এছাড়া জার্মান বাহিনী আর কোথাও প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়নি। মিউজ নদীর উপর সেতুতে সংঘটিত লড়াইয়ে ফরাসীদের শার বালবি ও সামোয়া ট্যাংকের বিপরীতে জার্মান পাঞ্জার ক্যাম্ফ ওয়াগান-১ এবং পাঞ্জার-২ ট্যাংক অংশগ্রহণ করে। গুণগত দিক দিয়ে ফরাসী ট্যাংকগুলো ছিল অনুন্নত। ফরাসীরা পদাতিক বাহিনীর সহায়তায় ট্যাংক ব্যবহার করে। জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে এ পাল্টা হামলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৬ মে বেলজিয়ামে যান। সেখানে তিনি ফরাসী জেনারেল গ্যামেলিনের কাছ থেকে সিডানের অগ্রবর্তী অবস্থানে বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে হতাশ হন। তিনি আরো জানান যে, প্যারিসে ৫টি জার্মান ডিভিশন প্রবেশ করায় একের পর এক বিপর্যয় ঘটছে। তার কথা শুনে চার্চিল জানতে চান, কৌশলগত রিজার্ভ কোথায়? জবাবে গ্যামেলিন জানান, কোনো কৌশলগত রিজার্ভ অবশিষ্ট নেই। রণাঙ্গনে এসব বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে চার্চিল লন্ডনে ফিরে আসেন। তার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দু'টি ছিল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। একটি ছিল প্যারিসে জার্মানদের প্রবেশ এবং আরেকটি ছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধজাহাজ এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলস হারানো।

প্যারিসের পতন ঘটায় জেনারেল ওয়েগাঁ প্রথম মহাযুদ্ধের নায়ক জেনারেল গ্যামেলিনের স্থলাভিষিক্ত হন। সকল সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে জেনারেল ওয়েগাঁ অগ্রবর্তী অবস্থানে উড়ে যান। কিন্তু তাকে পিছু হটতে হয়। এসময় তার সঙ্গে হাই কমান্ডের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরেকজন ফরাসী জেনারেল বিলোঁও নিহত হন। বৃটিশ এক্সপিডিশনারী ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল লর্ড গোর্টের কাছে এ সন্ধিক্ষণে ৪ দিন কোনো নির্দেশ পৌঁছেনি। অবশেষে ২২ মে প্যারিসে চার্চিলের সঙ্গে জেনারেল ওয়েগাঁর সাক্ষাত হয় এবং তারা প্যারিস রক্ষায় একটি কৌশল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পিছু হটার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরগুলোতে এগিয়ে যাবার জন্য জেনারেল গোর্টকে নির্দেশ দেয়া হয়। গোর্টের সৈন্যরা আরাস শহরে জার্মানদের উপর হতাশাব্যঞ্জক হামলা চালায়। এ যুদ্ধে বৃটিশ ট্যাংকগুলো ছিল জার্মান টাংকের বিপরীতে অসহায়। বিপর্যয় সত্ত্বেও ওয়েগাঁ তখনো সোমের দক্ষিণে একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার কথা ভাবতেন। লর্ড গোর্টকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তবে ইতিপূর্বে মিত্রবাহিনীর যে পরিকল্পনা তাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, তারা সে পরিকল্পনাই অনুসরণ করছিল। এসময় ফরাসীদের কোনো কৌশলই কাজে আসতো না। ফরাসী সরকারকে পরাজয়ের মনোভাব গ্রাস করে। জার্মান পাঞ্জার ইংলিশ

www.pathagar.com

চ্যানেলের বন্দরগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। তারা বুলোন, ক্যালে ও ডানকার্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। লর্ড গোর্টের সোমে পৌঁছার কোনো আশা ছিল না। এদিকে, পুনর্গঠিত হওয়ার জন্য পাঞ্জার থেকে যায় এবং পদাতিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

জার্মান বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল অপারেশন ডায়নামো কার্যকর করার নির্দেশ দেন। অপারেশন ডায়নামো ছিল একটি পরিকল্পনার নাম। ফরাসী বন্দর ডানকার্ক থেকে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম প্রত্যাহার করা ছিল এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বৃটিশ এক্সপিডিশানারী ফোর্স (বিইএফ)'র কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল জন গোর্ট এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৪০ সালের ২৭ মে থেকে ৪ জুন নাগাদ ডানকার্ক থেকে মোট ৬৯৩ টি যুদ্ধজাহাজ ও ৩ লাখ ৩৮ হাজার ২২০ জন সৈন্য বৃটেনে ফিরিয়ে আনা হয়। এসব সৈন্যের মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজার ছিল ফরাসী। তবে সকল ভারি অস্ত্রশস্ত্র ফ্রান্সে ফেলে রেখে আসা হয়। ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণে অসামরিক বিমানও তলব করা হয়। ৩১ মে চার্চিল আবার প্যারিসে গিয়ে মার্শাল পেতাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পেঁতা জার্মানীর সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী ছিলেন। চার্চিল ও তার স্টাফরা তাকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে জার্মান অধিকৃত ফরাসী বন্দর নগরীগুলোতে বোমাবর্ষণ। মার্শাল পেঁতা তার পরামর্শ উপেক্ষা করেন। নিরাশ হয়ে চার্চিল লন্ডন ফিরে আসেন। ৪ জুন তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তার দেশ ইংল্যান্ডের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন। একই সময়ে ইতালীর একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী দক্ষিণ ফ্রান্স অভিযানে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন। হিটলার ৪ জুন পর্যন্ত ফ্রান্সে ইতালীর অভিযান স্থগিত রাখার জন্য মুসোলিনীকে অনুরোধ করেন। মধ্য রাতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইতালীয় সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ ফ্রান্সে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এসময় বৃটিশ সৈন্যেরা লিবিয়ায় ইতালীয় সৈন্যদের উপর হামলা করে। উভয় রণাঙ্গনে ইতালীয়রা পরাজিত হয়।

১১ জুন চার্চিল ফ্রান্সে আসেন। তিনি প্যারিসের পরিবর্তে ব্রিয়ারে ফরাসী সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ফরাসী ওয়ার কাউন্সিলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল শার্লে দ্য গলও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ফরাসীরা তাদের প্রতিরক্ষায় বৃটেনে প্রাপ্ত প্রতিটি বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর দাবি জানায়। চার্চিল দ্বিমত পোষণ করে বলেন, বৃটেনের আকাশেই নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ হবে এবং প্রাপ্ত প্রতিটি বিমানের প্রয়োজন হবে। মাত্র ২৫টি ফাইটার স্কোয়াড্রন ফ্রান্সে মোতায়েন রাখা হয় এবং বৃটিশ এয়ার মার্শাল হাফ ডাউনিং ফ্রান্সে আরো যুদ্ধ বিমান পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। চার্চিল ফরাসী নৌ বাহিনীর এডমিরাল দারলানের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি জার্মানদের কাছে ফরাসী নৌ-বহর তুলে দেবেন না। শত্রুদের চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো রিজার্ভ না থাকায় ১৯৪১ সালের ১৪ জুন প্যারিস আত্মসমর্পণ করে এবং জার্মান দখলে চলে যায়। ১৬ জুন যুদ্ধ বিরতি কামনা করে মার্শাল পেঁতা ও ওয়েগাঁ একটি নয়া সরকার গঠন করেন। জেনারেল দ্য গল গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বিমানে

www.pathagar.com

করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। ১৮ জুন তিনি বিবিসি রেডিও-তে নিজেকে প্রবাসী ফ্রি ফ্রেন্স বাহিনীর নেতা হিসেবে ঘোষণা করে সকল ফরাসীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমরা একা নই'। দ্য গলের এ ঘোষণার পর তাঁবেদার ভিসি সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। এডমিরাল দারলান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফরাসী নৌ-বহরকে ইংল্যান্ডের বন্দরে নিয়ে যাননি। তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় বৃটিশ ইউনিটগুলো ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা উপকূলে ফরাসী যুদ্ধ জাহাজগুলোকে ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে ধ্বংস করে।

১৮ জুন চার্চিল পার্লামেন্টে ভাষণে বলেন, 'জেনারেল ওয়েগাঁ যেখানে বলেছেন ফ্রান্সে লড়াই শেষ, আমি সেখানে বলছি বৃটেনের লড়াই সবেমাত্র শুরু।'

ফরাসী বাহিনী সোমে ও আইসন বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা দ্রুত লয়েরে সরে আসতে বাধ্য হয়। পল রেনোঁ ও তার সরকার ফরাসী রাজধানী ত্যাগ করে টাওয়ার্সে এসে আশ্রয় নেয়। ১৪ জুন জার্মানরা প্যারিস দখল করে নেয়। প্রধানমন্ত্রী রেনোঁ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, জার্মানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি পূর্ব আফ্রিকায় ফরাসী অধিকৃত ভূখণ্ডে সরকার স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন। উপপ্রধানমন্ত্রী হেনরি ফিলিপ পেতাঁ ও সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল মাক্সিম ওয়েগাঁ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারা জোর দিয়ে বলেন, সরকারকে ফ্রান্সেই অবস্থান করতে হবে এবং একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিতে হবে। অনাস্থার মুখে রেনোঁ পদত্যাগ করেন এবং প্রেসিডেন্ট আলবার্ট লাবরুন পেতাঁকে ফ্রান্সের নয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী পেতাঁ অবিলম্বে এডলফ হিটলারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং ২২ জুন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্সকে অধিকৃত ও অনধিকৃত দু'টি ভূখণ্ডে বিভক্ত করে ফেলা হয় এবং এ দু'টি অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমানা চিহ্নিত করা হয়। জার্মানী সরাসরি ফ্রান্সের তিন-পঞ্চমাংশের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এ তিন-পঞ্চমাংশের মধ্যে ছিল ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল এবং গোটা আটলান্টিক উপকূল। মার্শাল হেনরি ফিলিফ পেতাঁর আওতায় ভিসি সরকারকে বাদবাকি ফ্রান্স শাসনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়। ফ্রান্সে বসবাসকারী সকল ইহুদী জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে– চুক্তিতে এ শর্তও ছিল। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১ লাখ ছাড়া অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। উভয়পক্ষ একমত হয় যে, জার্মানদের হাতে আটক ১৫ লাখ ফরাসী সৈন্য যুদ্ধবন্দী হিসেবে থাকবে। ফরাসী সরকার তার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দেশ ত্যাগ বন্ধে সম্মত হয় এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার জন্য নিজ দেশের নাগরিকদের নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স দখলে জার্মানদের যে ব্যয় হয় তাও ফরাসী সরকারকে বহন করতে হয়। ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষায় আনুমানিক ৩ লাখ ৯০ হাজার সৈন্য প্রাণ দেয়। অন্যদিকে, আগ্রাসনকালে জার্মান পক্ষে নিহত হয় ৩৫ হাজার সৈন্য। ১৯৪০ সালে জার্মান অভিযানকালে ফরাসীরা লড়াই করেছিল ঠিকই। তবে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারদুন ও সোমেতে ফরাসীরা যে বীরত্ব

www.pathagar.com

দেখিয়েছিল পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনকালে তারা সেই বীরত্ব দেখাতে পারেনি। প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশরা যেভাবে লড়াই করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তারা একই কৌশলে লড়াই করে। বেলজীয়রা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। ওলন্দাজরা লড়াই করেছিল মাত্র কয়েকদি । বিমান শক্তিতে জার্মানদের সুস্পষ্ট আধিপত্য ছিল। তাদের ট্যাংক ছিল ফরাসীদের চেয়ে উন্নত। জার্মান ট্যাংকের গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। কমান্ডাররা যখন যেদিকে যেতে নির্দেশ দিতেন, ট্যাংক বহর তৎক্ষণাৎ সে নির্দেশ পালন করতো। পক্ষান্তরে, ফরাসীদের অবস্থা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। তারা প্রথম মহাযুদ্ধে অনুসৃত যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করতো এবং বিশ্বাস করতো যে, প্রথম মহাযুদ্ধে অনুসৃত কৌশলই উত্তম। নেতৃত্ব ও বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তারা আধুনিক ছিল না। অগ্রযাত্রায় দিক পরিবর্তন করতে চাইলে তাদেরকে প্রথমে থামতে হতো এবং পরে নুতন করে নির্দেশ গ্রহণ করতে হতো। তখন তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করতে পারতো।

১৯৪০ সালের ২২ জুন পেতাঁ যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানান। ১৯১৮ সালে জার্মানরা রেলের যে কম্পার্টমেন্টে ফরাসীদের কাছে অবমাননাকর আত্মসমর্পণ চুক্তিতে সই দিয়েছিল, এই কম্পার্টমেন্টে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪০ সালে ২২ জুন ফরাসীরা জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই দেয়।

www.pathagar.com

জেনারেল দ্য গলের সংগ্রাম

জার্মানী ফ্রান্স দখল করে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। ভার্দুন বিজয়ী মার্শাল হেনরি পেঁতা ছিলেন এ পুতুল সরকারের প্রধান। জার্মান নিয়ন্ত্রিত তাঁবেদার ফরাসী সরকারের রাজধানী ছিল ভিসি। তাই এ সরকার ভিসি সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মিত্রপক্ষ এ সরকারকে কখনো স্বীকৃতি দেয়নি। মিত্রপক্ষ বরাবরই ভিসি সরকারের কার্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখতো। তারা এ সরকারকে জার্মানীর পুতুল সরকার বলে বিবেচনা করতো।

ভিসি ছিল মধ্য ফ্রান্সে প্যারিসের দক্ষিণে জার্মান অধিকৃত একটি ক্ষুদ্র শহর। ভিসি সরকার লেবানন, সিরিয়া ও আলজেরিয়াসহ ফ্রান্সের অন্যান্য উপনিবেশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে ইরাকে বৃটিশ-বিরোধী একটি অভ্যুত্থানে সমর্থন দানে জার্মান বিমান বাহিনী লুফটওয়াফে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে মসুলে কয়েকটি বিমান পাঠায়। ১৯৪১ সালে সুয়েজ খালের পেছনে জার্মানীর এ সুবিধা নস্যাত করে দেয়ার লক্ষ্যে বৃটিশ অস্টম আর্মি ও জেনারেল শার্লে দ্য গলের নেতৃত্বাধীন ফ্রী ফ্রেঞ্চ ইউনিট লেবানন ও সিরিয়ায় হামলা চালায়। ১৯৪২ সালের নভেম্বরে মিত্রপক্ষ উত্তর আফ্রিকায় হামলা চালালে জার্মানী ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ১৯৪০ সালের অস্ত্রবিরতি চুক্তি বাতিল করে এবং গোটা ফ্রান্স দখল করে নেয়।

ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ে ফরাসী জাতির ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তখন যিনি ফরাসীদের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে আসেন তিনি হলেন জেনারেল শার্লে দ্য গল। প্রথম মহাযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে দ্য গল বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর দিন শেষ হয়ে গেছে। এ যুগ সাঁজোয়া বাহিনী বা যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগ। ১৯২৮ সালে তিনি তার 'ভার্স লা আর্মি দ্য মিটির' নামে একটি পুস্তকে ভবিষ্যত যুদ্ধে যান্ত্রিক বহরের অপরিহার্যতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সর্তক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থপর রাজনীতিক ও সৈন্যাধ্যক্ষরা নিজেদের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার ভয়ে এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বীর যোদ্ধার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে জার্মান হামলায় দ্য গলের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি হয়। জার্মানরা ব্লিৎসক্রীগ গতিতে শত শত ট্যাংক নিয়ে ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে মাত্র ১৪ দিনের লড়াইয়ে রাজধানী প্যারিসসহ অর্ধেক ফ্রান্স দখল করে নেয়। ফরাসী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েগাঁ ম্যাজিনো লাইনের উপর ভরসা করে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দ্য গল সৈন্যাধ্যক্ষের এ নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী রেনোঁর কাছে সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অভিযোগ করেছিলেন। রণাঙ্গনে দ্য গল ছিলেন একজন ডিভিশনাল কমান্ডার। জার্মান বাহিনীর ঝটিকা গতির

www.pathagar.com

সামনে তিনি সেকেলে পদাতিক ডিভিশন নিয়ে বেশীক্ষণ টিকতে পারেননি। যুদ্ধবিরতির কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ওয়ার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। পেঁতা সরকার জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে জেনারেল দ্য গল ইংল্যান্ডে পালিয়ে আসেন। তখন তার পরিচিতি বলতে কিছু ছিল না। ডানকার্ক ও নার্ভিক বন্দর হয়ে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা বিধ্বস্ত ফরাসী ইউনিটগুলোকে নিয়ে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২৩ জুন ফরাসী জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির নেতৃত্বে ফ্রান্সকে দখলদার মুক্ত করার সংগ্রাম চলতে থাকে। দ্য গল ছিলেন এ কমিটির প্রধান। ভিসি সরকার তার অনুপস্থিতিতে তাকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। বৃটেনে ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হতে থাকে। ২৮ জুন বৃটিশ সরকার জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বাধীন ফরাসী জাতীয় কমিটিকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা দেয়। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক ঘোষণায় বললেন, স্বাধীন ফরাসীরা বৃটেনের পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে বৃটেন তাদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

ফ্রি ফ্রেন্স আর্মির নেতা জেনারেল শার্লে দ্য গল

জেনারেল দ্য গল তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ঘোষণা দিলে প্রবাসী ফরাসীরা তাকে বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। ফরাসী উপনিবেশগুলো থেকেও তার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা হয়। তবে কারো কারো সমর্থন প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে। নিউক্যালিডোনিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ফরাসী উপনিবেশ, ফরাসী অধিকৃত ভারতের পন্ডিচেরী, পশ্চিম আফ্রিকার শাদ ও ক্যামেরুন স্বেচ্ছায় ভিসি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং জেনারেল দ্য গলের পক্ষে যোগ দেয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের

www.pathagar.com

ফরাসী অধিকৃত মার্টিনিক প্রথমে বেঁকে বসেছিল। তবে পরে তাদের মনোভাবে পরিবর্তন আসে। দ্য গলের সমর্থকদের চাপে ফরাসী ইন্দোচীনের সরকার পদত্যাগ করে। ডাকার (বর্তমান সেনেগাল)কে নিজের পক্ষে আনার জন্য দ্য গল সেখানে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু ডাকার দ্য গলের প্রস্তাবে সম্মত হতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ডাকার দ্য গলকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। জেনারেল দ্য গল শক্তিপ্রয়োগ করে আফ্রিকার গ্যাবন দখল করেন। সিরিয়ার ফরাসী সেনাপতি মিটেলহয়জার ভিসি সরকারের নির্দেশ মেনে যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী অস্ত্রত্যাগ করেন। লোহিত সাগরীয় উপকূলে ফরাসী উপনিবেশ জিবুতি ছিল ইতালীয়দের দখলে। দু'একটি উপনিবেশের বৈরিতা সত্ত্বেও দ্য গল এগিয়ে যেতে থাকেন।

লন্ডনের হাইড পার্কের কাছে সে সময়কার ৭/৮, সীমার গ্রোভ (পরবর্তীতে ৭ কার্জন) রোডের দু'তলায় একটি ভবনে তিনি কাজ করতেন। ১৮ জুন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলটি তার সঙ্গে সাক্ষাত করে। বৃটেনের স্বীকৃতি দ্য গলকে অনেকদূর এগিয়ে দেয়। ফরাসী প্রতিরোধ লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকায় অস্থায়ী ফরাসী জাতীয় কমিটি লন্ডনে ভিক্টোরিয়া এ্যামব্যাঙ্কমেন্টের সেন্ট স্টিফেন হাউসে প্রথমে ৪ টি এবং পরে ১২টি কক্ষ ভাড়া নেয়। ফ্রেঞ্চ কমিটি অব ন্যাশনাল লিবারেশন বা সিএফএলএন-তে রিক্রুটদের ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরের উপকূলীয় বন্দরগুলোর আশপাশে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৪১ সালের শেষ নাগাদ ফ্রী ফ্রেঞ্চ ফোর্সের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ৫ লাখ ৬০ হাজার এবং ১৯৪৫ সালের মে মাসে ১২ লাখ ৫০ হাজার। ১৯৪৪ সালে প্রবাসী ফরাসী সরকার গঠন করা হয়। দ্য গল হন এ সরকারের অস্থায়ী প্রধান। ১৯৪৪ সালের ২৬ আগস্ট তিনি প্যারিস মুক্ত করার লড়াইয়ে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দানে সফল হন। পরে তিনি ফ্রান্সের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের নেতা নির্বাচিত হন।

১৯৪২ সালের ২২ জুলাই জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দ্য গলের সাক্ষাত হয়। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের সময় আইসেনহাওয়ার ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল। পরবর্তী বছরগুলোতে তার দ্রুত পদোন্নতি ঘটে। দ্য গলের সঙ্গে সাক্ষাত হলেও আইসেনহাওয়ার ছিলেন সতর্ক। ইউরোপে মিত্রবাহিনীর অবতরণ পরিকল্পনা থেকে ফ্রী ফ্রেঞ্চ ও দ্য গলকে বাইরে রাখতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন দ্য গলের প্রতি চরম বৈরি। তার নির্দেশেই দ্য গলের সঙ্গে আইসেনহাওয়ারের সম্পর্ক ছিল শীতল। ১৯৪৩ সালে আলজেরিয়া পৌঁছে দ্য গল মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আইসেনহাওয়ারের নিযুক্তির বিরোধিতা করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দ্য গলকে চিনতেন না। তার নামও জানতেন না। ১৯৪২ সালের ১২ জুন ব্রায়ার থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের প্রেরিত একটি বার্তা পড়ে তিনি তার কথা জানতে পারেন। চার্চিল তার বার্তায় উল্লেখ করেন যে, ওয়েগাঁর মতো ফরাসী জেনারেলগণ যেখানে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাতে ইচ্ছুক সেখানে সুপ্রীম এ্যালায়েড ওয়ার কাউন্সিলে একজন মাত্র 'জেনারেল' মনে করেন

www.pathagar.com

যে, একটা কিছু করা দরকার। ১৩ জুন রুজভেল্ট চার্চিলের বার্তার জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার জবাবে ওই জেনারেল কে, কি তার পরিচয় কিছুই জানতে চাননি।

১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের বার্ষিকীতে দ্য গল ফ্রান্সের মুক্তি সংগ্রামে আমেরিকার সাহায্য কামনা করেন। এ অনুরোধ জানানোর সময় রুজভেল্ট প্রথম তার নাম শুনতে পান। পরদিন নিউইয়র্ক টাইমসে দ্য গলের বিবৃতি ছাপা হয়। রুজভেল্ট দ্য গলকে একজন জেনারেল ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছিলেন না। তিনি মনে করতেন, তার অনুসারীরা দ্য গলকে ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত করেনি। তাই তিনি তাকে অবজ্ঞা করতেন। রুজভেল্টের সঙ্গে দ্য গলের দু'বার সাক্ষাত হয়। একবার ১৯৪৩ সালে কাসাব্লাঙ্কায় এবং আবার ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে ওয়াশিংটনে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ২৩ অক্টোবর নাগাদ রুজভেল্ট ফ্রী ফ্রেঞ্চকে স্বীকৃতি দেননি। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইয়াল্টা সম্মেলনে দ্য গলের যোগদানের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে উভয়ের শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। চার্চিল ও স্টালিন দু'জনই ছিলেন ইয়াল্টা সম্মেলনে দ্য গলের যোগদানের পক্ষে। ক্রিমিয়া থেকে ফেরার পথে রুজভেল্ট আলজিয়ার্সে তার সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য দ্য গলকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্তব্য করেন, 'ফরাসী ভূখণ্ডে একজন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানালে আমি তাতে যোগদান করি কিভাবে?' রুজভেল্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দ্য গল অনুতপ্ত হয়েছিলেন কিনা অথবা রুজভেল্টের কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন কিনা তা চিরকালের মতো অমীমাংসিত থেকে গেলো। দ্য গলের সঙ্গে বৈঠকে বসার আগ্রহ প্রকাশ করার দু'মাস পর ১২ এপ্রিল রুজভেল্ট মারা যান। রুজভেল্টের মৃত্যুতে দ্য গল নয়া প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের কাছে শোক বার্তা পাঠালেও তিনি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেননি।

১৯৪০ সালে জার্মানী ফ্রান্সে সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির অর্ধেক দখল সম্পন্ন করলে ফ্রান্স হিটলারের সঙ্গে ২২ জুন একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি করে। ফরাসী-জার্মান চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী নৌ-বহর জার্মানীর হস্তগত হলে হিটলার যে এগুলো বৃটেনের বিরুদ্ধে ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না- এ বিষয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কোনো সন্দেহ ছিল না। ফ্রী ফ্রেঞ্চের নেতা দ্য গলের উদ্বেগ ছিল একই। তাই ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই প্রত্যুষে ফরাসী রণতরীগুলোকে বৃটিশ বন্দরে এনে সমবেত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফরাসী নৌ-বাহিনীকে নিরস্ত্র করার অপারেশনের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন ক্যাটাপাল্ট।'

ভিসি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরাসী নৌ-বাহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা কখনো জার্মানী অথবা ইতালীকে তাদের যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করতে কিংবা অধিগ্রহণ করতে দেবে না। বৃটিশ রাজকীয় নৌ-বাহিনী অধিকৃত ফরাসী নৌ-বাহিনীর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও বৃটিশ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।

যুদ্ধের সূচনা থেকেই ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহর বৃটিশ ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহরের সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল স্যার এন্ড্রুক্রোর অধিনায়কত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। আটলান্টিক ও ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থানকারী ফরাসী নৌ-বহরের সেনাপতি ছিলেন বৃটিশ নৌ-বহরের কমান্ডার-ইন-চীফ এডমিরাল স্যার চার্লস ফোর্বেস।

www.pathagar.com

বৃটিশ বন্দর পোর্টর্সমাউথ, প্লিমাউথ এবং শিয়ারনেসে ফরাসীদের দু'টি ব্যাটলশীপ, দু'টি হাল্কা ক্রুজার, কয়েকটি সাবমেরিন, ৮ টি ডেস্ট্রয়ার ও ছোট-খাট প্রায় দুশো জাহাজ ছিল। ঐ দিন ভোরে বিনা রক্তপাতে এসব জাহাজ অধিকার করা হয়। কিন্তু ফরাসীদের অধিকাংশ জাহাজই ছিল ভূমধ্যসাগরে আফ্রিকা উপকূলের আলেক্সান্দ্রিয়া ও ওরান বন্দরে। আলজেরিয়ার ওরানের কাছে মার্স আল-কবীর ছিল ফরাসী নৌ-বাহিনীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নৌ-ঘাঁটি। আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফরাসী নৌ-বহরের এডমিরাল গডফ্রে বৃটিশের দাবি মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হন এবং সেখানকার ফরাসী নৌ-বহরকে বিনা চ্যালেঞ্জে নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করা হয়। কিন্তু বাধা আসে ওরানে। ৩ জুলাই সকালে বৃটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হল্যান্ড আলজেরিয়ার ওরানে গিয়ে ফরাসী কমান্ডার এডমিরাল জেনসোনের সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি চান। কিন্তু তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপর তিনি এডমিরাল জেনসোনের কাছে একটি চরমপত্র পাঠান। চরমপত্রে বলা হয়, হয়তো তাদের বৃটিশ নৌ-বহরের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে নতুবা জাহাজের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কোনো বৃটিশ বন্দরে বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মার্টিনিক কিংবা অনুরূপ কোনো বন্দরে গিয়ে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে। এ সকল শর্তের কোনোটি পূরণ করা সম্ভব না হলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে হবে। নতুবা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সারা দিন আলোচনা চললো। কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। এ সময় ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ারসহ বৃটেনের জিব্রাল্টারের একটি নৌ-বহর ফোর্স এইচ ভাইস এডমিরাল স্যার জেমস সোমারভিলের নেতৃত্বে সেখানে উপস্থিত হয়। ফরাসী কমান্ডারের অনমনীয় মনোভাব দেখে লন্ডন থেকে রাত নামার আগেই সোমারভিলকে তার কর্তব্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়। বিকেল ৫টা ৫৮মিনিটে বৃটিশ রণতরী থেকে ফরাসী রণতরীর উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়। বন্দরের উপকূলীয় কামানগুলো থেকেও গোলাবর্ষণ করা হয়। প্রায় ১০মিনিট প্রচণ্ড লড়াই হয়। লড়াইয়ে ফরাসী রণতরী ডানকার্ক মারাত্মক জখম হয় এবং ব্রেটাগ্নে ও অন্য দু'টি ডেস্ট্রয়ার এবং একটি সী প্লেন ক্যারিয়ার বিধ্বস্ত হয়। স্ট্রাসবুর্গ ও আরো কয়েকটি জাহাজ সরে গিয়ে টুলোঁ বন্দরে আশ্রয় নেয়। ফরাসী ব্যাটলশীপ 'রাইখেলিউ' তখন ছিল ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার ডাকার বন্দরে। ৮ জুলাই এখানেও ওরানের মতো চরমপত্র দেয়া হয়। কিন্তু কমান্ডার সম্মত না হওয়ায় বৃটিশ নৌ-বহর থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। গোলাবর্ষনে রাইখেলিউ মারাত্মকভাবে জখম হয়। ফরাসী যুদ্ধজাহাজে গোলাবর্ষণ করায় পেঁতা সরকার ৫ জুলাই বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ফরাসী দূতাবাস প্রত্যাহার করা হয়।

www.pathagar.com

ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন তছনছ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর যে ক'টি কৃতিত্বের উল্লেখ করতে হয় তার মধ্যে ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন তছনছ করে দেয়া ছিল নিঃসন্দেহে একটি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালী ও জার্মানীর সঙ্গে সীমান্ত বরাবর নির্মিত ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ইতিহাসে ম্যাজিনো লাইন নামে পরিচিত। কংক্রীটের তৈরি শক্ত বাংকার, ট্যাংকবিধ্বংসী ফাঁদ, মেশিনগান চৌকি এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যূহের সমন্বয়ে পশ্চিমে সিডান থেকে পূর্বদিকে ওয়াইসেমবার্গ পর্যন্ত দেড় শ' মাইল বিস্তৃত এ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করা হয়। ফরাসীরা বিশ্বাস করতো যে, এ প্রতিরক্ষা লাইনে শত্রু এসে বাধাপ্রাপ্ত হলে তারা তাদের সৈন্য সমাবেশে পর্যাপ্ত সময় পাবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি রোধে ফরাসীরা সম্ভাব্য জার্মান হামালা মোকাবিলায় ম্যাজিনো লাইন নির্মাণ করে।

৪ বছর পর ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। এ মহাযুদ্ধে শত্রুরা ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চল প্রায় পুরোপুরি দখল করে নেয়। তাছাড়া, প্রথম মহাযুদ্ধে ১০ লাখ বেসামরিক ফরাসী নাগরিক নিহত এবং ৪ থেকে ৫ কোটি লোক আহত হয়। যুদ্ধের পর ফ্রান্স অনুরূপ যুদ্ধে নিজেকে রক্ষার বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। ভার্সাই চুক্তি ফ্রান্সকে মোটেও স্বস্তি দিতে পারেনি। ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তির লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষ জার্মানীকে পঙ্গু করে রাখা। কিন্তু অনেক ফরাসী রাজনীতিক ও জেনারেল ভার্সাই চুক্তির শর্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তারা মনে করতেন, এ চুক্তিতে জার্মানীকে ছাড় দেয়া হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল ফসের মতো ব্যক্তিগণ মনে করতেন, ভার্সাই চুক্তি আরেকটি যুদ্ধবিরতি মাত্র এবং পুনরায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত উদ্বেগ সরকারী উদ্বেগে পরিণত হয়। এ উদ্বেগ থেকে ১৯১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্স্যু বিষয়টি নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান মার্শাল পেঁতার সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মার্শাল জোফরে। পল রেনোঁ ও শার্লে দ্য গলের মতো আধুনিকতাবাদীরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। জেনারেল দ্য গল এ ধরনের কোনো প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণে অর্থের অপচয়ের পরিবর্তে ট্যাংক ও বিমান নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মার্শাল পেঁতা সমর্থন করায় ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে মার্শাল জোফরের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে আঁন্দ্রে ম্যাজিনো সরকারকে এ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগে রাজি করান। ম্যাজিনো ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের একজন প্রবীণ সৈনিক। তিনি প্রথমে ছিলেন ফ্রান্সের প্রবীণ সৈনিক বিষয়ক মন্ত্রী এবং পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

www.pathagar.com

একটি প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি সরকারী কমিশনের রিপোর্টেও অনেকগুলো প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে এগুলোর মধ্যে ৩টি প্রস্তাব প্রাধান্য লাভ করে। দু'টি প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা জোরদার করা এবং তৃতীয় প্রস্তাবটি দেয়া হয় ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে। শার্লে দ্য গলের মতো ব্যক্তিগণ ছিলেন তৃতীয় প্রস্তাবের পক্ষে। তৃতীয় দল মনে করতেন, বিমান বাহিনীর সহায়তায় ভবিষ্যত যুদ্ধ হবে ট্যাংক ও অন্যান্য সাঁজোয়া যানের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত ও ভ্রাম্যমান। তবে তাদের মতামাতের প্রতি ভ্রূকুটি করা হয়। ফলে অন্য দুটি প্রস্তাব অগ্রাধিকার লাভ করে।

সুবিশাল ভার্দুন প্রতিরক্ষা ব্যূহের কার্যকারিতাকে প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বোচ্চ সফলতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, কামানের গোলা থেকে এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ রক্ষা পেয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে খুবই সামান্য। কিন্তু ১৯১৬ সালে জার্মান হামলায় ভার্দুন প্রতিরক্ষা লাইনের বৃহত্তম দুর্গ দুআউর্মঁর পতন ঘটায় এ ধরনের প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণে বিতর্ক দেখা দেয়। ৫শ' সৈন্যের জন্য তৈরি এ দুর্গে জার্মান হামলার সময় সৈন্য ছিল এক-পঞ্চমাংশের কম। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, দুআউর্মঁর মতো অন্যান্য দুর্গের সমন্বয়ে গঠিত সুরক্ষিত ভার্দুন প্রতিরক্ষা লাইন সফলতা বয়ে এনেছে। যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়, প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল এমন একটি যুদ্ধ যেখানে শত্রুর শক্তি ক্ষয় করাই ছিল লক্ষ্য এবং এ যুদ্ধে কাঁটা তারের বেড়া পরিবেষ্টিত শত শত মাইল বিস্তৃত পরিখা কয়েক বছর শত্রুকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। ভার্দুন লাইনের এ সফলতাকে সামনে রেখে এ উপসংহারে পৌঁছানো হয় যে, পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা লাইন হবে পুরোপুরি কার্যকর।

মার্শাল জোফরের সমর্থনপুষ্ট প্রথম প্রস্তাবের সমর্থকরা ফাঁকের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালানোর সুবিধা বজায় রেখে একটি ক্ষুদ্র অথচ সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা লাইনে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখার প্রস্তাব দেন। অন্যদিকে, মার্শাল পেঁতার সমর্থনপুষ্ট দ্বিতীয় পক্ষ সুদীর্ঘ, গভীর ও ঘন ঘন দুর্গের সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এ পক্ষ উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের একটি নেটওয়ার্ক পূর্বাঞ্চলে একটি বিরাট এলাকার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করবে এবং হিন্ডেনবার্গ লাইনেও মারাত্মক আঘাত হানা সম্ভব হবে। প্রতিরক্ষা কৌশলের সমর্থক মার্শাল পেঁতা ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন কমান্ডার ও বীর। তাই তার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে।

১৯২২ সালে নবনিযুক্ত ফরাসী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আঁন্দ্রে ম্যাজিনো মার্শাল পেঁতার মডেলকে গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভার্সাই চুক্তিতে ফ্রান্সকে প্রদত্ত নিরাপত্তার কোনো মূল্য নেই। ১৯২৪ সালে পল পেইনলেভি তার স্থলাভিষিক্ত হলেও কখনো তিনি নিজেকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ থেকে দূরে রাখতে পারেননি। ১৯২৬ সালে পেঁতার মডেলের ভিত্তিতে নয়া প্রতিরক্ষা লাইনের পরীক্ষামূলক তিনটি ক্ষুদ্র অংশ নির্মাণে তিনি ও পল পেইনলেভি কমিটি অব ফ্রন্টিয়ার ডিফেন্স-এর জন্য সরকারী তহবিল বরাদ্দে সক্ষম হওয়ায় কাজে অগ্রগতি ঘটে। ১৯২৯ সালে আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে এসে

www.pathagar.com

ম্যাজিনো একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা লাইনের জন্য সরকারী তহবিল লাভ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণ শুরু হয়। তবে ৩ শ' কোটি ফ্রাঁ ব্যয়ে ১৯৩৫ সালের মধ্যে মূল নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের বিরুদ্ধে সোসালিস্ট ও কমিউনিস্টসহ অনেক মহল থেকে ব্যাপক বিরোধিতা করা হতে থাকে। কিন্তু ম্যাজিনো সবাইকে রাজি করানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীর জনবল হ্রাস এবং ব্যাপক রক্তপাত এড়িয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। ভার্সাই চুক্তিতে ফ্রান্সকে জার্মানীর রাইনল্যান্ডে সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দেয়া হলেও ফরাসী সৈন্যরা ১৯৩০ সালের মধ্যে সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য ছিল। সুতরাং এ বাফার জোন ফ্রান্সের জন্য উদ্বেগের কারণ। এসব যুক্তি তুলে ধরে ম্যাজিনো শান্তিবাদীদের আশ্বস্ত করেন যে, এ প্রতিরক্ষা লাইন হবে আত্মরক্ষামূলক। তিনি আরো বলেন, তাতে নতুন কর্মসংস্থান হলে শিল্পে গতি সঞ্চার হবে।

পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটি লক্ষ্য ছিল ফরাসী সৈন্যদের পুরোপুরিভাবে সমাবেশ ঘটানোর আগে যে কোনো আগ্রাসনে বাধা দেয়া এবং আরেকটি লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইনে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর হামলা ব্যর্থ করে দেয়া। পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের পক্ষে এ যুক্তিও প্রবল ছিল যে, এ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মিত হলে যে কোনো লড়াই হবে ফরাসী ভূখণ্ডের প্রান্তসীমায় এবং তাতে অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতি হবে কম এবং শত্রুর হাতে ভূখণ্ড হারানোর ঝুঁকিও হ্রাস পাবে। জার্মানী ও ইতালী হুমকি বলে বিবেচিত হওয়ায় এ দু'টি দেশের সীমান্ত বরাবর এ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতালীর সীমান্ত বরাবর নির্মিত ম্যাজিনো লাইনের অংশ আলপাইন লাইন হিসেবে পরিচিত ছিল। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ প্রতিরক্ষা লাইন আর্দেনিস পর্বতের ঘন জঙ্গল পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে এবং উত্তরদিকে যাবার প্রয়োজন হবে না। আর্দেনিসকে দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য বলে বিবেচনা করা হতো। উত্তরদিকে বেলজিয়াম সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন সম্প্রসারিত না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। ১৯২০-এর দশকে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করার সময় ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ছিল মিত্র। ১৯২০ সালে দু'টি দেশ একটি মৈত্রি চুক্তিতে সই করে। চুক্তিতে বলা হয় যে, জার্মান সৈন্যরা আক্রমণ চালালে ফরাসী সৈন্যরা বেলজিয়ামে প্রবেশ করে যুদ্ধ করবে। চুক্তিতে একথা উল্লেখ থাকায় তখন এটা ছিল অচিন্তনীয় যে, বেলজীয় সীমান্ত ফ্রান্সের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে কিংবা দেশটি মিত্রতা অস্বীকার করবে। তবে তার মানে এই ছিল না যে, এ এলাকাকে অরক্ষিত রাখা হবে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের প্রতিরক্ষায় ব্যাপকভিত্তিক দুর্গ গড়ে তোলা হলেও এটা মাথায় রাখা হয়েছিল যাতে ফরাসী সেনাবাহিনীর একটি বিশাল অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমবেত হয়ে প্রয়োজন হলে বেলজীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে লড়াই করতে পারে। আর্দেনিস পর্বতের ঘন জঙ্গল ছিল একটি সংযোগ এবং এ সংযোগকে দুষ্প্রবেশ্য বলে বিবেচনা করা হতো।

কয়েকটি কমিটি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত ছিল। কমিটি ফর দ্য অর্গানাইজেশন অব দ্য ফর্টিফাইড রিজিয়ন্স বা সিওআরএফ প্রতিরক্ষা লাইনের স্থান ও কার্যক্রম

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে। তবে প্রকৃত নির্মাণ কাজের নেতৃত্ব দেয় টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন বা এসটিজি। ১৯৪০ সাল নাগাদ তিনটি নির্দিষ্ট স্তরে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু ম্যাজিনো এ প্রতিরক্ষা লাইনের শেষ দেখে যেতে পারেননি। ১৯৩২ সালের ৭ জানুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন। পরে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিরক্ষা লাইনের নামকরণ করা হয় 'ম্যাজিনো লাইন।' ১৯৩০- ৩৬ সালের মধ্যে ম্যাজিনো লাইনের মূল কাজ সম্পন্ন হয়। তখন মূল পরিকল্পনার অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়। এসময় কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। দ্রুত অর্থনৈতিক ধস নামায় এ প্রকল্পের কয়েকটি উচ্চাকাংখী ডিজাইন বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে, রাইনল্যান্ডে জার্মানীর সামরিক তৎপরতা একটি ব্যাপক হুমকির সৃষ্টি করে। ১৯৩৬ সালে নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের মতো বেলজিয়ামও নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার আগের মিত্রতা ছিন্ন করে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ম্যাজিনো লাইন বেলজীয় সীমান্ত অবধি সম্প্রসারিত করার কথা থাকলেও বাস্তবে মাত্র কয়েকটি ব্যূহ নির্মাণ করা হয়। বিশ্লেষকগণ এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তবে বেলজিয়ামের ভেতরে প্রবেশ করে লড়াই করার মূল ফরাসী পরিকল্পনা ছিল অবিকৃত। এ পরিকল্পনাও সমালোচনার উর্ধে ছিল না। ১৯৩৬ সাল নাগাদ ম্যাজিনো লাইনের অবকাঠামো তৈরি শেষ হওয়ায় পরবর্তী ৩ বছরের মূল কাজ ছিল সৈন্য ও প্রকৌশলীদের এ প্রতিরক্ষা লাইন পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দান। সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্যমান ইউনিটে কর্মরত স্থল ও গোলন্দাজ সৈন্যদের পাশাপাশি প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের একটি অভিনব সংমিশ্রণে 'দুর্গ সৈন্যদের' গঠন করা হয়। ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে ব্যয়ের প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, মূল পরিকল্পনা ছিল অতিকায় অথবা নির্মাণ কাজে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করায় এ প্রকল্প কাটছাঁট করতে হয়েছে। কাটছাট করার প্রমাণ হিসেবে তারা বলছেন, তহবিল ফুরিয়ে যাওয়ায় বেলজীয় সীমান্তে প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করা হয়নি। অন্যান্যরা দাবি করছেন যে, যত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ব্যয় করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম। তার পরিমাণ ছিল দ্য গলের যান্ত্রিক বহরের ব্যয়ের চেয়ে কয়েক শ' কোটি ফ্রাঁ কম। সম্ভবত ৯০ শতাংশ। ১৯৩৪ সালে পেঁতাকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো ১শ' কোটি ফ্রাঁ দেয়া হয়েছিল। এ ব্যয় বরাদ্দকে অনেকে অত্যধিক ব্যয়ের লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করছেন। তবে এ ব্যয়ের আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ম্যাজিনো লাইনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। ম্যাজিনো লাইনকে অনায়াসেই পেঁতা কিংবা পেইনলেভি লাইন হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারতো। মার্শাল পেঁতা এ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণে প্রাথমিক গতি সঞ্চার করেছিলেন এবং তার সুখ্যাতি এ প্রকল্পকে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে মেনে নিতে উৎসাহিত করেছিল। অন্যদিকে, পল পেইনলেভি পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। তবে আঁন্দ্রে ম্যাজিনো দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন। তিনি অনাগ্রহী পার্লামেন্টকে অনুমোদন দানে সম্মত করিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে শুরু হলেও এক পর্যায়ে ম্যাজিনো লাইন ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। চীনের মহা প্রাচীর বা

www.pathagar.com

হাডরিয়ানার দেয়ালের মতো ম্যাজিনো লাইন একটি একক অব্যাহত অবকাঠামো ছিল না। পাঁচ শতাধিক পৃথক ভবনের সমন্বয়ে এ প্রতিরক্ষা লাইন গঠন করা হয়েছিল। প্রতিটি ভবন বিস্তারিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। মূল ইউনিটগুলো ছিল ফরাসী ভাষায় 'আওভরেস' নামে পরিচিত বৃহৎ দুর্গ। একটি থেকে আরেকটি দূর্গের দূরত্ব ছিল ৯ মাইল। কামান সজ্জিত ১০৮টি বৃহত্তম দুর্গের প্রতিটি দুর্গে সৈন্য ছিল ১ হাজার। বড় বড় দুর্গগুলোর মাঝে ছিল ২ থেকে ৫ শ' সৈন্যের ক্ষুদ্রাকার আওভরেস। এসব আওভরেসে কামান ছিল আনুপাতিক হারে বড় দুর্গের চেয়ে কম। স্থায়ী ভবনে অবস্থিত দুর্গগুলো শত্রুর ভারি কামানের গোলাবর্ষণ হজমে সক্ষম ছিল। স্টীলের আস্তরণ দিয়ে ৩ দশমিক ৫ মিটার পুরু কংক্রীটের তৈরি দুর্গগুলোর উপরিভাগ সুরক্ষিত করা হয়। ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার পুরু স্টীলের তৈরি গম্বুজগুলোর ভেতর থেকে কামান চালকরা গোলাবর্ষণ করতে পারতো।

ম্যাজিনো লাইনের পূর্বাংশে ছিল ৫৮টি এবং ইতালীয় সীমান্ত বরাবর ছিল আরো ৫০টি আওভরেস। দুর্গের এ নেটওয়ার্ক আরো অনেকগুলো প্রতিরক্ষা ব্যূহের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। এক মাইলের কম ব্যবধানে ছিল ছোট্ট বহুতল ব্লকের কুঠুরি। কুঠুরিগুলো নিরাপদ চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব চৌকি থেকে মুষ্টিমেয় সৈন্য আক্রমণকারী সৈন্যদের উপর হামলা চালাতে এবং তাদের পার্শ্ববর্তী চৌকিগুলো রক্ষা করতে পারতো। পরিখা, ট্যাংকবিধ্বংসী ফাঁদ ও মাইন ক্ষেত্রের সাহায্যে প্রতিটি অবস্থান সুরক্ষিত করা হয়। পর্যবেক্ষণ চৌকি ও অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো মূল প্রতিরক্ষা লাইনকে আগাম হুঁশিয়ার করে দিতো। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। কোনো কোনো এলাকায় সৈন্য ও সুরক্ষিত ভবন ছিল প্রচুর। আবার কোথাওবা কোনো দুর্গ অথবা কামান ছিল না। মেৎজ, লাউটার ও আলসেসের আশপাশের এলাকাগুলো ছিল খুবই শক্তিশালী। অন্যদিকে, রাইন ছিল দুর্বল। বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান দুর্গ এবং প্রতিরক্ষা অবস্থানকে অঙ্গীভূত করায় ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় সীমান্তের আলপাইন লাইনও ছিল সামান্য দুর্বল। এসব দুর্গ গিরিপথ ও সম্ভাব্য দুর্বল পয়েন্টের আশপাশে কেন্দ্রীভূত ছিল। এভাবে আল্পসের নিজস্ব ও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা জোরদার করা হয়। মোট কথা, ম্যাজিনো লাইন ছিল একটি ঘন ও বহুতল ব্যবস্থা সম্বলিত একটি প্রতিরক্ষা লাইন যাকে একটি বিরাট ফ্রন্টে 'অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণের লাইন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের সাহায্যে এ লাইন নির্মাণ করা হয়। বড় বড় দুর্গগুলো ছিল ৬ তলা সমান গভীর। সুবিশাল এ ভূগর্ভস্থ কমপ্লেক্সে ছিল হাসপাতাল, ট্রেন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্যালারি। সৈন্যরা ভূগর্ভে বসবাস এবং ঘুমাতে পারতো। মেশিনগান পোস্ট ও ফাঁদ যে কোনো আগ্রাসন প্রতিহত করতে পারতো। ম্যাজিনো লাইন একটি অগ্রবর্তী আত্মরক্ষামূলক অবস্থান হলেও ধারণা করা হয় যে, এ প্রতিরক্ষা লাইনের কয়েকটি এলাকা আণবিক বোমা হামলাও মোকাবিলা করতে পারতো। তখনকার রাজা, প্রেসিডেন্ট ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পরিদর্শন করেন বলে এ প্রতিরক্ষা লাইন ছিল সমকালীন যুগের একটি বিস্ময়।

www.pathagar.com

ম্যাজিনো লাইন পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া নির্মিত হয়নি। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে ভার্দুনের আশপাশে একটি দুর্গ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। দুআউমাঁ ছিল বৃহত্তম দুর্গ। গোপন এ দুর্গের কংক্রীটের ছাদ ও কামান বসানোর মঞ্চ ছাড়া আর কিছু দেখা যেতো না। মাটির নীচে ছিল আঁকাবাকা করিডোর, ব্যারাক রুম, গোলাবারুদের মজুদ ও ল্যাট্রিন। প্রকৃতই দুআউমঁ ছিল তদানীন্তন ফ্রান্সের সবচেয়ে বৃহত্তম ও সুপরিকল্পিত দুর্গ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বেলজীয় প্রকৌশলী হেনরি ব্রেইলমন্ট কয়েকটি সুবৃহৎ ও সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। এসব নেটওয়ার্কের অধিকাংশই ছিল পৃথক পৃথক দুর্গ। তিনি তার নেটওয়ার্ক তৈরিতে স্টীলের গম্বুজ ব্যবহার করেছিলেন। এ নেটওয়ার্কের দুর্বল দিকগুলো পরিহার করে সর্বোত্তম ধারণার ভিত্তিতে ম্যাজিনো লাইন তৈরি করা হয়। ব্রেইলমন্ট পরিখার সাহায্যে কয়েকটি দুর্গের সংযোগ ঘটিয়ে যোগাযোগ ও প্রতিরক্ষা জোরদার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত এ ধরনের ব্যবস্থা না থাকায় জার্মান সৈন্যরা এসব দুর্গ সহজেই অতিক্রমে সক্ষম হয়। এজন্য ম্যাজিনো লাইনে সুরক্ষিত ভূগর্ভস্থ ১শ' কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ও পরস্পর সংযুক্ত গোলাবর্ষণের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। দুআউমঁ বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি রোধে ম্যাজিনো লাইনে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকদেরও নিয়োগ করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স একাই প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করেনি। ইতালী, ফিনল্যান্ড, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস,বেলজিয়াম ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করে কিংবা প্রতিরক্ষা লাইনের উন্নয়ন ঘটায় যদিও এক দেশের প্রতিরক্ষা লাইনের সঙ্গে আরেক দেশের বিস্তর পার্থক্য ছিল। পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা উন্নয়নের দিক থেকে ম্যাজিনো লাইন নির্মাণ ছিল একটি যৌক্তিক পরিণতি। ফরাসী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আঁন্দ্রে ম্যাজিনো, ভার্দুন বিজয়ী মার্শাল পেঁতা ও অন্যান্যরা মনে করতেন, তারা বিগত অতীত থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি আদর্শ প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরিতে সর্বোত্তম প্রকৌশলকে ব্যবহার করছেন।

আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রযাত্রায় ম্যাজিনো লাইন কিভাবে বাধা দিতে পারতো এবং নানা কলা-কৌশলের হামলা কিভাবে রোধ করা সম্ভব হতো সে ব্যাপারে সামরিক কৌশলবিদ ও যুদ্ধবিশারদদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। ঐতিহাসিকরা এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে পরোক্ষভাবে ১৯৪০-এর দশকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীকে দায়ী করছেন। বলছেন, ঐ মুহূর্তে ফ্রান্স আক্রান্ত হওয়ায় এ প্রতিরক্ষা লাইনের নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। ১৯৪০ সালে নাৎসী জার্মানী 'সিচেলসনিট' বা কাট অব দ্য সিকল (কাঁচিকাটা) ছদ্মনামে ফ্রান্সে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করে। এ অভিযানে তিনটি জার্মান আর্মি গ্রুপকে নিয়োজিত করা হয়। একটি আর্মি গ্রুপকে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের মধ্য দিয়ে, আরেকটিকে ম্যাজিনো লাইন এবং তৃতীয়টিকে আর্দেনিসের বিপরীতে বেলজিয়াম ও ম্যাজিনো লাইনের মাঝের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। জেনারেল ভন লীবের নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সি ম্যাজিনো লাইন অতিক্রমের দুরূহ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ১৯৪০ সালের ১০ মে জার্মান আর্মি গ্রুপ এ বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে নেদারল্যান্ড আক্রমণ করে। ৫ দিনের মধ্যে তারা ফ্রান্সের গভীর

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাদের অগ্রযাত্রা ছিল অপ্রতিহত। এসময় বৃটিশ ও ফরাসীরা বেলজিয়ামে জার্মান হামলা প্রতিহত করতে ম্যাজিনো লাইনকে একটি অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যদিকে, জার্মান আর্মি গ্রুপ বি লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সোজা আর্দেনিসের দিকে মোড় নেয়। এভাবে জার্মানরা সরাসরি ম্যাজিনো লাইনে আঘাত হানা এড়িয়ে যায়। তবে সেখানে যে যুদ্ধ হয়নি তা নয়। ম্যাজিনো লাইনের যে ক'টি বড় দুর্গে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী সরাসরি আঘাত হেনেছিল সেগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

প্রায় ১০ লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য ও ১ হাজার ৫শ' ট্যাংক অনায়াসে আর্দেনিস ফরেস্ট অতিক্রম করে। এখানে ফরাসী ইউনিটগুলোর বিমান সহায়তার অভাব এবং জার্মান বোমারু বিমান-গুলোকে বাধা দেয়ার কোনো উপায় না থাকায় জার্মান সৈন্যরা খুব সামান্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। ১৫ মে আর্মি গ্রুপ বি-এর সামনে সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে গেলে ফরাসী সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে। ডানকার্কের ঠিক বাইরে এসে থামার আগে ২৪ মে নাগাদ জার্মান আর্মি গ্রুপ এ ও বি'র অগ্রযাত্রা ছিল বিরামহীন। ৯ জুন জার্মান সৈন্যরা পেছন থেকে আঘাত হেনে ম্যাজিনো লাইনকে বাদবাকি ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জার্মানদের বাধা দিতে অক্ষম হওয়ায় ফরাসী সরকার যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেয় এবং ২২ জুন কম্পেইনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে ম্যাজিনো লাইন ছিল তখনো অক্ষত। বেশ কয়েকজন ফরাসী কমান্ডার ম্যাজিনো লাইনের অভ্যন্তর থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেনারেল মাক্সিম ওয়েগাঁ আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। লড়াই চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ফরাসী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। সামনে ও পেছন থেকে খুব সামান্য জার্মান হামলা হওয়ায় এ প্রতিরক্ষা লাইন লড়াইয়ে কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পারতো। তবে এ লাইনের আল্পসীয় অংশ পুরোপুরি সফল হয়। এ অংশটি যুদ্ধবিরতি নাগাদ ইতালীয় সৈন্যদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। বিপরীতক্রমে, ১৯৪৪ সালের জুনে মিত্র বাহিনী এ লাইন এড়িয়ে হামলা চালালে জার্মান সৈন্যরা এটিকে প্রতিরোধ ও পাল্টা হামলা চালানোর একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে মেৎস ও আলসেসে তুমুল লড়াই হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ম্যাজিনো লাইনের প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো ভেঙ্গে না ফেলে বরং এগুলোকে সক্রিয় সার্ভিসে ফিরিয়ে আনা হয়। কয়েকটি আধুনিকায়ন করা হয় এবং অন্যান্য কয়েকটিকে পারমাণবিক হামলা মোকাবিলার উপযোগী করা হয়। তবে ১৯৬৯ সালের দিকে ফ্রান্স পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হলে ম্যাজিনো লাইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হতে থাকে এবং পরবর্তী দশকে এ লাইনের অনেকগুলো দুর্গ ও কুঠুরি বেসামরিক ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। বাদবাকিগুলো ক্ষয় হতে থাকে। আজকে ম্যাজিনো লাইনের কদর হচ্ছে মাশরুম চাষ, ডিস্কো ও জাদুঘরের কাছে। অনেকেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাভে হাতে লণ্ঠন কিংবা আলো নিয়ে ম্যাজিনো লাইন দেখতে যায়। ম্যাজিনো লাইনের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে আরেকটি বৈদেশিক আগ্রাসনে বাধা দেয়া। কিন্তু এ লাইন তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এটি আন্তর্জাতিক বিদ্রুপের

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছিল। জেনারেল শার্লে দ্য গল ছিলেন সমালোচনাকারীদের অন্যতম। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, এ প্রতিরক্ষা লাইন কোনো কাজে আসবে না। বড়জোড় ফরাসীরা এ প্রতিরক্ষা লাইনের দুর্গগুলোতে লুকিয়ে থাকতে পারবে এবং ইউরোপের খণ্ড বিখণ্ড হওয়া চেয়ে চেয়ে দেখবে। জেনারেল দ্য গল যতটুকু সমালোচনা করেছিলেন পরে সমালোচনা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী।

আধুনিক বিশ্লেষকগণ ম্যাজিনো লাইনের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করছেন। ঐতিহাসিক আয়ান আউসবাই ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তার 'অক্যুপেশনঃ দি অরডিয়েল অব ফ্রান্স' নামে পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে সময় ও অর্থের অযথা অপচয় হয়। ১৯৪০ সালে জার্মান হামলাকালে এ লাইনের অপ্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, ম্যাজিনো লাইন নির্মাণে রাইনল্যান্ডের উপর অত্যধিক জোর দেয়া হলেও বেলজিয়ামের সঙ্গে ফ্রান্সের ৪শ' কিলোমিটার সীমান্ত ছিল অরক্ষিত।' তবে এ সমালোচনা খণ্ডন করে অন্যান্যরা দাবি করছেন, এ লাইন ছিল পুরোপুরি সফল। কেননা, এটি ছিল পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র। বেলজিয়ামে প্রবেশ করে লড়াই করার বাকি অংশ পূরণ করা হয়নি বলেই এ লাইনকে ব্যর্থ মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া যেটুকু নির্মাণ করা হয় সেটুকু ছিল মূল পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত। ফলে এ লাইন তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

ম্যাজিনো লাইনকে দুর্ভেদ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, সত্যি কি এটি দুর্ভেদ্য ছিল? অথবা লোকজন কি সত্যি সে রকম ধারণা পোষণ করতো? বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে আক্রমণকারী বাহিনীর উপর হামলা চালানো কি এ লাইনের লক্ষ্য ছিল? অথবা তার দৈর্ঘ্য কি ছিল বিপজ্জনক একটি ভুল? কোনো সেনাবাহিনীকে দিকনির্দেশনা দেয়া যদি এ লাইনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে কেউ কি তা ভুলে গিয়েছিল? অথবা এ লাইনের নিরাপত্তায় কি কোনো ত্রুটি ছিল কিংবা তা কি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি? এসব প্রশ্নের কোনো সর্বসম্মত জবাব নেই। তবে এটা সত্য যে, ম্যাজিনো লাইন কখনো সরাসরি আক্রান্ত হয়নি। ম্যাজিনো লাইন নিয়ে যে কোনো আলোচনায় শুধু প্রতিরক্ষার প্রতি আলোকপাত করলে চলবে না। এ প্রকল্প ছিল সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাতে প্রয়োজন ছিল শত শত কোটি ফ্রাঁ ও পর্যাপ্ত কাঁচামাল। ম্যাজিনো লাইনের ভরসায় সামরিক ব্যয় ও পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় ফ্রান্সের নতুন নতুন অস্ত্র ও কলাকৌশল উদ্ভাবন মন্থর হয়ে পড়ে। তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ফরাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেনি। জার্মানী এগিয়ে যায় ভিন্ন ধারায়। দেশটি ট্যাংক ও বিমান নির্মাণে বিনিয়োগ করে। বিশ্লেষকগণ বলছেন, ম্যাজিনো প্রতিরক্ষার মানসিকতা গোটা ফরাসী জাতি, সরকার ও সেনাবাহিনীকে গ্রাস করেছিল। কূটনৈতিক-ভাবেও ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিজেকে নিজে রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় অন্যান্য দেশ ফ্রান্সকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে। এককথায়, ম্যাজিনো লাইন ফ্রান্সকে সম্মানিত করার পরিবর্তে অপমানিত করেছে বেশী।

www.pathagar.com

লন্ডনে জার্মান বিমানের একটানা ৫৭ দিন বোমাবর্ষণ

জার্মানীর পোল্যান্ড অভিযানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। পোল্যান্ড দখল করায় বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের যুদ্ধ ঘোষণার শাস্তি স্বরূপ এডলফ হিটলার ফ্রান্স দখল করে নেন। ফ্রান্স দখল শেষ হওয়ার পর তিনি ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে বৃটেনের প্রতি মনোযোগ দেন। বৃটেনের উপর তিনি স্থল অভিযান শুরু না করে বিমান আক্রমণ চালান।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী বছরের মে পর্যন্ত জার্মান বিমানবাহিনী (লুফটওয়াফে) লন্ডন ও অন্যান্য শহরে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে রাজধানী লন্ডনের উপর একটানা ৫৭ দিন বোমাবর্ষণ করা হয়। ১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রথমদিনের হামলায় অংশ নিয়েছিল ৩৪৮টি বোমারু ও ৬১৭টি জঙ্গীবিমান। জার্মান বোমাবর্ষণে বাকিংহাম প্রাসাদ, বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে (জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে), হাউস অব লর্ডস, ওয়েস্ট-মিনিস্টার হল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ প্রভৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

আজকে একথা শুনলে হয়তো অনেকেরই চোখ কপালে উঠবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে লন্ডনে এ দুঃসাহসিক হামলা পরিচালনা করা ছিল ছেলের হাতের মোয়ার মতো সহজ ব্যাপার। এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। তার নাম এডলফ হিটলার।

হিটলারকে যে যেভাবেই দেখুক না কেন, তিনি ছিলেন প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী। একজন জার্মান হিসেবে দেশের দুর্দশায় তার প্রাণ কেঁদে উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হলে মিত্রশক্তি জার্মানীকে ভাগাভাগি করে নেয়। চাপিয়ে দেয় ভার্সাই চুক্তি। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা ১ লাখে সীমিত করা হয়। বিমানবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ট্যাংক মোতায়েন নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩৩ সালে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার পর হিটলার ভার্সাই চুক্তির এসব অবমাননাকর ধারা অগ্রাহ্য করেন। জার্মান হের-এর আওতায় সাঁজোয়া সৈন্যদের জন্য একটি কমান্ড গঠন এবং লুফটওয়াফে পুনর্গঠন করা হয়। গ্রাউন্ড এ্যাটাক যুদ্ধবিমান তৈরি এবং এগুলো ব্যবহারের মতবাদও গ্রহণ করা হয়। লন্ডনের উপর জার্মানী যে বিমান হামলা চালায় ইতিহাসে তা ব্লিৎসক্রিগ হিসেবে পরিচিত। জার্মানীর সে সময়কার সামরিক কাঠামো পরিবর্তন করা ছাড়া ব্লিৎসক্রিগ পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে জার্মান স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্লিৎসক্রিগ কৌশলের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে। জার্মান বিমান বাহিনী

www.pathagar.com

স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপক লাভবান হয়। জার্মান বিমান বাহিনীর জাংকার্স জেইউ-৮৭ স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এ গৃহযুদ্ধে ১৮ হাজার লুফটওয়াফে সৈন্য অংশগ্রহণ করে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে নাৎসী ব্লিৎসক্রিগের পর বৃটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন থেকেই লন্ডনে জার্মান বিমান হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। বিমান হামলার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নেয়া হয়। লোকজনের বাগানে বাংকার খোঁড়া হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যে ১৩ শতাংশ লোক লন্ডন থেকে পালিয়ে যায়। বহু শিশুকে গ্রামের বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। তবে সম্ভাব্য বিমান হামলা না হওয়ায় যেসব লোক লন্ডন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেকেই ধীরে ধীরে ফিরে আসে। ফ্রান্সের পতন এবং হামলা আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও লোকজনের ফিরে আসা বন্ধ হয়নি। ১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বোমারু বিমান লন্ডনের আকাশে এসে হাজির হয়। রাজকীয় বিমানবাহিনী (আরএএফ) ধ্বংসের লক্ষ্যে জার্মান বিমান বাহিনী প্রথম হামলাটি চালায়। জার্মান বোমারু বিমানগুলো দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বিগিন হীলের মতো বিমানঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানায় বোমাবর্ষণ করে। বৃটেনে জার্মানীর এ বোমাবর্ষণ 'ব্যাটল অব বৃটেন' বা বৃটেনের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

১৯৪০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর নাগাদ দক্ষিণ ইংল্যান্ডের রণক্ষেত্রে মূলত বৃটেনের বিখ্যাত স্পিটফায়ার বিমানের সঙ্গে জার্মান বিমান স্টুকার মোকাবিলা হয়। জার্মান বিমান হামলাগুলো ধারণাতীতভাবে সফল হয়। অন্যদিকে, বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর অগণিত পাইলট নিহত এবং বিমান ধ্বংস হয়। বৃটেনের ভাগ্য ভালো যে, জার্মানরা সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে তাদের রণকৌশলে পরিবর্তন আনে এবং তারা বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণের পরিবর্তে লন্ডনে একটানা বোমাবর্ষণ করতে থাকে। এতে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়। লন্ডনের উপর জার্মানীর প্রথম বড় আকারের বিমান হামলার লক্ষ্য ছিল শিল্পাঞ্চল ও মূলত লন্ডনের ইস্ট এ্যান্ডে ডকল্যান্ড ধ্বংস করে দেয়া।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ দিন ও রাতে বিমান হামলা হতো। দিনে দুপুরে বিমান আক্রমণে বিপুলসংখ্যক বিমান খোয়া যাওয়ায় জার্মানরা তাদের কৌশল পাল্টিয়ে ফেলে এবং কেবলমাত্র নৈশকালে তাদের বিমান আক্রমণ সীমিত করে। নৈশকালীন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকার্যকর প্রমাণিত হলে বিমানবিধ্বংসী কামানের উপর লন্ডনবাসীদের প্রবল আস্থায় ধস নামে। তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শত্রু বিমান ভূপাতিত হয়নি। এ সময় বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীতে দ্রুতগতিতে উড্ডয়নে সক্ষম কোনো বিমান ছিল না।

ইস্ট এ্যান্ডে প্রাথমিক বিমান আক্রমণের পর লুফটওয়াফে মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে বাদবাকি লন্ডনের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। এসময় বাকিংহাম প্রাসাদেও বোমাবর্ষণ করা হয়। বাকিংহাম প্রাসাদে ঠিক ঐ সময় জার্মান বিমান বোমাবর্ষণ করে যে মুহূর্তে তদানীন্তন রানী এলিজাবেথ (পরে রানী মাতা) ইস্ট এ্যান্ডে জার্মান বোমাবর্ষণের

www.pathagar.com

ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখেছেন বলে বিবৃতি দিচ্ছিলেন। প্রায় প্রতি রাতে বিমান হামলা হতো এবং বৃটিশ রাজধানীর উপর বিপুল সংখ্যক জার্মান বোমারু বিমান শ' শ' টন আগুনে বোমা নিক্ষেপ করতো। পাশাপাশি ৩ থেকে ৪ শ' জঙ্গীবিমান তার দ্বিগুণ বোমাবর্ষণ করতো। এসব বোমাবর্ষণে লন্ডনের জীবনযাত্রা তছনছ হয়ে যায়। সড়ক ও রেলপথ ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া পয়ঃনিষ্কাশন, পানি ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামোও বিধ্বস্ত হয়। এসময় লন্ডনের বাসিন্দাদের মনোবল কিংবদন্তীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নৈশকালীন বিমান আক্রমণ উপেক্ষা করে সাধারণ নর-নারী ও শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন অব্যাহত রাখতো। এক সময় সবাই বিমান আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যেমন—জার্মান বিমান হামলাকালে সিনেমা হলগুলো খোলা থাকতো এবং দর্শকরা যথারীতি ছবি উপভোগ করতো। বাহ্যিকভাবে লন্ডনবাসীদের এসব স্বাভাবিক জীবন যাপন সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক নিজ নিজ বাড়িঘরে অবস্থান করতো।

১৯৪০ সালের নভেম্বর থেকে লুফটওয়াফে লন্ডনের উপর থেকে মনোযোগ প্রত্যাহার করে এবং অন্যান্য শহর ও নগরে বোমাবর্ষণ শুরু করে। তার দু'মাস আগে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে পরিকল্পিত অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে লুফটওয়াফে রাজকীয় বিমানঘাঁটি ও রাডার স্টেশনগুলো ধ্বংসে বোমাবর্ষণ করে। বৃটিশদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে তাদের হীন শর্তে চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে রাজি করাতে হিটলার লন্ডন ধ্বংসে মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। জার্মানী প্রথমে লন্ডনে বোমাবর্ষণ করেছিল দুর্ঘটনাক্রমে। ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট জার্মান বোমারু বিমানগুলো সামরিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণ করতে এসে গতিপথ হারিয়ে ভুলক্রমে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে বোমাবর্ষণ করে। এতে বহু আবাসিক ভবন ধ্বংস ও প্রচুর বেসামরিক লোক নিহত হয়। লন্ডনের প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ হয়। প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ধারণা করেছিলেন যে, বেসামরিক নিরীহ লোকজনের উপর জার্মানীর বিমান হামলা ইচ্ছাকৃত। তাই তিনি পাল্টা বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন। পাল্টা বোমাবর্ষণের মূলে ছিল তার এ ভুল ধারণা। চার্চিল লন্ডনে বোমা হামলার পরদিন রাতে বার্লিনে বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন। ৪৫টি বোমারু বিমান বার্লিনের আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু বৃটিশ বোমাবর্ষণ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। বার্লিনে এটাই ছিল প্রথম বোমাবর্ষণ। এ বোমা হামলায় বার্লিনের বাসিন্দাগণ অত্যন্ত অবাক হয়। তারা তাদের একজন নেতার উপর ভীষণ চটে যায়। ওই নেতা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বার্লিনে কখনো বিমান হামলা হবে না। ২৮-২৯ আগস্ট জার্মানীতে আরেক দফা বৃটিশ বিমান হামলায় বেশ কিছু জার্মান নিহত হয়। দু'রাত পর জার্মানীতে আবার হামলা হয়। জার্মানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। এসময় হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করেন, বৃটিশ বিমান বাহিনী ২০০০ থেকে ৪০০০ কিলোগ্রাম ওজনের বোমাবর্ষণ করলে জার্মানী ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ ওজনের বোমাবর্ষণ করে প্রতিশোধ নেবে।

৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪ টায় লন্ডনে বোমাবর্ষণ শুরু হয় এবং ৬টা নাগাদ স্থায়ী হয়। বিমান হামলায় দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। এ আগুন দ্বিতীয় বহরের

www.pathagar.com

বোমাবর্ষণকে সহজতর করে তোলে। দ্বিতীয় দফা বোমাবর্ষণ রাত সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা ছিল লন্ডন ও অন্যান্য বৃটিশ শহরে সর্বাত্মক হামলার সূচনা মাত্র। এ হামলা ১৯৪১ সালের মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পর পর ৫৭ দিন লন্ডনে দিনের আলোয় নয়তো রাতের অন্ধকারে বোমাবর্ষণ করা হয়। অগ্নিকাণ্ডে লন্ডনের অধিকাংশ এলাকা ভস্মীভূত হয়। লোকজন যে যেখানে সম্ভব সেখানে আশ্রয় নেয়। অনেকে ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলোতেও আশ্রয় নেয়। রাতে অন্তত ১ লাখ ৭৭ হাজার লোক ভূগর্ভস্থ স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করতো। একটি একক ঘটনায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একটি স্কুলে বোমায় সাড়ে ৪শ' লোক নিহত হয়।

পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর স্বার্থে হিটলার ১১ মে লন্ডনে বোমাবর্ষণ স্থগিত করেন। দু'মিনিট অন্তর জার্মান বিমানগুলো মৌমাছির মতো লন্ডনের উপর দিয়ে উড়ে যেতো। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর এখানে সেখানে বোমা পড়তো। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বেপরোয়া বোমাবর্ষণের আগে জার্মানী কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে বোমাবর্ষণ করতো। পরে তারা ইংল্যান্ডের শহরগুলো লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করতে থাকে। ফলে জার্মানীর অগোচরে ইংল্যান্ড তার বিমানঘাঁটি পুনঃনির্মাণ, নতুন পাইলটদের প্রশিক্ষণদান এবং জঙ্গীবিমান মেরামত করার সুযোগ পেয়ে যায়। লন্ডনে নৈশকালীন বোমাবর্ষণকালে লোকজন গুদামঘর ও ভূগর্ভস্থ বাংকারে ঘুমাতো। তাদের গোপনীয়তা বলতে কিছু ছিল না এবং শোবার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। ১৪-১৫ নভেম্বর কভেন্ট্রি নামে মধ্য ইংল্যান্ডের একটি ক্ষুদ্র শহরে জার্মান বিমান হামলা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সেদিন জার্মানী এ শহরে আনুমানিক সাড়ে ৪শ' বৃহদাকার বোমা, ১ হাজার ৪শ' উচ্চ বিস্ফোরক ও অন্যান্য ক্যাটাগরির আরো ১ লাখ বিস্ফোরক বর্ষণ করে। এতে ৫০ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং ৫৬৮ জন নিহত ও আরো ১ হাজার লোক আহত হয়। ২৯-৩০ ডিসেম্বর রাতে জার্মানীর নিক্ষিপ্ত বোমায় বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সূচনা হয় এবং বহু গীর্জা ভস্মীভূত হয়। ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে যেগুলো ধ্বংস হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল, বাকিংহাম প্যালেস, ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবন। ১৯৪০ সালের শেষদিকে জার্মান বিমান হামলায় ১৫ হাজার বৃটিশ নাগরিক নিহত হয়। হিটলার চাইতেন বৃটিশরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করুক। এ লক্ষ্য নিয়ে তিনি এসব বিমান হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জার্মান বিমান হামলায় অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হলেও ইংরেজরা এতে ঐক্যবদ্ধ এবং যে কোনো ধরনের নাৎসী হামলা থেকে নিজেদের রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে জার্মান বিমান বাহিনী রাজকীয় বৃটিশ বিমান বাহিনী ও বৃটিশ বিমান নির্মাণ শিল্প ধ্বংস করে দিয়ে দক্ষিণ বৃটেন ও ইংলিশ চ্যানেলে আকাশযুদ্ধে আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা চালায়। জার্মানরা বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর উপর বিজয় লাভকে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পূর্ণাঙ্গ অভিযানের জন্য অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করে। ১৯৪০ সালে তারা ব্লিৎসক্রিগ (বিদ্যুৎগতিতে হামলা) কৌশল গ্রহণ করে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রান্স পদানত করে। স্থল বাহিনীর সঙ্গে বিমান বাহিনীর ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব দেশ দখল করে নেয়া হয়। উল্লেখিত দেশগুলো দখলে

www.pathagar.com

লুফটওয়াফে মূল ভূমিকা পালন করলেও বৃটেন দখলে জার্মান বিমান বাহিনীর দূরপাল্লার অপারেশনের জন্য সজ্জিত হওয়ার এবং তদ্রুপ প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের এ দু'টির কোনোটাই ছিল না। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়, জার্মানরা রাজকীয় বিমান বাহিনী ধ্বংসে সফল হলে তারা অনায়াসে বৃটেনে স্থল হামলা চালাতে সক্ষম হতো। হবে একথাও সত্যি যে, বৃটেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঐ সময় বৃটেন ছাড়া ইউরোপে নাৎসী হামলা মোকাবিলা করার মতো আর কোনো দেশ ছিল না।

১৯৪১ সালের জুন নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেনি। একই বছরের ডিসেম্বর নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়নি। এ চরম সন্ধিক্ষণে ২০ আগস্ট পার্লামেন্টে উইন্সটন চার্চিল তার বিখ্যাত ভাষণে অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, মানব ইতিহাসে আর কখনো কোনো সংঘাতে এত বিপুলসংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে এত মুষ্টিমেয় লোক লড়াই করেনি। বৃটেনে সর্বাত্মক জার্মান বিমান হামলা সত্ত্বেও পরিকল্পনায় তাদের অপরিপক্কতার আভাস ফুটে উঠে।

বৃটেনে বিমান হামলার পরিকল্পনা প্রণয়নকালে তারা ইংলিশ চ্যানেলকে একটি ক্ষুদ্র বাধা হিসেবে গণ্য করে ভুল করে। তারা ইংলিশ চ্যানেলকে একটি প্রশস্ত নদী পারাপারের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেনি। হিটলার তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাজকীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হলেও তিনি বৃটেনে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হতেন না। কারণ বৃটিশ নৌবাহিনী তখনো ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জার্মান যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিতে ছিল পুরোপুরি সক্ষম। অন্যদিকে, জার্মানদের পরিকল্পিত বিজয়ে বৃটিশ বিমান বাহিনী দমন করা হতো তাদের পক্ষে প্রথম দুরূহ কাজ। তবে এটাই তাদের সামনে একমাত্র বাধা ছিল না। বৃটিশরা আরো কলাকৌশল অবলম্বন করতে পারতো। বৃটিশরা যদি দেখতে পেতো যে, তাদের প্রচুর বিমান খোয়া যাচ্ছে তাহলে তারা উত্তরদিকে তাদের বিমানগুলো প্রত্যাহার করে নিয়ে যেতো। সেক্ষেত্রে কোনো বাধাই তাদের রুখতে পারতো না। ফলে তখনো সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসন মোকাবিলায় বৃটিশরা তাদের বিমান বহর রিজার্ভ রাখতে পারতো। স্পষ্টতই এ ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল যে, বৃটেন বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন করতে লুফটওয়াফেকে সত্যিকার সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। মে মাসের শেষ দিকে ডানকার্ক উপকূল থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য অপসারণকালে জার্মানীর প্রথম বিপর্যয় ধরা পড়ে।

মের্সাসমিট বিএফ-১০৯ (এমই-১০৯) নামে আধুনিক জঙ্গীবিমান ছিল লুফটওয়াফের মূল অবলম্বন। কিন্তু এ বিমানের পাল্লা ছিল সীমিত। এসব বিমান ডানকার্কের অনেক দূরবর্তী ঘাঁটি থেকে অপারেশন চালাতো। ফলে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমানগুলোর অবস্থা নাজুক হয়ে দাঁড়ায়। ডানকার্কে জার্মানদের বিপর্যয় এ আভাস দিচ্ছিল যে, খোদ বৃটেনের মূল ভূখণ্ডে তারা শিগগির অনুরূপ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। ডানকার্ক অপারেশনে জার্মানরা ২৪০টি বিমান হারায়। অন্যদিকে, বৃটেনের খোয়া যায় ১৭৭টি বিমান। ফ্রান্স অভিযানে জার্মানীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপরিমেয়। এ অভিযানে তাদের ৩০ শতাংশ বিমান খোয়া যায়। এসময়

www.pathagar.com

যুদ্ধবিমান নির্মাণে জার্মানী মিত্রপক্ষের বহু পেছনে পড়ে যায়। ১৯৩৯ সালে বৃটেনে সর্বাত্মক স্থল হামলার সূচনা হিসেবে লুফটওয়াফে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হলেও তৎক্ষণাৎ এ পরিকল্পনা নাকচ করে দেয়া হয়। বৃটিশ নৌ বাহিনীর শক্তি বিবেচনা করে জার্মানী এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, তাদেরকে প্রথম সুযোগেই রাজকীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দিতে হবে।

পোল্যান্ড, স্ক্যান্ডেনেভিয়া ও ফ্রান্স অভিযান সফল হওয়ার পর জার্মানদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, বৃটেন অভিযানও অনুরূপ সহজ হবে। কিন্তু জার্মানরা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে, বৃটেন অভিযান সহজসাধ্য নয়। বৃটেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। ফলে পরিস্থিতি জার্মানদের জন্য আরো কঠিন হয়ে ওঠে। অধিকন্তু তাদেরকে বোমারু বিমানের নিরাপত্তা বিধানে সীমিত পাল্লার জঙ্গীবিমানের আওতায় অপারেশন চালাতে হয়।

বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর শক্তিকে খাটো করে দেখা এবং বৃটিশ বিমান নির্মাণকারী শিল্পের ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা ছিল জার্মানদের বিজয়ের পথে আরেকটি বাধা। জার্মানরা ধারণা করেছিল, তারা মাত্র ৪ দিনে বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমান্ড এবং ৪ সপ্তাহে বৃটিশ বিমান নির্মাণকারী শিল্প ধ্বংসে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, জার্মান বিমান শক্তি ও তাদের দক্ষতা সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা করে বৃটিশরাও ভুল করেছিল। এ ধরনের ভুল হিসাব দুর্ভাগ্যজনক হলেও তা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার মতো কোনো কারণ ছিল না। এসময় বৃটিশরা রাডার আবিষ্কার করে। ফলে রাডার শত্রু বিমান চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া বৃটিশদের কাছে জার্মানদের পারস্পরিক যোগাযোগের বার্তাও ধরা পড়ে। আকাশে প্রাধান্য বিস্তারে উভয় পক্ষ ছিল প্রায় সমান সমান। সকল জার্মান বিমান স্পেনের গৃহযুদ্ধে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে। এমই-১০৯ ছিল মূল জার্মান জঙ্গীবিমান। কেন্টে উড়ে এলে তার মাত্র ১৫ মিনিটের জ্বালানি অবশিষ্ট থাকতো এবং লন্ডনের উপরে তার পাল্লা সীমিত হয়ে পড়তো। দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট এমই-১১০'র পাল্লা ছিল সামান্য বেশি। জার্মানরা দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট মাঝারি পাল্লার ডোর্নিয়ার-১৭, জাংকার্স-৮৮ স্টুকা বোমারু বিমানও ব্যবহার করতো। সেনাবাহিনীকে সরাসরি সমর্থন দিয়ে স্টুকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও রাজকীয় বিমান বাহিনীর মোকাবিলায় এগুলো চরমভাবে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হতো।

www.pathagar.com

আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে জার্মানী ইউরোপের এক একটি দেশকে পদানত করার পর যুদ্ধকে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে ঠেলে দেয়। এডলফ হিটলার ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একইদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হাওয়াই দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারে জাপানী নৌ হামলার ৪ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধে যায়। দু'টি দেশ সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হলেও জার্মান সৈন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূলে ইউ-বোটের তৎপরতা ছাড়া জার্মানীর আর কোনো সাফল্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে হিটলার অনায়াসে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে বিজয়ী হতে পারতেন। অফুরন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ঐতিহাসিকরা হিটলারের যতগুলো ভুল উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অন্যতম।

১২ ডিসেম্বর প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে জার্মান ইউ-বোট আমেরিকার পানি সীমায় তৎপরতা শুরু করে। এ অপারেশনের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন ড্রামবিট'। ইউ-বোটের কমান্ডার-ইন-চীফ এডমিরাল ডোয়েনিটস ছিলেন এ পরিকল্পনার রূপকার। তিনি বরাবরই বিশ্বাস করতেন, জার্মান ইউ-বোট বিনা চ্যালেঞ্জে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। ইউ-১২৩ এর ক্যাপ্টেন হার্ডেগান ও তার ক্রুরা নোভা স্কোটিয়া উপকূলে 'সাক্লোপস'কে ডুবিয়ে দেয়। ১৪ ডিসেম্বর ইউ-১২৩ লং আইল্যান্ডের মোন্টাউক পয়েন্ট থেকে ৬০ মাইল দূরে 'নোরনেস'কে ডুবিয়ে দিলে যুদ্ধ নিউইয়র্ক উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সন্ধ্যায় ইউ-১২৩ একইভাবে লং আইল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল ধরে পশ্চিম দিকে নিউইয়র্কের দিকে এগিয়ে যায়। এ জার্মান সাবমেরিন রকএ্যাওয়ের সৈকতের কাছাকাছি ভিড়ে। তবে ক্রুদের কাছে এলাকার কোনো সুনির্দিষ্ট মানচিত্র ছিল না এবং রকএ্যাওয়ের দক্ষিণমুখী বাঁক সম্পর্কেও তারা আঁচ করতে পারেনি। ইউ-১২৩ ফোর্ট টিলডেন বা জ্যাকব রিস বীচের উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছিল। একইদিন রাত ১০ টায় ক্যাপ্টেন হার্ডেগোন ৩৩০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে নিউইয়র্ক শহরের বাতি দেখতে পান। তবে ফোর্ট টিলডেনে মোতায়েন রক্ষীরা জার্মান ইউ-বোটকে দেখতে পায়নি এবং এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। পরে ১১০ ডিগ্রি কোণ ধরে ইউ-১২৩ নিউ জার্সির উপকূল বরাবর ডেলাওয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯৪২ সালে প্রথম ৬ মাসে মোট ৩৯৭ টি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। মেইন থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত আটলান্টিক উপকূলে ১৭১ টি, মেক্সিকো উপসাগরে ৬২ টি ও ক্যারিবীয় সাগরে ১৪১ টি জাহাজ ডুবে যায়। এ সময় ২,৪০৩ জন নৌ-সেনা নিহত ও ১,১৭৮ জন আহত হয়। উপকূল থেকে রাতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেতো এবং হতাহত ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নিতেও দেখা যেতো। এ সব ঘটনা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও জার্মানীর উপকূলের মতো যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে কখনো নিষ্প্রদীপ সতর্কতা দেখানো হয়নি। এতে জার্মান সাবমেরিনগুলো ধারণাতীত সুবিধা পেয়ে যায়। তারা রাতের আঁধারে তাদের বাতি নিভিয়ে উপকূলে চলাচলকারী মালবাহী জাহাজগুলো শনাক্ত এবং ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে বাতি নিভিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে বাতি নিভিয়ে দেয়া হলেও উপকূলের মাত্র ২৫ মাইল দূর থেকে টহল বোটগুলো নিউইয়র্কের আলোকছটা দেখতে পেতো। ১০ নভেম্বর জার্মান সাবমেরিন ইউ-৬০৮ নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ে ১০ টি মাইন পুঁতে। একটি মাইন খুঁজে পাওয়া যায় এবং দু'দিনের জন্য নিউইয়র্ক পোতাশ্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৪২ সালের ১৩ জুন ইউ-২০২ থেকে ৪ জন জার্মানের একটি অন্তর্ঘাতক দল লং আইল্যান্ডের আমগানসেটে অবতরণে সক্ষম হয়। ১৬ জুন ৪ জনের আরেকটি দল ফ্লোরিডার পোন্টে ভেড্রায় অবতরণ করে। তাদের কাছে ছিল বিস্ফোরক। তাদের লক্ষ্য ছিল কলকারখানা, সেতু, সুরঙ্গ, বিদ্যুত প্রকল্প ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া। ৮ জনের সকলেই ধরা পড়ে এবং ৮ আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে তাদের ৬ জনের মত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা ছিল এক অভাবিত ঘটনা। জার্মান সেনা কমান্ড ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পড়ে। মিলিটারি হাই কমান্ডের অপারেশন স্টাফ প্রধান জেনারেল আলফ্রেড জোডল হন্তদন্ত হয়ে 'ওবারকমান্ডো দার ওয়ারম্যাট (ওকেডব্লিউ)'র প্ল্যান সেকশনের প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্ল্যান সেকশনের প্রধান জেনারেল ওয়াল্টার ওয়ার্লিমন্টকে জানান যে, ফুয়েরার এইমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য প্রাথমিকভাবে কোথায় কোথায় মোতায়েন করা হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তার স্টাফকে নির্দেশ দিয়েছেন। জেনারেল ওয়ার্লিমন্ট একমত পোষণ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। তাই এটা পরীক্ষা করে দেখার মতো প্রয়োজনীয় উপাত্ত আমাদের হাতে নেই।

জার্মানরা ভাবতে পারেনি যে, ত্রিপক্ষীয় জোটের অংশীদার জাপানের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার সীমা ডিঙ্গিয়ে হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। জার্মানরা বড়জোর মনে করতো হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। সকল প্রাথমিক লক্ষণ এ ইঙ্গিতই দিচ্ছিল যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য নৌ-বাহিনীর এডমিরালদের চাপ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ জুলাই হিটলার এডমিরাল এরিখ রীডারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াইকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে বৈরি করে তুলতে চান না। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক

www.pathagar.com

উপকূলে আঘাত হানার জন্য জার্মান ইউ-বোট (ডুবোজাহাজ) বহরের কমান্ডার এডমিরাল ডোয়েনিটস বারংবার অনুরোধ করছিলেন। হিটলার তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছিলেন। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম থেকে পরবর্তী সময়ে আমেরিকার তরফে অসংখ্য প্ররোচনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সুযোগ না দেয়ার নীতিতে জার্মানী অটল থাকে। হিটলার যাত্রীবাহী মার্কিন জাহাজগুলোতে টর্পেডো নিক্ষেপ না করতে কঠোরভাবে বারণ করেছিলেন। এমনকি যুদ্ধজাহাজের বহরের ভেতর থাকলেও নয়। নিরপেক্ষ দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে প্ররোচনা না দেয়ার জন্য তিনি এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার তার এ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কোনো জেনারেল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা কেবিনেটের কোনো সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করা ছাড়াই তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কেউ কেউ ধারণা করতেন, হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তারা তার এ সিদ্ধান্তে হতাশ হন।

কেন হিটলার তার অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন সে প্রশ্নের জবাবে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন। তবে সকল ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হিটলার একা এবং তিনি এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যা জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত করে তুলেছিল। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণা ১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে জার্মানীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের স্বয়ংক্রিয় বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এ চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ ছিল, চুক্তি স্বাক্ষরকারী তিনটি দেশ এই মর্মে অঙ্গীকার করছে যে, বর্তমানে ইউরোপীয় রণাঙ্গন কিংবা চীন-জাপান সংঘাতে জড়িত নয় এমন কোনো দেশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোনো দেশের উপর আক্রমণ চালালে একে অপরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক উপায়ে সহযোগিতা করবে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত উভয় মহাসাগরের ওপারে যুদ্ধকে ঠেলে দেয়ার হুমকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা এবং ওয়াশিংটনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলাই ছিল ত্রিপক্ষীয় চুক্তির লক্ষ্য। একথা সত্যি চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী পক্ষগুলো সম্মত হয়েছিল যে, চতুর্থ শক্তির আগ্রাসনের শিকার যে কোনো পক্ষকে সহায়তা দেয়া হবে। অন্যদিকে, চুক্তিতে একথাও উল্লেখ করা হয়, 'চুক্তির ৩ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী কোনো পক্ষ আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা স্বাক্ষরকারী তিনটি পক্ষ (জার্মানী, জাপান ও ইতালী) নির্ধারণ করবে'। চুক্তির এ শর্ত থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে জাপানের সহায়তায় এগিয়ে যেতে হিটলারের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

১৯৪১ সালের ১৪ এপ্রিল হিটলার ত্রিপক্ষীয় চুক্তির সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে জাপানী রাষ্ট্রদূত ইউসুকে মাৎসুওকাকে এ আশ্বাস দেন যে, 'জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে জার্মানী অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং এক্ষেত্রে কে যুদ্ধ শুরু করলো তা বিবেচ্য হবে না'। জাপানী রাষ্ট্রদূত মাৎসুওকা হিটলারের এ প্রতিশ্রুতির প্রতি হয়তো

www.pathagar.com

কর্ণপাত করেননি অথবা তিনি তার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে ব্যর্থ হন। জাপানকে অযাচিত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়ার অর্থ একটাই হতে পারে যে, হিটলার চাইছিলেন আসন্ন রাশিয়া অভিযানে জাপানও অংশগ্রহণ করুক। কিন্তু জাপান স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে থাকে যে, সে রুশ অভিযানে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নয়। জাপানের এ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে হিটলার অনায়াসে চুক্তির মূল ধারায় ফিরে আসতে পারতেন। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে হিটলার পারস্পরিক সুবিধা আদায়ে জাপানের উপর চাপ প্রয়োগ করা থেকে বিরত হন। জাপানের কাছ থেকে রুশ অভিযানে সহায়তা লাভের অঙ্গীকার আদায় করা ছাড়াই দৃশ্যতঃ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্রস্তুত ছিলেন। মর্যাদাবোধের তাড়না থেকে হিটলার জাপানকে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ওয়াদা পূরণে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিতে চাইলে তার অজুহাতের অভাব হতো না। ঐতিহাসিক সেলিগ এডলার মন্তব্য করেছেন, 'সম্মানবোধের চেয়ে অন্য একটি বিষয় হিটলারকে নিরপেক্ষ থাকার পরিবর্তে বরং জাপানকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে অবিচল থাকতে বাধ্য করে'।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যাচ্ছে জাপান আমেরিকার পরিবর্তে বৃটেন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে হিটলার অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ছিল বৃটেনের একমাত্র ভরসাস্থল। দৃশ্যপট থেকে রাশিয়া অপসৃত হয়ে গেলে আমেরিকাও বৃটেনের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারতো না। কারণ রাশিয়ার পরাজয়ে দূরপ্রাচ্যে জাপানের শক্তি অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতো। পশ্চাৎদিক দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার রুশ হুমকি তিরোহিত হলে জাপান এশিয়ায় বৃটেনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যেতে পারতো। এভাবে সে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঠেকিয়ে দিতে পারতো। আমেরিকার বিদ্যমান সহায়তা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হলে বৃটেনের নিশ্চিত পতন ঘটতো। একই সঙ্গে জার্মানীর ইউ-বোটের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে মার্কিন সহায়তা লাভে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের প্রত্যাশা ভেস্তে যেতো। ফলে মিত্রহীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে হিটলারের উপর আঘাত হানাকে দুঃসাধ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হতো।

রাশিয়া অভিযানে জাপান অংশগ্রহণ করবে না এবং জাপানী সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করাও বৃথা- একথা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর হিটলার যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি তার নিজের সমর্থনের বিনিময়ে জাপানের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারতেন। একটি ছিল ভ্লাডিভোস্টকের মধ্য দিয়ে জাহাজ যোগে রাশিয়ায় আমেরিকার সাহায্য প্রেরণ বন্ধ এবং আরেকটি ছিল সাইবেরিয়ায় রুশ সৈন্যদের ব্যস্ত রাখা। এ দু'টির একটি প্রতিশ্রুতি তিনি জাপানের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। এক্ষেত্রে জাপানীরা অনমনীয় হলে হিটলারও আমেরিকাকে শত্রুতে পরিণত না করার এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার অজুহাত তুলে না দেয়ার নীতিতে অটল থাকতে পারতেন। দৃশ্যতঃ কোনো সুবিধা অর্জন করা

www.pathagar.com

ছাড়াই হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঝুঁকি নেন। এভাবে তিনি পার্ল হারবারে জাপানী হামলার একক বৃহত্তম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তিনি ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মনযোগ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। এর আগে ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে জানান, যুক্তরাষ্ট্র জাপান আক্রমণ করলে অবিলম্বে জার্মানীও যুদ্ধে যোগদান করবে। উত্তরে জাপানী রাষ্ট্রদূত বলেন, ইউরোপে জার্মানীর বিজয় অর্জিত হওয়া নাগাদ জাপান রণাঙ্গন ত্যাগ করবে না। ওয়াশিংটন আলোচনা ভেঙ্গে পড়েছে এবং আমেরিকার হুমকি ত্রাসে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে জাপানের পরিকল্পনা রয়েছে- একথা হিটলারকে অবহিত করার জন্য ৩০ নভেম্বর জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদেকি তোজো রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে নির্দেশ দেন। পার্ল হারবারে জাপানী হামলা শুরু হওয়ার দিনও জার্মান রাষ্ট্রদূত ইউজেন ওট তার প্রেরিত বিভিন্ন বার্তায় বার বার উল্লেখ করতেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সংঘাত অনিবার্য। হিটলারের লক্ষ্য ছিল আমেরিকাকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতে ব্যস্ত রাখা। তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছিল যে, জার্মানীর পক্ষ থেকে আশু সহায়তা পাওয়া না গেলেও জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। জাপানীরা পার্ল হারবারে নৌ হামলার কথা হিটলারকে পূর্বাহ্নে অবহিত করেনি। তবে পরে তিনি এ হামলার বিষয় অবহিত হয়ে বলেন,'এখন আমাদের যুদ্ধে পরাজিত হওয়া অসম্ভব। আমরা এমন একটি মিত্র খুঁজে পেয়েছি যারা বিগত ৩ হাজার বছরেও নির্মূল হয়ে যায়নি'।

হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে তার দক্ষিণহস্ত গোয়েরিংয়ের সঙ্গেও আলোচনা করতে ব্যর্থ হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ও মন্ত্রিপরিষদের অনেকেই তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কথায় ভ্রুক্ষেপ করেননি। হিটলার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন এক সময় যুদ্ধের ঘোষণা দেন যে মুহূর্তে পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ অভিযানে জার্মানরা ছিল বেকায়দায়। রোস্টভে সাফল্যের পর ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরের শুরুতে বলতে গেলে রাতারাতি গোটা জার্মান অগ্রবর্তী অবস্থান জুড়ে রুশরা পাল্টা হামলা চালায়। জার্মান সামরিক সদর দপ্তর পূর্ব রণাঙ্গন থেকে একের পর এক বিপর্যয়ের সংবাদ পাচ্ছিলো। ইতিপূর্বে তারা এধরনের দুঃসংবাদ কখনো পায়নি। রাশিয়ায় জার্মান স্থল অভিযান স্তব্ধ হয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর মার্শাল ঝুকভের নেতৃত্বাধীন রেড আর্মি মস্কোর পশ্চিম উপকণ্ঠে পাল্টা হামলা চালায়। মধ্য ডিসেম্বর নাগাদ জার্মানরা প্রায় কয়েক ডজন অবস্থান থেকে পিছু হটে আসে। এসব বিপর্যয়ের মুখে হিটলার আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণকারী জেনারেলদের বরখাস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন 'তার অন্তরাত্মার নির্দেশে তিনি সুপ্রীম কমান্ড স্বহস্তে গ্রহণ করছেন'।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলাই ছিল হিটলারের মূল নীতি। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মীমাংসা হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি সংঘাতে লিপ্ত হতে চাননি। হিটলারের মার্কিন নীতিতে এ পরিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়ার

www.pathagar.com

চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, হিটলার নিশ্চিত ছিলেন তিনি ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ রাশিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবেন। কিন্তু তার এ হিসাব ছিল ভুল। রুশ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে হিটলারের ভুল হিসাব যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনি এটাও অগ্রহণযোগ্য যে, জাপানের উপর মার্কিন নৌ-বাহিনীর চাপ হ্রাস এবং মার্কিন নৌ-বাহিনীর মনযোগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ঐতিহাসিকরা বলছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীর চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছিল হিটলারের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

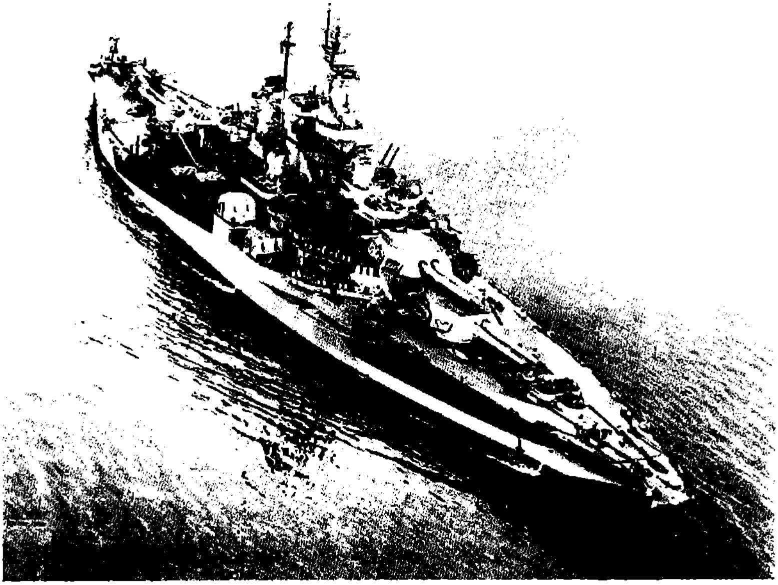

যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে একটি টহলদানকারী মার্কিন যুদ্ধজাহাজ

কোনো কোনো দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনের সময় থেকেই হিটলার মার্কিন হামলার আশংকা করছিলেন। ১৯৪১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দেখা মাত্র জার্মান জাহাজে গুলী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ নির্দেশ দেয়ায় হিটলার বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, লিন্ডবার্গের মতো নিরপেক্ষবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রকে বেশীদিন যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন না। পার্ল হারবারে জাপানী হামলার পর হোয়াইট হাউস জাপানকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যুদ্ধে ঠেলে দেয়ার জন্য জার্মানীকে দোষারোপ করে। মার্কিন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ শুধু জার্মানী নয়, গোটা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমসের এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, 'টোকিও নয়, হিটলারই আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য

www.pathagar.com

বৃহত্তম হুমকি।' এতে আরো মন্তব্য করা হয়, 'চূড়ান্ত লড়াই হবে ইংলিশ চ্যানেলে, দূরপ্রাচ্যে নয়।'

পার্ল হারবারে জাপানী হামলার অব্যবহিত পর হিটলার দেখা মাত্র মার্কিন যুদ্ধজাহাজে গুলী করার জন্য জার্মান ইউ-বোট ও যুদ্ধজাহাজগুলোকে নির্দেশ দেন। এদিকে, ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত জার্মান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে আগ্রহী নন এবং জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীর জন্য দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করা হবে অযৌক্তিক।' কিন্তু হিটলার তার মতামত অগ্রাহ্য করেন এবং বড়জোর ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে হিটলারের ধারণা ছিল মিশ্র। একদিকে তিনি মনে করতেন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে নরডিকদের মহামিলনের কেন্দ্রস্থল এবং দেশটি অভিবাসন বন্ধের আইন প্রণয়ন এবং এশীয় বংশোদ্ভূতদের বিতাড়িত করে নিজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করছে। অন্যদিকে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন বলেও শোনা যায় যে, 'আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ভুল পক্ষ জয়ী হয়েছে এবং দক্ষিণের নয়, খোদ মার্কিনী জাতির পতন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র একটি মিশ্রবর্ণের দেশ এবং দেশটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির জন্য জার্মানদের প্রবল ইচ্ছার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে না।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণাকালে রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বাইরে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের আগস্টে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ সামান্য ভোটের ব্যবধানে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিল অনুমোদন করে। ১৯৪১ সালের মে ও অক্টোবরে পরিচালিত গ্যালাপ জরিপে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে মাত্র ১৭ শতাংশ মার্কিনী মত প্রকাশ করে। হিটলার মার্কিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোমাত্রায় ওয়াকেবহাল ছিলেন এবং তিনি ১৯৪০ সালের নির্বাচনে রুজভেল্টকে পরাজিত করতে মার্কিনীদের অনুভূতিকে উস্কে দেয়ার জন্য জার্মান প্রচারণাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

হিটলার অতিমাত্রায় সংযম প্রদর্শন করলে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কী হতো তা বলা সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে কখনো একটি উত্তম বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেননি। ৭ ডিসেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেনরি স্টিমসন এক বৈঠকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করলে কেউ তাকে সমর্থন করেননি। যুদ্ধের চূড়ান্ত ঘোষণায়ও যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর সঙ্গে জাপানকে জড়িয়ে কোনো কথা বলেনি। জনমত এবং কংগ্রেসের বিরোধিতার ভয়ে রুজভেল্ট নিজেকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যান যেখানে তিনি কী ব্যবস্থা নেবেন তা নির্ভর করছিল তার শত্রুর পরবর্তী ভূমিকার উপর। তিনি চাইতেন জার্মানরা এমন কোনো অঘটন ঘটাক যাতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করতে পারে।

১৯৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'নিউট্রালিটি এ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস হয়। হিটলার মনে করতেন ইউরোপীয় সংঘাতে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এ আইন প্রণীত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অনায়াসে এ আইন বাতিলে সক্ষম হন। নিউট্রালিটি এ্যাক্ট

www.pathagar.com

বাতিল হওয়ায় অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। ফলে ঘাঁটিগুলোতে ডেস্ট্রয়ার মোতায়েন, দেখা মাত্র শত্রু জাহাজে গুলী এবং আমেরিকান বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এসব প্ররোচনামূলক কার্যকলাপকে হিটলার উপেক্ষা করেন এবং এডমিরালগণ দেশটির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যে অনুরোধ করছিলেন তিনি তা ক্রমাগত অগ্রাহ্য করছিলেন। কিন্তু তারপরেও তিনি ১১ ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হিটলারের অতুলনীয় সংযম দেখে আমেরিকান নেভাল অপারেশন চীফ এডমিরাল স্টার্ক সেপ্টেম্বরে এক স্মারকলিপিতে মন্তব্য করেছিলেন,'আমি বিশ্বাস করি না যে, হিটলার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কেউ কেউ তথাকথিত 'স্টুফেনপ্ল্যান' নামে পরিচিত হিটলারের দুই স্তরবিশিষ্ট পররাষ্ট্রনীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার যৌক্তিকতা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তারা বলছেন, হিটলারের প্রথম পর্যায়ের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল ইউরোপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে আঁতাত করা। ন্যূনপক্ষে দেশটিকে নিরপেক্ষ রাখা। শক্তি হিসেবে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাশিয়ার উরাল পর্বত থেকে ফ্রান্সের পিরেনিস পর্যন্ত বিস্তৃত নয়া 'সুপার জার্মানী' প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, কাঁচামাল সরবরাহ এবং আটলান্টিকে নিজেদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানীকে তৈরি করার জন্য মধ্য আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। বলা হয়েছিল, ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায় শেষ হবে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারীতে 'জেড' বা 'জিয়েল' প্ল্যানে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়টি মাথায় রেখে ১৯৪৮ সালের মধ্যে একটি নৌ-বহর গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা ছিল। হিসাব করা হয়েছিল, হিটলারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ করা হবে। ১৯৩৯ সালে জার্মানী নিজেকে রাশিয়ার পরিবর্তে 'ভুল শত্রু' বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত দেখতে পেয়ে দ্বিতীয় পর্যায় শিকেয় তুলে রাখে। পশ্চিম ইউরোপে বিস্ময়কর বিজয়ের পর আবার এ পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এসময় হিটলারের কাছে মনে হয়েছিল, বৃটেন তার কাছে নতি স্বীকার করবে। রাশিয়া অভিযানের পর আবার এ পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে 'জেড' পরিকল্পনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ এসময়ে বৃটেন ছিল জার্মানীর শত্রু। রাশিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়নি।

হিটলার সঠিক কোন্ কারণে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের বিচার হয়। এ আদালতে জবানবন্দি দানকালে তিনি বলেছিলেন, হিটলার তাকে জানান, আমরা যদি জাপানীদের পক্ষ না নিই তাহলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে। তবে মূল কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আমাদের জাহাজে গুলীবর্ষণ শুরু করেছে এবং বাস্তবে তাদের কার্যকলাপ একটি যুদ্ধাবস্থা।

www.pathagar.com

হিটলারের রাশিয়া অভিযান

নাৎসী জার্মানী দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করেছিল। একটি ছিল পশ্চিম রণাঙ্গন এবং আরেকটি ছিল পূর্ব রণাঙ্গন বা ইস্টার্ন ফ্রন্ট। পূর্ব রণাঙ্গনের লড়াইয়ে জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এ রণাঙ্গনের আয়তন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব ক'টি রণাঙ্গনের সম্মিলিত আয়তনের চেয়ে বড়। এখানে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয় মানব ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এডলফ হিটলার শুরু থেকেই পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াই এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একসঙ্গে দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করতে গেলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও নিয়তি তাকে পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করে পরাজিত হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে হিটলার লড়াইকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ১৯৩৯ সালের আগস্টে ১০ বছর মেয়াদী একটি অনাক্রমণ চুক্তি করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে হিটলার ক্ষণকালের জন্য পূর্ব রণাঙ্গনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা স্টালিনের চাতুর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার জন্য যতগুলো কারণ দায়ী তার মধ্যে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল অন্যতম। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের সত্যতা অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে নেয়। এ চুক্তির অপ্রকাশিত ধারা ছিল ভয়ংকর। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী তিনটি রাষ্ট্র-এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও রুমানিয়াকে ভাগাভাগি করার ব্যাপারে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি গোপন চুক্তি হয়। পোল্যান্ডের ব্যাপারে সমঝোতা হয় যে, জার্মানী দখল করে নেবে দেশটির পশ্চিমাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বাংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই তার পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ছিল। দেশটি মনে করতো যে, পশ্চিমা মিত্র জোট পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের সূচনা করলে তার পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এ উদ্বেগ থেকে রক্ষা পায়। সমঝোতা অনুযায়ী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ড দখল করে নেয়। হিটলারের

www.pathagar.com

এটা জানা ছিল না যে, তিনি পোল্যান্ডে সামরিক অভিযান চালিয়ে স্টালিনের ফাঁদে পা দিয়েছেন। জোসেফ ভিসারিওনোভিচ যোগাশভিলি স্টালিন এডলফ হিটলারকে পোল্যান্ডের পশ্চিমাংশ দখল করে নেয়ার সবুজ সংকেত দিয়ে মূলত তিনি জার্মানীকে পশ্চিমা মিত্রজোটের কোপানলে নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি হিসাব করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানী পোলান্ডে হাত বাড়ালেই পশ্চিমা জোট হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। বস্তুতঃ তাই হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার দু'দিন পর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মান সৈন্যরা পোল্যান্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যরাও পোল্যান্ডে প্রবেশ করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। পশ্চিমা মিত্র জোটের অনুকূল মনোভাব বুঝতে পেরে স্টালিন হুমকি দেন যে, রুমানিয়া ও তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র দখলের সুযোগ দেয়া না হলে এবং রুমানিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে ইউক্রেনীয়, বাইলোরাশান ও মোলদাভীয় ভূখণ্ড ফেরত দানের দাবি পূরণ করা না হলে সে শক্তি প্রয়োগ করবে। এ পরিস্থিতিতে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবি পূরণে বাধ্য হন। এভাবে হুমকি দিয়ে স্টালিন তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র এবং উল্লেখিত ভূখণ্ডগুলো শান্তিপূর্ণভাবে দখলে সক্ষম হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের আচরণে হিটলার চরম ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তার করার কিছু ছিল না। এ সময় তিনি জানতে পারেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীসহ গোটা পশ্চিম ইউরোপ দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। শুরুতে যুদ্ধ ছিল পুরোপুরি জার্মানীর অনুকূলে। হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্য ও বেসামরিক লোক জার্মান সৈন্যদের স্বাগত জানায়। তারা কমিউনিজম বিরোধী শ্লোগান দেয়। এমনকি অনেকে জার্মান সৈন্যদের সহযোগী হয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই ইতালীর সিসিলি দ্বীপে মিত্র বাহিনীর সৈন্য অবতরণ করায় হিটলার পূর্ব রণাঙ্গণ থেকে দ্বিতীয় এসএস পাঞ্জার কোরসহ কয়েকটি ইউনিট প্রত্যাহার করেন। এসব শক্তিশালী ইউনিট প্রত্যাহার করায় সেখানকার প্রতিরক্ষা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে জার্মানীকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গনে ভয়াবহ লড়াই চলে। এ লড়াইয়ে একটি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটে, সোভিয়েত সৈন্যরা পূর্ব ইউরোপ দখল করে নেয় এবং জার্মানী বিভক্ত হয়। ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের বিরুদ্ধে রুশদের লড়াইকে যেভাবে 'প্যাট্রিয়টিক ব্যাটল' বা দেশপ্রেমের যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ঠিক সেভাবে পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়ায় হিটলারের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ব্যাটল বা 'মহান দেশপ্রেমের লড়াই' হিসেবে পরিচিত।

১৯৪১ সালের ২২ জুন ভোর পৌনে ৫ টায় ৪০ লাখ জার্মান, ইতালীয় ও রুমানীয় সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে এবং সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। জার্মান পাঞ্জার বাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণে বিশাল বিশাল ঘাঁটিতে সোভিয়েত সৈন্যরা অবরুদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। ধীরগতি সম্পন্ন জার্মান পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রায় সোভিয়েত সৈন্যরা কচুকাটা হতে থাকে। প্রায় এক মাস জার্মান সৈন্যদের অগ্রযাত্রা ছিল অপ্রতিহত। জার্মান আর্মি গ্রুপ নর্থের লক্ষ্য ছিল বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্য দিয়ে লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ষোড়শ, অস্টাদশ ও চতুর্থ পাঞ্জার গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত এ আর্মি গ্রুপ লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া এবং রুশ শহর পাসকভ ও নোভগোরাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঞ্জার গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত আর্মি গ্রুপ সেন্টার ব্রেস্ট-লিটোভস্কের উভয় তীর বরাবর পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় এবং মিনস্কের সামনে গিয়ে সমবেত হয়। এরপর এগিয়ে আসে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও নবম আর্মি। মাত্র ৬ দিনে এ সম্মিলিত বাহিনী তাদের যাত্রাস্থল থেকে ৪শ' মাইল সামনে বেরিসিনা নদীর তীরে পৌঁছে যায়। পরবর্তী লক্ষ্য ছিল নিপার নদী অতিক্রম। ১১ জুলাইয়ের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জিত হয়। এরপর জার্মান সৈন্যদের লক্ষ্য ছিল স্মোলেনস্ক। ১৬ জুলাই স্মোলেনস্কের পতন ঘটে। কিন্তু এখানে রুশদের প্রতিরোধ লড়াইয়ে জার্মানদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। ব্লিৎসক্রিগ ব্যাহত হয়। পঞ্চম পাঞ্জার গ্রুপ, ষষ্ঠ, একাদশ ও সপ্তদশ আর্মির সমন্বয়ে গঠিত আর্মি গ্রুপ সাউথকে গালিসিয়ার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের অগ্রযাত্রা ছিল তুলনামূলকভাবে মন্থর।

মধ্য জুলাই নাগাদ আর্মি গ্রুপ সাউথ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ অভিমুখী একটি করিডোর দখলে সক্ষম হয়। দু'টি রুমানীয় আর্মির সহায়তায় একাদশ জার্মান আর্মি বেসারাবিয়া ও ওডেসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। এসময় প্রথম পাঞ্জার গ্রুপ কিয়েভ পাশ কাটিয়ে নিপার নদীর বাঁকের দিকে অগ্রসর হয়। ইউমানে আর্মি গ্রুপ সাউথের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইউনিটগুলোর সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটে। প্রথম পাঞ্জার গ্রুপ একটি বিশাল ঘাঁটিতে ১ লাখ সোভিয়েত সৈন্যকে বন্দী করে। ক্রমবর্ধমান জার্মান চাপে রেড আর্মি নিপার ও ভিনা নদীর পেছনে হটে এলে সোভিয়েত নেতৃত্ব অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে দূরে উরাল ও মধ্য এশিয়ার পেছনে প্রত্যন্ত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। অস্ত্রশস্ত্রসহ অধিকাংশ বেসামরিক লোক স্থানান্তর করা সম্ভব না হওয়ায় তাদেরকে আগ্রাসী সৈন্যদের করুণার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। স্মোলেনস্ক দখল এবং লুগার নদী বরাবর অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় আর্মি গ্রুপ সেন্টার ও আর্মি গ্রুপ নর্থ তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করে। আড়াই শ' মাইল দূরে রাজধানী মস্কো অভিমুখী রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। জার্মান জেনারেলগণ অবিলম্বে মস্কো অভিযানের পরামর্শ দিলে হিটলার তাৎক্ষণিক মস্কো অভিযানের পরিবর্তে ইউক্রেনের উর্বর শষ্য ক্ষেত্র ও ভারি শিল্পাঞ্চল দখলের উপর জোর দেন। দ্বিতীয় পাঞ্জার আর্মি গ্রুপকে দক্ষিণ দিকে ঘুরে কিয়েভ অভিমুখে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ পালনে এ আর্মি গ্রুপের পুরো আগস্ট লেগে যায়। এ অভিযান সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড়ায়। ৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পাঞ্জার গ্রুপ লোখভিৎসায় প্রথম পাঞ্জার গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হলে ৬ লাখ ৬৫ হাজার সোভিয়েত সৈন্য বন্দী হয়। ৯ সেপ্টেম্বর কিয়েভের পতন ঘটে। এ পর্যায়ে হিটলার মস্কো অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। এ অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি পাঞ্জার গ্রুপের নামকরণ করেন পাঞ্জার আর্মি। ৩০ সেপ্টেম্বর অপারেশন টাইফুন প্রণয়ন করা হয়। এ

www.pathagar.com

অপারেশনের আওতায় দ্বিতীয় পাঞ্জার আর্মি ওরালের উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে প্লাভস্কয়িতে ওকা নদীর দিকে ধাবিত হয়। চতুর্থ ও তৃতীয় পাঞ্জার আর্মি ভায়াজমা ও ব্রিয়ানস্কে দু'টি ঘাঁটিতে সোভিয়েত সৈন্যদের ঘেরাও করে ফেলে। আর্মি গ্রুপ নর্থ লেনিনগ্রাদের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পূর্ব দিকে তিখভিনের রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা চালায়। শুরু হয় লেনিনগ্রাদে ৯শ' দিনব্যাপী অবরোধ।

সুমেরু বৃত্তের উত্তরে জার্মান-ফিনিশ সৈন্যদের সম্মিলিত বাহিনী মারমানস্কের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু তারা লিৎসা নদীর সামনে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে তারা অবস্থান গ্রহণ করে। আর্মি গ্রুপ সাউথ নিপার থেকে আজভ সাগরের উপকূলে পিছু হটে গিয়ে খারকভ, কুরস্ক ও স্টালিনোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। একাদশ আর্মি ক্রিমিয়ার দিকে ধাবিত হয় এবং শরৎ কালের আগে সিবাস্তপোল ছাড়া গোটা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে। ২১ নভেম্বর জার্মানরা ককেশাস অঞ্চলের প্রবেশদ্বার রোস্টভ দখল করে নেয়। এসময় জার্মানদের প্রতিরক্ষা লাইন বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ায় সোভিয়েত সৈন্যরা উত্তর দিকে একাদশ আর্মির উপর পাল্টা হামলা চালায়। সোভিয়েতরা পাল্টা হামলা চালিয়ে জার্মানদের শহর থেকে পিছু হটিয়ে মিউজ নদীর ওপারে ঠেলে দেয়। রাশিয়া অভিযানে এটাই ছিল জার্মানদের প্রথম বৃহত্তম পশ্চাদপসরণ। জার্মানদের এ বিপর্যয়ের পর পরই আবহাওয়া বিরূপ হয়ে উঠে। অক্টোবরের প্রথমার্ধে এত বৃষ্টিপাত হয় যে, রাস্তাঘাট কাদায় ভরাট হয়ে যায়। ফলে জার্মান ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও ঘোড়া ফাঁদে পড়ে। মস্কো তখনো ছিল ১শ' মাইল দূরে। প্রবল বৃষ্টিপাতে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। তুষারপাত হতে থাকে। যানবাহন এগিয়ে যাবার পরিবেশ ফিরে আসে। কিন্তু তীব্র শীতে সৈন্যরা স্থবির হয়ে পড়ে। তাদের শীত বস্ত্র ছিল না। জার্মান নেতৃবৃন্দ আশা করছিলেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে মস্কো অভিযান সম্পন্ন হবে। কিন্তু তারা শীতকালে লড়াই করার জন্য তাদের সৈন্যদের উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করতে ব্যর্থ হন। ১৫ নভেম্বর জার্মানরা মস্কোর আশপাশে প্রতিরক্ষা বৃত্ত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ২৭ নভেম্বর চতুর্থ পাঞ্জার আর্মি খিমকিতে একটি ট্রাম স্টেশনে পৌঁছে গেলে ক্রেমলিন তাদের নাগালের ১৯ মাইলের মধ্যে চলে আসে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পাঞ্জার আর্মি মরিয়া চেষ্টা করেও তুলা দখলে ব্যর্থ হয়। তুলা ছিল সোভিয়েত রাজধানীতে এগিয়ে যাবার পথে শেষ শহর। ওরশায় আর্মি জেনারেল স্টাফ প্রধান জেনারেল হ্যাল্ডার এবং তিনটি আর্মি গ্রুপ ও আর্মি প্রধানদের মধ্যে বৈঠকে অলস বসে থাকার চেয়ে রণাঙ্গনে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৬ ডিসেম্বরের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জার্মান সেনাবাহিনী মস্কো দখলে মোটেও শক্তিশালী নয়। ফলে এ অভিযান অচল হয়ে পড়ে। এ সময় সোভিয়েত জেনারেল জর্জি ঝুকভ জার্মানদের উপর পাল্টা হামলা চালানোর জন্য সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য থেকে তাজা ও সুসজ্জিত সৈন্যদের মস্কো নিয়ে আসতে থাকেন। সম্ভাব্য জাপানী হামলা মোকাবিলায় এসব সৈন্য সেখানে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাপান সংক্রান্ত সোভিয়েত গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ রিচার্ড সোর্গি স্টালিনকে জানান যে, জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

www.pathagar.com

অঞ্চলে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ গোয়েন্দা তথ্য পেয়ে স্টালিন দূরপ্রাচ্য থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ১৯৪১ সালের ৫ ডিসেম্বর দূরপ্রাচ্য থেকে আগত নয়া সৈন্যরা টি-৩৪ ট্যাংক ও কাতুশা রকেটের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মস্কোর আশপাশে জার্মানদের প্রতিরক্ষা লাইনের উপর পাল্টা হামলা চালায়। সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাটালিয়ন ছিল তুষারপাতের ভেতর লড়াই করার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১৯৪২ সালের ৭ জানুয়ারীর মধ্যে ক্লান্ত ও শীতে আড়ষ্ট জার্মান সৈন্যদের ৬০ থেকে ১৫০ মাইল পেছনে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে শীত নিবারণ উপযোগী পোশাক পরিহিত সোভিয়েত সৈন্যরা এগিয়ে যেতে থাকে। জানুয়ারীর শুরুতে তারা আরো এক দফা পাল্টা হামলা চালায়। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান আর্মি গ্রুপ নর্থ ও আর্মি গ্রুপ সেন্টারের সংযোগস্থল সেলিগার হ্রদ ও রেঝেভের মধ্যে ফাটল ধরানোর উপর জোর দেয়। কালুগা থেকে মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে সোভিয়েত সৈন্যরা স্মোলেনস্কে দু'টি পাল্টা হামলা চালায়। কিন্তু জার্মানরা তাদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তারা রেঝেভে একটি ভূখণ্ড রক্ষায় সক্ষম হয়। জার্মান অধিকৃত দোরোজেবাগে সোভিয়েত সৈন্যদের প্যারাশূটে অবতরণের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী জীবিত ছত্রী সেনারা মুক্তাঞ্চলে পালিয়ে এসে জার্মান অবস্থানের পেছনে জড়ো হতে থাকে। সোভিয়েত সৈন্যরা উত্তরে দামানস্কে একটি জার্মান ঘাঁটি অবরোধ করে এবং খোলম,ভেলিঝ ও ভেলিকির সামনে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলে। চার মাস বিমান সরবরাহের মাধ্যমে জার্মানরা দামানস্কে তাদের ঘাঁটি ধরে রাখে। রেড আর্মি দক্ষিণে আইঝুমে দোনেৎস নদী বরাবর ৬০ মাইল গভীরে এগিয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য ছিল আজভ সাগরের (কৃষ্ণ সাগরের উত্তরাংশ) বিপরীতে জার্মান আর্মি গ্রুপ সাউথকে অবরুদ্ধ করে ফেলা। কিন্তু শীতের তীব্রতা কমে এলে জার্মানরা পাল্টা হামলা চালাতে সক্ষম হয় এবং খোরকভের দ্বিতীয় যুদ্ধে তারা সোভিয়েত সৈন্যদের ব্যাপক বিস্তৃত সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অপারেশন টাইফুনের পর জার্মানরা 'অপারেশন ব্লু' শুরু করে। ১৯৪২ সালের ৭ মে থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত এ অপারেশনের আওতায় আবার মস্কো দখলের চেষ্টা করা হয়। মস্কোতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হলেও ১৯৪২ সালের ২৮ জুন এ অপারেশনে একটি নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আর্মি গ্রুপ সাউথ অপারেশনের এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রথমে ডোন ও ভলগা দখল করা এবং পরে তেল সমৃদ্ধ ককেশাস অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু অপারেশনাল পরিস্থিতির তাগিদে হিটলার একই সঙ্গে এ দু'টি অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। প্রথম পাঞ্জার ২৪ জুলাই রোস্টভ পুর্নদখল করে দক্ষিণে মেইকোপের দিকে এগিয়ে যায়। অপারেশন ব্লু'র পাশাপাশি 'অপারেশন শামিল' নামে আরেকটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। অপারেশন শামিলের আওতায় ব্রান্ডেনবার্গার কমান্ডোদের একটি গ্রুপ সোভিয়েত এনকেভিডি (Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del) বা গুপ্ত পুলিশের পোশাক পরে মেইকোপে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা লাইনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ ফাঁকে প্রথম

www.pathagar.com

পাঞ্জার আর্মি নামমাত্র প্রতিরোধের মুখে তেল সমৃদ্ধ মেইকোপ শহরে প্রবেশ করে। ষষ্ঠ আর্মি দীর্ঘদিন চতুর্থ পাঞ্জারের সহায়তা ছাড়া স্টালিনগ্রাদের দিকে ধেয়ে যেতে থাকে। এসময় চতুর্থ পাঞ্জার আর্মি স্টালিনগ্রাদ অভিযানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অন্যদিকে, জেনারেল ভাসিলি চুইকভের নেতৃত্বে ৬২তম সোভিয়েত আর্মির প্রতিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে। ২৩ আগস্ট ডোন নদী অতিক্রম করার সুযোগ জার্মানদের ভলগা পৌঁছে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু পরবর্তী তিন মাস জার্মান ওয়ারম্যাটকে স্টালিনগ্রাদে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করতে হয়। প্রথম পাঞ্জার আর্মি দক্ষিণে ককেশাস পর্বতের পাদদেশ ও মাকা নদীতে পৌঁছে যায়।

আগস্টের শেষ নাগাদ পার্বত্য যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রুমানীয় সৈন্যরা ককেশাস অভিযানে যোগ দেয়। অন্যদিকে, রুমানীয় তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মি স্টালিনগ্রাদের উভয় পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। ট্রান্সিলভানিয়া প্রশ্নে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে ইতালীয় অস্টম আর্মি ডোন নদীর বাঁকে হাঙ্গেরীর দ্বিতীয় আর্মি থেকে রুমানীয় আর্মিকে পৃথক করে ফেলে। এভাবে প্রথম পাঞ্জার আর্মির সঙ্গে সংযুক্ত একটি স্লোভাকীয় কন্টিনজেন্ট এবং ষষ্ঠ আর্মির সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি ক্রোয়েশীয় রেজিমেন্টসহ জার্মানীর সকল মিত্র সৈন্যদের রণাঙ্গনে মোতায়েন করা হয়। জার্মানরা মালগোবেক ও গ্রোজনীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় ককেশাস অভিযানে বির্পযয় নেমে আসে। ফলে তারা গতি পরির্বতন করে এবং অক্টোবরের শেষ মাথায় মাকা নদী অতিক্রম করে উত্তর ওসেটিয়ায় প্রবেশ করে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওরডঝোনিকিজির উপকণ্ঠে ত্রয়োদশ পাঞ্জার ডিভিশনের অগ্রযাত্রা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফলে ককেশাস অঞ্চলে জার্মান অভিযানে ইতি ঘটে। অন্যদিকে, জার্মান ষষ্ঠ ও চতুর্থ পাঞ্জার আর্মি স্টালিনগ্রাদে লড়াই করছিল।

সোভিয়েত সৈন্যরা ডোন নদীতে ভাসমান সেতু তৈরি করে এবং সেগুলো অতিক্রম করে তারা শহরের উভয় পাশে সমবেত হতে থাকে। রুমানীয় সৈন্যরা সোভিয়েত সৈন্যদের বাধা দানে অক্ষম হওয়ায় ১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা সেখান থেকে লেনিনগ্রাদে জার্মানদের উপর হামলা চালায়। অপারেশন ইউরেনাসের আওতায় দু'টি সোভিয়েত ফ্রন্ট (তখনকার দিনে বৃটিশ ও আমেরিকান আর্মি গ্রুপের সমান সৈন্য নিয়ে গঠিত সোভিয়েত স্থল বাহিনীর শক্তিশালী ইউনিট) রুমানীয় সৈন্যদের তছনছ করে দিয়ে ২৩ নভেম্বর কালাচে পৌঁছে এবং অক্ষশক্তির ৩ লাখ সৈন্যকে ফাঁদে ফেলে দেয়। একই সময়ে অপারেশন মার্স-এর আওতায় স্মোলেনস্কে এগিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু জার্মানদের বুদ্ধিমত্তায় রুশ অভিযান ব্যর্থ হয়। স্টালিনগ্রাদ দখলের মরিয়া চেষ্টা চালাতে জার্মানরা রাশিয়ায় আরো সৈন্য স্থানান্তর করে। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর নাগাদ অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি। এসময়ে ষষ্ঠ আর্মি স্টালিনগ্রাদে অনাহারের মুখোমুখি হলে তারা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছিল না। অপারেশন উইন্টার স্টর্মের আওতায় স্থানান্তরিত তিনটি পাঞ্জার ডিভিশন কোটেলনিকভো থেকে দ্রুত আকসাই নদীর দিকে এগিয়ে

www.pathagar.com

যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্যস্থল থেকে ৪০ মাইল দূরে তাদের অগ্রযাত্রায় বিপর্যয় ঘটে। জার্মানদের উদ্ধার তৎপরতা ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে সোভিয়েতরা ইতালীয়দের বিধ্বস্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর তাদের অপারেশন শুরু হয়। স্টালিনগ্রাদে উদ্ধার তৎপরতায় নিয়োজিত বহু জার্মান বিমান তারা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়।

বিপর্যয় রোধে হিটলার আর্মি গ্রুপ এ-কে ককেশাস অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করে ডোন নদীর এপারে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার এ উদ্যোগ সুফল বয়ে আনতে পারেনি। ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী ৩ লাখ সৈন্যের ষষ্ঠ আর্মির জীবিত ৯০,০০০ সৈন্য সোভিয়েতদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এসময়ে হাঙ্গেরীয় কন্টিনজেন্টও নির্মূল হয়ে যায়। সোভিয়েতরা স্টালিনগ্রাদের ৩শ' মাইল পশ্চিমে ডোন থেকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে এবং কুরস্ক ও খারকভের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে। দক্ষিণে নিজেদের অবস্থান রক্ষায় ফেব্রুয়ারীতে রেঝেভ পরিত্যাগ করে পর্যাপ্ত জার্মান সৈন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে এনে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৪৩ সালের ২০ফেব্রুয়ারী বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টাইগার ট্যাংক সজ্জিত একটি এসএস পাঞ্জার কোরের সহায়তায় ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টেইন পোল্টাভা থেকে সোভিয়েতদের উপর পাল্টা হামলা চালান এবং তিনি মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে খারকভ পুনর্দখল করেন। বসন্ত কাল এসে পড়ায় কুরস্কের সামনে অগ্রবর্তী অবস্থানে জার্মানদের সুবিধা হয়।

স্টালিনগ্রাদ দখলে ব্যর্থতার পর হিটলার জার্মান আর্মি হাই কমান্ডের পরবর্তী অভিযান প্রণয়নের কর্তৃত্ব স্থগিত করেন এবং জেনারেল গুদেরিয়ানকে পাঞ্জার বাহিনীর ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করেন। কুরস্কে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে জার্মান জেনারেল স্টাফের মধ্যে বির্তক দেখা দেয়। এমনকি স্বয়ং হিটলারও যে কোনো অভিযান চালানোর ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, বিগত ৬ মাসে রুশরা ট্যাংকবিধ্বংসী কামান, ট্যাংক ধ্বংসের ফাঁদ, স্থল মাইন, কাঁটা তারের বেড়া, পরিখা, সুরক্ষিত চৌকি, কামান ও মর্টারের সাহায্যে কুরস্কের প্রতিরক্ষা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভেবে দেখলেন যে, শেষ চেষ্টা হিসেবে ব্লিৎসক্রিগ অভিযানে সোভিয়েতদের নির্মূল করে দিতে পারলে তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনে পশ্চিমা মিত্র জোটের হুমকির প্রতি মনোযোগ দিতে সক্ষম হবেন। তার এ হিসাব থেকে কুরস্কের উত্তরে ওরাল থেকে দক্ষিণে বেলগোরদ অভিমুখী হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিকল্পনা করা হয় যে, সোভিয়েত ভূখণ্ডে সক্রিয় জার্মান বাহিনীর উভয় অংশ তিমে এসে একত্রিত হবে এবং এভাবে ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে আর্মি গ্রুপ সাউথ যে প্রতিরক্ষা লাইনে অবস্থান করছিল সে প্রতিরক্ষা লাইন পুনরুদ্ধার করা হবে। কিন্তু জার্মানদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। তারা জানতো না যে, ১৯৪১-৪২ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েতদের রিজার্ভ সৈন্য ফুরিয়ে গেলেও তারা পুনর্দখলকৃত অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে লোকজনকে সেনাবাহিনীতে রিক্রুট করছিল এবং পুনরায় অস্ত্র সজ্জিত হচ্ছিল। জেনারেলদের চাপের মুখে হিটলার কুরস্কে অভিযান চালাতে সম্মত হন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ্যাবওয়ার

www.pathagar.com

(জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা) প্রেরিত গোয়েন্দা তথ্য ছিল ভুল। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা স্টাভকা এবং সুইজারল্যান্ডে তৎপর নাৎসী বিরোধী গোয়েন্দা চক্র লুসি স্পাই রিং জার্মান গোয়েন্দা সংস্থাকে বিভ্রান্ত করতো। অজ্ঞাতসারে এ্যাবওয়ার প্রতিপক্ষের বিভ্রান্তিকর তথ্যকে কখনো কখনো সঠিক বলে মনে করতো। কুরস্কের পরিস্থিতি সম্পর্কে এভাবেই এ্যাবওয়ার হিটলারের কাছে মিথ্যা তথ্য প্রেরণ করে। কুরস্ক অভিযানে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। জার্মানরা যখন নতুন নতুন ট্যাংক ও অস্ত্রশস্ত্রের অপেক্ষায় দিন গুণছিল ততক্ষণে সোভিয়েতরা সেখানে ট্যাংকবিধ্বংসী কামানসহ এত বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ মজুদ করে ফেলে যে, ততদিন নাগাদ আর কোনো একক যুদ্ধে এত গোলাবারুদ মজুদ করা হয়নি। উত্তরে রেঝেভ থেকে ওরালে গোটা নবম আর্মিকে পুনঃমোতায়েন করা হয় এবং এ আর্মি মালোয়ারখানগালেস্ক থেকে কুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ বাহিনী অগ্রযাত্রার সূচনাস্থল থেকে ৫ মাইল সামনে ওখোভাৎকায় তাদের প্রথম লক্ষ্যস্থলও অতিক্রম করতে পারেনি। কুরস্ক ও নবম আর্মির মধ্যে উঁচু ভূমি ছিল একমাত্র প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা। অন্যদিকে ছিল সোভিয়েতদের পুঁতে রাখা মাইনক্ষেত্র। ফলে নবম আর্মিকে ওখোভাৎকার পশ্চিমে পনিরিতে দিক পরিবর্তন করতে হয়। তবে তারা এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেয়। সোভিয়েতরা জার্মানদের মার হজম করে পাল্টা হামলা চালায়। ১২ জুলাই রেড আর্মি ঝিদরা নদী বরাবর ২১১ ও ২৯৩তম ডিভিশনের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড দিয়ে প্রবেশ করে কারচেভ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে কর্নেল জেনারেল হোথের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ আর্মির আওতায় তিনটি ট্যাংক কোর আরো অগ্রগতি অর্জন করে। এসএস পাঞ্জার কোর এবং গ্রোয়েসল্যান্ড পাঞ্জারগ্রানাডিয়ার আপার ডোনেৎসের উভয় তীর বরাবর একটি সংকীর্ণ করিডোর দিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি এড়িয়ে মাইনক্ষেত্র অতিক্রম করে ওবোয়ানের দিকে ধাবিত হয়। তীব্র প্রতিরোধের মুখে জার্মানরা রণাঙ্গনে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। প্রখোরভকার বাইরে সোভিয়েত পঞ্চম ট্যাংক গার্ড আর্মির রির্জাভের মুখোমুখি হওয়ার আগেই জার্মান ট্যাংক ১৫ মাইল এগিয়ে যায়। ১২ জুলাই প্রায় ১ হাজার সোভিয়েত ট্যাংক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ প্রখোরভকায় সংঘটিত ট্যাংক লড়াইকে সর্বকালের বৃহত্তম ট্যাংক লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে পরবর্তীতে ভিন্ন রকম তথ্য আবিস্কৃত হয়। প্রখোরভকায় সোভিয়েত পঞ্চম ট্যাংক গার্ড আর্মির ট্যাংক লড়াইকে ব্যর্থ ও বিশৃংখল হিসেবে চিহ্নিত হয়। নতুন তথ্যে দেখা গেছে যে, প্রথম জার্মান এসএস কোরের বিপরীতে সোভিয়েত পঞ্চম ট্যাংক গার্ডের প্রায় আড়াই শ' ট্যাংক লড়াই করে। জার্মানরা সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা করেনি। কিন্তু সোভিয়েতদের পরিকল্পনায় ত্রুটি থাকায় জার্মানরা তাদের হামলা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। ১২ জুলাই দক্ষিণাঞ্চলে সেদিনের লড়াইয়ে সোভিয়েতরা মোট ৪শ' ট্যাংক হারায়। অন্যদিকে, জার্মানরা হারায় মাত্র কয়েকটি ট্যাংক। তবে আক্রমণকারী সোভিয়েত টি-৩৪ ট্যাংকের বিরুদ্ধে জার্মান পদাতিক সৈন্য হতাহত হওয়ার সংখ্যা ছিল বিপুল। উভয়পক্ষ

www.pathagar.com

একে অপরকে কোণঠাসা করে ফেলা সত্ত্বেও উত্তরে জার্মান ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টেইন চতুর্থ ট্যাংক আর্মির সাহায্যে লড়াই অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে, দক্ষিণে পাল্টা হামলা ব্যর্থ হওয়ায় রেড আর্মি উত্তরাঞ্চলে ওরালে শক্তিশালী অভিযান শুরু করে এবং জার্মান ৯ম আর্মির পশ্চাৎভাগে অগ্রগতি অর্জন করে। জার্মান অধিকৃত ওরালে অগ্রাভিযানকালে বিপুলসংখ্যক সোভিয়েত সৈন্য হতাহত হতে থাকে। হিটলারের আস্থাভাজন গ্রোয়েসল্যান্ড ডিভিশনকে বেলগোরাদ থেকে কারাচেভে মোতায়েন করেও সোভিয়েতদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। জার্মানরা ওরাল থেকে পিছু হটে দক্ষিণে ব্রায়ানস্কের সম্মুখে হ্যাগেন প্রতিরক্ষা লাইনে এসে অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় ১৯৪৩ সালের ৫ আগস্ট রেড আর্মি ওরাল দখল করে নেয়। সোভিয়েতরা জার্মান আর্মি গ্রুপ সাউথ অধিকৃত বেলগোরাদের মধ্য দিয়ে আবার খারকভের দিকে এগিয়ে যায়।

জুলাইয়ের শেষ থেকে লড়াই শুরু হয়ে আগস্টে গড়ায়। এসময় একটি মেরুতে জার্মান টাইগার ট্যাংক সোভিয়েত ট্যাংকগুলোকে ঘায়েল করতে সক্ষম হলেও পশ্চিম দিকে সোভিয়েতরা অন্য একটি মেরুতে তাদেরকে অতিক্রম করে সালেতে এগিয়ে যায়। ফলে ২২ আগস্ট চূড়ান্তভাবে খারকভ থেকে জার্মানদের পিছু হটতে হয়। আগস্টে মিউজে মোতায়েন জার্মানরা এত কাহিল হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের নিজেদের ফ্রন্টে সোভিয়েত হামলা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েতদের হামলার মুখে তাদেরকে ডোনবাস শিল্পাঞ্চল থেকে পিছু হটে আসতে হয়। এতে দখলীকৃত রুশ ভূখণ্ডের অর্ধেক কৃষি জমি জার্মানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে হিটলার নিপার লাইনে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হন। পশ্চিমা মিত্র জোটের বিরুদ্ধে জার্মানীর মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশে ওয়েস্টার্নওয়াল নামে খ্যাত প্রতিরক্ষা লাইনের অনুরূপ নিপার লাইনকে ওয়াস্টওয়ালে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও রাতারাতি এ প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেপ্টেম্বরে আর্মি গ্রুপ সাউথ পূর্বাঞ্চলীয় ইউক্রেন থেকে পিছু হটে নিপার নদীর ওপারে অবস্থান নেয়। সোভিয়েতরা পশ্চাদ্ধাবনকারী জার্মানদের উপর তীব্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো ২ মাইল প্রশস্ত নিপার অতিক্রম করতে থাকে এবং নদীতে ভাসমান সেতু তৈরি করে। ২৪ সেপ্টেম্বর কানেভে সোভিয়েতরা ছত্রী সেনা অবতরণের মাধ্যমে জার্মান অধিকৃত ভূখণ্ড পুনর্দখলের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৮ মাস আগে ডোরগোবাগে যে ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল কানেভে একই ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। সোভিয়েত ছত্রী সেনাদের প্রচেষ্টা নস্যাত করে দেয়া হয়। জার্মানরা যে মুহূর্তে সোভিয়েত ছত্রী সেনাদের হামলা মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিল ঠিক তখন রেড আর্মি নিপার নদী অতিক্রম করে এবং এপারে এসে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর গড়িয়ে অক্টোবর আসে। সোভিয়েতরা ভাসমান সেতু অতিক্রম করে বন্যার বেগে ধেয়ে আসতে থাকলে জার্মানরা নিপার লাইন রক্ষা করা অসম্ভব বলে দেখতে পায়। সোভিয়েতদের অগ্রাভিযানে নিপার অববাহিকায় একটির পর একটি শহরের

www.pathagar.com

পতন ঘটতে থাকে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে চেরকাসিতে অবরুদ্ধ ১০টি জার্মান ডিভিশন ভয়াবহ হতাহতের বিনিময়ে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এরপর মার্চে হুবের ঘাঁটি নামে খ্যাত কামেনাত-পডোলস্কিয়াতে জেনারেল ওবার্স্ট হ্যান্স ভ্যালেন্টিন হুবের নেতৃত্বাধীন প্রথম পাঞ্জার আর্মির ২০টি জার্মান ডিভিশন অবরুদ্ধ হয়।

সোভিয়েত নেতা স্টালিনকে লেনিনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে

দু'সপ্তাহ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর প্রথম পাঞ্জার সামান্য থেকে মাঝারি ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে পালাতে সক্ষম হয়। হ্যাগেন লাইন থেকে সামান্য ভূখণ্ড হারিয়ে ধীরে ধীরে আর্মি গ্রুপ সেন্টার পিছু হটে যায়। ব্রায়ানস্ক হারানো ছিল একটি বিরাট ক্ষতি। তার চেয়ে বড় ক্ষতি ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর স্মোলেনস্ক হারানো। স্মোলেনস্ক ছিল গোটা জার্মান প্রতিরক্ষা অবস্থানের মূল স্তম্ভ। তবে চতুর্থ ও নবম আর্মি এবং তৃতীয় পাঞ্জার তখনো নিপার নদীর উজানে পূর্বদিকে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে নোভরোগাদ হাতছাড়া হওয়া নাগাদ আর্মি গ্রুপ নর্থের এলাকায় লড়াই হয় খুবই সামান্য। ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রেড আর্মি এস্তোনিয়া এবং মার্চে রুমানীয় সীমান্তে পৌঁছে যায়। তারা রুমানীয় সীমান্তে পৌঁছে এপ্রিলে ওডেসা এবং মে মাসে সেবাস্তোপোল দখল করে নেয়। ১৯৪৪ সালের ২২ জুন মধ্যাঞ্চলে অপারেশন ব্যাগ্রেশনের আওতায় সোভিয়েতরা ব্যাপক হামলা শুরু করে। তাদের তৎপরতায় জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টার বিধ্বস্ত হয়। তার দু'সপ্তাহ আগে জার্মানরা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে নরম্যান্ডিতে মিত্রবাহিনীর হামলা মোকাবিলায় ফ্রান্সে বেশ কয়েকটি ইউনিট স্থানান্তর করে। এসময় ১২০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে গঠিত ৪টি সোভিয়েত আর্মি গ্রুপ নামমাত্র জার্মান প্রতিরক্ষা

www.pathagar.com

লাইন ধূলিসাৎ করে দেয়। ইতোমধ্যে সোভিয়েতরা একটি জার্মান ট্যাংকের বিপরীতে ১০টি এবং একটি জার্মান বিমানের বিপরীতে ৭টি বিমানের প্রাধান্য অর্জন করে। যুদ্ধের এ পর্যায়ে সোভিয়েতরা সৈন্য ও সমরাস্ত্র এবং সমরাস্ত্রের মানে অতুলনীয় হয়ে উঠে। জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টারের বিরুদ্ধে ২৫ লক্ষাধিক সোভিয়েত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টারের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮ লাখের কম। ফলে তারা বিধ্বস্ত হয়। ৩ জুলাই বাইলোরাশিয়ার রাজধানী মিনস্কের পতন ঘটলে ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য ফাঁদে পড়ে যায়। ১০ দিন পর রেড আর্মি পোল্যান্ড সীমান্তে যুদ্ধ পূর্ব অবস্থানে ফিরে যায়। দ্রুত ধাবমান সোভিয়েত অগ্রাভিযানে কুরল্যান্ডে লড়াইরত আর্মি গ্রুপ নর্থের জার্মান ইউনিটগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপারেশন ব্যাগ্রেশন ছিল যুদ্ধকালে কোনো একটি একক অভিযানে বৃহত্তম অপারেশন। এ অপারেশনে রেড আর্মির ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮১৫ জন সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ কিংবা অসুস্থ হয়। ট্যাংক ও কামান ধ্বংস হয় ২ হাজার ৯৫৭টি। পক্ষান্তরে, জার্মানরা ৪ লাখ সৈন্য হারায়। তাদের অধিকাংশ বন্দী হয়। ১৯৪৪ সালের ১৭ জুলাই রুশরা আরেকটি অপারেশন চালিয়ে পশ্চিম ইউক্রেনে জার্মানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দক্ষিণে রুমানিয়া পর্যন্ত সোভিয়েত অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ২৩ আগস্ট রুমানিয়ায় অক্ষশক্তির সমর্থনপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটলে ৩১ আগস্ট রেড আর্মি বুখারেস্ট দখল করে নেয়। ১২ সেপ্টেম্বর রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মস্কো যেসব শর্তে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে নির্দেশ দেয় রুমানীয় সরকার তাই পালন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে রুমানিয়ার আত্মসমর্পণে জার্মানীর পূর্ব রণাঙ্গনের দক্ষিণে একটি বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়। এ ফাটল দেখা দেয়ায় জার্মানীকে গোটা বলকান অঞ্চল হারাতে হয়।

জুলাইয়ে রেড আর্মি ওয়ারশর দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে পোল্যান্ডে পোলিশ হোম আর্মি অভ্যুত্থান ঘটায়। এদিকে, রেড আর্মি ভিশ্চুলা নদীর তীরে এসে থেমে যায়। তারা পোলিশ প্রতিরোধে সহায়তা দিতে অপারগ অথবা অনিচ্ছুক ছিল। ওয়ারশ দখলে নব গঠিত পোলিশ পিপলস কমিউনিস্ট পার্টির একটি চেষ্টা নস্যাত হয়ে গেলে সেপ্টেম্বরে তাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে হয়। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে স্লোভাকিয়ায় স্লোভাক জাতীয়তাবাদীরা অভ্যুত্থান ঘটালে জার্মান সৈন্য ও স্লোভাক বিদ্রোহীদের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়। এ বিদ্রোহ স্লোভাকিয়ার বানাস্কা বিসট্রিসিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রেড আর্মি স্লোভাক-পোলিশ সীমান্তে ডুকলা গিরিপথে হামলা শুরু করে। দু'মাসের লড়াইয়ে রুশরা বিজয়ী হয় এবং স্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। হতাহতের সংখ্যা ছিল বিশাল। রেড আর্মির ৮৫ হাজার সৈন্য এবং আরো কয়েক হাজার জার্মান, স্লোভাক ও চেক নিহত হয়। জার্মানরা পুরোপুরি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার পর ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে সোভিয়েতরা অবশেষে ওয়ারশ প্রবেশ করে। পরবর্তী তিন দিন ওয়ারশ থেকে সেনাবাহিনীর ৪টি ফ্রন্টের সমন্বয়ে রেড আর্মি একটি ব্যাপক ফ্রন্টে লড়াইয়ের সূচনা করে এবং নারেউ নদী

www.pathagar.com

অতিক্রম করে। সৈন্য, ট্যাংক, কামান ও স্বয়ংক্রিয় গানের অনুপাতে সোভিয়েতরা জার্মানদের তুলনায় বহুদূর এগিয়ে যায়। এসময় উভয় পক্ষের শক্তির অনুপাত ছিল একজন জার্মান সৈন্যের বিপরীতে ৯ জন সোভিয়েত সৈন্য, একটি জার্মান কামানের বিপরীতে ১০টি সোভিয়েত কামান এবং একটি জার্মান ট্যাংকের বিপরীতে ১০টি সোভিয়েত ট্যাংক। পরবর্তী ৪ দিন রেড আর্মি প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকে। এ পর্যায়ে তারা তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, ডানজিগ, পূর্ব প্রুশিয়া ও পোজনান দখল করে নেয় এবং পূর্ব দিকে ওডার নদী বরাবর বার্লিনের ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। ভিশ্চুলা ও ওডার নদীতে ২৩ দিনের যুদ্ধে রেড আর্মি ১ লাখ ৯৪ হাজার সৈন্য হারায়। এছাড়া, ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান ধ্বংস হয় ১ হাজার ২৬৭ টি।

১৯৪৫ সালের ২৫ জানুয়ারী হিটলার তিনটি আর্মি গ্রুপের নয়া নামকরণ করেন। আর্মি গ্রুপ নর্থের নাম রাখা হয় আর্মি গ্রুপ কুরল্যান্ড, আর্মি গ্রুপ সেন্টারের নাম হয় আর্মি গ্রুপ নর্থ এবং আর্মি গ্রুপ 'এ'র নাম রাখা হয় আর্মি গ্রুপ সেন্টার। আর্মি গ্রুপ নর্থ (পুরনো আর্মি গ্রুপ সেন্টারকে পূর্ব প্রুশিয়ার কোনিগসবার্গের আশপাশে একটি ক্ষুদ্র) এলাকায় তাড়িয়ে দেয়া হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী ফিল্ড মার্শাল হেইনরিচ হিমলারের নেতৃত্বে নবগঠিত আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলার একটি পাল্টা হামলা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। সোভিয়েতরা পোমেরানিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে এবং ওডার নদীর দক্ষিণ তীর দখল করে। অবরুদ্ধ বুদাপেস্টকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জার্মানদের তিনটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৩ ফেব্রুয়ারী সোভিয়েতদের কাছে এ শহরের পতন ঘটে। আবার জার্মানরা পাল্টা হামলা চালায়। হিটলার দানিয়ুব রক্ষার অসম্ভব আবদারের উপর জোর দিতে থাকেন। ১৬ মার্চের মধ্যে জার্মানদের আরেকটি চেষ্টা ব্যর্থ হলে একইদিন রেড আর্মি পাল্টা হামলা চালায়। ১৩ মার্চ তারা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং ভিয়েনা দখল করে নেয়। ১৯ এপ্রিল সোভিয়েতদের হাতে চূড়ান্তভাবে কোনিগসবার্গের পতন ঘটে যদিও বিধ্বস্ত আর্মি গ্রুপ নর্থের অবশিষ্ট ইউনিটগুলো হেইলিজেনবেইল ও ডানজিগের উপকূলভাগে অব্যাহতভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেড আর্মি যতগুলো রক্তক্ষয়ী ও ভয়ংকর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে পূর্ব প্রুশিয়ার লড়াই ছিল একটি। ১৩ জানুয়ারী থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব প্রুশিয়ার যুদ্ধে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ৭৮৮জন সোভিয়েত সৈন্য নিহত এবং ৩ হাজার ৫২৫টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। পূর্ব প্রুশিয়ার পর বার্লিনের লড়াই ছিল শেষ লড়াই। এখানকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এত দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। হিটলার আত্মহত্যা করেন। রাইখ চ্যান্সেলারীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতুড়ি কাস্তে খচিত লাল পতাকা উত্তোলিত হয়। জার্মানী বিভক্ত হয়ে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ সব ঘটনা ছিল অবিশ্বাস্য।

কেন হিটলারের এত দ্রুত পতন ঘটলো, কেন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পরাজিত হলেন—এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করছেন যে, পরাজয়ের জন্য হিটলার নিজেই দায়ী। ঐতিহাসিকদের এ দাবি উড়িয়ে

www.pathagar.com

দেয়া যায় না। হিটলার ভিন্নমতকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু। বৈঠকে তার বাগ্মিতায় ভিন্নমতের জেনারেলদের কণ্ঠ হারিয়ে যেতো। তারা তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পেতেন না। হিটলার নিজেকে একজন সামরিক প্রতিভা হিসেবে জ্ঞান করতেন। পুরো যুদ্ধের নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা তার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। তার ভুল সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুকূলে থাকাকালে মস্কো অভিযান না চালানো। ১৯৪১ সালের আগস্টে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ওয়ালথার ভন ব্রাউশিটস ও আর্মি গ্রুপ সেন্টারের কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল ফেডার ভন বক হিটলারকে বার বার মস্কোয় হামলা করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাদের মতামত উপেক্ষা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি জমি, শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখলে ইউক্রেন অবরোধ করে তা দখলের নির্দেশ দেন। এখানেই হিটলার তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করেন। যথাসময়ে মস্কো অভিযানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনি যুদ্ধে জেতার সুযোগ হারিয়ে ফেলেন। ইউক্রেনের কোনো সামরিক গুরুত্ব ছিল না। অথচ তিনি সেখানেই তার শক্তি ক্ষয় করেছেন বেশী। অভিজ্ঞ জেনারেলদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি মস্কো দখলের নির্দেশ দিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীই বিজয়ী হতো। এক পর্যায়ে রাশিয়া অভিযানে বিপর্যয় দেখা দিলে জেনারেলগণ তার কাছে পিছু হটার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে তিনি তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করায় কেউ কেউ তার অনুমতি ছাড়া সৈন্য প্রত্যাহার করেন। এ অপরাধে বেশ কয়েকজন জেনারেলকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি দাবি করেছেন যে, রাশিয়া থেকে জার্মান বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি নাকচ করে দিয়ে তিনি আর্মি গ্রুপ সেন্টারকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তার দাবি সঠিক ছিল না। ১৯৪৫ সালে বার্লিনের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলার কমান্ডার হিসেবে হেইনরিচ হিমলারের নিযুক্তি ছিল আরেকটি মারাত্মক ভুল। যুদ্ধের চাপে হিমলার মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং তার মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ায় বার্লিনের পতন ঘনিয়ে আসে।

www.pathagar.com

লেনিনগ্রাদে ৯শ' দিনের অবরোধ

১৯৪১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের ১৮ জানুয়ারী নাগাদ ৯ শ' দিন লেনিনগ্রাদ ছিল অবরুদ্ধ। এ অবরোধে ৬ লাখ ৩২ হাজার লোক প্রাণ হারায়। কেবলমাত্র ১৯৪১ সালের বড়দিনে একদিনে এ শহরে অনাহারে মারা যায় প্রায় ৪ হাজার লোক। হিটলার লেনিনগ্রাদকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। জার্মান অবরোধে এ ঐতিহাসিক শহরের অধিবাসীদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী আবেগ তুঙ্গে উঠে। লেনিনগ্রাদ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি মামুলি শহর ছিল না। বলশেভিক বিপ্লবের আগে তার নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ। বলশেভিক বিপ্লবের নেতা মহামতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামানুসারে এ শহরের নামকরণ করা হয় লেনিনগ্রাদ। সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ শহরের পতনের অর্থ ছিল প্রতীকী অর্থে লেনিনবাদ তথা মার্কসবাদের পতন এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের ধ্বংস।

লেনিনগ্রাদ অবরোধ ছিল রাশিয়া অভিযানে জার্মানীর সর্বাত্মক অভিযানের অংশ। ২ হাজার মাইলব্যাপী একটি বিরাট ফ্রন্টে ৪০ লাখ জার্মান সৈন্য রাশিয়া প্রবেশ করে। তাদের ফ্রন্ট এত দীর্ঘ ছিল যে, পশ্চাৎভাগ রক্ষা করা এবং সকল ইউনিটে সরবরাহ পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জ্বালানি ঘাটতি দেখা দেয়ায় জার্মান সৈন্যরা রাজধানী মস্কোতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। রুশ সৈন্যরা পিছু হটার সময় পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। তারা ফসলের মাঠ ও অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়। ফলে অগ্রসরমান জার্মান বাহিনীর লজিস্টিক সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া রাশিয়ার ভূমি ছিল জার্মান ট্যাংক চলাচলের জন্য অনুপযোগী। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জার্মানরা বিজয়ী হতো পারতো। কিন্তু একই বছরের শুরুর দিকে জার্মানী গ্রীসে অভিযান চালিয়ে নিজের সামরিক শক্তির একটি অংশ সেখানে নিয়োজিত করায় রুশ অভিযানে জনবলের ঘাটতি পড়ে। নইলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটতো বলে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন। রাশিয়ায় জার্মান হামলা ছিল দু'দেশের মধ্যকার অনাক্রমণ চুক্তির লংঘন। ১৯৩৯ সালের আগস্টে রাশিয়া ও জার্মানী অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির মেয়াদ ছিল ১০ বছর। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের তিন বছরের মাথায় রাশিয়া আক্রান্ত হয়। বিদেশী সূত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো স্টালিনকে বার বার জার্মান হামলা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিল। কিন্তু তিনি কারো হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত করেননি। স্টালিন জার্মান অভিযানের কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। শুধু তিনি নন, রুশ সামরিক কমান্ডারগণও একটা ভুল ধারণায় ছিলেন আচ্ছন্ন। এ ধারণা থেকে রাশিয়ায় জার্মান হামলা শুরুর হওয়ার পূর্ব রাতে সোভিয়েত

www.pathagar.com

সৈন্যদের কাছে প্রেরিত মার্শাল তিমোশেঙ্কো ও জেনারেল জর্জি ঝুকভের স্বাক্ষরিত এক নির্দেশে বলা হয়, 'কোনো প্ররোচনার জবাব দেবে না। সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোনো তৎপরতা চালাবে না।'

জার্মানীর জন্য শুধু লেনিনগ্রাদ নয়, গোটা রাশিয়া অভিযান একসময় বিপর্যয়ে পরিণত হয়। যদিও জার্মানরা দেশটির দুই-পঞ্চমাংশ অর্থনীতিসহ বিশাল অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে উল্কার মতো ছুটে যেতে থাকে। বাল্টিক রাষ্ট্র লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়ার মধ্য দিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করে। সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশের পর জার্মান সৈন্যরা কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে সামনে এগুতে থাকে। একটি ভাগের দায়িত্ব ছিল লেনিনগ্রাদ দখল করা। লেনিনগ্রাদ দখলের দায়িত্বে নিয়োজিত জার্মান আর্মি গ্রুপ নর্থ-এ ছিল ষোড়শ, অস্টাদশ ও চতুর্থ পাঞ্জার আর্মি। লেনিনগ্রাদ প্রবেশে ব্যর্থ হওয়ায় আর্মি গ্রুপ নর্থ শহরটি অবরোধে হিটলারের অনুমতি কামনা করলে তিনি তা মঞ্জুর করেন।

লেনিনগ্রাদ অভিযানের জন্য বেছে নেয়া হয় শীতকালকে। হিটলারের হিসাব ছিল ভয়াবহ শীতে রুশরা আড়ষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা পঙ্গপালের মতো মৃত্যুবরণ করবে। তার হিসাব পুরোপুরি ভুল হয়নি। শীতে রুশদের মৃত্যু হয়েছে যত তার চেয়ে হামলাকারী জার্মানদের প্রাণহানির সংখ্যা মোটেও কম ছিল না। জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সহযোগী ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্যরাও প্রাণ হারায়। গোলাগুলী ছাড়াই উভয়পক্ষে বেশুমার প্রাণহানি ঘটে। এ জন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, লেনিনগ্রাদ অবরোধ করার সময়সূচী সঠিক ছিল না। শীতকালে অভিযান শুরু করায় লেনিনগ্রাদ অবরোধ নিষ্ফল হয়। কিন্তু অনেকেই এ অভিমতের সঙ্গে একমত নন। তারা গোটা ইউরোপ দখলে স্টালিনের পরিকল্পিত অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, হিটলার আর দু'সপ্তাহ বিলম্ব করলে সোভিয়েত সৈন্যরাই বার্লিনের দোরগোড়ায় হাজির হতো। শুধু বার্লিন নয়, সমগ্র ইউরোপের পতন ঘটতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসাব করে দেখতে পায় যে, নাৎসী জার্মানীকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স ইউরোপ জয়ে তার উচ্চাকাংখা মেনে নেবে। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। জার্মানীকে ধ্বংস করার পুরস্কার হিসেবে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জোট কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আঁতাত করে এবং পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত দখলদারিত্ব মেনে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নথিপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, লেনিনগ্রাদ কিংবা স্টালিনগ্রাদ অবরোধসহ তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় জার্মানীর সর্বাত্মক অভিযানের কোনো বিকল্প ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে জার্মানী টিকে ছিল ৪ বছর। কিন্তু অভিযান না চালালে নাৎসী জার্মানীর টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল ৪ কি ৫ মাস। বিলম্ব করার মানে ছিল ধ্বংস হওয়ার জন্য নিজেকে সঁপে দেয়া। এ যুক্তিতে জার্মানী শীতের ভয়াবহতার কথা জেনেও এ সময়টাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিযানের জন্য বেছে নেয়।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালের ৬ জুলাই স্টালিন ইউরোপ দখলে নিষ্পত্তিকারী অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন। এ পরিকল্পিত অভিযানের কয়েক বছর আগে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিল। ১৯৩৯ সালে দেশটি তার অর্থনীতিকে পুরো যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ে যায়। পরবর্তী দু'বছরে সে দেশে অস্ত্র ছাড়া আর কিছু উৎপাদিত হয়নি। এসব অস্ত্রের অধিকাংশই ছিল গুণগতভাবে জার্মানীর তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে উন্নত। এক হিসাবে বলা হয় যে, ভিন্ন মতাদর্শের ইউরোপকে পদানত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় ৩ কোটি নাগরিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে। ইউরোপে পরিকল্পিত অভিযানের কয়েক মাস আগে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমাঞ্চলে তাদের অধিকাংশ সমরাস্ত্র ও সৈন্য স্থানান্তরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এসব কার্যকলাপ সম্পর্কে জার্মানী অনবহিত ছিল না। আসন্ন সোভিয়েত হামলা ব্যর্থ করে দিতে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিরোধমূলক অভিযান চালায়। কেউ কেউ যদিও বলছেন যে, ইহুদীবাদী কমিউনিজম ধ্বংস এবং পূর্বাঞ্চলের সম্পদ লুট করাই ছিল হিটলারের রাশিয়া অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়।

সোভিয়েতদের দৃষ্টিতে এডলফ হিটলার ও জার্মান ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি বা নাৎসী দল ছিল তাদের স্বার্থের পক্ষে একটি 'আইসব্রেকার।' জার্মানীকে শিক্ষা দেয়ার নাম করে সোভিয়েতরা ইউরোপে প্রবেশ করতো এবং একে একে গোটা মহাদেশ দখল করে নিতো। শুধু সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ নয়, সাম্যবাদী মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করাও ছিল ইউরোপ বিশেষ করে জার্মানীতে পরিকল্পিত সোভিয়েত সামরিক অভিযানের লক্ষ্য। সোভিয়েত বিশ্লেষকগণ গভীর মনযোগ দিয়ে দেখতে পান যে, মার্কসীয় অর্থনীতির আওতায় সমাজ ও রাষ্ট্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার কথা ছিল সে পরিবর্তন বলশেভিক বিপ্লবের দেশ সোভিয়েত রাশিয়ায় না এসে এসেছে নাৎসী জার্মানীতে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব কায়েমের অন্তত দেড় যুগ পরে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করে। দেশটির বেকারত্ব দূর হয়ে যায়। ভিক্ষাবৃত্তি, রাহাজানি ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত একটি মাঝারি আকারের দেশ মাত্র ৩/৪ বছরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। জার্মানীর এ অভাবিত উন্নতি ছিল স্টালিনের মাথাব্যথার কারণ। একইভাবে পুঁজিবাদে বিশ্বাসী যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো শক্তিগুলোও ঘাবড়ে যায়। এ 'বিগফোর' নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে গিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। 'বিগফোর' গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতামূলক ভারসাম্যে বিশ্বাসী জার্মানীর ঈর্ষণীয় অগ্রগতিতে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ম্লান হয়ে পড়েছে। এ কারণে তারা সম্মিলিতভাবে জার্মানীকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা অপপ্রচার চালানোর কৌশল গ্রহণ করে। চারদিক থেকে বলা হচ্ছিল যে, জার্মানীর অর্থনৈতিক সাফল্য হচ্ছে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফসল। তাতেও কাজ না হওয়ায় সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়।

১৯৪১ সালের ১ সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদে প্রথম জার্মান গোলা বর্ষিত হয়। লেনিনগ্রাদ ছিল রাশিয়া দখলে হিটলারের প্রণীত 'অপারেশন বারবারোসা'র অন্যতম লক্ষ্যস্থল।

www.pathagar.com

হিটলার ধারণা করেছিলেন, অবরোধ আরোপ করা হলে গাছের পাতার মতো এ শহরের পতন ঘটবে। অপারেশন বারবারোসার প্রাথমিক সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে জার্মানরা লেনিনগ্রাদে প্রবেশ করতে গিয়েও হোঁচট খায়। এরপর শুরু হয় অবরোধ। হিটলার তার জেনারেলদের কাছে এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, লেনিনগ্রাদ অবরোধ করে স্থল ও বিমান হামলা চালাতে থাকলে শহর রক্ষায় অব্যাহত লড়াই নিঃশেষ হয়ে যাবে। জার্মানরা বিমান থেকে প্রচারপত্র ফেলে শহরবাসীদের হুঁশিয়ার করে দেয়, আত্মসমর্পণ না করলে তারা অনাহারে মারা যাবে। জুনে জার্মান অপারেশনের সফলতায় লেনিনগ্রাদের ক্ষমতাসীন এলিট সামরিক আইন জারি করে। অবরোধের প্রথম সপ্তাহে ২ লাখ লোক শহর রক্ষায় সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। নারী ও শিশুদের শহর থেকে স্থানান্তর করা হয়। কর্তৃপক্ষ শহরের নিয়ন্ত্রণ লেনিনগ্রাদ গ্যারিসনের কমান্ডার লেঃ জেনারেল পোপভ, কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় কমিটির প্রধান এ, এ ঝাদানোভ এবং শহরের সোভিয়েত নির্বাহী প্রধান পি, পোপভের কাছে অর্পণ করে।

লেনিনগ্রাদের অনেকেই আশংকা করেছিলেন যে, জার্মানরা এ শহরে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেবে। তবে রুশদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নিজেদের সৈন্য সংখ্যা কম থাকায় জার্মানরা শহর দখল করার পরিবর্তে অবরোধ করে। ৮ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মান ট্যাংক লেনিনগ্রাদের ১০ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং বাদবাকি রাশিয়ার সঙ্গে শহরটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তবে আকাশ ও নদী পথে সরবরাহ লাইন ছিল খোলা। কিন্তু আকাশ ও নদীপথ ছিল জার্মানদের সার্বক্ষণিক হামলার আওতায়। জার্মানরা অনবরত শহরে বোমাবর্ষণ করায় বিদ্যুৎ স্টেশন অকেজো হয়ে যায়। তাছাড়া শহরে দ্রুত খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

১৯৪১ সালের জুনে রাশিয়ায় জার্মান হামলা শুরু হওয়ার সময় লেনিনগ্রাদের লোকসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। জার্মানরা রাশিয়ার অভ্যন্তরে এগিয়ে আসতে থাকলে আরো ১ লাখ শরণার্থী শহরে প্রবেশ করে। সরবরাহ লাইন খোলা রাখা সম্ভব হলেও কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় প্রয়োজনীয় খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হতো, প্রয়োজনীয় এক-তৃতীয়াংশ কয়লা পাওয়া যেতো, এক-দ্বাদষাংশ চিনি এবং অর্ধেক মাংস পাওয়া যেতো। ১২ সেপ্টেম্বর শহরের কর্তৃপক্ষ এক হিসাব প্রকাশ করে জানায় যে, তাদের কাছে নিম্নোক্ত সরবরাহ রয়েছে ঃ (১) আটা ৩৫ দিনের মজুদ (২) শিশু খাদ্য ৩০ দিনের (৩) মাংস ৩৩ দিনের (৪) চর্বি ৪৫ দিনের এবং (৫) চিনি ৬০ দিনের।

শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী রেল যোগাযোগ ছিল আনুমানিক ১শ' মাইল দূরে তিখভিনের পূর্বদিকে। কিন্তু ৯ নভেম্বর জার্মানদের হাতে তিখভিনের পতন ঘটে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ লেনিনগ্রাদ কার্যকরভাবে অবরোধ করা হয় এবং শহরটিকে গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। তখন শহরের লোকজনের খাদ্য ও জ্বালানি মজুদ ছিল সর্বনিম্ন। এ অবরোধ ৯ শ' দিন স্থায়ী হয়। শহর থেকে রেল যোগাযোগ দূরে হওয়ায় স্টালিন মস্কোর প্রতিরক্ষা জোরদারে লেনিনগ্রাদে প্রাপ্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ পণ্যাদি রাজধানীতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। অবিলম্বে রেশনিং চালু করা হয়। প্রাপ্ত রেশনের অধিকাংশই পেয়েছিল সৈন্য, বাল্টিক নৌ-বহর ও শ্রমিকরা।

www.pathagar.com

রেশন প্রাপ্তির পরের সারিতে ছিল সরকারী অফিসার এবং তারপরের সারিতে ছিল বেকার শ্রমিক ও শিশুরা। শহর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। হোটেল রেস্তোঁরাগুলো রেশন বহির্ভূত খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখায় এ পদ্ধতি কাংখিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। খাদ্য মজুদ ছিল সামান্য। জনগণ আতংকিত হবে ভেবে শহর কর্তৃপক্ষ খাদ্য মজুদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেনি। তবে খাদ্য মজুদ সম্পর্কে জনগণকে প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত করলে তারা নিজেদের মন মতো করে পরিকল্পনা করে চলতে পারতো। কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে খাদ্য বিক্রয়কারী দোকানের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস করা হয়। ফলে রেশনপ্রার্থী লোকজনের লাইন আরো লম্বা হতে থাকে। টাকা দিয়ে রেশনের মাল ক্রয় করা যেতো এবং এতে কালোবাজারী শুরু হয়।

লেনিনগ্রাদে প্রবল শীত পড়ে। ১৯৪১-৪২ সালের শীত তার ব্যতিক্রম ছিল না। জ্বালানির ঘাটতি থাকায় বসতবাটিতে বিদ্যুতের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। তবে সামরিক বাহিনী ও শিল্প-কারখানাগুলোকে বিদ্যুত ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বাতি জ্বালানোর জন্য কেরোসিন তেল পাওয়া যেতো না। তাই বসতবাটিতে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় পোড়ানো হতো। রুটির জন্য তীব্র শীতে বিরাট লাইনে দাঁড়াতে হতো। বেঁচে থাকার জন্য কুকুর ও বিড়াল মারা হতো। এমনকি নরমাংস ভক্ষণের ঘটনাও ঘটে। নতুন কবর থেকে রাতের অন্ধকারে লাশ তোলা হতো। সাহসী লোকেরা জার্মান কামানের গোলা উপেক্ষা করে শহরের বাইরে গিয়ে জমিতে আলু রোপন করতো। এতে শহরে খাদ্যের অভাব কিছুটা দূর হয়। তবে উৎপন্ন আলুগুলো কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হতো। পরে এগুলো সবার মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হতো। ময়দা সরবরাহ ফুরিয়ে যাওয়ায় শহর কর্তৃপক্ষ আটা পিষে ময়দা প্রস্তুত করার জন্য দক্ষ লোকজনকে নির্দেশ দেয়। অবরোধের প্রথম ক'মাসে বেকারীগুলো যেসব রুটি তৈরি করতো সেগুলোতে ময়দার পরিমাণ থাকতো ৫০ শতাংশ। পাউরুটি তৈরিতে সোয়া, বার্লি ও ভুটা ব্যবহার করা হতো। ভুট্টা ছিল মূলতঃ ঘোড়ার খাদ্য। খাদ্যের বিকল্প হিসেবে মল্ট ব্যবহার করা হয়। তুলাবীজ ও উদ্ভিদের গুঁড়ো দিয়েও রুটি তৈরির চেষ্টা করা হয়। এ দু'টি বস্তুর পুষ্টিমান নিম্ন হলেও লেনিনগ্রাদে এগুলো প্রচুর পাওয়া যেতো। বিড়াল ও ভেড়ার নাড়িভুড়ি সিদ্ধ করে 'খাদ্য' তৈরি করা হতো। লবঙ্গের তৈল মিশিয়ে সুস্বাদু করা হতো এবং দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ঘাস দিয়ে পাতলা ঝোল তৈরি করা হতো এবং স্যুপ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। লেনিনগ্রাদের অভিজ্ঞ লোকজনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্য সরবরাহের ঘাটতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি লোকের দৈনন্দিন ক্যালোরি চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ মিটানো যেতো। শ্রমিকরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কল-কারখানার বীয়ারিং থেকে গ্রীজ এবং ক্যান থেকে তেল বের করে খেতো। এভাবে লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কলকারখানায় ও রাস্তাঘাটে মারা যেতো। শহর কর্তৃপক্ষ মৃত লোকজনকে গণকবর দিতো। কবর খননকারী পাওয়া না গেলে বিস্ফোরক দিয়ে মাটিতে গর্ত করে লাশ চাপা

www.pathagar.com

দেয়া হতো। একসময় বরফে লাশ ঢাকা পড়ে যেতো। পিস্কারিভেস্কয়ি নামে একটি গোরস্তানে ৫ লক্ষাধিক লোককে গণকবর দেয়া হয়। একদিকে লোকজন যখন রাস্ত াঘাটে খাদ্যাভাবে মরছিল তখন অন্যদিকে চলছিল রেশন কার্ডের জন্য কামড়াকামড়ি। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে অবরোধের প্রথম পর্যায়ে অনাহারে ১১ হাজার লোক মারা যায়। প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন শ' লোক মারা যেতো। শহরে শীত ঝেঁকে বসলে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় লেনিনগ্রাদবাসী শহরে খাদ্যবাহী ট্রাক প্রবেশের জন্য দু'টি সরবরাহ পথ তৈরি করে। সরবরাহ পথের একটি ছিল সড়ক এবং আরেকটি ছিল হ্রদ লাগোদা। জাবোরির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে একটি রাস্তা নির্মাণে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। জাবোরি ছিল জার্মান অধিকৃত তিখভিনের পূর্বদিকে লেনিনগ্রাদের সবচেয়ে কাছের শহর। ২৭ দিনে যে রাস্তাটি তৈরি হয় তার দৈর্ঘ্য ছিল ২ শতাধিক মাইল। এটিকে রাস্তা বলা হলেও এর অনেক জায়গা এত সংকীর্ণ ছিল যে, কোথাও কোথাও দু'টি লরি নয়, একটি ট্রাক যাতায়াত করতেও কষ্ট হতো। রাস্তাটির কোথাও কোথাও ছিল খাড়া। আবার প্রবল তুষারপাতে কোনো কোনো অংশ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তো। লোকজন এ রাস্তাকে বলতো 'রোড টু লাইফ' বা জীবন রক্ষাকারী রাস্তা। ৬ ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষ রাস্তাটি প্রথমবার ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়ার ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় শহরের লোকজন আনন্দিত হয়। কিন্তু এটি শহরের তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার মতো প্রয়োজনীয় সরবরাহ পৌঁছানোর জন্য মোটেও যথেষ্ট ছিল না। প্রায় ৩ শতাধিক লরী যাত্রা করে। কিন্ত রাস্তায় বিস্তর বাধা-বিপত্তি থাকায় একদিনে একটি লরি বড়জোর ২০ মাইল অতিক্রম করে। ৯ ডিসেম্বর শহরে লোকজন আনন্দের সঙ্গে শুনতে পায় যে, রুশরা গুরুত্বপূর্ণ রেলযোগাযোগ সমৃদ্ধ তিখভিন পুনর্দখল করেছে। তিখভিনের পতনে জার্মানরা শীত ও রুশদের প্রতিশোধ উভয়ের মুখোমুখি হয়। ৭ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত এবং বাদবাকিদের তিখভিন থেকে ৫০ মাইল পেছনে হটিয়ে দেয়া হয়। রেল লাইন ও সেতু মেরামতের জন্য রুশরা রেলওয়ে প্রকৌশলীদের নিয়ে আসে। পিছু হটার সময় জার্মানরা যেসব খাদ্য ফেলে রেখে যায় সেগুলো খেয়ে রুশদের এক সপ্তাহ খুব ভালোই কাটে। এক সপ্তাহে রেল লাইনের মেরামত শেষ হয়ে যায়। আবার অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে সরবরাহ পৌঁছতে শুরু করে।

হ্রদ লাগোদা ছিল আরেকটি সরবরাহ পথ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লেনিনগ্রাদবাসীদের জন্য শীত অসহনীয় হলেও লরি পারাপারের জন্য লাগোদা হ্রদে তুষারপাতের পরিমাণ ছিল অপর্যাপ্ত। লরি পারাপারের মতো প্রয়োজনীয় তুষারপাত না হলেও বার্জ চলাচল ব্যাহত হওয়ার মতো জমাট বরফ ছিল। লরি চলাচলের জন্য প্রয়োজন ছিল ২ শ' মিলিমিটার পুরু বরফ। নভেম্বরের শেষ নাগাদ হ্রদে তুষারপাতের ঘনত্ব ইপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছে। ২৬ নভেম্বর ৮ টি লরি লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করে লাগোদা হ্রদ অতিক্রমে সক্ষম হয় এবং ৩৩ টন খাদ্য নিয়ে ফিরে আসে। এটা ছিল একটি বিরাট অগ্রগতি। কিন্তু লেনিনগ্রাদের দৈনিক প্রয়োজন ছিল ১ হাজার টন খাদ্য। তুষারপাত নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ বিবেচিত হওয়ায় আরো লরি আসা-যাওয়া করে এবং এ পর্যায়ে শহরে প্রতিদিন ১শ' টন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা হতো।

www.pathagar.com

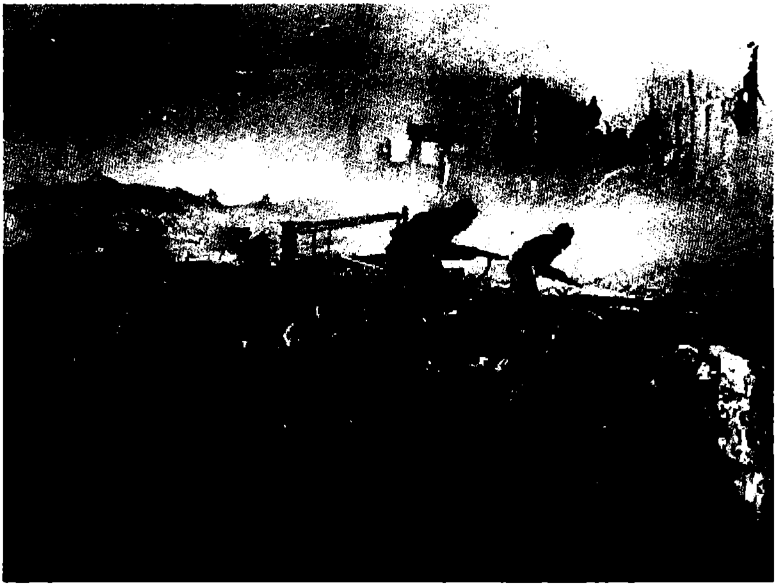

লেনিনগ্রাদে ধ্বংসস্তূপের ভেতর সোভিয়েত সৈন্যদের প্রতিরোধ লড়াই

'রোড টু লাইফ', রেলওয়ে এবং লাগোদা হ্রদের সাহায্যে শহরে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা এসে পৌঁছা সত্ত্বেও চাহিদার পুরোটুকু সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। শহরে রক্ষিত রেকর্ড থেকে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র ডিসেম্বরে ৫২ হাজার লোক মারা যায়। তীব্র শীত ও খাদ্যের অভাবে কেবল একদিনেই মারা যায় ১৬ হাজারের বেশী লোক। শহর কর্তৃপক্ষ যাদের মৃত্যুর তথ্য পেতো এবং যাদেরকে কবর দেয়া হতো তার ভিত্তিতে এ হিসাব তৈরি করা হয়। আরো বহু লোক নিজ নিজ বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাটে মারা যায় যাদের হিসাব শহর কর্তৃপক্ষের রেকর্ডে নেই। সরকারী হিসেবে লেনিনগ্রাদ অবরোধে মৃতের সংখ্যা ৬ লাখ ৩২ হাজার। অন্যদিকে, অনেকেই মনে করেন, এ সংখ্যা ১০ লাখের কাছাকাছি। তিখভিনের সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ গুরুতর অসুস্থ লোকজনকে শহরের বাইরে পাঠাতে সক্ষম হলেও তুষারাবৃত হ্রদ ও তড়িঘড়ি করে তৈরি রাস্তা দিয়ে বহুলোক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অমান্য করে পালিয়ে যায়। যে সময় শহরে জনবলের প্রয়োজন ছিল বেশী তখনি ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ৩৫ হাজার লোক লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করে। লেনিনগ্রাদ ত্যাগের সময় কত লোক মারা গেছে তার কোনো রেকর্ড নেই।

১৯৪২ সালের শেষ নাগাদ শহরের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১০ লাখের কম। অথচ ১৯৪১ সালের জুনে লোকসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। শহরের সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয়ে কর্তৃপক্ষ বিরাট জটিলতার মুখোমুখি হলেও লেনিনগ্রাদ অবরোধ ছিল একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা। উল্লেখিত পরিসংখ্যান তার প্রমাণ বহন করে। রোগব্যাধি, অনাহার এবং শহর থেকে যারা পালিয়ে যায় তাদের সবার মোট সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১৫ লাখ।

www.pathagar.com

রেড আর্মির অগ্রযাত্রার মুখে জার্মানরা লেনিনগ্রাদ থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! শহরকে যারা অবরোধের মুখে রক্ষা করেছিল স্টালিনের নির্দেশে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি তাদের গ্রেফতার করে। অবরোধকালে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার জন্য মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে তারা নব্য জার স্টালিনের প্রতিহিংসার শিকার হয় এবং যুদ্ধের পর বিভিন্ন অজুহাতে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, লেনিনগ্রাদ অবরোধকালে শহরের প্রতিরোধ লড়াইয়ের স্মারক হিসেবে যেসব রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল স্টালিনের নির্দেশে সেসব রাস্তার নাম পরিবর্তন করা হয়। যেমন—একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল 'প্রসপেক্ট অব টুয়েনটি ফিফথ অক্টোবর।' এটিকে তার আগের নাম' নেভস্কি প্রসপেক্ট'-এ ফিরিয়ে নেয়া হয়।

১৯৪১ সালের ২৭ জুন লেনিনগ্রাদের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি পরিষদ প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরিতে হাজার হাজার লোক নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কয়েকটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করা হয়। একটি নির্মাণ করা হয় লুগা নদীর মোহনা থেকে চুদোভো পর্যন্ত। এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ নেভা নদীর মাঝ বরাবর চলে গিয়েছিল। অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো পেটারগোফ থেকে গাটচীন, পুলকোভো, কোলপিনো ও কোলতুশি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। লেনিনগ্রাদের উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলীতে ফিনিশদের সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা হয়। গাছের গুঁড়ি ও কাঠ ফেলে ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ৬৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা হয়। ৭৫০কিলোমিটার দীর্ঘ ট্যাংকবিধ্বংসী পরিখা, মাটি ও গাছের গুঁড়ি বা কাঠ দিয়ে আরো ৫ হাজার প্রতিবন্ধক ও কামান স্থাপনের জন্য কংক্রীটের বাংকার তৈরি করা হয়। বেসামরিক লোকজন ২৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উন্মুক্ত পরিখাও খনন করে। লেনিনগ্রাদের দক্ষিণে পোলকোভস্কয়ি পাহাড়ের শীর্ষে ক্রুজার অরোরার কামান বসানো হয়। জুনের শেষদিকে নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের সোভিয়েত সৈন্যরা বাল্টিক অঞ্চলে পরাজিত হলে জার্মান ওয়ারম্যাট (সশস্ত্র বাহিনী) অস্টোভ ও পাসকোভের দিকে এগিয়ে আসে। ১০ জুলাই এ দু'টি শহরের পতন ঘটে। এরপর জার্মানরা কুন্ডা ও কিঙ্গিসিপে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে তারা লেনিনগ্রাদের দিকে ধেয়ে আসে। ৪ সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। ৮ সেপ্টেম্বর জার্মান বিমানের বোমাবর্ষণে ১৭৮টি জায়গায় আগুন ধরে যায়। অক্টোবরের শুরুর দিকে জার্মানরা শহরে হামলা চালাতে অস্বীকার করে। এ পরিস্থিতিতে ৭ অক্টোবর জেনারেল আলফ্রেড জোডল স্বাক্ষরিত হিটলারের নির্দেশে সৈন্যদের আত্মসমর্পণ না করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয়।

আগস্টে ফিনিশরা কারেলিয়ান যোজক পুনরুদ্ধার করলে পশ্চিম দিক থেকে লেনিনগ্রাদের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়। ফিনিশরা লেক লাদোগার পূর্বদিকে কারেলিয়া বরাবর অগ্রসর হলে উত্তর দিক থেকে লেনিনগ্রাদের প্রতি হুমকি দেখা দেয়। ফিনিশ সদরদপ্তর লেনিনগ্রাদে বোমাবর্ষণে জার্মানদের অনুরোধ উপেক্ষা করে এবং অধিকৃত ইস্ট কারেলিয়ার সাভির নদী থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানায়। রণাঙ্গনে

www.pathagar.com

জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতি ঘটছিল এবং সেপ্টেম্বর নাগাদ তারা লেনিনগ্রাদে অভিযান চালায়। ডিসেম্বরে উত্তরাঞ্চলে ফিনিশ সৈন্যরা লেনিনগ্রাদের ১৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে সাভির নদীতে পৌঁছা নাগাদ তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ৪ সেপ্টেম্বর জেনারেল জোডল ফিনিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহিমকে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪১ সালের ২৪ আগস্ট ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট রাইটি মার্শাল ম্যানারহিমের সদরদপ্তর পরিদর্শনে আসেন। জার্মানরা তাকে পুরনো সীমান্ত অতিক্রমকালে অনুসরণ করে এবং ম্যানারহিমের সদরদপ্তরে গিয়ে হাজির হয়। সেখানেই লেনিনগ্রাদে হামলা চালানোর জন্য মার্শাল ম্যানারহিমকে অনুরোধ করা হয়। জার্মানদের অনুরোধের জবাবে প্রেসিডেন্ট রাইটি বললেন যে, 'লেনিনগ্রাদ দখল করা আমাদের লক্ষ্য নয় এবং আমরা লেনিনগ্রাদ হামলায় অংশগ্রহণও করবো না।' ম্যানারহিম ও ফিনল্যান্ডের সমরমন্ত্রী ওয়াল্ডেন প্রেসিডেন্ট রাইটির সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ফলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জার্মানরা উত্তর দিক থেকে লেনিনগ্রাদে এগিয়ে যেতে সক্ষম ছিল না। ফিনল্যান্ডের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, ফিনিশ ভূখণ্ড থেকে কাউকে লেনিনগ্রাদে গোলাবর্ষণের অনুমতি দেয়া হবে না। নিজ ভূখণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদে গোলাবর্ষণ করতে না দেয়ার পেছনে ফিনল্যান্ডের আরো একটি কারণ ছিল। লেনিনগ্রাদে জার্মান হামলার আগে রুশ সৈন্যরা ফিনল্যান্ডে প্রবেশ করে। জার্মানরা তো ছিলই। তাই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ফিনল্যান্ড লেনিনগ্রাদ অভিযানে জার্মানীর সহযোগী হতে অস্বীকৃতি জানায়।

অপারেশন স্পার্ক শুরু হওয়া নাগাদ লেনিনগ্রাদ অবরোধ স্থায়ী হয়। ১৯৪৩ সালের ১২ জানুয়ারী ভোরে 'লেনিনগ্রাদ' ও 'ভোল্কহোভ' নামে দু'টি সোভিয়েত ফ্রন্ট একযোগে জার্মান অবস্থানের উপর হামলা শুরু করে। ভয়াবহ ও প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর রেড আর্মির ইউনিটগুলো লাদোগা হ্রদের দক্ষিণে শক্তিশালী জার্মান অবস্থান তছনছ করে দেয়। ১৯৪৩ সালের ১৮ জানুয়ারী 'লেনিনগ্রাদ' ও 'ভোল্কহোভ' ফ্রন্ট পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং অবরুদ্ধ শহরের সঙ্গে একটি স্থল করিডোর খুলে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে সোভিয়েত সৈন্যদের পাল্টা হামলায় শহরের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকণ্ঠ থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হয়। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে ফিনিশদেরও তাড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে লেনিনগ্রাদ অবরোধ মুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালে জোসেফ স্টালিন এ শহরকে 'অর্ডার অব লেনিন' পদকে ভূষিত করেন।

www.pathagar.com

স্টালিনগ্রাদ অবরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক এডলফ হিটলারের পরাজয়ের পেছনে যে ক'টি কারণ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে স্টালিনগ্রাদ অবরোধ অন্যতম। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, হিটলারকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি। তিনি নিজেই নিজেকে পরাজিত করেছেন। হিটলারের ভুলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেই এ মন্তব্য করা হয়েছে। স্টালিনগ্রাদ অবরোধের ঝুঁকি গ্রহণ না করলে হিটলারের পতন এত দ্রুত ঘটতো কিনা সন্দেহ। তিনি একইসঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলে ইউরোপীয় রণাঙ্গন এবং আফ্রিকায় আরেকটি রণাঙ্গনে লড়াই করছিলেন। এ দু'টি রণাঙ্গনে লড়াইয়ে ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার আগেই তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একটি ফ্রন্ট খুলে বসেন। এক সঙ্গে তিনটি রণাঙ্গনে লড়াই করতে গিয়ে জার্মান বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের রসদ ঘাটতি দেখা দেয়। অগণিত সৈন্য ক্ষয় হয়। স্টালিনগ্রাদের পরিস্থিতি ছিল খুবই করুণ। শীত ঘনিয়ে আসায় জার্মান বাহিনী বিনা যুদ্ধে মারা যেতে থাকে। স্টালিনগ্রাদে জার্মানীর ৭ মাসব্যাপী অবরোধের অবসান ঘটে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ঘুমন্ত রুশ দৈত্য জেগে উঠে। অন্যদিকে, বিশ্ব কাঁপানো হিটলার দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এ পতন তার আত্মহত্যায় গিয়ে ঠেকে।

৪০ লাখের একটি জার্মান বাহিনী উত্তরে বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর জুড়ে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে রাশিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে, সোভিয়েত রাশিয়াও ৩০ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। রুশ রণাঙ্গনে উভয় দেশের সৈন্যদের মধ্যে যে ভয়াবহ স্থল যুদ্ধ হয় অনুরূপ যুদ্ধ শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়, আর কোথাও কখনো এত বড় স্থল যুদ্ধ হয়নি।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর স্টালিনগ্রাদ অবরোধ করতে গিয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের পাল্টা হামলায় জার্মান সৈন্যরা নিজেরাই ফাঁদে আটকা পড়ে। এ শহরে লড়াইয়ে যত সৈন্য নিহত হয় মানব ইতিহাসে আর কোনো লড়াইয়ে এত সৈন্য নিহত হয়নি। জার্মান পক্ষে ১০ থেকে ২০ লাখ সৈন্য নিহত হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে অক্ষশক্তির এক চতুর্থাংশ লোকবল ক্ষয় হয় এবং এ ক্ষতি তারা আর কখনো পূরণ করতে পারেনি। স্টালিনগ্রাদ লড়াইয়ে সোভিয়েত পক্ষেও প্রায় ১০ লক্ষাধিক সৈন্য ও সাধারণ মানুষ নিহত হয় এবং এখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তি শুরু হয়। স্টালিনগ্রাদ বিজয় সোভিয়েত লাল ফৌজকে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালের জুনে জার্মানী প্রথম দফা সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিযান চালায়। এ অভিযানের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন বারবারোসা।' অপারেশন বারবারোসায় বিপুল-সংখ্যক জার্মান সৈন্য হতাহত হয়। ২২ জুন জার্মান সৈন্যরা ত্বরিত গতিতে হামলা চালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে ডিসেম্বরে সোভিয়েত সৈন্যরা ব্যাপক আকারে রাজধানী মস্কোর প্রবেশদ্বারে পাল্টা হামলা চালায়। এ লড়াই মস্কো লড়াই হিসেবে পরিচিত। শীতে জার্মান বাহিনী কাবু হয়ে পড়ে। তাছাড়া তাদের সরবরাহ লাইন বিস্তৃত হয়ে পড়ায় সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে জার্মান সৈন্যরা মস্কো থেকে বিতাড়িত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম দফা অভিযানে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও হিটলার হতাশ হননি। তিনি ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়নে আরেকটি অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেন। জার্মান ভাষায় এ অভিযানের ছদ্মনাম দেয়া হয় 'ফল ব্লাউ' অর্থাৎ অপারেশন ব্লু। ইতিপূর্বে ইউক্রেন বিজয়ী 'আর্মি গ্রুপ সাউথ'কে এ অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ আর্মি গ্রুপ বা বাহিনীতে ছিল ৬ষ্ঠ ও ১৭তম পাঞ্জার এবং ৪র্থ ও ৭ম পাঞ্জার। সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় দফা জার্মান অভিযানের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত লাল ফৌজের প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়া। ২ হাজার মাইল বিস্তৃত ইস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মানীর সুপ্রীম কমান্ডার ফুয়েরার হিটলার ভুলক্রমে বিশ্বাস করতেন যে, বিগত শীতকালের লড়াইয়ে লাল ফৌজ তাদের সৈন্যবল ও উপকরণের বিরাট অংশ নিঃশেষ করে ফেলেছে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি পুনরায় সোভিয়েত রণাঙ্গনে শক্তি বৃদ্ধি করেন। সফলতা অর্জনে তিনি রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও ইতালীর সহায়তায় একটি বিশাল বাহিনী গঠনে সক্ষম হন। এ বাহিনী ছিল সুসজ্জিত। তবে এ বাহিনীতে এমন কিছু সৈন্য ছিল যাদের যোগ্যতা সন্দেহের উর্ধে ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প ও তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল স্টালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর মূল অভিযান চালানোর কথা ছিল। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চলে লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং দ্রুত মধ্যাঞ্চল দখল করাও ছিল পরিকল্পনার অংশ। জুনে অপারেশন শুরু হয়। জার্মান বাহিনীর আকস্মিক অভিযানে সোভিয়েতরা হতচকিত হয়ে পড়ে। জার্মানরা পুরনো ব্লিৎসক্রিগ স্টাইলে সফলতা অর্জন করতে থাকে। এতে হিটলারের উচ্চাশা বৃদ্ধি পায়। ২৩ জুলাই ধাপে ধাপে বিজয় লাভের ধারণা বাতিল করে তিনি ৪৯ নং নির্দেশ জারি করেন। স্টালিনগ্রাদ অভিযানে এ নির্দেশ কার্যকর হয়। তবে একই সময়ে হিটলার স্টালিনগ্রাদ ও ককেশাস অঞ্চল দখলে দু'টি অভিযান পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। এ দু'টি অভিযানের স্বার্থে তিনি আর্মি গ্রুপ সাউথকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। একটির নাম দেয়া হয় 'আর্মি গ্রুপ সাউথ'(ক) এবং আরেকটির 'আর্মি গ্রুপ সাউথ'(খ)। হিটলার আর্মি গ্রুপ সাউথ(ক)-কে জেনারেল এরিক ভন ম্যানস্টেইন ও পল ভন ক্লেইস্টের নেতৃত্বে ন্যস্ত করেন এবং জেনারেল ফ্রেডারিক পাউলাস ও হারম্যান হোথের নেতৃত্বে ন্যস্ত করেন আর্মি গ্রুপ সাউথ(খ)-কে। আর্মি গ্রুপ সাউথ(খ)-তে ছিল ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পাঞ্জার।

www.pathagar.com

কর্নেল-জেনারেল ফ্রেডারিক পাউলাসের নেতৃত্বাধীন ৬ষ্ঠ এবং আরেক কর্নেল-জেনারেল হারম্যান হোথের নেতৃত্বাধীন ৪র্থ পাঞ্জারের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্টালিনগ্রাদ দখল করা। এ লক্ষ্যে তারা জুন ও জুলাইয়ের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তারা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে বিনা যুদ্ধে স্টালিনগ্রাদ দখল সম্ভব হতো। জার্মান জেনারেলগণ হিটলারকে বারংবার সাবধান করে দেন যে, একই সময়ে দু'টি অভিযানে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেন। হিটলার জেনারেল হারম্যান হোথের নেতৃত্বাধীন সাঁজোয়া বাহিনীকে স্টালিনগ্রাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ককেশাস অঞ্চল দখলে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এভাবে হিটলার সোভিয়েত সৈন্যদের স্টালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষায় প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ না দিয়ে এ শহর দখলের সুযোগ হাতছাড়া করেন।

এক পক্ষকাল পরে হিটলার ৪র্থ পাঞ্জারকে উত্তর পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে স্টালিনগ্রাদ অভিমুখে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনি তার সুযোগ হারিয়ে ফেলেন। স্টালিনগ্রাদ থেকে ১শ' মাইল দূরে থাকাকালে জেনারেল হোথের কাছে সরবরাহ না পৌঁছায় তার অগ্রযাত্রা থেমে যায়। এদিকে, জেনারেল পাউলাসের নেতৃত্বাধীন ৬ষ্ঠ পাঞ্জার একের পর এক লড়াই করে দোন নদী অতিক্রম করে এবং ২৩ আগস্ট স্টালিনগ্রাদের উত্তরে ভলগা নদীর দক্ষিণ তীরে পৌঁছে যায়। সেদিন জার্মান বোমারু বিমানের ব্যাপক বোমাবর্ষণে স্টালিনগ্রাদে হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত এবং শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ৬২তম সোভিয়েত কোর এ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও ঘরে ঘরে এবং কলকারখানায় অবস্থান গ্রহণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহরে লড়াই ছিল তীব্র ও ভয়ংকর। সোভিয়েত নেতা স্টালিন পলায়নপর সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দানের নির্দেশ দেন। যুদ্ধকালে সোভিয়েতরা কাপুরুষতার জন্য প্রায় ১৩ হাজার সৈন্যকে গ্রেফতার করে নয়তো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। আরো ৩ লাখ সৈন্যকে তাদের ইউনিটে ফেরত পাঠানো হয় অথবা অন্যান্য ইউনিটে বদলি করা হয়।

জার্মানরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। তবে তাদেরকেও চরম মূল্য দিতে হয়। জার্মান ৬ষ্ঠ পাঞ্জার স্টালিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। স্টালিনগ্রাদে অবস্থানরত রাশিয়ার ৬২ ও ৬৪তম কোরের কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে জেনারেল পাউলাস দোন ও ভলগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে বিমান ও সরবরাহ ঘাঁটি স্থাপন করেন। এসময় জেনারেল হোথের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে।

বেশ কয়েক দিনের তীব্র লড়াই এবং প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাসিল চুইকভের নেতৃত্বে রুশ সৈন্যরা বিধ্বস্ত স্টালিনগ্রাদ ধরে রাখে। দোন নদী বরাবর ৬ষ্ঠ পাঞ্জারের বাম পার্শ্ব রক্ষায় প্রয়োজনীয় সৈন্য স্বল্পতার কথা ভেবে জার্মান আর্মি হেডকোয়ার্টার্স স্টালিনগ্রাদ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে এ প্রতিরক্ষা লাইন শক্তিশালী করতে এবং শত্রুর অগ্রাভিযানের মুখে জেনারেল পাউলাসের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতা রোধে হিটলারকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু জার্মান আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের

www.pathagar.com

পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি দুর্বল দোন সেক্টর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে ৬ষ্ঠ পাঞ্জারে স্থানান্তরিত করেন এবং স্টালিনগ্রাদ দখলে এ বাহিনীকে নির্দেশ দেন।

লুফটফ্লুট-৪ এর বোমারু বিমানের সহায়তা নিয়ে জার্মান পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত পতনশীল রাজপথের মধ্য দিয়ে ব্যাপক হামলা শুরু করে। রুশ সৈন্যরা প্রতি মিটার জায়গা দখলে জার্মান বাহিনীকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় জার্মানদের সঙ্গে রুশদের বাংকারে বাংকারে ও ঘরে ঘরে লড়াই হয়। এমনকি নর্দমায়ও লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানরা কৌতুক করে অভূতপূর্ব এ নগর যুদ্ধের নাম দিয়েছিল 'রাটেনক্রিগ' বা ইঁদুরের যুদ্ধ। শহরের উপকণ্ঠে মামেয়েভ কুরগান নামে রক্তস্নাত একটি বিখ্যাত পাহাড় দখলের লড়াই ছিল নির্মম। এ পাহাড়ের শৃঙ্গ বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়। মামেয়েভ কুরগান পুনর্দখলে একদিনের এক পাল্টা হামলায় সোভিয়েতরা ১০ হাজার সৈন্যের পুরো একটি ডিভিশন হারায়। গ্রেইন এলিভেটর নামে একটি বিশাল সাইলোতে রুশ ও জার্মান সৈন্যরা হাতাহাতি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এখানে লড়াই কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। তাদের অবস্থান এত কাছাকাছি ছিল, তারা একে অপরের শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পেতো। শহরের অপর অংশে ইয়াকুভ পাভলভ নামে একজন রুশ অফিসারের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্য একটি আবাসিক ভবন রক্ষা করছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষায় আবাসিক ভবনটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। পরে ভবনটির নামকরণ করা হয়েছিল 'পাভলভ হাউস।' সৈন্যরা ভবনটির চারদিকে মাইন স্থাপন করে, জানালায় মেশিনগান বসায় এবং সুষ্ঠু যোগাযোগের স্বার্থে নীচতলার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। রুশ সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধে স্টালিনগ্রাদ দখলে জার্মান বাহিনীর অগ্রাভিযান দীর্ঘায়িত হয়। ক্রমে ক্রমে এ লড়াই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে রূপ নেয়। লড়াইয়ের কোনো নিষ্পত্তি না দেখে জার্মানরা ক্রমাগত শহরের অভ্যন্তরে ভারি কামান স্থানান্তর করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে ৬শ' মিলিমিটার ব্যাসের কয়েকটি বিশাল কামানও ছিল। অন্যদিকে, সোভিয়েত সৈন্যরা ভলগা নদীর পূর্ব তীর থেকে জার্মান অবস্থানে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। সোভিয়েত প্রতিরোধকারীরা ধ্বংস্তূপকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে। তাছাড়া সোভিয়েত স্নাইপাররা ধ্বংসস্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো। তারা জার্মানদের প্রচুর ক্ষতি করে। জিকান নামে একজন সোভিয়েত সৈন্য নভেম্বর পর্যন্ত লড়াইকালে ২২৪ এবং ভেসেলি আলেক্সান্ডার জেইৎসেভ নামে আরেকজন সৈন্য ১৪৯ জন জার্মান সৈন্য হত্যা করে। ৮ মিটার উঁচু ধ্বংসস্তূপের ভেতর জার্মান ট্যাংক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তারপরও ট্যাংক অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে সেগুলো ছাদের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত সোভিয়েত ট্যাংক বিধ্বংসী গোলার মুখোমুখি হয়। তাছাড়া পাথুরে পাথরের পাহাড়ে ট্যাংক চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় এ লড়াইয়ে পদাতিক বাহিনী প্রাধান্য বিস্তার করে। এক সপ্তাহ তীব্র লড়াইয়ের পর জার্মান বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এর কয়েকদিন পর জেনারেল পাউলাসের নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা লড়াই করতে করতে স্টালিনগ্রাদের উত্তরাঞ্চলে শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা দখল করে। তবে ২৯ নভেম্বর জেনারেল চুইকভের নেতৃত্বে রুশ সৈন্যরা তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। পুনরায় সংগঠিত এবং শক্তি বৃদ্ধি করে

www.pathagar.com

ট্যাংক ও ডাইভ বোমারু বিমানের সহায়তা নিয়ে জার্মানরা ১৪ অক্টোবর আবার অগ্রাভিযান শুরু করে এবং ১০ দিন ধরে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর আঘাত হানে। লড়াইয়ের শুরুতে রুশরা সংখ্যায় ব্যাপক না হলেও তারা রাতের অন্ধকারে বিশাল ভলগা নদীর পূর্ব তীর থেকে রণাঙ্গনে নতুন করে সৈন্য ও রসদ নিয়ে আসে। এসময় রুশদের উপর অবিরাম জার্মান হামলা চলছিল। স্টালিনগ্রাদে অবতরণকারী একজন সোভিয়েত সৈন্যের আয়ু মাত্র কয়েক ঘণ্টায় নেমে আসে। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত জার্মান ৬ষ্ঠ পাঞ্জার শত্রুদের বিতাড়িত করার ব্যর্থ লড়াই চালিয়ে যায়। ৫ লাখ লোক অধ্যুষিত স্টালিনগ্রাদে তখন হামলার লক্ষ্যবস্তু বলতে কোনো জিনিস অবশিষ্ট ছিল না। ৩ মাসব্যাপী গণহত্যা এবং চড়া মূল্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে নভেম্বরে জার্মানরা অবশেষে ভলগা নদীর তীরে এসে পৌঁছে এবং বিধ্বস্ত শহরের ৯০ শতাংশ দখল করে। তারা উত্তর ও দক্ষিণে রুশদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে তখনো ভলগা নদীতে একটি রেল সেতু ছিল অক্ষত। এ সেতু দিয়ে রুশরা তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করে।

স্টালিনগ্রাদে রুশ অবস্থানে জার্মান কামানের গোলাবর্ষণ<মডণ>

প্রচণ্ড তুষারপাত হতে থাকায় ভলগা নদীতে নৌকা ও টাগ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নদীর ওপার থেকে সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে রসদ সরবরাহ ব্যাহত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মামেয়েভ কুরগান পাহাড়ের ঢালু এবং শহরের উত্তরাঞ্চলে কলকারখানার ভেতর তখনো তীব্র লড়াই চলতে থাকে। 'রেড অক্টোবর ট্রাক্টর কারখানা' এবং 'বারিকাডি কারখানা' রক্ষার লড়াই বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে উঠে। সোভিয়েত সৈন্যরা যে মুহূর্তে তাদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য লড়াই করতো কিংবা জার্মানদের উপর

www.pathagar.com

গোলাবর্ষণ করতো তখন কারখানার শ্রমিকরা কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি আবার কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত ট্যাংক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রগুলো মেরামত করতো।

স্টালিনগ্রাদ লড়াই ছিল একটি মর্যাদার লড়াই। এ শহরের নামকরণ করা হয়েছিল জোসেফ স্টালিনের নামে। তাই তিনি যে কোনো মূল্যে এ শহর রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হিটলারের কাছেও ছিল স্টালিনগ্রাদ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার অবশ্য কয়েকটি কারণও ছিল। ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত শিল্পসমৃদ্ধ এ নগরী ছিল কাস্পিয়ান সাগর ও উত্তরাঞ্চলীয় রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। স্টালিনগ্রাদের দখল ককেশাস অভিমুখী জার্মান সৈন্যদের পশ্চাৎভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হতো। সবচেয়ে বড় কথা ছিল—হিটলারের এক নম্বর শত্রু জোসেফ স্টালিনের নাম বহন করতো বলে এ শহর দখল করা ছিল মতাদর্শগত ও প্রতীকী অর্থে হিটলারের কাছে মর্যাদার বিষয়। স্টালিনগ্রাদের লড়াই হিটলার ও স্টালিন উভয়ের জন্য একটি জীবন-মরণ লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত কমান্ড মস্কো থেকে তাদের লাল ফৌজের কৌশলগত রিজার্ভকে লোয়ার ভলগায় নিয়ে আসে এবং দেশের প্রাপ্ত সকল বিমানকে স্টালিনগ্রাদে প্রেরণ করে। সেসময় উভয় দেশের সামরিক কমান্ডারদ্বয় প্রচণ্ড চাপে ভুগছিলেন। জেনারেল পাউলাসের চোখে নিয়ন্ত্রণহীন একটি খিঁচুনি দেখা দেয়। অন্যদিকে চুইকভের এক্সিমা দেখা দেয়ায় তাকে একটি হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়।

জার্মানরা স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানার পরিকল্পনা করছিল। ঠিক তখন আসে সেই দুঃসংবাদ। ৫ নভেম্বর খবর আসে যে, ফিল্ড মার্শাল রোমেল মিসরের আল-আমিনে বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারির কাছে পরাজিত হয়েছেন। ৮ নভেম্বর মিত্র বাহিনী মরক্কো ও আলজেরিয়ায় অবতরণ করে এবং অক্ষশক্তির প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। জার্মানদের এ দুঃসংবাদ ছিল সোভিয়েত মার্শাল ঝুকভের জন্য একটি বোনাস। মার্শাল ঝুকভ স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে জার্মানদের উপর পাল্টা হামলার পরিকল্পনা করছিলেন। এজন্য তিনি বিশাল রিজার্ভ গড়ে তোলেন এবং শীতকালের অপেক্ষা করছিলেন।

স্টালিনগ্রাদ অবরোধকালে জার্মানী ও রুমানিয়ার কমান্ডারগণ দোন নদী বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন জোরদারে সহায়তা করার জন্য হেডকোয়ার্টার্সকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সোভিয়েত সৈন্যরা নদীর দক্ষিণ তীরে কয়েকটি অবস্থান ধরে রেখেছিল এবং যে কোনো কমান্ডার এগুলোকে একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে বিবেচনা করতেন। শহরের উপর হিটলারের পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ থাকায় এসব অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। জার্মান জেনারেল স্টাফের প্রধান ফ্র্যাঞ্চ হ্যালডার স্টালিনগ্রাদের প্রতি হিটলারের অত্যধিক মনোযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জার্মানদের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করেন। এ কারণে হিটলার মধ্য অক্টোবরে জেনারেল কুর্ট জেইটলারকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

লড়াই শরৎকালে গড়িয়ে গেলে সোভিয়েত মার্শাল জর্জি ঝুকভ স্টালিনগ্রাদের উত্তর ও দক্ষিণে তৃণভূমিতে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটানো শুরু করেন। স্টালিনগ্রাদ অবরোধে জার্মান বাহিনীর সহযোগী রুমানীয় সৈন্যদের মনোবল ও অস্ত্রশস্ত্র দু'টিই ছিল

নিম্নমানের। রুমানীয় সৈন্যরা স্টালিনগ্রাদের উত্তরাঞ্চল রক্ষার দায়িত্বে থাকায় ওই জায়গাটি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। মার্শাল ঝুকভ আঘাত হানার জন্য এ জায়গাটি বেছে নেন। অপারেশনের নামকরণ করা হয় 'ইউরেনাস।' ঝুকভ জার্মানদের উপর গোলাবর্ষণ করে দুর্বল পয়েন্ট দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শহরের ভেতরে তাদের ঘেরাও করার পরিকল্পনা করেন।

১৯৪২ সালের নভেম্বরে সোভিয়েত রেড আর্মি 'অপারেশন ইউরেনাস' বাস্তবায়নে হাত দেয়। জেনারেল নিকোলাই ভাতুতিনের নেতৃত্বে গঠিত আক্রমণকারী সোভিয়েত বাহিনীতে ছিল তিনটি পূর্ণাঙ্গ কোর। আরো ছিল ১৮টি পদাতিক ডিভিশন, ৮টি ট্যাংক ব্রিগেড, ২টি যান্ত্রিক ব্রিগেড, ৬টি ক্যাভালরি ডিভিশন ও একটি ট্যাংক বিধ্বংসী ব্রিগেড। রুমানীয়রা সোভিয়েতদের পাল্টা হামলার প্রস্তুতি দেখতে পেয়ে শক্তি বৃদ্ধির জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে থাকে। কিন্তু তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। জার্মান ৬ষ্ঠ পাঞ্জারের উত্তরাঞ্চলীয় বাহু রক্ষায় নিয়োজিত দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প ৩য় রুমানীয় কোর সোভিয়েত সৈন্যদের মাত্র একদিনের আঘাতে উড়ে যায়। ২০ নভেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ দিক দিয়ে এগিয়ে আসে। তাদের হামলায় তাৎক্ষণিক ক্যাভালরি নিয়ে গঠিত রুমানীয় ৪র্থ কোরের পতন ঘটে। আরেকটি সোভিয়েত সৈন্যদল পশ্চিম দিকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। দু'দিন পর কালাচ নামে একটি ছোট্ট শহরের কাছে দু'টি সোভিয়েত সৈন্যদলের মিলন হয় এবং তারা স্টালিনগ্রাদের চারদিক অবরোধ করে। ফলে শহরের অভ্যন্তরে প্রায় ৩ লাখ জার্মান, রুমানীয়, ইতালীয় ও ক্রোয়েশীয় সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩০ সেপ্টেম্বর হিটলার জাতির উদ্দেশে সদম্ভে বলেছিলেন, 'জার্মান সেনাবাহিনী কখনো স্টালিনগ্রাদ ছেড়ে আসবে না।' হিটলার এ ঘোষণা দেয়ায় স্টালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ জার্মান সেনানায়কগণ উভয় সংকটে পড়ে যান। শত্রুর প্রবল চাপে তারা দোন নদীর পশ্চিমে নতুন একটি অবস্থানে পিছু হটে যাবার কথা ভাবতে থাকেন। এসময় হ্যারম্যান গোয়েরিং আশ্বাস দেন যে, লুফটওয়াফে (জার্মান বিমান বাহিনী) ৬ষ্ঠ পাঞ্জারকে বিমান সহায়তা দেবে। কিন্তু এ কথা প্রত্যেকের কাছেই ছিল স্পষ্ট যে, জার্মান বিমান বাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া অসম্ভব। ক্রীট যুদ্ধের পর লুফটওয়াফের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। জার্মান বিমান বহর বড়জোর দৈনিক ৩শ' টন সরঞ্জাম পরিবহন করতে পারতো। কিন্তু এতটুকু মোটেও যথেষ্ট ছিল না। স্টালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ সৈন্যদের প্রতিদিন প্রয়োজন ছিল ৫শ' টন রসদ। হিটলার গোয়েরিংয়ের পরিকল্পনা সমর্থন করেন এবং তার পুরনো ঘোষণার প্রতিধ্বনি করে নির্দেশ দেন, 'আত্মসমর্পণ করা যাবে না।'

জার্মান সৈন্যদের কাছে তৎক্ষণাৎ সরবরাহ পাঠানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অসহনীয় শীত এবং সোভিয়েত বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবিরাম গোলাবর্ষণে আকাশ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় সহায়তার মাত্র ১০শতাংশ পৌছানো যেতো। তখনো যেসব পরিবহন বিমান অবশিষ্ট ছিল সেগুলো অবরুদ্ধ নগরী থেকে আহত ও রুগ্নদের স্থানান্তর করতো। জার্মান ৬ষ্ঠ পাঞ্জারের সৈন্যরা অভুক্ত অবস্থায়

www.pathagar.com

পতিত হয়। এমন এক অবস্থা দাঁড়ায় যে, বিমান থেকে খাদ্য খালাসে যেসব সৈন্য নিয়োজিত ছিল, দীর্ঘ অনাহার ও ক্লান্তিতে তারা বিমান থেকে খাদ্য খালাস পর্যন্ত করতে পারতো না। ইতোমধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা স্টালিনগ্রাদের চারদিকে তাদের অবস্থান জোরদার করে ফেলে। শহর থেকে অবরুদ্ধ সৈন্যদের উদ্ধারে দক্ষিণ দিকে জার্মানরা একটি পাল্টা হামলা চালায়। এ অপারেশনের ছদ্মনাম ছিল 'উইন্টার স্টর্ম।' ডিসেম্বরে সোভিয়েতরা জার্মানদের এ চেষ্টা নস্যাত করে দেয়। স্টালিনগ্রাদের চারদিকে অবরোধ দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এ সময় রাশিয়ার প্রাকৃতিক বন্ধু শীত এসে জেঁকে বসে। বরফ জমে ভলগা শক্ত হয়ে উঠে। এতে সোভিয়েতদের সরবরাহ লাভের পথ সুগম হয়। অবরুদ্ধ জার্মানদের রান্নার জ্বালানি ও চিকিৎসা সরবরাহ ফুরিয়ে যায়। তুষারপাত, পুষ্টিহীনতা ও রোগ-ব্যাধিতে হাজার হাজার সৈন্য মারা যায়।

জানুয়ারীতে সোভিয়েতরা 'অপারেশন নেপচুন' নামে আরেকটি অভিযানে ইতালীয় সৈন্যদের তছনছ করে দিয়ে রোস্টভ দখল করে। ফলে ককেশাস অঞ্চলে অবস্থানরত জার্মান আর্মি গ্রুপ সাউথ(খ)-ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিপর্যয়ের মুখে জার্মানরা একটি ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে। সাঁজোয়া বাহিনীর সহায়তা এসে পৌঁছানো নাগাদ এ নবগঠিত বাহিনীর ইউনিটগুলোকে লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। চরম প্রতিকূলতার মুখে জার্মান সেনানায়ক ভন ম্যানস্টেইন ককেশাস অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং স্টালিনগ্রাদ থেকে প্রায় আড়াই শ' কিলোমিটার দূরে অগ্রবর্তী অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি কোনোটাই করেননি। ৬ষ্ঠ পাঞ্জার জার্মানদের নাগালের বাইরে চলে যায়। অথচ স্টালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ হতভাগ্য এসব জার্মান সৈন্য তখনো ভাবতো তাদের কাছে সরবরাহ আসবে, তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। পাউলাসের অধীনস্ত কয়েকজন অফিসার তাকে হিটলারের নির্দেশ অমান্য করে স্টালিনগ্রাদ থেকে বের হতে যাবার চেষ্টা চালানোর অনুরোধ জানায়। কিন্তু হিটলারকে উপেক্ষা করার মতো সাহস তার ছিল না।

স্টালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে অবরুদ্ধ জার্মানরা খোদ শহরেই পিছু হটে আসে। পিটোমনিক ও গুমরাক বিমান ঘাঁটিরও পতন ঘটে। এ দু'টি বিমান ঘাঁটি পতনের অর্থ ছিল আকাশ পথে সরবরাহ এবং আহতদের স্থানান্তরের যবনিকাপাত। জার্মানরা আক্ষরিক অর্থেই অনাহারে পতিত হয়। তাদের গোলাগুলী ফুরিয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতেও তারা প্রবল লড়াই অব্যাহত রাখে। তারা আশংকা করছিল যে, আত্মসমর্পণ করলে সোভিয়েতরা তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবে।

১৯৪৩ সালের ৩০ জানুয়ারী হিটলার পাউলাসকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেন। ততদিন পর্যন্ত কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শাল শত্রুর হাতে জীবিত আত্মসমর্পণ করেননি। এ নজির সামনে থাকায় হিটলার ভেবেছিলেন, পাউলাসকে ফিল্ড মার্শাল পদে পদোন্নতি দিলে তিনি আমরণ লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করবেন। কিংবা লড়াইয়ে হেরে গেলে আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু হিটলারের হিসাব ভুল হয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাছে পাউলাসের বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

হেডকোয়ার্টার্সের কাছে এগিয়ে এলে হাত তুলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী অবশিষ্ট জার্মানরা আত্মসমর্পণ করে। ৯১ হাজার ক্ষুধার্ত শ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। তাদের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার সৈন্য বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছিল।

জার্মান জনগণ ১৯৪৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্টালিনগ্রাদ বিপর্যয়ের কথা জানতে পারেনি। স্টালিনগ্রাদ বিপর্যয়ের ঘোষণা দেয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা চালানো বন্ধ রাখা হয়। স্টালিনগ্রাদ অবরোধ ২শ' দিন স্থায়ী হয়। এতে ১৯৪২ সালের শুরুতে শুধুমাত্র জার্মান পক্ষে মারা যায় লক্ষাধিক সৈন্য। এছাড়া ইতালীয় মারা যায় ৮৭ হাজার এবং রুমানীয় প্রায় ১ লাখ। স্টালিনগ্রাদের চারদিকে সোভিয়েত অবরোধকালে আরো হতাহত হয় ৩ লাখ জার্মান। ৬ষ্ঠ পাঞ্জারকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় আরো হাজার হাজার জার্মান নিহত হয়। রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ায় শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়, মানব ইতিহাসে স্টালিনগ্রাদ অবরোধ একটি বৃহত্তম ট্রাজেডি।

www.pathagar.com

ডি-ডে ল্যান্ডিং : নরমান্ডি অপারেশন

১৯৪৪ সালে নরমান্ডি উপকূলে পশ্চিম ইউরোপ দখলকারী জার্মানদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর তুমুল লড়াইয়ে জার্মানরা ফ্রান্স ত্যাগে বাধ্য হয়। এতে দ্রুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দিকে ধাবিত হয়। নরমান্ডিতে মিত্রবাহিনীর সামরিক অভিযানের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন অভারলর্ড'। ডি-ডে ল্যান্ডিং নামে পরিচিত এ অপারেশন হচ্ছে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হামলা চালানোর এক অনন্য ইতিহাস। এ যুদ্ধে প্রায় ৩০ লাখ সৈন্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের নরমান্ডি উপকূলে পৌঁছে। এতে ১২টি দেশের সৈন্য অংশগ্রহণ করে। দেশগুলো ছিল অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লাভাকিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৬ জুন ডি-ডে শুরু হয়। ডে- ডে একটি সামরিক পরিভাষা। 'ডি' হচ্ছে ইংরেজী ডে শব্দের আদ্যাক্ষর। কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশেষ করে সামরিক অপারেশনের জন্য নির্ধারিত সময় ও দিন উল্লেখ করার জন্য ডি-ডে সাংকেতিক শব্দটি ব্যব্যহার করা হয়। অপারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সামরিক কমান্ডারগণ এ ধরনের সংকেত ব্যবহার করেন। এ সংকেতের সঙ্গে কখনো প্লাস বা মাইনাস জুড়ে দেয়া হয়। যেমন- ডি- ৪ বলতে বুঝায় কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনের ৪ দিন আগে। আবার ডি+৭ বলতে বুঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট দিনের ৭ দিন পর। তবে ডি-ডে বলতে সাধারণতঃ নরমান্ডি অপারেশনকেই বুঝানো হয়। সেদিন নৈশকালীন ছত্রী সেনা ও গ্লাইডার অবতরণ, জঙ্গী ও বোমারু বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে প্রচণ্ড বোমা ও গোলাবষর্ণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। নরমান্ডিতে দু'মাসের বেশী লড়াই স্থায়ী হয়। প্যারিস ও উপকূলীয় বন্দরগুলো মুক্ত করার মধ্য দিয়ে এ লড়াই শেষ হয়। ৬ জুন যুদ্ধ শুরু হলেও তা শেষ হয় ২৫ আগস্ট। মিত্রপক্ষে নিহত হয় ৩৭ হাজার, নিখোঁজ হয় ১৮ হাজার এবং আহত হয় ১ লাখ ৫৪ হাজার সৈন্য। অন্যদিকে, জার্মান পক্ষে প্রায় ২ লাখ সৈন্য হতাহত হয় এবং বন্দী হয় আরো ২ লাখ।

নরমান্ডিতে মিত্রবাহিনীর অভিযানের স্মারকচিহ্নগুলো এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। অভিযানকালে তারা যেসব ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিল পরবর্তীকালে বীচগুলোর নামকরণ করা হয় সেসব ছদ্মনামে। এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী ইউনিটগুলোর নামে এ উপকূলের রাস্তাঘাটের নামকরণ করা হয়। বিরাট বিরাট সমাধিক্ষেত্রে নিহত সৈন্যদের নাম খোদাই করা রয়েছে। কোথাও কোথাও ক্রুসচিহ্ন। দেখলেই বুঝা যায় যে, এখানে একদিন ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল।

www.pathagar.com

নরমান্ডিতে অবতরণের দিনক্ষণ, নিয়োগ ও কমান্ড নিয়ে মিত্রবাহিনীর শরীকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ হয়। ইউরোপে দ্বিতীয় আরেকটি রণাঙ্গন খোলার বিষয় দীর্ঘদিন স্থগিত রাখা হয়। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন ১৯৪২ সাল থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য মিত্রবাহিনীর উপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু বিজয়ের নিশ্চয়তা ছাড়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি ইতালী ও উত্তর আফ্রিকায় প্রথম আঘাত হানার পক্ষপাতি ছিলেন। অনেক আমেরিকান সেনা কমান্ডার মিত্রবাহিনীর স্থলবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীর নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের পছন্দ ছিল আরবান হ্যারল্ড আলেক্সান্ডার। একইভাবে ডুয়িট আইসেনহাওয়ারের নিযুক্তিতে মন্টগোমারীরও প্রশ্ন ছিল। কারণ ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে আইসেনহাওয়ারের অভিজ্ঞতা ছিল সামান্য। নরমান্ডি অপারেশনে আইসেনহাওয়ার ও মন্টগোমারী একে অপরকে চমৎকারভাবে সহযোগিতা করে গেলেও পরে একসময় তাদের মধ্যকার এ মতবিরোধ ফাঁস হয়।

ফরাসী উপকূলে কোন্ বন্দরে অবতরণ করা সঠিক হবে-এ নিয়েই যে মিত্রবাহিনীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল তা নয়, এ অপারেশনে গুরুতর লজিস্টিক সমস্যাও দেখা দেয়। শারবার্গে জার্মানদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী হওয়ায় মিত্রবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডারদের অনেকেই পাস দ্য ক্যালে-কে স্থলভাগে অবতরণের জন্য উত্তম স্থান বলে মতামত দিয়েছিলেন। নরমান্ডি অপারেশন সফল হলেও এ অপারেশনে সৈন্য ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল অফুরন্ত। প্রথম দিন কেইন দখলে তৃতীয় ডিভিশনের ব্যর্থতা এক মাসের বেশী সময় জুড়ে যুদ্ধ পরিচালনায় মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ ঘটনা সামনে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়। ভিলার্স বোকেজেও একই সমস্যা দেখা দেয়। এটি মিত্রবাহিনী দখল করে নিলেও সেখানে শক্তিবৃদ্ধি না করায় জার্মানরা তা পুনর্দখল করে। ফলে ১১ ও ১৭ জুন অভিযান প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। বিপুল শক্তি নিয়োগ করায় নরমান্ডিতে বিজয় মিত্রবাহিনীকে চুম্বন করে। ডি-ডের পরও নরমান্ডি উপকূলে প্রচুর সৈন্য ও রসদ আসতে থাকে। ১৯৪৪ সালের জুলাই নাগাদ প্রায় ১০ লাখ সৈন্য অবস্থান গ্রহণ করে। নরমান্ডি অপারেশনের সফলতা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পশ্চিম রণাঙ্গন খুলে দেয়। ফলে জার্মানীকে পশ্চিম ইউরোপে এ নয়া রণাঙ্গনে লড়াই করার জন্য সোভিয়েত ও আফ্রিকা রণাঙ্গন থেকে সৈন্য ও সরঞ্জাম প্রত্যাহার করে এখানে নিয়োগ করতে হয়। নরমান্ডিতে পা ফেলার জায়গা পাওয়ায় মিত্রবাহিনী যুদ্ধকে জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এসময়ে সোভিয়েতরা নিজেদের ভূখণ্ডে জার্মানীর শক্তিকে খর্ব করে দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করে। সুতরাং জার্মান তৃতীয় রাইখকে পরাজিত করার জন্য তখন পশ্চিমা মিত্রদের দ্বিতীয় আরেকটি রণাঙ্গন খোলার খুব প্রয়োজন ছিল না। ডি-ডেতে সোভিয়েত রেড আর্মি বন্যার বেগে জার্মানীর দিকে ধাবিত হচ্ছিল। জার্মানীর চার-পঞ্চমাংশ সৈন্য মোতায়েন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে। ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীকে জার্মানীর ২০ শতাংশ সৈন্যের মুখোমুখি হতে হয়। তবে একসঙ্গে দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করতে গিয়ে জার্মানীকে তার সৈন্য ও সমরাস্ত্র ভাগাভাগি করে ফেলতে হয়। তাতে যুদ্ধ দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যায়।

www.pathagar.com

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকায় নরমান্ডিতে অভিযান চালানো না হলে গোটা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ কমিউনিস্ট সৈন্যদের কব্জায় চলে যেতো। পরবর্তীকালে আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যদের উপস্থিতি ইউরোপে কমিউনিজম বিস্তারে একটি প্রবল যুক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এ প্রশ্নে ইউরোপ তথা বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৪১ সালে জার্মানরা অপারেশন বারবারোসা ছদ্মনামে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি অভিযান পরিচালনা করে। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর ভয়াবহ লড়াই শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সৈন্যদের উপর চাপ কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলবেন। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মেও তারা একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে কিভাবে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন সেটাই ছিল প্রশ্ন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রথম মহাযুদ্ধের কৌশল এড়িয়ে জার্মানীতে হামলা চালানোর পক্ষপাতি ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কৌশল ছিল সামনাসামনি ও কাছাকাছি অবস্থান থেকে শত্রুর উপর আঘাত হানা। তাই চার্চিল চাইছিলেন পশ্চিম ইউরোপের উপকূল বরাবর হামলার সূচনা করতে। একইসঙ্গে তিনি ইউরোপে সোভিয়েত অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমধ্যসাগর থেকে ভিয়েনা এবং দক্ষিণ দিক থেকে জার্মানীর উপর মূল আঘাত হানার পরিকল্পনাও করেন। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অভিমত ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, মিত্রবাহিনীর সুদৃঢ় ঘাঁটি থেকে খুব নিকটবর্তী অবস্থান থেকে আক্রমণ করাই হবে জার্মানী পৌঁছার সংক্ষিপ্ততম উপায়। তারা উভয়ে নিজ নিজ অভিমতের প্রতি অবিচল থাকেন। তাদের অভিমতের ভিত্তিতে দু'টি প্রাথমিক প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। তার একটি ছিল ১৯৪২ সালে প্রণীত অপারেশন শ্লেজহ্যামার এবং আরেকটি ছিল ১৯৪৩ সালে প্রণীত অপারেশন রাউন্ডআপ। এ দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এটাই অপারেশন অভারলর্ড-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৪ সাল নাগাদ এ অপারেশন স্থগিত রাখা হয়। বৃটিশ লেঃ জেনারেল স্যার ফ্রেডারিক ই,মর্গান ১৯৪৩ সালে মার্চের গোড়ার দিকে পরিকল্পনা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে জেনারেল ডুয়েট আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে শীফ (সুপ্রীম হেডকোয়ার্টার্স এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্স) এ পরিকল্পনা সংশোধন করা শুরু করে।

বৃটিশ স্পিটফায়ার ও হকার টাইফুনসহ মিত্রবাহিনীর জঙ্গীবিমানগুলোর পাল্লা কম হওয়ায় অবতরণক্ষেত্রের সীমানা অতিমাত্রায় সীমিত করা হয়। ভৌগলিক বাস্তবতার কারণে অবতরণ স্থল দু'টি জায়গায় সীমিত করে আনা হয়। তাদের একটি ছিল পাস দ্য ক্যালে এবং অন্যটি নরমান্ডি উপকূল। যুক্তরাজ্য থেকে পাস দ্য ক্যালের দূরত্ব ছিল আপেক্ষিকভাবে কম। তাছাড়া সেখানে অবতরণ করার মতো উপকূলও ছিল অনুকূল। পাস দ্য ক্যালের সঙ্গে সরাসরি সড়ক পথে জার্মানীর যোগাযোগ ছিল চমৎকার। এসব

www.pathagar.com

কারণে পাস দ্য ক্যালেই ছিল মিত্রবাহিনীর সম্ভাব্য অবতরণ স্থল। তবে জায়গাটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। তার আশপাশে ছিল জার্মান ইউ-বোটের ঘাঁটি। পরিশেষে মিত্রবাহিনী নরমান্ডিকেই অবতরণ স্থল হিসেবে বেছে নেয়।

১৯৪২ সালে দিয়েপে কানাডার বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার আলোকে মিত্রবাহিনী কোনো ফরাসী সমুদ্র বন্দরে সরাসরি আঘাত না হানার সিদ্ধান্ত নেয়। শক্তিপ্রয়োগে বৃহত্তর পরিসরে নরমান্ডিতে অবতরণ করা হলে শারবার্গ বন্দর ও ব্রিটনির পশ্চিমে উপকূলীয় বন্দরগুলোর প্রতি একযোগে হুমকি সৃষ্টি হতো এবং ফ্রান্স সীমান্তে জার্মানীর স্থল হামলা শুরু হতো। অন্যদিকে, নরমান্ডির প্রতিরক্ষা ছিল দুর্বল। জার্মানী এখানে মিত্রবাহিনীর তরফে হামলার আশংকা করেনি। এ কারণে মিত্রবাহিনী প্যারাশ্যুটের সাহায্যে নরমান্ডিতে অবতরণ করে জার্মান সৈন্যদের হতবুদ্ধি এবং তাদের বিশৃংখল করে দেয়ার জন্য এটিকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করে।

ফ্রান্সের নরমান্ডি উপকূলে যুদ্ধজাহাজ থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের অবতরণ

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল ডুয়িট আইসেনহাওয়ারকে ভূমধ্যসাগরীয় অপারেশনের কমান্ড থেকে সরিয়ে এলায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে জেনারেল আইসেনহাওয়ার যত সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন তত সৈন্যের নেতৃত্ব দেয়ার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত আর কারো হয়নি। পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য নরমান্ডিতে অবতরণ করা নাগাদ এগলায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সদর দপ্তর লন্ডনেই ছিল। একই সময়ে আইসেনহাওয়ারের উপর ইউরোপে মোতায়েন মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সার্বিক দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে জেনারেল স্যার বার্নার্ড মন্টগোমারীকে আক্রমণকারী স্থল বাহিনীর কমান্ডার পদে

www.pathagar.com

নিয়োগ করা হয়। তার আগে তিনি বৃটিশ ২১তম আর্মি গ্রুপের কমান্ডার হিসেবে নরমান্ডির পূর্বাংশে দায়িত্ব পালন করছিলেন। অন্যদিকে, নরমান্ডির পশ্চিম দিকে মোতায়েন দ্বাদশ আমেরিকান আর্মি গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লেঃ জেনারেল ওমর ব্রাডি। এ পর্যায়ে বিমান যোগে দু'টি ব্রিগেডসহ সমুদ্রপথে তিন ডিভিশন সৈন্য অবতরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। 'শীফ' সমুদ্রপথে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য এবং বিমান পথে আরো তিন ডিভিশন সৈন্যের সাহায্যে প্রাথমিক হামলা চালানোর পরিধি বৃদ্ধি করে। ওটাহ ছদ্মনামে উপকূলে বাড়তি হামলার বিষয়ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মোট ৪৭ ডিভিশন সৈন্য হামলায় অংশ নেবে। এসব ডিভিশনের মধ্যে ২৬ টি হবে বৃটিশ, কানাডীয়, কমনওয়েলথ ও মুক্ত ইউরোপীয় এবং ২১ টি হবে আমেরিকান। এডমিরাল স্যার বট্রাম রামসের নেতৃত্বে ৪,১০০ অবতরণ যানসহ ৬৯০০ যুদ্ধজাহাজ নিয়োগ করা হবে। এয়ার মার্শাল স্যার ট্রাফোর্ড লেহ্-মালরির নেতৃত্বে ১,২০০ জঙ্গী ও বোমারু বিমান অবতরণে ছত্রছায়া দেবে। ১,০০০ পরিবহনে ছত্রী সেনাদের বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহে ১০ হাজার টন বোমাবর্ষণ করা হবে এবং ১৪ হাজার বার বিমান হামলা চালানো হবে।

প্রথম ৪০ দিনব্যাপী অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল (১) কেইন ও শারবার্গসহ অবতরণোপযোগী বেলাভূমি দখল করা (২) ব্রিটনি ও তার আটলান্টিক উপকূলীয় বন্দরগুলো মুক্ত এবং প্যারিসের দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অন্যূন ১২৫ মাইল এগিয়ে যাওয়া।

৩ মাসব্যাপী লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ছিল দক্ষিণে লয়ার এবং উত্তর-পূর্বদিকে সীন নদী পরিবেষ্টিত একটি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। পাস দ্য ক্যালে-তে সত্যি আক্রমণ করা হচ্ছে- জার্মানদের এ ধোঁকা দেয়ার জন্য মিত্রবাহিনী 'অপারেশন ফর্টিচিউড' ছদ্মনামে একটি ব্যাপক চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। নকল ভবন ও যন্ত্রপাতিসহ ইউএস ফার্স্ট আর্মি গ্রুপ নামে একটি নকল ডিভিশন গঠন করা হয়। ভুয়া বেতার বার্তা পাঠানো হয়। এ নকল ডিভিশনের কমান্ডার হিসেবে লেঃ জেনারেল জর্জ প্যাটনের নাম প্রচার করা হয়। এসব ভুয়া বার্তা পেয়ে জার্মানরা অবতরণক্ষেত্র খুঁজে বের করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। গোটা দক্ষিণাঞ্চলীয় ইংল্যান্ড জুড়ে ছিল তাদের ব্যাপক গুপ্তচর নেটওয়ার্ক। কিন্তু জার্মানদের দুর্ভাগ্য। 'ডবল ক্রস সিস্টেম'-এর আওতায় দক্ষিণাঞ্চলীয় ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জার্মান এজেন্টদের মতান্তর ঘটানো হয় এবং এসব ডবল জার্মান এজেন্ট নিশ্চিত বার্তা পাঠাতে থাকে যে, পাস দ্য ক্যালে-ই হচ্ছে মিত্রবাহিনীর সম্ভাব্য অবতরণ ক্ষেত্র। এ চাতুর্যপূর্ণ কৌশল চালিয়ে যাওয়া হয়। এমন কি যুদ্ধকালেও তা অব্যাহত থাকে। রাডারে বিমান আক্রমণ এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য জার্মান স্থাপনায় হামলার ভুয়া সংকেত পাঠানো হয়। রেডিও ট্রাফিক ব্যবহার করে স্কটল্যান্ড থেকে 'অপারেশন স্কাই' নামে আরেকটি প্রতারণা করা হয়। নরওয়ে অথবা ডেনমার্কের উপর মিত্রবাহিনীর আক্রমণ ঘনিয়ে আসছে—একথা জার্মান ট্রাফিক বিশ্লেষকদের বুঝানোর জন্য এ প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়। এ বায়বীয় হুমকি

www.pathagar.com

মোকাবিলায় জার্মান সৈন্যরা ফ্রান্সে এগিয়ে না গিয়ে নরওয়ের দিকে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ডি-ডের গোড়ার দিকে সিক্স এসএএস কমান্ডোরা 'অপারেশন টাইটানিক' ছদ্মনামে আরেকটি ক্ষুদ্র অথচ কার্যকর চাতুর্যপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে। রাবারের তৈরি নকল ছত্রী সেন' অবতরণ করতে দেখে এবং কামানের ভুয়া গর্জন শুনে জার্মানরা বিভ্রান্ত হয় এবং তারা মিত্রবাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্র থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। আক্রমণোপযোগী সাঁজোয়া যান তৈরি করাসহ মিত্রবাহিনী আরো কিছু অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করে। মেজর জেনারেল পার্সি হোবার্টের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী এসব সাঁজোয়া যান প্রস্তুত করে। সাঁজোয়া যানের মধ্যে ছিল উভচর শেরম্যান ট্যাংক, মাইন অপসারণকারী ট্যাংক, সেতু পারাপারকারী ট্যাংক এবং রাস্তা প্রস্তুতকারী ট্যাংক। ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের কিরখাম প্রিয়রিতে এসব ট্যাংকের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহে আক্রমণকারী বাহিনীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পৌঁছাতে দু'টি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সমুদ্রের তলদেশে স্থাপিত পাইপের সাহায্যে ইংল্যান্ড থেকে জ্বালানি পৌঁছানোর জন্য 'অপারেশন প্রটো' প্রণয়ন করা হয়। আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ডি-ডে'তে তাদের কার কি ভূমিকা হবে তার মহড়া চালায়।

১৯৪৪ সালের ২৮ এপ্রিল ইংল্যান্ড উপকূলের দক্ষিণ জেভনে এরকম একটি মহড়া চালানো হয়। মহড়ার ছদ্মনাম ছিল 'এক্সারসাইজ টাইগার'। এ মহড়াকালে জার্মান টর্পেডো বোটের আকস্মিক হামলায় ৭৪৯ জন আমেরিকান সৈন্য ও নাবিক নিহত হয়।

১৯৪৪ সালের নভেম্বরে হিটলার ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের উপর হামলার হুমকিকে আর অগ্রাহ্য করা যায় না। ফিল্ড মার্শাল অরউইন রোমেলকে কোস্টাল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়। পরে তাকে আর্মি গ্রুপ বি-এর কমান্ডারও নিয়োগ করা হয়। আর্মি গ্রুপ বি ছিল উত্তরাঞ্চলীয় ফ্রান্সের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে। রোমেল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সাঁজোয়া বাহিনীর সাহায্যে শিগগির ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলে পাল্টা হামলা চালানোই মিত্রবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার একমাত্র উপায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে পাল্টা হামলা চালাতে উপকূলের খুব কাছাকাছি আরো ট্যাংক মোতায়েন করতে চেয়েছিলেন। তবে পশ্চিম রণাঙ্গনে মোতায়েন জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক না হওয়ায় তার এক্তিয়ার ছিল সীমিত। ফিল্ড মার্শাল গার্ড ভন রানডেসটাড ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। পাঞ্জার গ্রুপ ওয়েস্টের কমান্ডার জেনারেল গিয়ারভন সুইপেনবার্গ সর্বাধিনায়ক রানডেসটাডকে সমর্থন করতেন। আবার জেনারেল সুইপেনবার্গকে সমর্থন করতেন সাঁজোয়া বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল-জেনারেল হেইঞ্জ গুদেরিয়ান। মার্শাল রানডেসটাড ছিলেন স্থলভাগের অভ্যন্তরে পাঞ্জার ডিভিশন মোতায়েনের পক্ষে। শত্রুর অগ্রযাত্রার প্রাথমিক লক্ষণ নিশ্চিত হয়ে সর্বশক্তিতে পাল্টা হামলা চালিয়ে তা থামিয়ে দেয়া ছিল তার পরিকল্পনার লক্ষ্য। অপারেশন পরিকল্পনা নিয়ে জার্মান সেনানায়কগণের বির্তকের মূলে ছিল নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। লুফটওয়াফে (জার্মান বিমান বাহিনী)'র সুদিনে রানডেসটাড ও গুদেরিয়ান পূর্ব রণাঙ্গনে

www.pathagar.com

লড়াই করেছেন। তারা যে মুহূর্তে পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন তখন আকাশে উভয় পক্ষের বিমান বাহিনীর শক্তি ছিল সমান। ১৯৩৯-১৯৪১ সাল ছিল লুফটওয়াফের যৌবন। পরে জার্মান বিমান বাহিনীর শক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এ বাস্তবতা রানডেসটাড অথবা গুদেরিয়ান অনুধাবন করতে চাইতেন না। মিত্রবাহিনীর বিমান শক্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও তারা মনে করতেন, জার্মান বিমান বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সমতা রয়েছে। অন্যদিকে, রোমেল লড়াই করেছেন পশ্চিম রণাঙ্গনে যেখানে তাকে মিত্রবাহিনীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিমান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিমান শক্তিতে জার্মানীর সঠিক অনুপাত তিনি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

জেনারেলদের পারস্পরিক বিতর্ক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হিটলার উত্তর ফ্রান্সে মোতায়েন ৬ ডিভিশন পাঞ্জারকে দু'ভাগ করে ফেলেন এবং তিন ডিভিশন পাঞ্জার সরাসরি রোমেলের কমান্ডে ন্যস্ত করেন। বাদবাকি তিনটি পাঞ্জার ডিভিশন মোতায়েন করা হয় ফরাসী উপকূলের অনেক পেছনে। এ তিনটি পাঞ্জার ডিভিশন হিটলারের অপারেশন স্টাফের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধে নিয়োগ করা যেতো না। মাত্র ১৬৯টি জঙ্গীবিমানের সাহায্যে উত্তর ফ্রান্সের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ইতোমধ্যে উত্তর ফ্রান্সের বিমান ক্ষেত্রগুলো উপর্যুপরি ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিত্রবাহিনী কোথায় অবতরণ করবে- এ অনিশ্চয়তা জার্মান পরিকল্পনাকে এলোমেলো করে দেয়। মিত্রবাহিনীর সম্ভাব্য অভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম ফ্রান্সের বিভিন্ন পয়েন্টে জার্মান সৈন্যদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোতায়েন করা হয়। রোমেল ডে-ডে'র আগে আটলান্টিক ওয়াল নামে পরিচিত ফরাসী উপকূল বরাবর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মিত্রবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার সময়ও কয়েকটি বাংকার নির্মাণ করা হচ্ছিল।

যুদ্ধের গতি অব্যাহত রাখতে মিত্রবাহিনীকে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর অথবা পাস দ্য ক্যালের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হতো এবং ধীর গতিতে অবতরণের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সংক্ষিপ্ততম শিপিং রুট ব্যবহার করতে হতো। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেস্টের কাছাকাছি আক্রমণ চালাতে হতো। মূল ফরাসী ভূখণ্ড থেকে দূরে ব্রেস্টের আশপাশে ইউ-বোটের শক্ত ঘাঁটি থাকায় এটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। তাছাড়া এটি ছিল বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর আয়ত্বের বাইরে। সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদেরকে শারবার্গ, লী হার্ভে অথবা পাস দ্য ক্যালে-তে অবতরণ করতে হতো।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মিত্রবাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মানচিত্র তৈরি করে এবং অবতরণ ক্ষেত্র পরীক্ষা করে। ইংলিশ চ্যানেলের আবহাওয়ার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। জোয়ার ও আলো উভয় প্রয়োজনে পূর্ণিমার অপেক্ষা করা হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে ডে-ডে'র তারিখ ছিল ১৯৪৪ সালের ৫ জুন। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার জন্য তারিখ স্থগিত রাখতে হয়। ৬ জুনও আবহাওয়া খুব একটা ভালো ছিল না। এ পরিস্থিতিতে জেনারেল আইসেনহাওয়ার পরবর্তী পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত

www.pathagar.com

ছিলেন না। তার এ সিদ্ধান্তে জার্মানরা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এ ধরনের আবহাওয়ায় তারা মিত্রবাহিনীর হামলার কথা চিন্তা করতে পারেনি। রোমেলের ধারণাও ছিল তাই। মিত্রবাহিনী এ অসময়ে আক্রমণ চালাতে পারে না-এ বিশ্বাস থেকে তিনি ৪ জুন তার স্ত্রীর ৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য জার্মানীতে ফিরে যান।

প্রাথমিকভাবে ৮২তম বিমানবাহী ডিভিশনকে কোটেনটিনের বহু পশ্চিমে ও মধ্যাংশে সৈন্য নামানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যাতে সমুদ্রপথে অবতরণকারী সৈন্যরা তাদের পূর্বদিক দিয়ে উপদ্বীপে প্রবেশ এবং এ উপদ্বীপের উত্তরাংশে জার্মানদের পুনরায় শক্তিবৃদ্ধি প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ৯১তম জার্মান লুফটল্যান্ডি ডিভিশনকে সেখানে দেখতে পাওয়ায় ৮২তম ডিভিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পরিবর্তন করা হয়।

মিত্রবাহিনী নরমান্ডি অভিযানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপারেশনের ছদ্মনাম দিয়েছিল। পুরো অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন অভারলর্ড।' প্রথম পর্যায়ে একটি ভূখণ্ড দখলের অপারেশনের ছদ্মনাম দেয়া হয় 'অপারেশন নেপচুন'। অপারেশন নেপচুন শুরু হয় ডি-ডেতে এবং শেষ হয় ৩০ জুন। অপারেশন অভারলর্ড-ও শুরু হয় একইদিনে। ১৯৪৪ সালের ১৯ জুন সীন নদী অতিক্রম করা নাগাদ এ অপারেশন অব্যাহত থাকে।

জার্মানরা তাদের আটলান্টিক ওয়াল প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যাপকভাবে জোরদার করে। এখানে ৪ টি জার্মান ডিভিশন মোতায়েন ছিল। এছাড়া প্রতিরক্ষার দায়িত্বে আরো জার্মান সৈন্য নিয়োজিত করা হয়। এসব সৈন্য স্বাস্থ্যগত কারণে পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াইয়ে অক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছিল। সোভিয়েত বন্দীরাও আটলান্টিক ওয়ালে মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে জার্মান প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এসব সোভিয়েত সৈন্য জার্মান বন্দী শিবিরে নির্যাতিত হওয়ার চেয়ে রণাঙ্গনে লড়াই করে মৃত্যবরণ করাকে শ্রেয় বলে গণ্য করে।

কেইনের প্রতিরক্ষায় মোতায়েন ছিল ২১তম পাঞ্জার। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোতায়েন ছিল দ্বাদশ। দ্বাদশ পাঞ্জারকে বলা হতো 'হিটলারজুগেন্ড'। এ ডিভিশনের এ ধরনের নামকরণের পেছনে কারণও ছিল। হিটলার যুব আন্দোলনের কর্মীদের ১৬ বছর বয়সে সরাসরি এ ডিভিশনে রিক্রুট করা হতো। সতর্কতা হিসেবে জার্মানরা ওটাহ বীচের পেছনের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত করে দেয়।

বৃটিশ ৬ষ্ঠ এয়ারবোর্ন ডিভিশন প্রথম লড়াইয়ের সূচনা করে। তারা অবতরণ স্থলের পূর্ব পাশের নদীগুলোর উপর নির্মিত সেতুগুলো দখল করে নেয়। কমান্ডোরা এসে পৌঁছানো নাগাদ তারা এসব সেতু ধরে রাখে। মার্ভেলিতে একটি বিশাল গান ব্যাটারি ধ্বংস করে দেয়াও ছিল আরেকটি লক্ষ্য। জার্মানদের এ গান ব্যাটারি ধ্বংস করে দেয়া হয়। তবে আক্রমণকারী বৃটিশ ইউনিটের হতাহত হয় ৫০ শতাংশ সৈন্য। ৮২তম এবং ১০১তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন দ্রুত তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ দু'টি ডিভিশনের সৈন্যরা বিরাট এলাকা জুড়ে অবতরণ করায় তারা একত্রিত হতে পারেনি। সমুদ্র অথবা জার্মানদের প্লাবিত করে দেয়া ভূমিতে অবতরণ করায় অনেক

www.pathagar.com

ছত্রী সেনা ডুবে মারা যায়। ২৪ ঘন্টা পর ১০১তম ডিভিশনের মাত্র আড়াই হাজার সৈন্য সমবেত হতে সক্ষম হয়। সামান্য হতাহত হওয়ার বিনিময়ে নিয়মিত বৃটিশ পদাতিক সৈন্যরা সোর্ড বীচে অবতরণ করে। দিনের শেষ নাগাদ তারা মাত্র ৫ মাইল অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। মন্টগোমারী যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এ ডিভিশন সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ডি-ডে'র শেষ নাগাদ মূল লক্ষ্যস্থল কেইন ছিল জার্মানদের হাতে।

কানাডীয় সৈন্যরা জুনো বীচে অবতরণ করা মাত্র তারা ১৫৫ মিলিমিটার ব্যাসের ১১ টি ভারি এবং ৭৫ মিলিমিটার ব্যাসের ৯ টি মাঝারি পাল্লার কামানের মুখোমুখি হয়। জুনো বীচে আরো ছিল জার্মান মেশিনগান এবং সুরক্ষিত দেয়াল। প্রতিরক্ষা প্রাচীরগুলো ছিল ওমাহা বীচে নির্মিত প্রতিরক্ষা প্রাচীরের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচু। প্রথম বারের হামলায় হামলাকারীদের ৫০ শতাংশ হতাহত হয়। ৫ দিনব্যাপী বীচ দখলের লড়াইয়ে হতাহতের এ সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কানাডীয়রা বীচের দিকে এগিয়ে যায় এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ডি-ডে'র শেষ ভাগে ১৪শ' কানাডীয় সৈন্য সফলভাবে অবতরণে সক্ষম হয় এবং প্রবল প্রতিরোধের মুখে তৃতীয় কানাডীয় ডিভিশন অন্যান্য ডিভিশনের তুলনায় ফ্রান্সের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ে। ২১তম পাঞ্জার ডিভিশন সোর্ড ও জুনো বীচের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রথম ডি-ডে পাল্টা হামলা চালায়। ৭ ও ৮ জুন দ্বাদশ পাঞ্জারের পাল্টা হামলার মুখে কানাডীয়রা কোনো রকমে টিকে থাকে।

শেরম্যান ট্যাংক এসে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটায় গোল্ড বীচে হতাহত হয় ব্যাপক। জার্মানরা এ বীচে একটি গ্রামে শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। ৫০তম ডিভিশন তার প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে এবং দিনের শেষভাগে বেয়িআক্সের উপকণ্ঠে পৌঁছায়। ৪৭ (আরএম) বৃটিশ কমান্ডোরা সবার পরে এসে পৌঁছায় এবং লা হেমেলে গিয়ে অবতরণ করে। তাদের কাজ ছিল ভূখণ্ডের ভেতর ঢুকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং জার্মান অবস্থানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পেছন দিক থেকে পোর্ট এন বেসিনে আক্রমণ করা।

ডি-ডে'তে সবচেয়ে বেশী রক্তক্ষয় হয় ওমাহা বীচে। এখানে প্রথম ও ঊনত্রিশতম মার্কিন পদাতিক ডিভিশন জার্মানীর ৩৫২তম ডিভিশনের মুখোমুখি হয়। ওমাহা ছিল খুবই সুরক্ষিত বীচ। এখানে অবতরণের আগে বাংকারের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। তবে তা অকার্যকর হয়। নেতৃত্বহীন অবস্থায় এক কোম্পানী শেরম্যান ট্যাংক বীচে উঠে। প্রতিটি অফিসার অথবা সার্জেন্ট আহত কিংবা নিহত হয়। প্রায় ২ হাজার ৪শ' সৈন্য হতাহত হয়। হতাহতের ঘটনাগুলো ঘটে অবতরণের কয়েক ঘন্টার মধ্যে। এখানে লড়াই ছিল বাঁচার জন্য লড়াই।

অবতরণের পর দু'টি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈরি করা হয়। বৃটিশ সৈন্যরা একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করে এ্যারোমানসেস-এ এবং আমেরিকান সৈন্যরা আরেকটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করে ওমাহা বীচে। প্রবল ঝড়ে ওমাহা পোতাশ্রয় ধ্বংস হয়। ১৯৪৪ সালের আগস্ট নাগাদ এ্যারোমানসেস পোতাশ্রয়ে প্রতিদিন ৯ হাজার টন সাজসরঞ্জাম খালাস করা হতো।

www.pathagar.com

নরমান্ডি উপকূলে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত জার্মান সৈন্যরা সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সরবরাহ ঘাটতি ও পরিবহন সংকট এবং প্রশিক্ষণের মান নীচু হওয়ায় তাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। তাছাড়া অবতরণের আগে মিত্রবাহিনীর সপ্তাহব্যাপী বোমাবর্ষণে তাদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। জার্মানদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ৩৫২তম ডিভিশন। রোমেল এ ডিভিশনকে সেন্ট লো থেকে ওমাহাতে মোতায়েন করেছিলেন। রোমেলের নেতৃত্বাধীন এ ডিভিশনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কারণে ওমাহা বীচে মিত্রবাহিনীর বিপুল সৈন্য হতাহত হয়। নরমান্ডিতে প্রচলিত বোমাবর্ষণের পরিবর্তে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা অবতরণ করবে- একথা নিশ্চিত হতে জার্মান কমান্ডারদের কয়েক ঘন্টা লেগেছিল। রণাঙ্গনে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারের অনুপস্থিতি জার্মানদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যাহত করে। মার্কিন ছত্রী সেনারা বিক্ষিপ্তভাবে অবতরণ করায় জার্মানরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা এমন খবরও পাচ্ছিল যে, মিত্রবাহিনী উত্তর নরমান্ডিতে অবতরণ করছে। ২১তম পাঞ্জারের পাল্টা হামলা এবং ট্যাংকবিধ্বংসী গানারদের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও জার্মানদের এ আতংক গ্রাস করেছিল যে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এ আতংক থেকে তারা ৬ জুন দিনের শেষ ভাগে প্রত্যাহার করে। শোনা যায় যে, নিজেদের মাথার উপর ছত্রী সেনাদের অবরতর করতে দেখে ভয়ে জার্মানরা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেও তারা শেষ পর্যন্ত নরমান্ডিতে পরাজিত হয়। এ পরাজয় তাদেরকে চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয়। নরমান্ডিতে অবতরণ করেই মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা প্রথমে ফ্রান্স এবং পরে সব ক'টি ইউরোপীয় দেশ থেকে জার্মানদের বিতাড়িত করে। এভাবে খোদ জার্মানীরও পতন ঘটে।

www.pathagar.com

ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর ১৩শ' বিমানের বোমাবর্ষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ক'টি ট্রাজেডির সৃষ্টি হয় ড্রেসডেনে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বোমাবর্ষণ ছিল তার একটি। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বহীন এ শহরে বোমাবর্ষণ করার কোন যুক্তি ছিল না। যুদ্ধও তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। এছাড়া এ শহর ছিল শরণার্থীতে বোঝাই। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি ড্রেসডেনে ভয়াবহ বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন। কত মানুষ হতাহত হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক প্রয়োজনে অগণিত মানুষ হত্যা করার নির্মম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চার্চিল সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিনকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, তার পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী মিত্ররা জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এ প্রমাণ দিতে গিয়েই তিনি জার্মানীর ড্রেসডেন শহরে বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ এয়ার স্টাফের চার্লস পোর্টাল সকল জার্মান শহর ও জনপদে বোমাবর্ষণের পরামর্শ দেন। তিনি দাবী করেন, বোমাবর্ষণে দ্রুত জার্মানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। এয়ার মার্শাল আর্থার হ্যারিস তার পরামর্শ মেনে নেন। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোম্বার কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি পেয়ে তিনি এরিয়া বোম্বিং নামে পরিচিত একটি নীতি প্রবর্তন করেন। তার এ নীতি জার্মানদের কাছে ত্রাস সৃষ্টিকারী বোমাবর্ষণ হিসেবে পরিচিত। এরিয়া বোম্বিংয়ে সকল জার্মান শহর ও জনপদকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়।

ব্রিটিশ রাজকীয় ও মার্কিন বিমান বাহিনী ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণে যে কৌশলটি ব্যবহার করে তা ছিল অগ্নিঝড় সৃষ্টি। নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে আগুনে বোমা নিক্ষেপ করে তারা এ লক্ষ্য অর্জন করে। এসব বোমায় থাকতো ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস অথবা পেট্রোলিয়াম জেলি (নাপাম)'র মতো অতি দাহ্য বস্তু। কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বোমাবর্ষণের পর সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরে ওঠে যেতো। তখন চারপাশের বাতাস ছুটে আসতো এবং লোকজন আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যেতো।

১৯৪৫ সালে আর্থার হ্যারিস প্রাচীন শহর ড্রেসডেনে আগুনে বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এ শহর আক্রান্ত না হওয়ায় এবং এখানে কার্যত জার্মান বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় তিনি এ শহরকে একটি উত্তম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সোভিয়েট রেড আর্মি এগিয়ে আসতে থাকায় জার্মান শহরগুলো থেকে লোকজন পালাতে থাকে। ড্রেসডেনের লোকসংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৫০ হাজার। কিন্তু পলায়নরত লোকজন আশ্রয় নেয়ায় এ শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৭৩টি অ্যাভরো ল্যাঙ্কাসটার্স বোমারু বিমান

www.pathagar.com

ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণ করে। পরবর্তীতে মার্কিন বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণের জন্য ৫২৭টির অধিক ভারি বোমারু বিমান পাঠায়। মোট তিন দফা বোমাবর্ষণ করা হয়। বোমাবর্ষণে ১ হাজার ৩শ'র বেশি মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান অংশ নেয়। এসব বিমান থেকে ৩ হাজার ৩শ' টন বোমা ফেলা হয়। অধিকাংশ ছিল আগুনে বোমা। শহরের পুরনো অংশের কেন্দ্রস্থলে বোমাবর্ষণে একটি অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি হয়। এ অগ্নিপিণ্ড বাতাসের অক্সিজেন নিঃশেষ করে দেয়। তাপমাত্রা ১৮শ' ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছে। তার আগে ইউরোপে আর কখনও কোথাও আগুনে বোমা নিক্ষেপ করা হয়নি। নিচু দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমানগুলো এলবি নদীর তীর ধরে পলায়নরত লোকজনের উপর মেশিনগান দিয়ে গুলীবর্ষণ করে। পালিয়ে যাওয়া লোকজন একটি রাস্তায় উঠেছিল। চতুর্থ দফা বিমান হামলা হয়েছিল সেখানে। বোমাবর্ষণে শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়। বিমান থেকে ব্রিটিশ মালিকানাধীন শেল কোম্পানির শুভ্র তেল ট্যাংকার দেখা যেতো। কিন্তু বোমাবর্ষণকালে এগুলো অক্ষত থেকে যায়। ড্রেসডেন প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়। অগ্নিবলয় সৃষ্টি হওয়ায় হতাহতদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে ওঠে। কোন কোন সূত্র এ বোমাবর্ষণে ৩৫ হাজার লোক নিহত হয় বলে দাবী করে।

ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের সমান ড্রেসডেন শহরটি ছিল জার্মানীর সপ্তম বৃহত্তম শহর। জার্মানীর এ শহরটি যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগেও মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের হাত থেকে ছিল অক্ষত। শীতকালের মাঝামাঝি জার্মানীর পশ্চিম দিকে শরণার্থীদের ঢল নামে। ড্রেসডেনে শরণার্থীরা আশ্রয় নেয়। বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জার্মানরা অগ্রসরমান মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধে এ শহরের কৌশলগত সুবিধা ব্যবহার করতে না পারে। তাছাড়া ব্রিটিশ রাজকীয় বোমারু বিমানের ক্ষমতা কতটুকু রুশরা এ শহরে প্রবেশ করে যেন বুঝতে পারে, তাও ছিল এখানে বোমাবর্ষণের আরেকটি লক্ষ্য।

ব্রিটিশ বিমান বাহিনী প্রধানের ভাষ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের জন্য এয়ার মার্শাল আর্থার হ্যারিস সমালোচিত হন। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ড্রেসডেনে কেন বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সীমান্তে জার্মান সৈন্যরা অবস্থান করায় আমরা অগ্রবর্তী অবস্থানের কাছাকাছি দ্রুত জিএইচ এবং ওবি গ্রাউন্ড স্টেশন গড়ে তুলি। এ দু'টি প্রতিরক্ষা লাইন দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে আমাদের হামলায় সাফল্য নিশ্চিত করে। একইসময়ে ড্রেসডেন ও চেমনিৎজের মতো দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে বোমারু বিমানগুলো উড্ডয়ন করতে পারতো। শত্রু বিমান আক্রমণের পূর্বাভাস দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় এবং জার্মানীর জঙ্গী বিমানের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় আমি তার আগে এসব লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করিনি। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রুশ সেনাবাহিনী সেক্সনির কেন্দ্রস্থলের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করায় আমাকে ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রুশ অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে শহরটিকে প্রথম

www.pathagar.com

শ্রেণীর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় জার্মানীর প্রতিরক্ষায় ড্রেসডেন তাদের যোগাযোগের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে ড্রেসডেনে জার্মানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং জার্মান প্রতিরক্ষার কেন্দ্র হিসেবে শহরটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে ৮শ' বোমারু ও জঙ্গী বিমান দু'টি তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে বোমাবর্ষণ করে। পরে আবার দ্বিতীয় দফা বোমাবর্ষণ করা হয়। হামবুর্গে বোমাবর্ষণে যতটুকু সফলতা এসেছিল, এখানেও হামলায় ততটুকু সফলতা অর্জিত হয়। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন ছিল মাত্র ১৬শ' একর । বোমাবর্ষণে শহরে আগুনের ঝড় শুরু হয়। তবে শুধু ড্রেসডেন নয়, জার্মানীর দূরবর্তী শহরগুলোতে বসবাসকারী লোকজনের মনোরলও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী দু'দিন আমেরিকানরা দিনের বেলায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দু'টি হামলা পরিচালনা করে। আমি জানি যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে একটি সুন্দর শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণের যৌক্তিকতাকে অনেকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন যদিও তারা আমাদের পূর্ববর্তী অপারেশনগুলোকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। আমি বলতে চাই তখন আমার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণকে একটি সামরিক প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছেন।

ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের সাক্ষী

বোমাবর্ষণের রাতে মার্গারেট ফ্রেয়ার নামে এক মহিলা ড্রেসডেনেই ছিলেন। মার্গারেট জানান, অগ্নিঝড় ছিল অবিশ্বাস্য। সাহায্যের জন্য চিৎকার। আর্তনাদ। কিন্তু চারদিকে কেবল আগুন। আমার বাম পাশে হঠাৎ এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। আমি কখনও তাকে ভুলব না। তার হাতে পুঁটলির মত কী একটা দেখতে পেলাম। এটি ছিল তার শিশু। মহিলাটি তার শিশুকে নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। তার শিশুটি আগুনের একটি বৃত্তের মধ্যে উড়ছিল। আমার দক্ষিণ পাশে আমি একদল লোক দেখতে পেলাম। তারা আর্তনাদ করছিল এবং হাত নাড়ছিল। তারা কেবলই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এরপর আমি অবাক বিস্ময়ে একজনের পর আরেক জনকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম। আজ আমি বুঝতে পারছি অক্সিজেনের অভাবেই এসব লোকের মৃত্যু হয়েছে। প্রচণ্ড ভয় আমাকে গ্রাস করল। তখন আমি কেবল একটি মাত্র বাক্যই আওড়াচ্ছিলাম—আমি আগুনে পুড়ে মরতে চাই না। আমি কতজনকে পা দিয়ে মাড়িয়েছি বলতে পারব না। তবে শুধু এতটুকু মনে পড়ে আমি ভাবছিলাম, আমি অবশ্যই পুড়ে মরব না।

চিড়িয়াখানা কিপারের অভিজ্ঞতা

ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণে মানুষের মতো অবুঝ প্রাণীও মারা যায়। শহরের একটি চিড়িয়াখানায় হাতীগুলো বিকটভাবে চিৎকার করছিল। একটি অগভীর পুকুরে একটি ছোট্ট মাদী হাতী পিঠ নিচু করে শুয়েছিল। তার পা ছিল শূন্যে। বোমায় তার পেট মারাত্মকভাবে ঝলসে যাওয়ায় সে নড়াচড়া করতে করছিল না। ভয়াবহ আগুনের হাত

www.pathagar.com

থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে ৯০টি হাতীর একটি পাল ছুটাছুটি করছিল। কাঁপছিল। এ অবস্থায় চিড়িয়াখানার কিপার ওটে সেইলার জ্যাকসনের করার কিছুই ছিল না। তিনি হাতীগুলোকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

সে রাতে লোথার মেথজিগার নামে একটি শিশুও শহরে ছিল। এ শিশুটি রক্ষা পায়। পরে সে বড় হয়। কিন্তু সে শৈশবের সেই স্মৃতি ভুলতে পারেনি। ১৯৯৯ সালের মে মাসে মেথজিগার ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণে তার নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, রাত সাড়ে ৯ টায় সতর্ক সংকেত বাজানো হয়। আমাদের শিশুদের কাছে শব্দটি ছিল খুবই পরিচিত। সতর্ক সংকেত শুনতে পেলে আমরা জেগে উঠতাম এবং দ্রুত কাপড়-চোপড় পরতাম। সিঁড়ি দিয়ে নিচ তলায় নেমে একটি ভূগর্ভস্থ বাংকারে প্রবেশ করতাম। এটি ছিল বিমান আক্রমণের সময় আমাদের আশ্রয়কেন্দ্র। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠা বোন তার দুই শিশু কন্যা বহন করছিলাম। আমার মা বহন করছিলেন একটি স্যুটকেস এবং বাচ্চাদের দুধের বোতল। আমরা ভীতির সঙ্গে রেডিওর একটি বুলেটিন শুনতে পেলাম। বুলেটিনে বলা হচ্ছিল, 'এটেনশন, আমাদের শহরের উপর একটি বিরাট বিমান হামলা হচ্ছে'। আমি রেডিওর এ বুলেটিন কখনও ভুলব না। কতক্ষণ পর আমরা বোমারু বিমানের কানফাটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরে অবিরাম বিস্ফোরণ। আগুন ও ধোঁয়ায় আমাদের বাংকার পূর্ণ হয়ে যায় এবং তা ধ্বংস হয়। বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ হয়ে যায় এবং আহত লোকজন ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করছিল। প্রচণ্ড ভয়ে আমরা বাংকার থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। একটি বাস্কেটে বাচ্চা দু'টি শুয়েছিল। আমার মা ও বড় বোন এ বাস্কেট বহন করছিল। এক হাতে আমি আমার বড় বোনের হাত এবং আরেক হাতে মায়ের কোট চেপে ধরি। আমরা আমাদের চিরপরিচিত রাস্তা চিনতে পারছিলাম না। শুধু আগুন। যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই আগুন। আমাদের পঞ্চম তলার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাসভবনের অবশিষ্টাংশ তখনও জ্বলছিল। রাজপথে ছিল জ্বলন্ত যানবাহন এবং লোকজন বোঝাই ঘোড়ার গাড়ি। প্রত্যেকেই মৃত্যুভয়ে চিৎকার করছিল। আমি আহত পুরুষ, শিশু ও মহিলারা অন্য একটি বাংকারে পালিয়ে যাই। এসব লোক চিৎকার ও প্রার্থনা করছিল। ইলেকট্রিক টর্চ ছাড়া আর কোন আলো ছিল না। এরপর দ্বিতীয় দফা বিমান হামলা শুরু হয়। আমাদের এ আশ্রয়কেন্দ্রেও বোমাবর্ষণ করা হয়। পরে আমরা বাংকার থেকে বাংকারে ছুটাছুটি করতে থাকি। বহু লোক আশ্রয়ের সন্ধানে বাংকারে ছুটে আসে। লোকজনের উন্মাদনা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। তা ছিল দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর। অগণিত লোক দগ্ধ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে ওঠে। তখন ছিল অন্ধকার। আমরা সকলে অবিশ্বাস্য ভয়ে বাংকার ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করি। মৃত ও মুমূর্ষু লোকজন পদপিষ্ট হয়। লাগেজপত্র হয়ত লাপাত্তা হয়ে যায়। নয়তো উদ্ধারকর্মীরা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমার মায়ের হাত থেকে দু'টি বাচ্চাসহ বাস্কেট ছিনিয়ে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

পেছনের লোকজনের ধাক্কায় আমরা উপর তলার দিকে উঠতে থাকি। আমরা জ্বলন্ত রাজপথ, পড়ন্ত ধ্বংসাবশেষ ও ভয়াবহ অগ্নিঝড় দেখতে পেলাম। মা ভেজা কম্বল ও কোট দিয়ে আমাদের ঢেকে দেন। তিনি এগুলো একটি পানির টবের কাছে পেয়েছিলেন।

ব্রিটিশ বৈমানিকের খেদ

রাজকীয় বিমান বাহিনীর ক্রুরা অগ্নিঝড় সৃষ্টির নৈতিকতা সম্পর্কে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ড্রেসডেনে বিমান আক্রমণে রয় একহর্স্ট একজন ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ মানবতাবাদী অপারেটর তার নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণ আমাকে ভীষণ পীড়া দিত। নারী ও শিশুদের জন্য প্রাণ কাঁদত। মনে হচ্ছিল আমরা কয়েক ঘণ্টা একটি অগ্নিবলয়ের উপর দিয়ে উড্ডয়ন করছিলাম। আমি অজান্তে ক্রুকে লক্ষ্য করে বললাম, 'হায় ঈশ্বর, ওরা সবাই গরীব মানুষ। এ বোমাবর্ষণ পুরোপুরি অনাকাঙ্ক্ষিত। তুমি এ বোমাবর্ষণের কোন যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারবে না'।

ব্রিটিশ কমান্ডারের ব্যাখ্যা

যুদ্ধের পর বোম্বার কমান্ডের ডেপুটি এয়ার মার্শাল রবার্ট সানবি ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'সেখানে বোমাবর্ষণ একটি বিরাট ট্রাজেডি—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যুদ্ধের কোন নৈতিকতা নেই। সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাকে মানবিক কিংবা শিষ্টাচারপূর্ণ করা সম্ভব নয়। কোন পক্ষ মানবিক হতে চাইলে অবশ্যই তাকে পরাজিত হতে হবে। ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণে এটাই আমার শিক্ষা'।

১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ এয়ার মার্শাল আর্থার হ্যারিসের কাছে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে স্মারকলিপি পাঠান তাতে তিনি উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় কেবলমাত্র ত্রাস সৃষ্টির জন্য জার্মান শহরগুলোতে বোমাবর্ষণ করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে। নয়তো আমরা একটি মনুষ্যবিহীন বিরান ভূমির নিয়ন্ত্রণ লাভ করব। আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে জার্মানী থেকে ভবন নির্মাণের সামগ্রী নিয়ে আসতে পারব না। সাময়িকভাবে কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জার্মানদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্ট বোমাবর্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করি। যেমন—তেল স্থাপনা ও যোগাযোগ কেন্দ্র।

ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের কারণ

ড্রেসডেন ছিল সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্য কীর্তির এক অনুপম নির্দশন। এখানে ছিল বিখ্যাত জিউয়িংগার জাদুঘর, প্রাসাদ ও ফ্রুয়েনকারচি গীর্জা। শহরের কোন সামরিক গুরুত্ব ছিল না। এ শহর ধ্বংস হওয়ায় নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধ করার সামর্থ্য কোনক্রমেই দুর্বল হয়নি। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ নাগাদ এটি ছিল অক্ষত। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেড আর্মির অগ্রাভিযানের মুখে ড্রেসডেনের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ

www.pathagar.com

হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা নাৎসীদের কাছ থেকে ড্রেসডেন কেড়ে নেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ঠিক সে মুহূর্তে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ শহরে ভয়াবহ বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। নাৎসীদের আতঙ্কিত করাই উইন্সটন চার্চিলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়াও ছিল তার লক্ষ্য। দ্বিতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই তিনি ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের মাত্র কয়েকদিন আগে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ভাগাভাগি নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন কৃষ্ণসাগরীয় নগরী ইয়াল্টায় বৈঠকে মিলিত হন। চার্চিলের লক্ষ্য ছিল ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণ করে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী মিত্রদের বিমান ক্ষমতা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধারণা দেয়া এবং বুঝিয়ে দেয়া যে, রেড আর্মি একটি মৃত শহর দখল করবে।

রেড আর্মির কাছে আত্মসমপর্ণের পর শহরে একটি নয়া সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের হিসাব মতে, ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণে শ্বাসরুদ্ধ অথবা ভস্মীভূত হয়ে ৩৫ হাজার লোক নিহত হয়। নিহতদের অধিকাংশই ছিল নারী, শিশু ও বয়স্ক লোক। অন্যান্য সূত্র নিহতদের সংখ্যা আরও বেশি বলে দাবী করে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের উপস্থিতির দরুণ নিহতদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

ড্রেসডেনে বোমাবর্ষণের দু'বছর আগে হামবুর্গে বোমাবর্ষণে ৪০ হাজার লোক নিহত হয়। একথা সত্য, জার্মানীর হামলায়ও লাখ লাখ লোক নিহত হয়েছে। বেসামরিক লোকজন কখনও যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। ড্রেসডেন ও অন্যান্য জার্মান শহরে বোমাবর্ষণে হাজার হাজার নিরপরাধ লোক নিহত হওয়ায় ব্রিটিশ ধর্মযাজক জর্জ বেল মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি হাউস অব লর্ডসে দাঁড়িয়ে এক তেজোদৃপ্ত ভাষণে বেসামরিক লোকজনের হত্যাকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সে আওয়াজ আজও থামেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়করা আজ জীবিত নেই। বেঁচে থাকলে গণহত্যার জন্য তারা কি জবাব দিতেন জানি না।

www.pathagar.com

ব্যাটল অব বার্লিন

জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের পতনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এখানকার লড়াই ছিল মূলতঃ নাৎসীবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যকার মর্যাদার লড়াই। ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধে দু'টি ফ্রন্ট থেকে জার্মান সৈন্যরা ক্রমাগত পিছু হটছিল। পিছাতে পিছাতে এক সময় তারা নিজেদের ভূখণ্ডে এসে ঠেকে। একদিকে, সোভিয়েত লাল ফৌজ এবং অন্যদিকে, পশ্চিমা মিত্র জোট উভয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করছিল। তবে এক্ষেত্রে লাল ফৌজ ছিল এগিয়ে। পশ্চিমা মিত্র জোট বার্লিনে ছত্রী সেনা অবতরণের একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট হিসাব করে দেখতে পেয়েছিলেন যে, পশ্চিমা মিত্রবাহিনীর ছত্রী সেনারা বার্লিনে অবতরণ করলে কমিউনিস্ট পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনিবার্য। এ পরিস্থিতিতে জার্মানীর পতন ঘটার পরিবর্তে পতন ঘটবে পশ্চিমা মিত্র জোটের। তাই তিনি বৃথা রক্তক্ষয়ের ঝুঁকি নিতে চাননি।

জার্মানী পরাজিত হলে দেশটিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক মতাদর্শ কায়েম করা হয়। পশ্চিম জার্মানীতে কায়েম করা হয় পশ্চিমা ধাঁচের বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েত মডেলের কমিউনিজম। ঐতিহাসিক বার্লিন নগরীর পশ্চিমাংশ অখ্যাত বন-কে করা হয় পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। অন্যদিকে, বার্লিন সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানী বা জিডিআর-এর রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানীর রাজধানী বার্লিনকে পদানত করে এ মহানগরীর মাঝ বরাবর একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে। ১৯৮৯ সালের ৯ অক্টোবর বার্লিন দেয়ালের পতন ঘটলে দুই জার্মানীর এক হওয়ার সুযোগ আসে। এক বছরের মধ্যে দেশটি ঐক্যবদ্ধ হয়। বার্লিন আবার অভিন্ন জার্মানীর রাজধানী হিসেবে অভিষিক্ত হয়। আজ এগুলো কেবলি স্মৃতি।

বার্লিন দখলের লড়াইয়ে শুধু সোভিয়েত সৈন্যরাই নয়, পাশ্চাত্যের মিত্রজোটও অংশগ্রহণ করেছিল। উভয়ে বিপরীত দিক থেকে বার্লিনের দিকে এগিয়ে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়। পাশ্চাত্যের মিত্রজোট জার্মানীতে সামরিক অভিযান চালালেও তারা বার্লিনে প্রবেশ করতে পারেনি। সোভিয়েত সৈন্যরাই এখানে আগে প্রবেশ করে এবং এ নগরী কব্জা করে নেয়। পাশ্চাত্যের মিত্রজোট বার্লিনের উপর হাজার হাজার টন বোমাবর্ষণ করে। সোভিয়েতরা দাবি করছে যে, তারা বার্লিনে যে পরিমাণ

www.pathagar.com

কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে মিত্রজোটের বোমাবর্ষণের চেয়ে তার পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

বার্লিন দখলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছিল ২৫ লাখ সৈন্য। এসব সৈন্য তিনটি ফ্রন্টে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ফ্রন্টে ছিল কয়েকটি আর্মি। এক একটি আর্মি ছিল আজকের কয়েকটি কোরের সমান। সোভিয়েতদের কামানের সংখ্যা ছিল ৪১ হাজার ৬ শ', ট্যাংকের সংখ্যা সোয়া ৬ হাজার , ট্রাকের উপর স্থাপিত কাতুশা রকেট ৩ হাজার ২৫৫, বিমানের সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার, সামরিক যানের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৩৮৩ টি। অন্যদিকে, জার্মানীর পক্ষে সৈন্য ছিল ১০ লাখ, কামান ১০ হাজার ৪ শ', ট্যাংক দেড় হাজার, বিমান ৩ হাজার ৩শ'। 'স্টালিন অরগ্যান্স' ছদ্মনামের হাজার হাজার কাতুশা রকেট নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বার্লিনে লড়াই শুরু হয়। তিন সপ্তাহের লড়াইয়ে সোভিয়েত রেড আর্মি এ অবরুদ্ধ নগরীতে ২০ লাখের বেশী কামানের গোলা ও রকেট নিক্ষেপ করে। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন বার্লিন অপারেশনে মার্শাল জর্জি ঝুকভকে কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তার ডেপুটি ছিলেন জেনারেল আইভান কোনেভ ও জেনারেল ভাসিল চুইকভ। জার্মান পক্ষে কমান্ডার ছিলেন জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ, হেলমুট ওয়েডলিং, হেলমুট রেম্যান ও উইলহেম মোনকি।

শেষ দিনগুলোতে হিটলার বার্লিনেই ছিলেন। তার পালানোর কোনো জায়গা ছিল না। রাইখ চ্যান্সেলারীর বাগানের নীচে দু'তলা ভবন সদৃশ ভূগর্ভস্থ একটি বাংকারে তিনি আশ্রয় নেন। সব কিছু শেষ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি ৩০ এপ্রিল রক্ষিতা ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। সেদিনই তিনি আত্মহত্যা করেন। সায়ানাইড বিষপানে প্রথমে ইভা ব্রাউন জীবন দেন। পরে নিজের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে হিটলার আত্মহত্যা করেন। তার লাশ বাগানে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা লাশ পোড়ানোর কটু গন্ধ পেয়েছিল। হিটলারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জার্মানীতে থার্ড রাইখ বা তৃতীয় সাম্রাজ্যের শাসন শেষ হয়ে যায়। অথচ তিনি একবার গর্ব করে বলেছিলেন, থার্ড রাইখ হাজার বছর শাসন করবে। কী অলীক স্বপ্নই না হিটলার দেখেছিলেন! মাত্র ১২ বছরের মাথায় থার্ড রাইখের পতন ঘটে।

হিটলার ভেবেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পদানত করতে পারলে ইউরোপ ও এশিয়ায় জার্মানীর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তাই তিনি একবার বলেছিলেন, 'অপারেশন বারবারোসা শুরু হলে বিশ্বের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে এবং নিশ্চুপ হয়ে যাবে।' তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করে এ কথা বলেছিলেন। হিটলার এক সময় যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সে যুদ্ধ পরে তার ঘাড়েই এসে পড়ে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে রুশরা বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছিল। এ পরিস্থিতিতে হিটলার আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ জারি করেন এবং বার্লিনকে একটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলে একে রক্ষার শপথ নেন। রাজধানীর কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল হেলমুট রেম্যান হিসাব করে দেখতে পান যে, বার্লিনকে রক্ষা করতে হলে কমপক্ষে অভিজ্ঞ ২ লাখ সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্সট্রাম বা হোম গার্ড গঠনে যাদের

www.pathagar.com

পাওয়া গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। জার্মান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ছিল ৫০ হাজার শিশু ও পেনশনভোগী বৃদ্ধ। ভক্সট্রাম গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মহানগরী বার্লিন সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে নিজেকে রক্ষায় প্রস্তুত হয়। ব্যারিকেড স্থাপন এবং ট্যাংক ফাঁদে ফেলার জন্য পরিখা খনন করা হয়। তবে কমান্ড্যান্ট রেম্যান এসব প্রস্তুতিকে নিষ্ফল হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'কেবলমাত্র কোনো অলৌকিক ঘটনাই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্যথায় সোভিয়েতরা বার্লিন অবরোধ করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজধানী রক্ষায় প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সমরাস্ত্র কখনো পাওয়া যায়নি।

জার্মানদের চেয়ে শক্তিতে বেশি হওয়ায় বার্লিনে রুশদের বিজয় ছিল অনিবার্য। রুশ ও জার্মানদের শক্তির অনুপাত ছিল সৈন্য ৫ঃ১, কামান ১৫ঃ১, ট্যাংক ৫ঃ১ ও বিমান ৩ঃ১। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও বার্লিনে লড়াইয়ের ভবিষ্যত ছিল অনিশ্চিত। সৈন্যবাহিনী অনেক আগে ধ্বংস গেলেও হিটলার তার বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করতেন। বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে বলে একটা ভুল ধারণা তিনি পোষণ করতেন। অন্যদিকে, জোসেফ স্টালিন মনে করতেন, বার্লিনে প্রথমে যারা নিজেদের পতাকা উত্তোলন করবে তারাই যুদ্ধে বিজয়ী বলে গণ্য হবে। তবে পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তির হিসাব ছিল ভিন্নতর। বার্লিনের লড়াইয়ে নিয়োজিত রেড আর্মি জার্মানীর ভবিষ্যত বিভক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোন্নত ভূখণ্ড দখল করতে চাইছিল। স্টালিনের এ ভুল ধারণার জন্য রেড আর্মিকে চড়া মূল্য দিতে হয়। বার্লিন দখলের লড়াইয়ে একজন জার্মান সৈন্যের বিপরীতে ৪ জন রুশ সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়।

সোভিয়েত কমান্ডার মার্শাল জর্জি ঝুকভ ঘোষণা করেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণে তাদের চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে। মস্কোর নির্দেশে মাতৃভূমি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই করতে সোভিয়েত পতাকার নামে প্রতিটি সৈন্যকে শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ১৬ এপ্রিল বার্লিন দখলের লড়াই চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়। সেদিন তিনটি সোভিয়েত ফ্রন্ট উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে একযোগে বার্লিনে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ২০ এপ্রিল হিটলার টুয়েলফথ আর্মিকে আমেরিকানদের মোকাবিলা এবং নাইন্থ আর্মিকে বার্লিনের অবরোধ ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দেন। এ দু'টি জার্মান আমি গ্রুপ তার নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ততক্ষণে বার্লিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ২৪ এপ্রিল এ তিনটি সোভিয়েত আর্মি গ্রুপ জার্মান রাজধানীকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। পরদিন এলবি নদীর তীরে তোরগাউয়ে ইউএস ফার্স্ট আর্মির সঙ্গে সোভিয়েত ফিফথ গার্ড ট্যাংকের সংযোগ ঘটে। ভবনে ভবনে ও রাস্তায় রাস্তায় লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ এপ্রিল নাগাদ রুশ সৈন্যরা পুরোপুরি বার্লিন ঘেরাও করে ফেলে এবং ৩০ এপ্রিল দুপুর ২ টা ২৫ মিনিটে রাইখস্টাগের পতন ঘটে। স্টালিনের দেয়া শেষ সময়সীমা পেরিয়ে যাবার

www.pathagar.com

সামান্য আগে রাইখস্টাগের শীর্ষে সোভিয়েত পতাকা উত্তোলন করা হয়। লড়াইয়ে সাড়ে ৮১ হাজার সোভিয়েত সৈন্য নিহত এবং ২ লাখ ৮০ হাজার সৈন্য আহত হয়। ১ হাজার ১৯৭ টি সাঁজোয়া যান এবং ২ হাজার ১০৮টি কামান ও ৯১৭টি বিমান ধ্বংস হয়। অন্যদিকে, জার্মান পক্ষে নিহত হয় দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭৩ হাজার সৈন্য। বন্দী হয় ১ লাখ ৩৪ হাজার। এছাড়া, ১লাখ ৫২ হাজার বেসামরিক লোকও নিহত হয়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে কুরস্কের যুদ্ধে জার্মান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং আফ্রিকায় জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর সফল অবতরণ এবং রাশিয়ায় উপর্যুপরি বিপর্যয়ে জার্মানী নিজেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে দেখতে পায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশরা ক্রমশঃ জার্মানীর দিকে ধেয়ে আসছিল। জানুয়ারীর শেষদিকে রুশরা রাজধানী বার্লিনের ১শ' মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। সোভিয়েত সৈন্যরা পোল্যান্ড থেকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে। জানুয়ারীতে রেড আর্মি পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ দখল করে নেয়। পোল্যান্ডের সমতল ভূমি ছিল উন্মুক্ত। এ সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ওয়ারশ এবং নারেউ নদীর ওপার থেকে রেড আর্মির ৩ টি ফ্রন্ট বিশাল এলাকা জুড়ে জার্মানীর দিকে যাত্রা করে। যাত্রার ৪ দিনের মাথায় তারা প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার করে এগুতে থাকে। তারা তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, ডানজিগ, পূর্ব প্রুশিয়া, পোজনান প্রভৃতি দখল করে বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার পূর্বদিকে ওডার নদী বরাবর একটি রেখায় এসে থামে।

২৪ ফেব্রুয়ারী হেইনরিচ হিমলারের নেতৃত্বে নবগঠিত আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা রেড আর্মির উপর পাল্টা হামলা চালালেও তা ব্যর্থ হয়। রুশরা পোমেরানিয়ায় এগিয়ে যায় এবং ওডার নদীর দক্ষিণ তীর মুক্ত করে। ১৩ ফেব্রুয়ারী হাঙ্গেরীর অবরুদ্ধ রাজধানী বুদাপেস্টের অবরোধ ভাঙতে জার্মানদের তিনটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেদিন সোভিয়েতদের হাতে এ শহরের পতন ঘটে। জার্মানরা রেড আর্মির উপর আবার পাল্টা হামলা চালায়। হিটলার দানিয়ুব নদী পুনর্দখলের উপর জোর দেন। ১৬ মার্চ দানিয়ুব পুনর্দখলে জার্মানদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একই দিন রেড আর্মি-ও জার্মানদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। ৩০ মার্চ তারা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং ১৩ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে নেয়।

পরবর্তীকালে পূর্ব জার্মানী বা জিডিআর হিসেবে পরিচিত পূর্বাঞ্চলীয় জার্মানীতে সোভিয়েত অগ্রাভিযানের লক্ষ্য ছিল দু'টি। যুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিমা মিত্ররা তাদের দখলীকৃত ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করবে কিনা সে ব্যাপারে স্টালিন ছিলেন সন্দিহান। এজন্য সোভিয়েত সৈন্যরা একটি বিরাট ফ্রন্ট জুড়ে হামলার সূচনা করে এবং যত দ্রুত সম্ভব পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমা মিত্র সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বার্লিন। বার্লিন দখল করা ছাড়া জার্মানী দখল করা ছিল অর্থহীন। হিটলারের উপস্থিতি এবং জার্মানীর পারমাণবিক কর্মসূচীসহ যুদ্ধোত্তর বার্লিনের কৌশলগত গুরুত্বও ছিল বিবেচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

৯ এপ্রিল রেড আর্মির কাছে পূর্ব প্রুশিয়ার কোনিসবার্গের পতন ঘটে। ফলে জেনারেল রোকসোভস্কির নেতৃত্বাধীন সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট ওডার নদীর পূর্ব তীর ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহে রুশরা দ্রুত গতিতে তাদের সৈন্য পুনঃমোতায়েন সম্পন্ন করে। মার্শাল জর্জি ঝুকভ সীলো হাইটসের (সীলো পাহাড়ের চূড়া) সম্মুখ ভাগে একটি অঞ্চলে তার ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট মোতায়েন করেন। তার আগে এটি বাল্টিকের দক্ষিণে ফ্রাংকফোর্ট থেকে ওডার নদী বরাবর মোতায়েন ছিল। সীলো হাইটসের উত্তরে যেখান থেকে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট সরে আসে সেখানে সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সৈন্য পুনঃমোতায়েনকালে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা লাইনে যে ফাঁক ফোঁকর তৈরি হয় সেখান দিয়ে ডানজিগের কাছে একটি অবস্থানে অবরুদ্ধ জার্মান সেকেন্ড আর্মি ওডার নদীর এপারে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দক্ষিণে জেনারেল কোনেভ ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের মূল শক্তিকে আপার সাইলেশিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেইসি নদীর উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন করেন।

সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে জার্মান ওয়ারম্যাট (সশস্ত্র বাহিনী)-এর জ্বালানি সরবরাহ ছিল না। তারা তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি চাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ সরবরাহ পাচ্ছিল। জ্বালানির অভাবে বিমানগুলোও আকাশে উড়তে পারছিল না। মিউনিখ বিমান ঘাঁটিতে অধিকাংশ বিমান বিধ্বস্ত হয়। এটা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বার্লিনের পতন মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। তবে ধারণা করা হচ্ছিল যে, লড়াই হবে ভয়ংকর। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জার্মানীর সমরাস্ত্র কারখানায় বিমান ও ট্যাংক উৎপাদন করা হতো ঠিকই। কিন্তু সেগুলোর মান ১৯৪৪ সালের আগের মতো ছিল না। সমরাস্ত্রের ঘাটতি দেখা দেয়ায় এবং জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় জার্মানদের বড়জোড় একমাস টিকে থাকার ক্ষমতা ছিল।

২০ মার্চ জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলার কমান্ডার হিসেবে ফিল্ড মার্শাল হিমলারের স্থলাভিষিক্ত হন। জেনারেল গথার্ড হেইনরিচ ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর একজন সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা টেকটিশিয়ান। তিনি অবিলম্বে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। জেনারেল হেইনরিচ সঠিকভাবে ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, ওডার নদীর ওপার থেকে এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর অটোবান (জার্মানীর মূল মহাসড়ক) ধরে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের নিষ্পত্তিকারী হামলা চালাবে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি ওডার নদীর তীর রক্ষার চেষ্টা না করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিবর্তে তিনি সীলো হাইটসের ওই অংশ যেখানে ওডার নদী অটোবানকে অতিক্রম করেছে সেখানে জার্মান প্রকৌশলীদের মোতায়েন করেন। তিনি সীলো হাইটসের প্রতিরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিরক্ষা লাইনে প্রাপ্ত জনবল হ্রাস করেন। জার্মান সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীগণ উজানের একটি জলাধারের পানি ছেড়ে দিয়ে ওডার নদীর সমতল ভূমি প্লাবিত করে দেয়। বার্লিনকে প্লাবিত জলাভূমির পেছনে রেখে তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ করা হয়। ট্যাংকবিধ্বংসী পরিখা, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ও বাংকারের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

১৬ এপ্রিল হাজার হাজার কামান থেকে গোলাবর্ষণ এবং কাতুশা রকেট নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বার্লিনে সোভিয়েত হামলা শুরু হয়। এ হামলা বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। অতি ভোরে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট ওডার নদীর ওপার থেকে হামলার সূচনা করে। একই সময়ে নেইসি নদীর ওপার থেকে ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট-ও হামলায় অংশগ্রহণ করে। ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট ছিল অধিকতর শক্তিশালী। তবে এ ফ্রন্টের কাজ ছিল কঠিন। অধিকাংশ জার্মান সৈন্যদের হামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদেরকেই। ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের প্রাথমিক হামলায় বিপর্যয় ঘটে। জার্মান জেনারেল হেইনরিচ সোভিয়েত হামলা আঁচ করতে পেরে আগেই তিনি তার সৈন্যদের প্রতিরক্ষা লাইনের পরিখা থেকে প্রত্যাহার করেছিলেন। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য ১৪৩টি সার্চলাইট ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ভোরের কুয়াশায় সার্চ লাইটের আলো বাধাগ্রস্ত হয়। জার্মানদের পাল্টা হামলা এবং প্লাবিত জলাভূমি সোভিয়েতদের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমাণিত হয়। অগণিত সোভিয়েত সৈন্য প্রাণ হারায়। অগ্রযাত্রায় মন্থরতা দেখে স্টালিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশে মার্শাল ঝুকভ তার রিজার্ভ সৈন্যদের রণাঙ্গনে পাঠান। সম্ভাব্য অগ্রগতিকালে পশ্চাৎভাগ রক্ষায় রিজার্ভ সৈন্যদের নিয়োজিত করা ছিল তার পরিকল্পনা। সন্ধ্যা নাগাদ কয়েকটি এলাকায় ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটে। তবে তখনো জার্মান প্রতিরক্ষা লাইন ছিল অক্ষত। দক্ষিণে ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট পরিকল্পনা মাফিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে ঝুকভ স্টালিনের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হন যে, সীলো হাইটসে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ হচ্ছে না। এ কথা শুনে স্টালিন ক্ষুব্ধ হন এবং খোঁচা মেরে ঝুকভের সুপ্ত পৌরুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য বললেন, তাহলে তিনি ট্যাংক আর্মি নিয়ে বার্লিনে এগিয়ে যেতে জেনারেল কোনেভকে অনুমতি দেবেন।

দ্বিতীয় দিন ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের স্টাফের সংখ্যা কমিয়ে তাদেরকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। একযোগে হামলা চালানোর সোভিয়েত রণকৌশলে হতাহতদের সংখ্যা প্রচলিত কৌশলের চেয়ে বেশী বলে বিবেচিত হচ্ছিল। ১৭ এপ্রিল রাত নাগাদ জেনারেল ঝুকভের বিপরীতে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল অটল। তবে দক্ষিণে মার্শাল ফার্ডিনান্ড শোরনারের নেতৃত্বাধীন জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টার তেমন একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হচ্ছিল না। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান আর্মির প্রবল আক্রমণে শোরনারের বাম পাশে ফোর্থ পাঞ্জার আর্মি পিছু হটছিল। তিনি ফোর্থ পাঞ্জারের শক্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তার দু'টি রিজার্ভ ডিভিশনকে দক্ষিণে মোতায়েন রাখেন। রাতের মধ্যে আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা ও আর্মি গ্রুপ সেন্টারের দক্ষিণ বাহু ভেঙ্গে পড়তে থাকায় লড়াই একটি সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়। ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির মতো এ দু'টি আর্মি পিছু না হটলে তাদেরকে অবরুদ্ধ হওয়ার মুখোমুখি হতে হতো। সীলো হাইটসের দক্ষিণে জেনারেল শোরনারের নাজুক প্রতিরক্ষা লাইনের উপর কোনেভের সফল হামলায় হেইনরিচের প্রতিরক্ষা লাইন কাবু হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

১৮ এপ্রিল দু'টি সোভিয়েত ফ্রন্ট দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করে। তবে এতে তাদের হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। রাতের মধ্যে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট জার্মানদের শেষ ও চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা লাইনে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে, ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট ফোরস্ট নামে একটি জায়গা দখল করে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায়। ১৯ এপ্রিল চতুর্থ দিনে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট সীলো হাইটসের চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে ফেলে। এ সময় এ ফ্রন্ট ও বার্লিনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন জার্মান সেনা ইউনিট ছাড়া আর কোনো বাধা ছিল না। সীলো হাইটসের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত নাইন্থ জার্মান আর্মির বাদবাকি সৈন্য এবং ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির উত্তরাঞ্চলীয় বাহুর অবশিষ্ট সৈন্যরা ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের সৈন্যদের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে ছিল থার্ড গার্ডস আর্মি, থার্ড ও ফোর্থ গার্ডস ট্যাংক। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের এ তিনটি সোভিয়েত আর্মি জার্মান ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির প্রতিরক্ষা লাইন তছনছ করে দিয়ে বার্লিনে পৌঁছতে এবং ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের সঙ্গে মিলিত হতে উত্তর দিকে মোড় নেয়। ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের অন্যান্য আর্মি আমেরিকানদের সঙ্গে সংযোগ সাধনে পশ্চিম দিকে ছুটে যায়। ১৯ এপ্রিলের দিকে জার্মান পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তখন যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ। ১ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সোভিয়েতদের মূল্য দিতে হয় চড়া। এ সময় তাদের ২ হাজার ৮০৭ টি ট্যাংক খোয়া যায়। একই সময়ে জার্মানীর পশ্চিম রণাঙ্গনে পশ্চিমা মিত্রদের খোয়া যায় ১ হাজার ৭৯ টি ট্যাংক।

২০ এপ্রিল হিটলারের জন্মদিনে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টের কামান থেকে বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে মুহূর্মুহূ গোলাবর্ষণ করা হতে থাকে এবং শহরটি আত্মসমর্পণ করা নাগাদ এ গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্ট শহরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগুতে থাকে। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টারের উত্তরাঞ্চলীয় বাহু চুরমার করে এগিয়ে আসে এবং এলবি নদী বরাবর আমেরিকান অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে অর্ধেক সামনে জুটারবগ নামে একটি জায়গার উত্তর দিক অতিক্রম করে। সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট স্টেটিন ও শিউইডের মধ্যবর্তী জায়গার উত্তরে আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলার আওতাধীন থার্ড পাঞ্জার আর্মির উত্তরাঞ্চলীয় বাহুর উপর হামলা চালায়। ২১ এপ্রিল সেকেন্ড গার্ডস আর্মি বার্লিনের উত্তরে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং ওয়ারনিউচন নামে একটি জায়গার দক্ষিণ-পশ্চিমে আক্রমণ চালায়। অন্যান্য সোভিয়েত ইউনিট বার্লিনের বহিঃস্থ বৃত্তে পৌঁছে যায়। প্রথমে বার্লিন এবং পরে এলিভেন্থ আর্মিকে ঘেরাও করা ছিল সোভিয়েতদের পরিকল্পনা। জার্মান ফিফথ কোরের কমান্ড ফাঁদে পড়ে গেলেও এটি তখনো কোটবাস নামে একটি জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ফোর্থ পাঞ্জার আর্মির দক্ষিণাঞ্চলীয় বাহু ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ার ফ্রন্টের উপর পাল্টা হামলা চালিয়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকটি সাফল্য লাভ করার পর হিটলার কতিপয় নির্দেশ জারি করেন। এ নির্দেশ জারির ঘটনায় এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, তার বাস্তব সামরিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তিনি নাইন্থ আর্মিকে কোটবাস ধরে রাখতে এবং পশ্চিম দিক বরাবর একটি ফ্রন্ট খোলার

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন। আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, উত্তর দিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বহরের উপর তাদেরকে হামলা চালাতে হবে। এ হামলা তাদেরকে উত্তরাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু হতে সহায়তা করবে। এ সাঁড়াশি বাহুকে দক্ষিণ দিক থেকে আগুয়ান ফিফথ পাঞ্জার আর্মির সঙ্গে মিলিত হতে হবে এবং ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান আর্মিকে ঘেরাও করে ধ্বংস করে দিতে হবে। নির্দেশে আরো বলা হয় যে, দক্ষিণ দিকে থার্ড পাঞ্জার আর্মি আক্রমণ করা না পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ দক্ষিণাঞ্চলীয় সাঁড়াশি বাহু ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টকে অবরোধ করবে এবং বার্লিনের উত্তর দিক থেকে এসএস জেনারেল ফেলিক্স স্টেইনারের নেতৃত্বাধীন এলিভেন্থ আর্মি সোভিয়েত ফার্স্ট বাইলোরাশান ফ্রন্টকে ধ্বংস করবে। কিন্তু দিনের শেষভাগে স্টেইনার জেনারেল হেইনরিচকে খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে, এ কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় ডিভিশন তার হাতে নেই। স্টেইনারের কাছ থেকে এ রিপোর্ট পেয়ে জেনারেল হেইনরিচ হিটলারের স্টাফকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে, অবিলম্বে নাইন্থ আর্মিকে পিছু হটার অনুমতি দেয়া না হলে সোভিয়েতদের হাতে তারা ঘেরাও হয়ে যাবে। তিনি এটাও জানিয়ে দেন, এ আর্মিকে বার্লিনের উত্তর-পশ্চিমে ফিরিয়ে আনার সময় ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। তাই এটিকে পশ্চিমে পিছু হটতে দিতে হবে। হেইনরিচ আরো জানান, হিটলার নাইন্থ আর্মিকে পশ্চিমে পিছু হটার অনুমতি না দিলে তিনি তাকে কমান্ড থেকে অব্যাহতি দানের প্রার্থনা জানাবেন।

২২ এপ্রিল সম্মেলন কক্ষে হিটলার রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেলেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, আগের দিন তিনি যেসব নির্দেশ জারি করেছেন সেগুলো আর কার্যকর হচ্ছে না। হতাশা থেকে তিনি বললেন, আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছি। এ কথা বলে তিনি জেনারেলদের দোষারোপ করেন এবং ঘোষণা করেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বার্লিনেই অবস্থান করে আত্মহত্যা করবেন। এ সময় হিটলারকে কপট সান্ত্বনা দিয়ে জেনারেল আলফ্রেড জোডল বললেন, আমেরিকানরা ইতিমধেই এলবি নদী বরাবর পৌঁছে গেছে। তাই বার্লিনের দিকে তাদের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। সুতরাং আমেরিকানদের মোকাবিলায় মোতায়েন টুয়েলফথ আর্মি বার্লিনে মুভ করতে পারে। জোডলের ধারণা হিটলারের মনঃপূত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে টুয়েলফথ আর্মিকে প্রত্যাহার করে বার্লিনের প্রতিরক্ষা জোরদারে নগরীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণে জেনারেল ওয়ালথার ওয়েঙ্ককে নির্দেশ দেন। তখন ধারণা করা হয়েছিল, নাইন্থ আর্মি এগিয়ে এলে এটি টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এ আশায় সন্ধ্যায় এ সংযোগ সাধনে হেইনরিচকে অনুমতি দেয়া হয়।

ফুয়েরার বাংকারে রক্ষিত মানচিত্রে যুদ্ধের পরিস্থিতি যতই জার্মানদের অনুকূলে বলে ধারণা করা হোক না কেন, তখন বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভয়াল ডিভিশনগুলোর সাহায্যে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখে সোভিয়েতেরা ছিল বিজয়ের পথে। সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট ১৫ কিলোমিটার গভীর অভ্যন্তরে ওডার নদীর পূর্ব প্রান্তে

www.pathagar.com

একটি সেতু নির্মাণ করে এবং থার্ড পাঞ্জার আর্মির সঙ্গে ভয়াবহ লড়াইয়ে মেতে উঠে। নাইন্থ আর্মি কোটবাসের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং তাদের উপর পূর্ব দিক থেকে চাপ বৃদ্ধি পায়। একটি সোভিয়েত ট্যাংক বহর বার্লিনের পূর্ব দিকে হাভেল নদী অতিক্রম করে এবং আরেকটি ট্যাংক বহর বার্লিনের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যূহের একটি অংশ ভেঙ্গে ফেলে।

২৩ এপ্রিল সোভিয়েত ফার্স্ট বাইলোরাশান ও ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট বার্লিন ঘেরাও করে এগিয়ে আসতে থাকে। তারা শহরের সঙ্গে জার্মান নাইন্থ আর্মির যেটুকু সংযোগ ছিল সেটুকু বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের ইউনিটগুলো বার্লিনের পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শহর অভিমুখে অগ্রসরমান জার্মান টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে হিটলার জেনারেল ওয়েডলিংকে বার্লিনের প্রতিরক্ষা কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত করেন। ২৪ এপ্রিল নাগাদ ফার্স্ট বাইলোরাশান ও ফার্স্ট ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্ট বার্লিন অবরোধ সম্পন্ন করে। পরদিন ২৫ এপ্রিল সেকেন্ড বাইলোরাশান ফ্রন্ট স্টেটিনের দক্ষিণে একটি সেতুর আশপাশে থার্ড পাঞ্জার আর্মির অবস্থান ভেঙ্গে এগিয়ে আসে এবং তারা র‍্যান্ডো সোয়াম্প নামে একটি জলাভূমি অতিক্রম করে। তখন তাদের পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে বৃটিশ টুয়েনটি ফার্স্ট আর্মি গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং বাল্টিক বন্দর স্ট্রাসলসুন্ডে এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ফিফথ গার্ড আর্মির ফিফটি এইটথ গার্ড ডিভিশন এলবি নদীর তীরে জার্মানীর তোরগাউয়ে ফার্স্ট ইউএস আর্মির সিক্সটি নাইন্থ ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হয়।

বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্য যাদের পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি ছিন্নভিন্ন আর্মি এবং কয়েকটি ওয়াফেন-এসএস ডিভিশন। পুলিশ ও হিটলার যুব আন্দোলনের ছাত্ররা তাদের সহায়তা দেয়। তাছাড়া ভক্সট্রাম নামে আরেকটি প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল। এ প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিলেন বৃদ্ধ। তাদের কেউ কেউ যৌবনে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছেন। আবার কেউ বা ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক। বার্লিনের পশ্চিমে টুয়েনটিন্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, উত্তরে নাইন্থ প্যারাশূট ডিভিশন, উত্তর-পূর্ব দিকে পাঞ্জার ডিভিশন মিউনিখবার্গ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এলিভেন্থ এসএস পাঞ্জারগ্রেনাডিয়ার ডিভিশন নোর্ডল্যান্ড এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে রিজার্ভ সেকেন্ড টুয়েনটিন্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন অবস্থান গ্রহণ করে। অপরিমেয় সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানদের এতটুকু প্রতিরক্ষা ছিল তাসের ঘরের মতো ভঙ্গুর।

বার্লিন রক্ষার লড়াই শেষ হয়ে যায়। তবে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ চলতে থাকে। সোভিয়েতেরা তিনটি মেরু বরাবর শহরের কেন্দ্রস্থলে এগিয়ে আসে। রাইখস্টাগ, মল্টবিক ব্রীজ, আলেক্সান্ডারপ্লাৎস ও হাভেল ব্রীজে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এসব জায়গায় ঘরে ঘরে ও হাতাহাতি লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। এসএস বাহিনীর ফরেন কন্টিনজেন্ট প্রাণপনে লড়াই করে। তারা ছিল নাৎসীবাদের আদর্শের অনুসারী। তাই তারা আশংকা করছিল যে, ধরা পড়লে তাদের মৃত্যু অবধারিত। যে কোনো মূল্যে বার্লিন রক্ষায় হিটলার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন হেইনরিচ সে নির্দেশ পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলে

www.pathagar.com

তাকে কমান্ড থেকে অপসারণ করা হয় এবং পরদিন জেনারেল কুর্ট স্টুডেন্ট তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৩০ এপ্রিল সোভিয়েত সৈন্যরা বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেলে হিটলার ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। হিটলারের মৃত্যু সংবাদ শুনে স্টালিন মন্তব্য করেছিলেন, 'অতএব এখানেই জারজটার শেষ। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো যে, তাকে জীবিত ধরা সম্ভব হলো না।' ২ মে জেনারেল ওয়েডলিং সোভিয়েতদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে বার্লিনের শেষ প্রতিরোধ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বার্লিনে লড়াই থেমে গেলেও এ নগরীর দক্ষিণে বেশ কয়েকদিন ভয়াবহ লড়াই অব্যাহত ছিল। জার্মান নাইন্থ আর্মি যেসব অবস্থানে অবরুদ্ধ ছিল সেগুলো থেকে বের হওয়ার জন্য মরিয়া লড়াইয়ে মেতে উঠে। নাইন্থ আর্মি জার্মান টুয়েলফথ আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে এলবি নদী অতিক্রম করে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল।

জার্মানদের জনবল ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সপ্তাহ পর প্রচণ্ড লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। তাদের সরবরাহ মজুদ করা ছিল বহিঃস্থ প্রতিরক্ষা লাইনের বাইরে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতরা জার্মানদের এসব মজুদ দখল করে। বার্লিনের লড়াইয়ে সোভিয়েতরা ২ হাজার সাঁজোয়া যান হারায়। জার্মানদের পাঞ্জারফাউস্ট নামে কাঁধে বহনযোগ্য রকেটের সুনিপুন আঘাতে এসব সোভিয়েত সাঁজোয়া যানের অধিকাংশ ধ্বংস হয়। বেসামরিক জার্মানদের কাছেও প্রচুর পাঞ্জারফাউস্ট রকেট সরবরাহ করা হয়েছিল। প্রতিশোধকামী সোভিয়েত সৈন্যরা শহরের অধিকাংশ এলাকায় লুটতরাজ চালায় এবং মহিলাদের ধর্ষণ করে। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লুটপাট চলতে থাকে। প্রথমদিকে রেড আর্মির অফিসারগণ এসব অন্যায় সহ্য করতেন। কিন্তু সামরিক অভিযান দখলদারিত্বে পরিণত হলে কর্তৃপক্ষ ও এনকেভিডি এগুলো থামিয়ে দেয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ৪ হাজার সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার বিচার করা হয়।

হিটলারের শেষ ইচ্ছানুযায়ী এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিটস নয়া জার্মান প্রেসিডেন্ট এবং জোসেফ গোয়েবলস নয়া রাইখ চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১ মে গোয়েবলস আত্মহত্যা করলে পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধানের উপর মিত্রপক্ষের সঙ্গে জার্মানীর আত্মসমর্পণের আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে মিত্রবাহিনীর কাছে সকল জার্মান সশস্ত্র বাহিনী নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করলে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটে।

পরাজিত হলেও হিটলার বিশ্বের চেহারা বদলে দিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে দু'টি নতুন পরাশক্তির জন্ম হয়-একটি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরেকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দু'টি পরাশক্তি পরে স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। খ্যাতনামা মার্কিন দার্শনিক ডি, টোকেভিলে ১৯৪৫ সালের প্রায় দেড় শ' বছর আগে একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'আজ হোক কাল হোক, যুক্তরাষ্ট্র ও

www.pathagar.com

রাশিয়া বিশ্বের দু'টি প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে।' ১৯৪৫ সালে জার্মানী ও জাপানের পতনের মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এ যুদ্ধ শেষে দেশটি ইউরোপ থেকে ত্বরিত গতিতে তার পুরো সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা সম্ভব হয়নি। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য কায়েম হলে পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ে উঠে। যুদ্ধোত্তর রুশ প্রজন্মকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়। যুদ্ধে প্রতি তিনটি শিশুর একজন পিতৃহীন হয়। এ যুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজো থেমে যায়নি। উদাহরণস্বরূপ—প্রতিটি বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রত্যেক কনেকে স্থানীয় যুদ্ধের স্মারক স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থানে পৌঁছে যায়। স্টালিন চেয়েছিলেন আর যেন কেউ তার দেশে আগ্রাসন চালাতে না পারে। তার দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের সম্ভাব্য হামলা রোধে তিনি একটি বাফার জোন গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। ইউরোপে সোভিয়েত উপস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিসিসিপির ফাল্টনে এক ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন, 'মহাদেশের বুকে একটি লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।'

হিটলারের মৃত্যু

ক্রমাগত সোভিয়েত অগ্রাভিযানের মুখে এডলফ হিটলার নিরাপত্তার জন্য রাজধানী বার্লিনে চ্যান্সেলারী ভবনের ৫০ ফুট নীচে ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নেন। এ বাংকারকে বলা হতো 'ফুয়েরারবাংকার।' বোমা প্রতিরোধী ভূগর্ভস্থ এ কমপ্লেক্সে ছিল দু'টি পৃথক ফ্লোরে ৩০টি কক্ষ। সেখানে বায়ু চলাচলের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সীমিত। তাই বাংকারে স্টাফ অফিসারগণ সরাসরি রণাঙ্গনের খবরাখবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হতেন। এ সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা বাইরে অবস্থানরত বেসামরিক লোকজনের কাছে টেলিফোন করে সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রযাত্রার অবস্থান জেনে নিতেন। বাংকারে প্রতিদিন জেনারেলগণ হিটলারকে যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রীফিং দিতেন। সেখান থেকেই তিনি রণাঙ্গনের সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হতেন। জাতীয় জীবনের এ সন্ধিক্ষণে পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ধাবমান তিনি তার বিধ্বস্ত আর্মিকে পাগলের মতো নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তার সৈন্যরা জেনারেল (পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল) জর্জি ঝুকভের নেতৃত্বাধীন ৮টি সোভিয়েত আর্মির অগ্রযাত্রা নস্যাত করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার এ আশা ছিল দুরাশা মাত্র। হিটলারের বিশ্বস্ত এসএস তাকে রক্ষায় এবং বার্লিনের পতন রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে জার্মানিরা জায়গায় জায়গায় সাদা পতাকা দেখাচ্ছিল। এসএস এ সময় নিষ্ঠুরভাবে সাদা পতাকা উত্তোলনকারী জার্মানদের গুলী করে হত্যা করে।

২২ এপ্রিল বাংকারে যুদ্ধ বিষয়ক ৩ ঘন্টার এক সামরিক বৈঠকে যারা তাকে পরিত্যাগ করেছেন তাদের তিনি কঠোর ভাষায় দোষারোপ করেন এবং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি তার রাইখকে ব্যর্থ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এখন তার কিছুই করণীয় নেই। তিনি বার্লিনেই অবস্থান করবেন এবং শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত। তার স্টাফ তাকে বার্চটেসগাডেনের আশপাশের পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যদের দিকনির্দেশনা দিয়ে রাইখকে টিকিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এ পরামর্শ উপেক্ষা করে জানান যে, তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

মুহূর্মুহূ সোভিয়েত কামানের গোলাবর্ষণের মুখে প্রচারমন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস তার ৬ সন্তানসহ পুরো পরিবার নিয়ে হিটলারের সঙ্গে অবস্থান করার জন্য বাংকারে এসে আশ্রয় নেন। গোয়েবলসের সন্তানদের চোখে-মুখে ছিল ভীতির চিহ্ন। লেডি ফ্রাউলিন গোয়েবলস ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। গোয়েবলস তার স্ত্রী ও সন্তানদের মৃত্যুর জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুত হতে বলেন। অন্যদিকে হিটলার যেসব দলিল গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্য বাছাই করছিলেন। বাংকার ত্যাগে তিনি স্টাফদের অনুমতি দেন। অনেকেই তার হুকুম মান্য করে এবং ট্রাক ও বিমানে করে বার্চটেসগাডেনের দিকে রওনা হয়ে যায়। তবে কিছু স্টাফ বাংকারে থেকে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্টিন বোরম্যান, গোয়েবলসের পরিবার, এসএস ও সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার, হিটলারের দু'জন সচিব এবং তার দীর্ঘদিনের সহচরী ইভা ব্রাউন। ২৩ এপ্রিল হিটলারের বন্ধু ও সমরমন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার ফুয়েরারের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাকে জানান যে, হিটলার তাকে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তা পালন করেননি। যুদ্ধোত্তর জার্মনীর পুনর্গঠনের জন্য তিনি শিল্প-কারখানাগুলো ধ্বংস করেননি। আলবার্ট স্পীয়ার ভেবেছিলেন একথা শুনে হিটলার রেগে যাবেন। কিন্তু না। হিটলার তাকে অবাক করে দেন। নীরবে তার বক্তব্য শুনে যান।

সেদিন বিকেলে হিটলার বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিংয়ের কাছ থেকে একটি জরুরি টেলিগ্রাম পান। গোয়েরিং ততক্ষণে বার্চটেসগাডেনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে হিটলার যে ডিক্রি জারি করেছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তার টেলিগ্রাম বার্তায় বলেন,

'প্রিয় ফুয়েরার,

বার্লিনের দুর্গে আপনার অবস্থান করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আপনি কি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, ১৯৪১ সালের ২৯ জুন জারিকৃত ডিক্রি অনুযায়ী আপনার ডেপুটি হিসেবে আমি দেশ ও বিদেশে পূর্ণ স্বাধীনতায় রাইখের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি? আজ রাত ১০ টার মধ্যে জবাব না পেলে ধরে নেবো আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং আপনার ডিক্রির শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে। তখন আমি দেশ ও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করবো। আপনার জীবনের এ দুঃসময়ে আপনার প্রতি আমার টান কতটুকু হতে পারে আপনি তা জানেন। আমি আমার অনুভূতি প্রকাশে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

আপনার অনুগত হেরম্যান গোয়েরিং।'

গোয়েরিংয়ের এ বার্তা পড়ে হিটলার রাগে ফেটে পড়েন। বোরম্যান তাকে আরো উত্তেজিত করে তোলেন। ক্রুদ্ধ হিটলার গোয়েরিংয়ের কাছে আরেকটি পাল্টা বার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, তিনি দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছেন। তার এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তিনি অবিলম্বে সকল পদে ইস্তফা দিলে দীর্ঘদিনের সার্ভিস বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করা হবে। বোরম্যান গোয়েরিংকে গ্রেফতার করার জন্য বার্চটেসগাডেনের কাছাকাছি অবস্থানরত এসএস-কে নির্দেশ দেন। ২৫ এপ্রিল ভোর হওয়ার আগেই গোয়েরিং গ্রেফতার হয়ে যান। পরদিন চ্যান্সেলারী ভবন ও বাংকারের ঠিক উপরে প্রথম সোভিয়েত কামানের গোলা এসে পতিত হয়। সেদিন সন্ধ্যায়

www.pathagar.com

লুফটওয়াফের (জার্মান বিমান বাহিনী) জেনারেল রিটার ভন গ্রেইম ও মহিলা টেস্ট পাইলট হানা রীচ একটি ক্ষুদ্র বিমান নিয়ে ফুয়েরার বাংকারের কাছে একটি রাস্তায় অবতরণ করেন। বিমান উড্ডয়নকালে সোভিয়েতদের গোলায় জেনারেল গ্রেইমের পা জখম হয়। হিটলার আহত গ্রেইমকে জানান যে, তিনি তাকে গোয়েরিংয়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তাকে লুফটওয়াফের কমান্ডে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হলো। হিটলার সশরীরে উপস্থিত হয়ে কমান্ড গ্রহণে জেনারেল গ্রেইমকে নির্দেশ দেন। অথচ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতো। পায়ে গুলী লাগায় গ্রেইমকে বাংকারে তিনদিন বিশ্রামে থাকতে হয়। ২৭ এপ্রিল রাতে বাংকারে সোভিয়েত গোলাবর্ষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। হিটলার বিধ্বস্ত জার্মান আর্মির সাহায্যে বার্লিন মুক্ত করার জন্য ফিল্ড মার্শাল কিটেলের কাছে উন্মত্তের মতো টেলিগ্রাম পাঠাতে থাকেন। কিন্তু মার্শাল কিটেল তাকে জানিয়ে দেন যে, বার্লিনে সৈন্য পাঠানো সম্ভব নয়। সোভিয়েতদের কাছে এ শহরের পতন অনিবার্য।

২৪ এপ্রিল হিটলার চরম আঘাত পান। সেদিন তিনি জানতে পারেন যে, এসএস'র কমান্ডার হেইনরিচ হিমলার মিত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনার এবং পশ্চিমে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে জার্মান আর্মির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক খবরে বলা হয় যে, হিমলার সুইস রেড ক্রসের কাউন্ট বারনাডেটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হিমলারের এ আত্মঘাতি উদ্যোগের কথা জানতে পেরে হিটলার উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকেন। তাকে কখনো এরকম আচরণ করতে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে হিমলার ছিলেন তার সঙ্গী। তিনি ছিলেন তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাই তাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল 'ডার ট্রু' বা বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বাসী হিমলার হিটলারের বিপদের দিনে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। হিমলারকে তিনি গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি বাংকারে হিমলারের প্রতিনিধি ও ইভা ব্রাউনের ভগ্নিপতি এসএস লেঃ জেনারেল হারমেন ফেজেলিয়ানকে চ্যান্সেলারীর বাগানে দাঁড় করিয়ে গুলী করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ফেজেলিয়ানকে হিমলারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি হ্যাঁসূচক জবাব দেন। তিনি ইতিবাচক জবাব দেয়ায় এসএস তাকে টেনে হিঁচড়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলী করে। একসময়ের আস্থাভাজন গোয়েরিং ও হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বার্লিনের দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা ধেয়ে আসতে থাকায় হিটলার নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যার পর তিনি দু'টি উইল তৈরি করেন। ১৯২৩-২৪ সালে রচিত মেইন ক্যাম্ফে তার যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল, এ দু'টি উইলে তাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের জন্য তিনি ইহুদীদের দায়ী করলেন। এক সংক্ষিপ্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মধ্যরাতের আগে হিটলার ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। বিয়ে অনুষ্ঠানে ইভা ব্রাউন সিল্কের একটি কালো জামা পরেন। বিয়ের মন্ত্র পড়ান একজন নিম্নপদস্থ নাৎসী অফিসার। তিনিই ছিলেন সিভিল ম্যারেজ অনুষ্ঠানের দায়িত্বে। বিয়েতে পৌরহিত্যকারী নাৎসী অফিসার নিয়ম অনুযায়ী বর ও

www.pathagar.com

কনে উভয়ের কাছে জানতে চান তারা বিশুদ্ধ আর্য রক্তের কিনা। তাদের শরীরে বংশপরম্পরায় কোনো রোগ আছে কিনা। হিটলারের ব্যক্তিগত স্যুটে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। জেনারেল ও অন্যান্যরা তাদের অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষী হিসেবে গোয়েবলস ও বোরম্যান বিয়ের রেজিস্টার খাতায় সই করেন। অতিথিরা শ্যাম্পেইন পানের উৎসবে মেতে উঠেন। নাচে গানে পরিবেশ অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে। হিটলার আবেগপ্রবণ হয়ে যান। এ সময় তিনি স্মৃতিচারণে হারিয়ে যান। অনেক না-বলা কথা তিনি প্রকাশ করেন। উপস্থিত লোকজন হিটলারের স্মৃতিচারণ মনযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি বললেন, তার জীবন থেকে সুখ বিদায় নিয়েছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগতরা ত্যাগ করায় মৃত্যুই কেবল তাকে মুক্তি দিতে পারে।

২৯ এপ্রিল বিকেলের দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা ফুয়েরার বাংকারের এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীকে তার সৈন্যরা গ্রেফতার করে এবং পরে তাকে হত্যা করে তার লাশ মিলানের একটি চত্বরে ঝুলিয়ে রাখে। মুসোলিনীর রক্ষিতা ক্লারা প্যাত্তাসির পরিণতিও হয় একই। বাংকারে রুদ্ধশ্বাসে হিটলার তার ঘনিষ্ঠ মিত্র মুসোলিনীর এ পরিণামের কথা শুনেছিলেন। বাইরের দুনিয়া থেকে এটাই ছিল হিটলারের শেষ খবর প্রাপ্তি। তিনি বুঝতে পারেন যে, আত্মহত্যা না করলে তার ভাগ্যও মুসোলিনীর মতো হবে। ৩০ এপ্রিল দুপুরে হিটলার সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে শেষ বৈঠকে মিলিত হন। তখন তাকে জানানো হয় যে, বাংকার থেকে সোভিয়েতরা মাত্র কয়েকটি ভবন দূরে রয়েছে। তাই তিনি দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারীর বাগানে বিষ প্রয়োগে তার প্রিয় কুকুর ব্লোন্ডিকে হত্যা করেন এবং বিষের কার্যকারিতা লক্ষ্য করেন। ব্লোন্ডির ছিল দু'টি বাচ্চা। বাচ্চা দু'টিকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। হিটলার তার মহিলা সচিবদের কাছে একটি করে সায়ানাইডের ক্যাপস্যুল তুলে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চান এবং বলেন, চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাদের জন্য তার কাছে এর চেয়ে উত্তম উপহার আর নেই। সচিবদের জানিয়ে দেয়া হয়, কেবলমাত্র সোভিয়েতরা বাংকারে হামলা চালালে তারা এসব ক্যাপস্যুল ব্যবহার করবে। তার আগে নয়। ৩০ এপ্রিল আড়াইটায় হিটলার স্টাফদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য ডাইনিং এলাকায় তার ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি সবার সঙ্গে নীরবে করমর্দন করেন। করমর্দন শেষে আবার তিনি নিজের কক্ষে ফিরে যান। হিটলারের বিদায় নেয়ার পর উপস্থিত স্টাফরা পরস্পর চোখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। তারা এইমাত্র যে দৃশ্য দেখেছে তার পরিণাম যে শুভ নয় তা তারা বুঝতে পারে। হিটলারের জীবন প্রদীপ নিভে আসছে এ ইঙ্গিত পেয়ে তাদের মনের ভার যেন উবে গিয়েছিল।

হিটলার শেষবারের মতো আহার করেন। আহার ছিল নিরামিষ। চ্যান্সেলারীর বাগানে ২শ' লিটার গ্যাসোলিন সরবরাহে তার ব্যক্তিগত গাড়ী চালককে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যক্তিগত সচিব গানসিকে আত্মহত্যার পর পর চ্যান্সেলারীর বাগানে তাদের লাশ দ্রুত পুড়িয়ে ফেলতে বলা হয়। বোরম্যান, গোয়েবলস, জেনারেল ক্রেবস ও জেনারেল বার্গডর্ফ এবং অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তা ও স্টাফদের সঙ্গে হিটলার ও ইভা ব্রাউন

www.pathagar.com

বিদায়ী সাক্ষাত করেন। বিদায় নিয়ে তারা তাদের ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করেন। বোরম্যান ও গোয়েবলস নীরবে অশ্রুমোচন করছিলেন। তার কয়েক মিনিট পর গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় বোরম্যান, গোয়েবলস, হিটলারের ভৃত্য হেইঞ্চ লিঞ্চ, অটো গানসি ও হিটলার ইয়ুথ মুভমেন্টের প্রধান আর্থার এ্যাক্সম্যান তার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং একটি সোফায় তার শরীর এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তখনো তার কপালে গুলীতে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। ইভা ব্রাউন বিষ পানে মারা যান। গানসি ও লিঞ্চে একটি কম্বল দিয়ে হিটলারের লাশ ঢেকে ফেলে। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গ্যাসোলিন ঢেলে লাশে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দু'জন এসএস সদস্য তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলে। ইভা ব্রাউনের লাশ আগুনের ভেতর খাড়া হয়ে উঠে। বোরম্যান ও গোয়েবলস সামরিক কায়দায় হিটলারকে শেষ অভিবাদন জানান। পরবর্তী ৩ ঘন্টায় লাশগুলোয় পুনঃপুনঃ গ্যাসোলিন ঢালা হয়। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের দেহাবশেষ মোটা কাপড়ে জড়িয়ে শবাধারে তোলা হয় এবং তৎক্ষণাৎ সমাহিত করা হয়। বাংকারের পেছনে প্রত্যেকে প্রকাশ্যে ধূমপান করে বুঝিয়ে দেয় যে, ফুয়েরার আর নেই। হিটলারের জীবদ্দশায় কেউ তার সামনে ধূমপান করতো না। বাংকারে তখন বৃষ্টির মতো সোভিয়েত কামানের গোলা এসে পড়ছিল। হিটলারের জীবিত স্টাফরা সোভিয়েতদের হাতে ধরা পড়ার আগে কিভাবে বার্লিন থেকে পালানো যায় সে পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠে।

হিটলারের আত্মহত্যার পরদিন গোয়েবলস তার ৬ সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি তাকে ও তার স্ত্রী ফ্রাউলিন ম্যাগদাকে পেছন থেকে গুলী করে হত্যা করার জন্য এসএস'কে অনুরোধ করেন। এসএস তার অনুরোধ রক্ষা করে। তিনি বাংকার থেকে বাইরে এলে এসএস তাকে ও তার স্ত্রীকে পেছন থেকে গুলী করে হত্যা করে। বোরম্যান নিখোঁজ হয়ে যান। তার লাশের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২ মে রেড আর্মির গোয়েন্দা ইউনিট 'স্মার্স' (SMERSH) চ্যান্সেলারী ভবনে প্রবেশ করে। রেড আর্মির সাধারণ সৈন্যদের বাংকার ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। রেড আর্মির অন্যান্য ইউনিটের কাছে আতংক হিসেবে পরিচিত 'স্মার্স-এর সৈন্যরা জানতো যে, হিটলারের লাশের প্রতি স্টালিনের আগ্রহ বেশী। এ লাশ খুঁজে বের করতে না পারলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। এ দুশ্চিন্তায় স্মার্স উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। হিটলারের বাংকারে এ ইউনিটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ভাদিস। আত্মহত্যার পর হিটলারের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ যেসব বিবরণ দিচ্ছেন সেগুলোর ভিত্তি হচ্ছে ভাদিসের রিপোর্ট। মস্কো হিটলারের মৃত্যুকে ভাওতা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তাই তার দেহ খুঁজে বের করা একটি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ভাদিস বাংকারে জীবিত জার্মানদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সবাই একই জবাব দেয় যে, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। বাংকার তল্লাশি করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহকারী জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিটলারের দেহ খুঁজে বেরা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। এরপর স্টালিন এনকেভিডি'র একজন জেনারেলকে বার্লিনে পাঠানোর জন্য গুপ্ত পুলিশ প্রধান বেরিয়াকে নির্দেশ দেন। এ জেনারেলকে মস্কোতে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হতো।

www.pathagar.com

৩ মে রুশ গোয়েন্দা ইউনিটের সৈন্যরা বাংকারের মেঝেতে গোয়েবলস, গোয়েবলসের স্ত্রী ম্যাগদা ও তাদের ৬ সন্তানের লাশ খুঁজে পায়। গোয়েবলসের সন্তানদের মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তার সন্তানদের সায়ানাইড পানে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জার্মান নেভির ভাইস এডমিরাল ভস তাদের লাশ শনাক্ত করেন। একইদিন চ্যান্সেলারীর বাগানে একটি লাশ পাওয়া যায়। হিটলারের মতো চার্লি চ্যাপলিন মার্কা গোঁফ। মাথার চুলও অবিকল তার মতো আঁচড়ানো। তবে পায়ে ছিল বুনন মোজা। লাশের পায়ে বোনা মোজা দেখে স্মার্স ঘোষণা করে যে, হিটলার কখনো হাতে বোনা মোজা পরতেন না। তাই লাশ তার হতে পারে না। ৪ মে চ্যান্সেলারীর বাগানে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ পাওয়া যায়। স্মার্সের একজন এজেন্ট একটি শবাধারের নীচে ধূসর কম্বলের একটি টুকরো দেখতে পায়। বাগান খনন করা হয়। খননের পর হিটলার ও ইভা ব্রাউনের ভস্মীভূত লাশের অবশিষ্টাংশ উত্তোলন করা হয়। একটি জার্মান এ্যালসেশিয়ান কুকুর ও কুকুরের একটি বাচ্চাও পাওয়া যায়। ৫ মে ভোরে বার্লিনের উত্তর-পূর্বদিকে বাচ-এ স্মার্সের সদর দপ্তরে এ দু'টি লাশ পাঠানো হয়। হিটলারের লাশ সংরক্ষণে এত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যে, জার্মানীতে সোভিয়েত সামরিক অপারেশনের অধিনায়ক জেনারেল ঝুকভকেও জানানো হয়নি। হিটলারের ডেন্টাল রেকর্ড এবং তার ডেন্টাল বা দন্ত পরীক্ষার পর জেনারেল ভাদিস নিশ্চিত হন যে, তিনি হিটলারের দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। ৭ মে মস্কোকে জানানো হয়, হিটলারের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। তখন থেকে এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। ১৯৭০ সালে ক্রেমলিন হিটলারের দেহাবশেষ সমাহিত করার ঘোষণা দেয়। তারা দাবি করে যে, তারা ম্যাগডেবার্গে আর্মির একটি প্যারেড গ্রাউন্ডে হিটলারের লাশ সমাহিত করেছে। সোভিয়েত গোয়েন্দা ইউনিট স্মার্স হিটলারের চোয়াল রেখে দেয়। তারা তাদের ডেন্টাল পরীক্ষায় এ চোয়াল ব্যবহার করে। ইয়েলিনা রাঝেভস্কিয়া এ কথা স্বীকার করেছেন। বাচ-এ হিটলারের দন্ত স্টাফদের স্মার্সের জিজ্ঞাসাবাদকালে তিনি দোভাষী হিসেবে কাজ করেন। এনকেভিডি হিটলারের মাথার খুলি রেখে দেয়। মস্কোর মোহাফেজখানায় হিটলারের চোয়াল ও মাথার খুলি দু'টিই দেখা গেছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি রুশ কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, তারা ম্যাগডেবার্গ প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে হিটলারের দেহাবেশেষ উত্তোলন করে এবং পরে তা পুড়িয়ে শহরের নর্দমায় ছিটিয়ে দেয়।

হিটলারের শেষ ইচ্ছা

'যেহেতু আমি আমার সংগ্রামমুখর জীবনে বিয়ে করার মতো দায়িত্ব পালন করার কথা ভাবতে পারিনি তাই আমি জীবনের অস্তাচলগামী মুহূর্তে আমার অবরুদ্ধ জীবনে সুখ দুঃখের অংশীদার হতে স্বেচ্ছায় যে আমার বাংকারে এসেছে তাকে অর্থাৎ ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে তার ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে জীবন দিতে চায়। আমাদের জনগণের কল্যাণে আমরা এতদিনে যা হারিয়ে ফেলেছি হয়তো এ বিয়েতে তার কিছুটা লাঘব হবে। আমার যা সম্পদ রয়েছে তার কোনো মূল্য থাকলে

www.pathagar.com

সেগুলোর মালিক হবে দল। দল ধ্বংস হয়ে গেলে মালিক হবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেলে সেখানে আমার সিদ্ধান্ত দেয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি সারা জীবন যেসব চিত্রকর্ম সংগ্রহ করেছি সেগুলো আমি নিজের জন্য সংগ্রহ করিনি। সংগ্রহ করেছিলাম ডোনাউ-এ আমার নিজ শহর লিঞ্জের একটি সংগ্রহশালা সম্প্রসারণের জন্য। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, আমার অনুরোধ যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে। আমি আমার দলের বিশ্বস্ত সহকর্মী মার্টিন বোরম্যানকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করছি। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ আইনগত কর্তৃত্ব তাকে দেয়া হলো। আমার ভাই ও বোন, সর্বোপরি আমার স্ত্রীর মা এবং আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী বিশেষ করে আমার পুরনো সচিব ফ্রাউ উইন্টার যারা তাদের কাজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন আমাকে সহায়তা দিয়েছে তাদের সংসার জীবনে যদি কোনো জিনিসের আবেগঘন মূল্য থাকে অথবা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাও বোরম্যানকে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হলো।

শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার অসম্মান এড়িয়ে যেতে আমি ও আমার স্ত্রী সহমরণে যাচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা যে, আমাদের লাশ সেখানে অনতিবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলা হবে যেখানে আমি আমার জাতির জন্য বিগত ১২টি বছর দিনরাত কাজ করেছি।'

বার্লিন, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫, রাত ৪টা
(স্বাক্ষর) এ, হিটলার।
সাক্ষী ঃ (১) ডাঃ জোসেফ গোয়েবলস (২) মার্টিন বোরম্যান (৩) কর্নেল নিকোলাস ভন বীলো।

হিটলারের রাজনৈতিক দলিলের প্রথমাংশ

'প্রথম মহাযুদ্ধ যা রাইখের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন থেকে একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জাতির সেবায় আমি ৩০ টি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। এ তিন দশক আমার কর্ম, চিন্তা ও শ্রম সবই ছিল আমার জাতির মঙ্গলের জন্য। আমার জাতি আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্তি যুগিয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিরল। এ তিন দশকে আমি জাতির সেবায় আমার জীবন, কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্য সবই বিলিয়ে দিয়েছি।

আমি অথবা জার্মানীর কেউ যুদ্ধ চায়নি। এ যুদ্ধ ঐসব আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়করাই চেয়েছিলেন এবং উস্কে দিয়েছিলেন যারা হয়তো ছিলেন ইহুদী বংশোদ্ভূত নয়তো ছিলেন ইহুদী স্বার্থের প্রতিভূ। আমি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণে বহু প্রস্তাব দিয়েছি। এসব প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে আগামীদিনের বংশধর যুদ্ধ শুরু হওয়ার দায় দায়িত্ব আমার উপর চাপাতে সক্ষম হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি কখনো চাইনি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধুক। ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকা আক্রান্ত হোক। শত শত বছর পরে হলেও আমাদের শহর ও স্মৃতিসৌধ থেকে ঘৃণা উত্থিত হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা এ যুদ্ধের জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী।

জার্মান-পোলিশ যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩ দিন আগে আমি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে সার নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ যেভাবে মীমাংসা করা হয়েছিল সেভাবে দু'টি দেশের বিরোধ

www.pathagar.com

নিষ্পত্তির জন্য বার্লিনে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার এ প্রস্তাবের কথা কারো অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ বৃটিশ রাজনীতির নেতৃস্থানীয় অংশ যুদ্ধ চেয়েছিলেন। তারা যুদ্ধ চেয়েছিলেন দু'টি কারণে। এক, অস্ত্র বিক্রি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আরেকটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ইহুদী গোষ্ঠীর প্ররোচনা। আমি স্পষ্ট করে বলেছিলাম, এ রক্তাক্ত যুদ্ধের মূল হোতা আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্রান্তকারীদের ফাঁদে পা দিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দায়দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। আমি এটাও নিঃসন্দেহাতীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, এ যুদ্ধে ইউরোপের লাখ লাখ আর্য সন্তান অনাহারে মারা গেলে, বয়স্ক লোকের মৃত্যু হলে কিংবা হাজার হাজার শিশু ও মহিলা ভস্মীভূত হলে এবং শহরগুলো ধ্বংস্তূপে পরিণত হলে ইহুদীদেরও অনুশোচনা করতে হবে।

৬ বছর যুদ্ধের পর আমি রাইখের রাজধানী বার্লিন ত্যাগ করতে পারি না। আমার বাংকারে শত্রুর হামলা মোকাবিলা করার মতো সৈন্য খুবই সামান্য হওয়ায় এবং আমাদের প্রতিরোধ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় আমি এ শহরে যারা এখনো অবস্থান করছেন তাদের অনুরূপ ভাগ্য বরণ করতে চাই। আমি শত্রুর হাতে ধরা পড়তে চাই না। তাই বার্লিনে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফুয়েরার ও চ্যান্সেলর হিসেবে আমার মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব না হলে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার নামে সৈন্যরা ফ্রন্টে লড়াই করছে, মহিলারা ঘরে এবং কৃষক ও শ্রমিকরা বাইরে পরিশ্রম করছে। এটা এক অনন্য ইতিহাস। আমি আপনাদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এ আশা ব্যক্ত করছি যে, আপনারা কোনো অবস্থাতেই এ সংগ্রাম পরিত্যাগ করবেন না। আপনারা মহান ক্লজউইজের খাঁটি বংশধর হিসেবে পিতৃভূমির শত্রুদের বিরুদ্ধে যে কোনো স্থানে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। আমার মরণে কোনো দুঃখ নেই। অনেক নারী-পুরুষ আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাদেরকে সে অনুমতি দেইনি। আমি তাদেরকে জাতির বৃহত্তর সংগ্রামে অংশ নিতে পরামর্শ দিয়েছি। জাতীয় সমাজতন্ত্রের যে চেতনায় আমাদের সৈন্যরা উজ্জীবিত সেই চেতনায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আমি সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদের অনুরোধ করেছি। আমি তাদের একথাও জানিয়ে দিয়েছি যে, এ সংগ্রামের স্থপতি ও স্রষ্টা হিসেবে ক্ষমতা ত্যাগ কিংবা কাপুরুষের মতো বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে উত্তম। আমাদের নৌ-বাহিনী প্রতিরোধ লড়াইয়ে যে নজির স্থাপন করেছে আমাদের কোনো জেলা বা শহরের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যরা সম্মানের সেই আচরণবিধি অনুসরণ করবেন বলে আমি কামনা করি। আমি আশা করি সকল কমান্ডার আমৃত্যু বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করবেন এবং সামনে এগিয়ে যাবেন।'

রাজনৈতিক দলিলের দ্বিতীয় অংশ

'আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে রাইখমার্শাল হেরম্যান গোয়েরিংকে দল থেকে বহিষ্কার করছি এবং ১৯৪১ সালের ২৯ জুন ঘোষিত ডিক্রির আওতায় তিনি যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন সেগুলো থেকে তাকে অব্যাহতি দিচ্ছি। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর

www.pathagar.com

রাইখস্টাগে প্রদত্ত আমার বিবৃতি বলে আমি গ্রসএডমিরাল ডোয়েনিটসকে রাইখের প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করছি। আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে সাবেক রাইখ ফুয়েরার-এসএস এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেইনরিচ হিমলারকে দল ও রাষ্ট্রের সকল পদ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি। আমি গলিটার কার্ল হেঙ্কিকে রাইখ ফুয়েরার-এসএস এবং জার্মান পুলিশ প্রধান এবং গলিটার পল গিয়েসলারকে রাইখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করছি।

আমার প্রতি আনুগত্যহীনতা ছাড়াও গোয়েরিং ও হিমলার শত্রুর সঙ্গে গোপন আলোচনা এবং বেআইনীভাবে নিজেরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালানোর মাধ্যমে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। এগুলো তারা করেছেন আমার অজ্ঞাতে এবং আমার মতের বাইরে। (হিটলার পরে নয়া সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন)

মার্টিন বোরম্যান ও গোয়েবলসের মতো বেশকিছু লোক সস্ত্রীক নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তারা কোনো পরিস্থিতিতে রাইখের রাজধানী ত্যাগ করতে চাননি। বরং তারা আমার সঙ্গে মরতে প্রস্তুত। তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে বলবো। তাদেরকে আবেগের উর্ধে উঠে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের কর্ম ও আনুগত্যের মাধ্যমে মৃত্যুর পর তারা আমার সঙ্গী হবেন। আমি বিশ্বাস করি আমার আত্মা তাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে এবং তাদেরকে অনুসরণ করবে। আমি চাই তারা কর্মে কঠোর হবেন। তবে অন্যায় করবেন না। সর্বোপরি তারা তাদের কাজে কখনো ভীতির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং তারা জাতির সম্মানকে বিশ্বে সবকিছুর উর্ধে স্থান দেবেন।

শেষ কথা হলো, তাদেরকে এ সত্য মানতে হবে যে, আমাদের কর্ম যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অব্যাহত প্রচেষ্টা তা আগামী শতাব্দীতে আমাদের আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি অভিন্ন স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে একটি বাধ্যবাধকতার আওতায় নিজের সুখ ও সুবিধাকে বিসর্জন দিতে হবে। আমি সকল জার্মান, সকল ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি নয়া সরকার ও এ সরকারের প্রেসিডেন্টের প্রতি বিশ্বস্ত হতে এবং আমৃত্যু আনুগত্য প্রদর্শন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সকল জাতির সার্বজনীন বিষপ্রয়োগকারী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের নির্মম বিরোধিতা এবং জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার আইন প্রয়োগে শৈথিল্যের পরিচয় দেয়ায় আমি জাতির ঐসব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের আওতায় যারা কাজ করেছেন তাদের অভিযুক্ত করছি।

বার্লিনে প্রদত্ত ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল, ভোর ৪ টা
এডলফ হিটলার
সাক্ষী ঃ (১) ডঃ গোয়েবলস (২) মার্টিন বোরহ্যাম (৩) উইলহেম বার্গডর্ফ (৪) হ্যান্স ক্রেবস।

www.pathagar.com

জার্মানীর আত্মসমর্পণ

হিটলারের আত্মহত্যা এবং রাজধানী বার্লিনের পতনের পর জার্মানীর আত্মসমর্পণ ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। হিটলার তার রাজনৈতিক উইলে কার্ল ডোয়েনিটসকে তার উত্তরাধিকারী বা প্রেসিডেন্ট এবং প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসকে চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্তি দেন। ১ মে গোয়েবলস আত্মহত্যা করলে আত্মসমর্পণের আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়িত্ব এককভাবে অর্পিত হয় ডোয়েনিটসের কাঁধে। ডোয়েনিটস ভন ক্রোসিগকে রাইখের চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেন।

১ মে এসএস জেনারেল কার্ল উলফ মিত্রবাহিনীর সঙ্গে অননোমোদিতভাবে দীর্ঘ আলোচনা শেষে ইতালীতে মোতায়েন জার্মান ১০ম আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ হেইনরিচ ভন ভিয়েতিনগোফকে সকল সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। জেনারেল উলফ একটি আত্মসমর্পণ দলিলেও স্বাক্ষর করেন। তার স্বাক্ষরকৃত আত্মসমর্পণের দলিলে বলা হয়, ২ মে ইতালীতে মোতায়েন সকল জার্মান সৈন্যকে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ডোয়েনিটস আত্মসমর্পণে সময় নিতে চাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, মিত্রবাহিনী তাকে দ্রুত আত্মসমর্পণে চাপ দিচ্ছিলো। আত্মসমর্পণে সময় নেয়ার পেছনে ডোয়েনিটসের আশু লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে বন্দী হওয়ার আগে পূর্ব রণাঙ্গনে লড়াইয়ে নিয়োজিত জার্মান সৈন্যদের পালিয়ে আসার সুযোগ দেয়া।

জার্মান হাই কমান্ড বিশ্বাস করতো যে, সুযোগ পেলেই সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান সৈন্য ও বেসামরিক লোকজনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আলফ্রেড জোডল সুপ্রীম এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের হেডকোয়ার্টার্সে এসে পৌছান। তিনি মিত্রবাহিনীর কমান্ডারদের বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণে আরো কিছু সময় দেয়া উচিৎ। তিনি বলেন, সময় না পেলে জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত সৈন্যদের হাতে বন্দী হবে। কিন্তু বন্দী না হয়ে ফিরে আসাতে পারলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন হবে। মিত্রবাহিনীর কমান্ডাররা বাড়তি সময় দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং অবিলম্বে আত্মসমর্পণের জন্য জোডলের উপর প্রচণ্ড চাপ দেন। অগত্যা জেনারেল জোডল আত্মসমর্পণের দলিলে সই দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে ফ্লেন্সবার্গে ডোয়েনিটসের সদর দপ্তরে একটি সংকেত পাঠান। ডোয়েনিটস রাত দেড়টায় জবাব দেন। তারপর জোডল

www.pathagar.com

ও তার নেতৃত্বাধীন জার্মান প্রতিনিধি দল মিত্রশক্তির প্রতিনিধি দলের সামনে উপস্থিত হন। শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণায় মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইসেনহাওয়ার জার্মান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানান। তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জার্মান প্রতিনিধি দল আত্মসমর্পণ দলিলের ৪ টি কপিতে স্বাক্ষর করেন। ৭ মে ভোর ০২.৪১ টায় ফ্রান্সের রেইমসে সুপ্রীম এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্স বা শাফ-এর সদর দপ্তরে আত্মসমর্পণের দলিলে সই দেয়া হয়। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জেনারেল জোডল নিজেদেরকে ইতিহাসের অবিচারের শিকার বলে দাবি করেন এবং বলেন, আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে জার্মান জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভাগ্য বিজয়ী মিত্রশক্তির উপর ন্যস্ত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, '৫ বছরের অধিক স্থায়ী যুদ্ধে উভয়পক্ষ বিশ্বের অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে বেশী দুর্দশা ভোগ করেছে। তাই এ মুহূর্তে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, বিজয়ীরা বিজিতদের প্রতি সদয় আচরণ করবেন।' রেইমস চুক্তিতে জার্মান হাই কমান্ডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল এবং এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সুপ্রীম কমান্ডারের পক্ষে (১) ডব্লিউ বি, স্মিথ এবং (২) সাক্ষী হিসেবে সই করেন ফরাসী সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এফ, সেভেজ। সোভিয়েত হাই কমান্ডের পক্ষে সই করেন মেজর জেনারেল সুসলাপারভ। আত্মসমর্পণ দলিলের ১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'এতদ্বারা আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী জার্মান হাই কমান্ডের কর্তৃত্ব বলে এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সুপ্রীম কমান্ডার এবং একই সঙ্গে সোভিয়েত হাই কমান্ডের কাছে নিঃশর্তে সকল জার্মান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সৈন্যদের আত্মসমর্পণে সম্মত হয়ে স্বাক্ষর করছি।' চুক্তিতে আরো বলা হয়, 'জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সৈন্য ১৯৪৫ সালের ৮ মে থেকে মধ্য ইউরোপীয় সময় ২৩০১ টায় সক্রিয় তৎপরতা থেকে বিরত হবে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সোভিয়েত নেতা স্টালিনের সঙ্গে এই মর্মে একমত হন যে, বার্লিনে অনুরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের আগে রেইমসে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয় প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু সাংবাদিকরা ৭ মে বিকেলের মাঝামাঝি ঘটনা ফাঁস করে দিলে ইউরোপ ও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে আনন্দ উল্লাস শুরু হয়ে যায়। ৮ মে যুক্তরাষ্ট্রে ভি-ই (ভিক্টোরি ইন ইউরোপ) ডে ঘোষণা করা হয়। সেদিন ছিল প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের ৬১তম জন্মদিন। তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয়কে তার পূর্বসূরি ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্টের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিল পরলোকগমন করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হলে লন্ডনে ১০ লাখ লোক বিজয় উল্লাসে মেতে উঠে। ট্রাফলগার স্কোয়ার থেকে বাকিংহাম প্রাসাদ ছিল লোকে লোকারণ্য। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী এলিজাবেথ সমবেত জনতাকে অভিনন্দন জানাতে প্রাসাদের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। এসময় প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলও সেখানে উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন। প্রিন্সেস (পরবর্তীকালে রাণী) দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও তার বোন মার্গারেট নিরাপত্তা প্রটোকল ভেঙ্গে জনতার ভিড়ে মিশে যান।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজয় দিবস উদযাপিত হওয়ার সংবাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন চরম ক্ষুব্ধ হয়। সোভিয়েতরা মন্তব্য করে যে, পশ্চিমা মিত্রশক্তি তাদেরকে বিজয়ের অংশীদার করতে আগ্রহী নয়। রেইমগের চুক্তি তাদের মনঃপূত হয়নি। নিজ এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধি মেজর জেনারেল আইভান সুসলাপারভ রেইমস চুক্তিতে সই দেয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার ভাগ্যে কি ঘটেছিল কেউ জানতে পারেনি। সোভিয়েতরা চুক্তিতে যেসব শর্ত রাখার প্রস্তাব করেছিল সেসব শর্ত উপেক্ষিত হওয়ায় তারা চুক্তি বাতিলের হুমকি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯ মে নাগাদ জনগণকে বিজয়ের সংবাদ দেয়নি। ফলে সূচনাতেই বিজয়ী শিবিরে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন জার্মান চীফ অব স্টাফ জেনারেল আলফ্রেড জোডল

পরদিন ৮ মে মধ্য রাতের কিছু আগে বার্লিনে জার্মান কর্মকর্তারা জেনারেল জর্জি ঝুকভের উপস্থিতিতে সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণের আরেকটি দলিলে সই করেন। ৯ মে মস্কোর স্থানীয় সময়ে জার্মান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ কার্যকর হয়। বার্লিন চুক্তিতে জার্মান হাই কমান্ডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ফ্রিডবার্গ কিটেল স্টাম্ফ। উপস্থিত হিসেবে স্বাক্ষর করেন এ্যালায়েড এক্সপিডিশনারী ফোর্সের সুপ্রীম কমান্ডারের পক্ষে এ ডব্লিউ টেডার এবং রেড আর্মির সুপ্রীম হাই কমান্ডের পক্ষে জেনারেল জর্জি ঝুকভ। সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১) এফ, ডি লাতরি-তাসিগানি (ফার্স্ট ফ্রেঞ্চ

www.pathagar.com

আর্মি, জেনারেল কমান্ডিং-ইন-চীফ) এবং (২) কার্ল স্পাজ, (জেনারেল, কমান্ডিং ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্র্যাটেজিক এয়ার ফোর্স)।

তার আগে ৪ মে বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী হল্যান্ড, উত্তর-পশ্চিম জার্মানী এবং ডেনমার্কে অবস্থানকারী জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উল্লেখিত অঞ্চলের কোনো কোনো অংশের অপারেশনাল কমান্ডার ছিলেন গ্রান্ড এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিটস। তার কমান্ডের এসব অংশ আত্মসমর্পণ করায় ইউরোপে যুদ্ধ থেমে যাচ্ছিল। ৫ মে ডোয়েনিটস আক্রমণাত্মক তৎপরতা থেকে বিরত এবং নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসার জন্য সকল জার্মান ইউ-বোটকে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, ২ মে বার্লিনে লড়াই বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের ৮ মে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও আরো কয়েক সপ্তাহ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। ৭ মে জেনারেল বোহনি নরওয়েতে জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার কথা ঘোষণা করেন। তবে পূর্ব রণাঙ্গনে ফিল্ড মার্শাল ফার্ডিনান্ড শোরনারের নেতৃত্বাধীন জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টার আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। ৩০ এপ্রিল হিটলারের রাজনৈতিক উইলে তাকে জার্মান সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। নাৎসী জার্মানীতে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ড ওকেডব্লিউ এবং আর্মির হাই কমান্ড ওকেএইচ-এর মধ্যে বিভক্ত। ১৯৪৫ সাল নাগাদ ওকেডব্লিউ পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন ছাড়া প্রতিটি রণাঙ্গনে মোতায়েন সকল জার্মান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতো। পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন সৈন্যরা ছিল ওকেডব্লিউ-এর কমান্ডের আওতায়। হিটলারের মৃত্যুর আগে এ ফ্রন্ট সরাসরি তার কাছে রিপোর্ট করতো। কিন্তু ৮ মে জার্মানীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের দিন ফিল্ড মার্শাল শোরনার ওকেডব্লিউ, ডোয়েনিটস নাকি ভন ক্রোসিগের কমান্ডে ছিলেন তা মোটেও স্পষ্ট ছিল না। অবশেষে শক্তিপ্রয়োগে এ সংকটের নিষ্পত্তি করা হয়। ৮ মে শোরনার তার কমান্ড পরিত্যাগ করেন এবং অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যান। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাগ অভিযানে জার্মান আর্মি গ্রুপ সেন্টারের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠায়। ১১ মে'র মধ্যে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের সকল ইউনিটকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। জেনারেল সাউকেনের নেতৃত্বাধীন সেকেন্ড আর্মি হেলিগেনবেইন ও ডানজিগে আত্মসমর্পণ করে।

৮ মে নাগাদ অন্যান্য যেসব জার্মান সেনা ইউনিট আত্মসমর্পণ করেনি তাদের মধ্যে ছিল আর্মি গ্রুপ কুরল্যান্ড। পরদিন ৯ মে এ গ্রুপ আত্মসমর্পণ করে। কুরল্যান্ড আর্মি গ্রুপের ৩২টি জার্মান ও উনিশতম লাটভীয় ডিভিশনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হলেও লাটভীয় বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর অনেকেই আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায় এবং শেষ বুলেট দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তারা কুরল্যান্ডের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর থেকে ৫ লাখ জার্মান সৈন্য ও ২০ হাজার লাটভীয় সৈন্যের একটি ডিভিশন নিয়ে গঠিত আর্মি গ্রুপ কুরল্যান্ড ছিল অবরুদ্ধ। এ অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ছিল সোভিয়েত রেড আর্মি এবং উত্তর ও পশ্চিমে ছিল বাল্টিক সাগর। যে জায়গাটিতে জার্মান সৈন্যরা অবরুদ্ধ

www.pathagar.com

ছিল সেটিকে লাটভীয়রা বলতো কুরজেমেস কেটলস বা কুরল্যান্ড কেটলি। অন্যদিকে, জার্মানরা বলতো ফেসটাং কুরল্যান্ড বা কুরল্যান্ড দুর্গ। আর্মি গ্রুপ কুরল্যান্ড বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াইয়ে ছিল অপরাজিত। ৮ মে'তেও তাদের পতন ঘটেনি। কিন্তু নিয়তি তাদের শেষ হাসি হাসতে দেয়নি। অনিবার্য পরিণতি তাদেরকে মেনে নিতে হয়েছে।

অন্যদিকে, আদর্শগত দুশমন হলেও অভিন্ন শত্রু নাৎসী জার্মানদের বিরুদ্ধে রুশ ও মার্কিনীরা একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল সোভিয়েত ও মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে সংযোগ হলে তারা জার্মানীকে দু'টি অংশে বিভক্ত করে ফেলে। ইউএস ফার্স্ট আর্মির ৬৯ তম ডিভিশনের ইউনিটগুলো এলবি নদীর তীরে তোরগাউয়ে সোভিয়েত ফিফথ গার্ড আর্মির ৫৮ তম গার্ড ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে, কার্ল ডোয়েনিৎস জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তার সরকারকে মিত্রশক্তি স্বীকৃতি না দিলেও তাকে কাজ চালিয়ে যেতে দেয়া হয়। বৃটিশ ও আমেরিকানরা জার্মানীর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ডোয়েনিটসকে কাজ চালিয়ে যেতে দিতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, সোভিয়েত ও ফরাসীদের তর সইছিল না। তাদের চাপে ২৩ মে ফ্লেন্সবার্গে এ সরকারের সদস্যদের আটক ও গ্রেফতার করা হলে ডোয়েনিটস সরকারের পতন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্স- এ চতুষ্টয় শক্তি একটি দলিলে সই করে। তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তি বলে জার্মানী শাসনে এ্যালায়েড কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হয়। ৫ জুন বার্লিনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয়, 'এত দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক, বৃটেন এবং অস্থায়ী ফরাসী সরকার জার্মান সরকার ও হাই কমান্ডের সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করছে।'

যুদ্ধের শেষ মাসগুলোয় মিত্র সৈন্যরা বেশ কয়েকটি বন্দী শিবির উদ্ঘাটন করে। বন্দীদের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাছাড়া, জিপসি, স্লাভ, ক্যাথলিক ও সমকামীরাও ছিল। ১৯৪৫ সালের মে ও জুনে পশ্চিমা মিত্রশক্তি অস্ট্রিয়ায় হাজার হাজার রুশ যুগোস্লাভ শরণার্থীকে আটক করে। পরে তাদেরকে নিজ নিজ দেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ায় প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড নয়তো নির্বাসনে পাঠানো হয়। একইভাবে পরাজিত ফিনল্যান্ড ও নিরপেক্ষ সুইডেন ইনিগ্রিয়ান এ বাল্টিক শরণার্থীদের প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শরণার্থীদের অনেকেই প্রত্যর্পণের আগে আত্মহত্যা করে।

যুদ্ধ ও শান্তি কোনো অবস্থাই জার্মানদের জন্য সুখকর ছিল না। মিত্রশক্তি জার্মানীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পরও তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং তাদের দুর্দশা সকল সীমা অতিক্রম করে। বার্লিনে সোভিয়েত সৈন্যদের হাতে অসংখ্য জার্মান নারী ও কিশোরী ধর্ষিত হয়। ফলে মহিলাদের মাঝে ব্যাপক হারে যৌন রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত হেফাজতে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য পঙ্গপালের মতো মারা যায়। যুদ্ধকালে জার্মানীতে মিত্রবাহিনী নির্মমভাবে কার্পেট বোমাবর্ষণ করায় ৬০ লাখ বেসামরিক লোক নিহত ও আরো ৯০ লাখ আহত হয়। ৫০ লাখের বেশী জার্মান সৈন্য নিহত হলে ১০ লক্ষাধিক মহিলা বিধবা হয়। কত শিশু পিতৃহারা ও এতিম হয়েছিল

www.pathagar.com

তার কোনো লেখাজোখা নেই। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় পুরুষ পিছু বিবাহযোগ্যা মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় দু'জন। যুদ্ধকালে ৭০ লাখ জার্মান গৃহহীন হয়ে পড়ে। পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডগুলোয় বসবাসকারী সংখ্যালঘু জার্মানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বহিষ্কারের খড়গ নেমে আসে। এ অঞ্চল থেকে ১ কোটি ২০ লাখ লোককে উৎখাত করা হয়। এসময় ৫ লক্ষাধিক জার্মান হয় মারা যায় নয়তো তাদের হত্যা করা হয়। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিকভাবে মৃত্যু ঘটলেও সে অবস্থাকে বলা হচ্ছিল, এটি নাকি নাৎসীদের হাত থেকে জার্মানদের মুক্তি। হলোকাস্ট যুদ্ধের আগে নয়, পরেই ঘটেছিল। আর তার শিকার হয়েছিল, পরাজিত জার্মানী। অথচ আজকের বিশ্ব এ সত্য বেমালুম চেপে যাচ্ছে।

মিত্রশক্তির মধ্যে ইতিপূর্বে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জার্মানীর থার্ড রাইখকে বিভক্ত করা হয়। পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পূর্ব প্রুশিয়াকে ভাগাভাগি করা হয়। ওডার নদীর পূর্ব তীরে অন্যান্য জার্মান ভূখণ্ড পোল্যান্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বার্লিন বাদে জার্মানীকে ৪ টি অংশে বিভক্ত করা হয়। ১৯৩৮ সালে থার্ড রাইখের অংশে পরিণত অস্ট্রিয়ার মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয় এবং দেশটিকে একইভাবে বিভক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল পূর্ব জার্মানী বা জিডিআর-এ পরিণত হয়। একই বছর পশ্চিমা মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন বাদবাকি তিনটি অঞ্চল মিলে গঠিত হয় পশ্চিম জার্মানী বা এফআরজি। ৪ টি সেক্টরে বিভক্ত বার্লিন ১৯৯০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর নাগাদ আনুষ্ঠানিক সামরিক দখলদারিত্বের আওতায় ছিল। সে বছর জার্মান সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী চতুষ্টয় শক্তি ও উভয় জার্মানী একটি চুক্তি করে। এ চুক্তির ফলে ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৯১ সালের ১৫ মার্চ ঐক্যবদ্ধ জার্মানী আবার পুরোপুরি সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়। একই বছর জার্মানী বিদ্যমান সীমান্ত মেনে নিয়ে পোল্যান্ডের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

www.pathagar.com

বার্লিনে হিটলারের বাংকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক জার্মানীর চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার নিজের নিরাপত্তাকে বরাবরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তিনি জানতেন যে, মৃত্যু তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। এ উদ্বেগ থেকে তিনি সুরক্ষিত বাংকারে অবস্থান করতেন। প্রথমে বসবাস করতেন পূর্ব প্রুশিয়ার রাসটেনবার্গে 'উলফ লেয়ার'-এ। ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই এখানে তাকে হত্যার একটি ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি তার ঘাঁটি পরিবর্তন করেন। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হলে তিনি বার্লিনে ভূগর্ভস্থ বাংকারে এসে আশ্রয় নেন। ১৬ জানুয়ারী মাটির নীচে ১৫ মিটার গভীরে এ বাংকারে প্রবেশ করার পর মৃত্যু পর্যন্ত একদিনের জন্যও তিনি বাইরের পৃথিবীর সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখেননি।

রাইখ চ্যান্সেলারীর উত্তর-পূর্ব কোণে এ কমপ্লেক্স ছিল। দু'দিকে দু'টি স্তরে ছিল ৩০টি কক্ষ। নির্গমন পথের সাহায্যে মূল ভবনের সঙ্গে বাংকারের যোগাযোগ ছিল। চ্যান্সেলারীর বাগানের সঙ্গে ছিল আরেকটি জরুরী নিগর্মন পথ। দু'টি ধাপে এ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে নির্মাণ করা হয় প্রথম অংশ এবং ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় অংশ। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বার্লিনে ব্যাপক ভূগর্ভস্থ স্থাপনা নির্মাণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ বাংকার তৈরি করা হয়। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল হোচটিয়েফ কোম্পানী। এ কোম্পানী নির্মাণ করে বাংকারের দ্বিতীয় অংশ। হিটলার বসবাস করতেন পরবর্তীতে নির্মিত দ্বিতীয় অংশে।

বাংকারে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন, ঘুমাতেন, দৈনন্দিন সামরিক ব্রীফিং গ্রহণ করতেন। এখানেই তিনি ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। নাৎসী প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলস সপরিবারে হিটলারের সঙ্গে বসবাস করার জন্য বাংকারে আশ্রয় নেন। দুই থেকে তিন ডজন চিকিৎসক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাও বাংকারে এসে উঠেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্টিন বোরম্যান, হিটলারের একান্ত সচিব ট্রাউডল জাংঙ্গিসহ অন্যান্য সচিব, ইরনা ফ্লাজেল নামে একজন সেবিকা ও সামরিক টেলিফোন অপারেটর রোকাস মিশ।

বাংকারে খাদ্য ও অত্যাবশকীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ছিল প্রচুর। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের চূড়ান্ত দিনগুলোতে বিরামহীন শেলিংয়ের মুখে বাংকারটি অক্ষত ছিল। অনেকে সেখানকার বাতাস চলাচল ব্যবস্থায় সার্বক্ষণিক গুন গুন শব্দ শুনতে পেয়েছেন বলে স্বীকার করেন। রুশ সৈন্যরা বার্লিন পুরোপুরি ঘেরাও করে ফেলার আগে ২২-২৩ এপ্রিল অধিকাংশ স্টাফ রুশদের অবরোধ ভেঙ্গে পলায়ন করে। তবে হিটলার শেষ পরিণতি পর্যন্ত অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। ৩০ এপ্রিল তিনি ইভা ব্রাউনকে নিয়ে

www.pathagar.com

আত্মহত্যা করেন। পরদিন গোয়েবলস তার সন্তানদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে অবশিষ্টরা বাংকার ত্যাগ করে। এ সময় অবরোধকারী রুশ সৈন্যরা ছিল বাংকার থেকে এক কিংবা দুই মাইল দূরে। খুব স্বল্পসংখ্যক লোক বাংকার কমপ্লেক্সে ছিল। ২ মে রুশ সৈন্যরা তাদের আটক করে। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টরা কমপ্লেক্সে অনুসন্ধান চালিয়ে ভস্মীভূত কিছু কাগজ ও দলিলপত্রসহ এক ডজনের বেশী লাশ খুঁজে পায়। ১৯৪৫ সালে রুশ সৈন্যরা রাইখ চ্যান্সেলারীর বেশীর ভাগ জায়গা গুঁড়িয়ে দেয়। একই সময়ে বাংকারের অংশবিশেষ প্লাবিত হয়। হিটলারের ভবনের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে সোভিয়েতরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিস্মম্ভ নির্মাণ করে। ১৯৪৭ সালে সোভিয়েতরা এ বাংকার উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তবে এতে বাংকারের পৃথকীকরণ দেয়াল ছাড়া আর কিছু ধ্বংস হয়নি। ১৯৫৯ সালে পূর্ব জার্মান সরকার একইভাবে বাংকারটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের চেষ্টাও সফল হয়নি। ১৯৮৮-৮৯ সালে এ জায়গায় আবাসিক স্থাপনা ও অন্যান্য ভবন নির্মাণকালে পুরনো বাংকারের ভূগর্ভস্থ কয়েকটি অংশ উদ্ঘাটিত হয় এবং বেশীর ভাগ ধ্বংস করে ফেলা হয়।

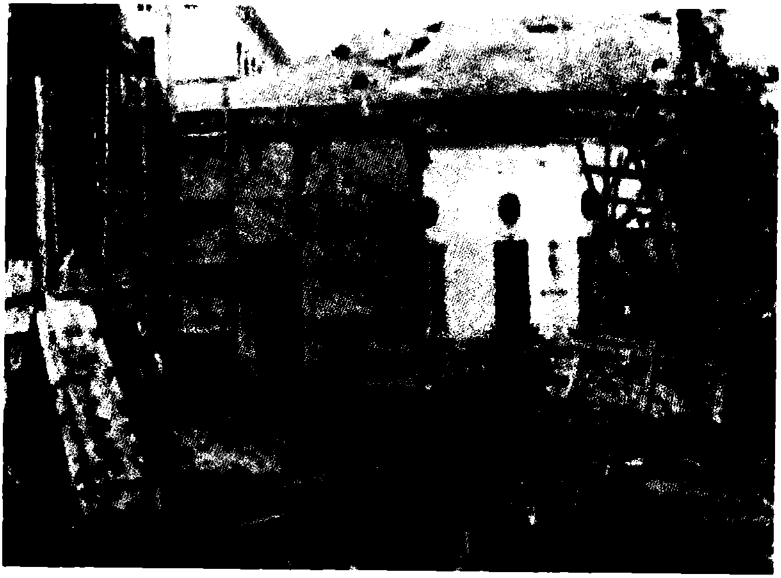

বার্লিনে হিটলারের বিধ্বস্ত বাংকারের উপরিভাগের কিয়দংশ

রাজধানী বার্লিনে হিটলারের গোপন আশ্রয়স্থল 'ফুয়েরারবাংকার' হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি ছিল তখন তার সদর দপ্তর। অত্যন্ত সুরক্ষিত ৫৫ ফুট মাটির নীচে ৪ মিটার কংক্রীটের আস্তরণ সম্বলিত ৩ হাজার বর্গফুট বিস্তৃত ফুয়েরারবাংকার এখনো মাটির নীচে আছে। যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হওয়ায় কত ওলট-পালট হয়! জার্মানী বিভক্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে পূর্ব জার্মান ডেমোক্রেটিক প্রজাতন্ত্র বা জিডিআর নামে একটি নতুন দেশ আত্মপ্রকাশ করে। জিডিআর সরকার হিটলারের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে রুশ প্রভুদের মন জয় করার চেষ্টা করায় ফুয়েরার বাংকার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে হিটলারের স্মৃতি বিজড়িত এ বাংকার সংরক্ষণের দাবি জোরদার হতে থাকে। হিটলারের জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল ফুয়েরার বাংকার কোনো রূপকথা না হলেও আজ রূপ কথার মতোই মনে হয়। আজকের বার্লিন নগরীর ঠিক কোন্ জায়গায় হিটলারের বাংকার ছিল একথা কারো পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকগণ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাবি করছেন যে, ৭৭, উইলহেমস্ট্রাসির অদূরে ভোসস্ট্রাসির কাছাকাছি এক সময়ের গোয়েরিংস্ট্রাসি'র (বর্তমান এ্যালবার্টস্ট্রাসি) কোথাও হিটলারের বাংকার ছিল। নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল উইলহেমস্ট্রাসিতে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে বাংকারের একটি সিঁড়ি ছিল। রাইখ চ্যান্সেলারীর বাগানের নীচে ছিল হিটলারের বাংকার। রুশ সৈন্যরা উচ্চ বিস্ফোরক দিয়ে রাইখ চ্যান্সেলারী গুঁড়িয়ে দেয়। রুশ গোলায় বাংকারের উপরে হিটলারের অফিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অধিকাংশ সরকারী ভবন ছিল উইলহেম স্ট্রাসি বা স্ট্রীটে। রাইখ চ্যান্সেলারীতে ভূগর্ভস্থ কয়েকটি রাস্তা ছিল। তাছাড়া, আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংকারও ছিল। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ চ্যান্সেলারীর বাগানে যেখানে পুড়িয়ে ফেলা হয় সেখানে এখন শিশুদের খেলার মাঠ। হিটলার ও ইভা ব্রাউনের লাশ পোড়ানো হয়েছিল বাংকারের একটি প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে। ইমারজেন্সী এক্সিট বা জরুরী নির্গমন পথের উপর নির্মাণ করা হয়েছে গাড়ী-পার্কিং।

এক দশক পরে গৃহীত ছবিতে বাংকারের নির্গমন পিলবক্স ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার অক্ষত দেখা গেছে। বহুদিন পর্যন্ত এগুলো সরানো হয়নি। ১৯৬১-৮৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিমারা বার্লিন দেয়ালের ওপাশ থেকে জায়গাটি দেখতে পেতো। ১৯৬১ সালে জিডিআর সরকার হিটলারের বাংকারের পশ্চিম প্রান্তে একটি দেয়াল নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে এ দেয়াল বার্লিন দেয়াল নামে পরিচিত হয়ে উঠে। হিটলারের চ্যান্সেলারী ভবনের মাঝ বরাবর ছিল পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীর সুরক্ষিত সীমান্ত। ব্রায়ান লাভ তার বিখ্যাত বই 'দ্য গৌস্ট অব বার্লিন'-এ মন্তব্য করেছেন, 'মার্কসীয় দর্শনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উপর জোর দেয়া হলেও ইতিহাসের মহামানবদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। তাই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মান সরকার বাংকারের অবস্থান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সকল তথ্য পূর্ব জার্মানদের কাছে গোপন রেখেছে।'

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি জিডিআর সুড়ঙ্গ পথে লোকজনের পালিয়ে যাবার আশংকায় এ গোপন এলাকায় ব্যাপক জরিপ কাজ চালায়। এ জরিপ চালানো থেকে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, এ বাংকার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং পরে তা সীল করে দেয়া হয়। বার্লিনে বৃটিশ সেক্টরের সাবেক গভর্নর টনি টিসিয়ার বিংশ শতাব্দীর এ ঐতিহাসিক নগরীর সুদৃশ্য ছবি সম্বলিত তার 'বার্লিন তখন এবং এখন' নামে বিখ্যাত বইয়ে মন্তব্য করেছেন, 'আশির দশকের মাঝামাঝি জিডিআর সরকার এ এলাকায় ভবন

www.pathagar.com

নির্মাণ করতে শুরু করলে একজন ওলন্দাজ সাংবাদিক এ প্রকল্পের মানচিত্র দেখতে চান। মানচিত্রে হিটলারের বাংকার কোথায় জানতে চাইলে ওলন্দাজ সাংবাদিককে তা চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিতে নির্মাণ প্রকৌশলীকে মোটেও বেগ পেতে হয়নি।' সরকারী ভবনগুলোর নকশা এ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংকারের আশপাশে এগুলোর ভিত নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ প্রকল্পের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়। হিটলারের বাংকারের উপরে স্টীলের সুরক্ষিত কংক্রীটের লেয়ার ধ্বংস করে যে এ রাস্তা নির্মাণ করা হয় তা বুঝা যায়। আর এ রাস্তা নির্মাণ করা হয় কোনোরূপ ঢাকঢোল না পিটিয়ে।

বার্লিন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার পর ঐক্যবদ্ধ বার্লিনবাসীদের এ স্থানটি চিহ্নিত করার আগ্রহ ছিল খুবই কম। কিন্তু বাংকারটি নিজেকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপত্য হিসেবে প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত সৈন্যরা টিএনটি এবং স্টীম রোলার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও এটি আবার ফিরে আসছে। ১৯৯০ সালে জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ উপলক্ষে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়। এ কনসার্টের প্রস্তুতিকালে শ্রমিকরা হিটলারের সাবেক চ্যান্সেলারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে নামে। চ্যান্সেলারী ভবনটি পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রমিকরা বাংকারের অজানা একটি অংশের সন্ধান পায়। তার আয়তন ছিল ১৫শ' বর্গফুট। চ্যান্সেলারীর এলিট এসএস ড্রাইভাররা এখানে বসবাস করতো। জার্মানীতে হিটলারের বাংকারকে বলা হয় 'দার ফুয়েরারবাংকার।' ড্রাইভারের জার্মান প্রতিশব্দ ফাহরার। উদ্ধারকৃত এসএস স্থাপনার নাম 'দার ফাহরারবাংকার' হওয়ায় বুঝা যায় যে, এটি ছিল এসএস ড্রাইভারদের বসবাস করার জায়গা। হিটলারের বাংকারের এ কৌতূহলোদ্দীপক অংশটি খুঁজে পাওয়ার পর তার ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়। উপদেশ বাণী সম্বলিত নীল দেয়ালের দার ফাহরারবাংকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল হেলমেট, ছুরি, মাটিতে সেঁধিয়ে যাওয়া কিছু রূপার থালাবাসন, একটি ভাঙ্গা চেয়ার ইত্যাদি। বেল্টের একটি বাকলে লেখা ছিল 'ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' দেউরিতে লেখা ছিল, 'বহু লোক আছে। তবে ভালো লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।' বাংকারের এ অংশটির সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের প্রধান প্রত্মতাত্ত্বিকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এটি সীল করে দেয়া হয়।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি বাংকারের কাছাকাছি নির্মাণ শ্রমিকরা অসাবধানতাবশতঃ মাটির নীচে চাপা পড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুটি কয়েক গোলা স্থানান্তর করতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে এবং কয়েকজন শ্রমিক নিহত হয়। এসব শ্রমিক নিহত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে বাংকার নিয়ে আবার নতুন করে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের মে মাসে বার্লিনের আঞ্চলিক পার্লামেন্ট বাংকারের অবশিষ্টাংশ ঘেরাও করে ফেলার এবং বাংকারের উপরিভাগে বুন্ডেস্রাভারের প্রতিনিধিদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালে গ্রুনেন বুন্ডনিস নামে একটি জার্মান রাজনৈতিক দল বাংকারটিকে একটি স্মৃতিসৌধ হিসেবে সংরক্ষণ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা অগ্রাহ্য করে বার্লিন পার্লামেন্ট এ সিদ্ধান্ত নেয়। বাংকার থেকে মাত্র ১শ' মিটার দূরে এসব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজনে বাংকারের অধিকাংশ প্রবেশপথ ও বাইরের অংশ ধ্বংস করে ফেলা হয়। ব্রান্ডেনবার্গ গেইটের ঠিক

www.pathagar.com

দক্ষিণে হিটলারের বাংকার আবিষ্কৃত হয়। বার্লিন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কর্মকর্তা কারিন ওয়াগনার বলেছেন, তিনি নিঃসন্দেহ যে, এটি হিটলারের বাংকার।

নব্বই দশকে দু'বার হিটলারের বাংকার পুনরায় মাটি চাপা দেয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়। একবার ১৯৯৮ সালে হলোকাস্ট স্মৃতিসৌধের জন্য নিকটবর্তী জায়গায় খনন কাজ চালাতে গিয়ে জোসেফ গোয়েবলসের বাংকার খুঁজে পাওয়ার পর এবং আবার ১৯৯৯ সালে একটি রাস্তা নির্মাণকালে। রাস্তা নির্মাণের জন্য খোঁড়াখুড়ি করতে গিয়ে শ্রমিকরা অপ্রত্যাশিতভাবে ৬ মিটার পুরু ইস্পাতের মরিচা ধরা একটি সুরক্ষিত ছাদের খানিকটা ছিদ্র করে ফেলে। এ সময় বাংকারে বসবাসকারী এক জীবিত এসএস সার্জেন্ট তখনো বার্লিনে বসবাস করতেন। এ সার্জেন্ট বাংকারটি উন্মুক্ত অবস্থায় রাখার পক্ষে মতামত দেন যাতে সারা বিশ্ব এটি দেখতে পারে। হিটলারের বাংকারের আশপাশে অথবা উপরের কিছু অংশে রাস্তা ও আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এতে বাংকারের ঠিক উপরের অংশটি স্পষ্ট ধরে পড়ে।

হিটলারের বাংকার সম্পর্কে রেকর্ড রাখা হয়েছে খুব কম। নব্বই দশকে বার্লিনে এটি ছিল পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণীয় স্থান। হিটলারের বাংকারের পাশে চৌরাস্তায় ৪ ফুট উঁচু সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে ভোস ও উইলহেম স্ট্রীট নির্দেশ করা হয়েছে। তবে বাংকার কোন্ দিকে সাইনবোর্ডে তার কোনো উল্লেখ নেই। উইলহেম স্ট্রীটের ওপারে আরেকটি সাইনবোর্ডে হিটলারের চ্যান্সেলারীর দিকনির্দেশনা থাকলেও বাংকার কোথায় তার উল্লেখ নেই। হিটলারের বাংকার দ্রুত রহস্যময়তায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ২০০৫ সালের এক বিকেলে ভোস ও উইলহেম স্ট্রীটের চৌমাথায় সমবেত পথচারীদের কাছে হিটলারের বাংকার কোন্ দিকে জানতে চাইলে যাদের বয়স ২৫ বছরের নীচে তাদের অর্ধেক অজ্ঞতা প্রকাশ করে। কয়েক জন ভাসাভাসাভাবে নির্দেশ করে। ৬০ অথবা তার চেয়ে বেশী বয়সের লোকজনের ধারণা ছিল অবশ্য খুব স্বচ্ছ।

শহর নির্দেশিকায়ও হিটলারের বাংকার চিহ্নিত করা হয়নি। যেমন- ফোডর 'সিটিপ্যাক বার্লিন', গর্ডন ম্যাকলাচনানের 'বার্লিন', জার্মান ভাষায় বার্লিন বিষয়ক 'জিও' বিশেষ সংখ্যা এমনকি 'ডরলিং কিন্ডার্সলি বার্লিন' প্রভৃতি গাইড বুকেও বাংকারের কোনো দিকনির্দেশনা নেই। 'দ্য ক্লেইন বার্লিন গেসচিচিতি' (বার্লিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস)-তে বলা হয়েছে, 'হিটলার চ্যান্সেলারীর বাংকারে গুলীতে আত্মহত্যা করেন।' কিন্তু সংযুক্ত ছবি ও ছবি পরিচিতিতে তিনি কোথায় আত্মহত্যা করেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি। এ পুস্তিকায় বরং বার্লিনে মিত্রবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। 'দ্য বার্লিন অফেন্স স্টাড' (উন্মুক্ত নগরী বার্লিন) নামে গাইড বুকে হিটলারের ভূগর্ভস্থ বাংকারের উল্লেখ রয়েছে মাত্র একবার। তবে ভোস ও উইলহেম স্ট্রীটের যে মানচিত্র রয়েছে তাতে বাংকারের অবস্থান দেখানো হয়নি। 'জার্মানী ঃ দ্য রাফ' গাইডে বিভ্রান্তিকরভাবে বলা হয়েছে যে, 'ইনফো বক্স থেকে আপনি প্রকৃত স্থানটি দেখতে পাবেন।' যেহেতু জায়গাটি চিহ্নিত করা হয়নি সেজন্য এ ধরনের দিকনির্দেশনা অর্থহীন। 'লেট আজ গো টু জার্মানী' বা চলো যাই জার্মানী নামে গাইড বুকে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে পাঠকদের কয়েকটি অনিশ্চিত স্থান সম্পর্কে সর্তক করে দিয়ে বলা হয়,

www.pathagar.com

'বাংকারের প্রকৃত জায়গাটি বর্তমানে একটি খেলার মাঠ বলে যে দাবি করা হচ্ছে তা ভুল। খেলার মাঠটি বাংকারের কয়েক শ' ফুট মাত্র।' 'দ্য লোনলি প্লানেট'-এর মানচিত্রে স্থানটি সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়। 'দ্য এন্ডার্স রাইসেল' (ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ) গাইডে আরেকটু পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, হিটলারের বাংকারটি ছিল চ্যান্সেলারীর বাগানের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে।

বার্লিনে ভূগর্ভস্থ বাংকারে মানচিত্রের দিকে চোখ রেখে হিটলার রণাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ে জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা করছেন

হিটলারের বাংকার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে ক্লাউস ডিয়েটার জার্ক নামে এক ব্যক্তির কাছে। ৪০ বছর বয়সের দিকে বার্লিনের অধিবাসী জার্কের মনে এ বাংকার সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। তিনি বহু ঐতিহাসিক নির্দশন সংগ্রহ করেছিলেন। এসব নিদর্শনের মধ্যে ছিল আলবার্ট স্পীয়ারের অভিজাত হোটেল এডলনের কার্ড। এসব অভিজাত হোটেলে থার্ড রাইখের উঁচু শ্রেণীর লোকজন আসা-যাওয়া করতেন। জার্ক নব্বই দশকে নির্মাণ শ্রমিকদের কাছ থেকে আরো ২শ' কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন। হোটেল এডলনের কার্ড এবং নির্মাণ শ্রমিকদের কাছে প্রাপ্ত কার্ড ছিল অভিন্ন। নির্মাণ শ্রমিকরা পুরনো হোটেল সংস্কার করতে গিয়ে এসব কার্ডের সন্ধান পায়। হোটেলের বোর্ডারদের বিল প্রস্তুত এবং তাদের কাছে কোনো বার্তা পাঠানোর জন্য এসব কার্ড ব্যবহার করা হতো। একজন নির্মাণ শ্রমিক হিটলারের বাংকার সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে জিডিআর সরকারের একটি জরিপ রিপোর্ট জার্কের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ১৯৯২ সালে হিটলারের বাংকারের আরেকটি অংশ উদ্ঘাটিত হলে জার্ক ভেতরে প্রবেশ করেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নীচের স্তর স্পর্শ করতে ভূগর্ভে কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে ডুব দিয়েছিলেন। সত্যি হিটলারের বাংকার ছিল জার্কের কাছে শখের চেয়ে

বেশী। তিনি ১০ বছর হিটলারের চ্যান্সেলারীর আশপাশে ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি হোটেল এডলনের যে কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন তা নিয়ে জার্মানীর বহুল প্রচারিত দৈনিক 'দ্য ফ্রাংকফার্টার এ্যালিজেমেইন জেইটাং- এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জার্ক আশংকা প্রকাশ করছিলেন যে, তার নাতি যদি জানতে চায় যে, বার্লিনে নাৎসীদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোন্‌টি- তাহলে দেখানোর মতো কিছু থাকবে না। তিনি হিটলারের বাংকার খুলে দেয়ার এবং এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোর একটি রেকর্ড তৈরির স্বপ্ন দেখছিলেন। জার্ক তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বই প্রকাশের চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি মনে করেন, পুরো বিষয়টি একটি নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, শহরের রিয়েল এস্টেট মার্কেটের মাঝামাঝি দক্ষিণে ছিল হিটলারের চ্যান্সেলারী ভবন।

জার্ক হিটলারের বাংকার সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। তার মতো আরো অনেকেই এ দাবি করেছেন। কিন্তু কারো দাবি গ্রাহ্য করা হয়নি। বার্লিনের প্রত্নতাত্ত্বিক অফিসে বহু চিঠি ও ফ্যাক্স পাঠানো হয়। কিন্তু কোনোটির জবাব দেয়া হয়নি। এ উদাসীনতা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, কোনো নাৎসী স্থাপনা সংরক্ষণ করা হলে তা নব্য নাৎসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হতে পারে। হিউ ট্রেভার-রোপার তার 'দ্য লাস্ট ডেজ অব হিটলার' গ্রন্থে হিটলারের আত্মহত্যার সত্যিকার ঘটনা ফাঁস হলে তার অনুসারীরা উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে বলে রুশদের ভীতি উল্লেখ করে প্রশ্ন রেখেছেন, 'একটি সত্যিকার তীর্থস্থানের অনিশ্চয়তা কি তার ভক্ত-অনুরাগীদের আরেকটি ভুয়া তীর্থস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা থেকে বিরত রাখতে পারবে?' হিটলারের স্মারক চিহ্ন সংরক্ষণের পক্ষপাতি কেউ নয়। ভয় একটাই- না জানি হিটলারের বিশ্ব কাঁপানো চেতনা আবার জেগে উঠে।

www.pathagar.com

হিটলারের প্রতি ইভার ভালোবাসা

আর দশটি মানুষের মতো হিটলারেরও মন ও আবেগ ছিল। ঘর বাঁধার স্বপ্নও ছিল। কিন্তু তার সাধ পূরণ হয়নি। ইভা ব্রাউনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সোভিয়েত সৈন্যরা এসে পৌঁছানোর আগে বার্লিনে 'ফুয়েরারবাংকারে' তারা দু'জন একসঙ্গে আত্মহত্যা করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। পারিবারিক আপত্তি থাকায় তারা তাদের ১৭ বছরের অন্তরঙ্গ জীবনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেননি। তবে এমন এক সময় তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন যখন মৃত্যু ছিল তাদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে। কোঁকড়ানো চুলের ইভা ছিলেন লাজুক। রাজনীতিতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। নাৎসী দলের সর্বময় কর্তা এডলফ হিটলারের ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি কখনো সরকারী কাজে প্রভাব বিস্তার করতে চাননি। নাৎসী দলের সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। বরাবরই তিনি ছিলেন শিশুর মতো সহজ সরল। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। তবে ফুয়েরার বাংকারে জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাহসী ও বাস্তববাদী এক মহিয়সী নারী।

১৯১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী মিউনিখে ইভা আন্না পাউলা ব্রাউনের জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। প্রাথমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলে ১৬ বছর বয়সে ইভা ইংরেজ সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত একটি কনভেন্টে শিক্ষা লাভ করেন। কনভেন্টে তিনি অন্যান্য বিষয়ে নম্বর পেতেন গড়পড়তা। তবে এ্যাথলেটিক্সে নৈপুন্যের পরিচয় দেন।

হিটলারের সঙ্গে ইভা ব্রাউনের মন দেয়া-নেয়ার কথা খুব কম লোকই জানতো। হিটলার ছিলেন চাপা প্রকৃতির। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত কথাগুলো কারো কাছে প্রকাশ করেননি। সারাক্ষণই তার মন রাজনীতির জটিল জগতে বিচরণ করতো। তবে বিদ্যুৎ চমকের মতো কখনো কখনো ইভা তার হৃদয়ে ছায়া ফেলতেন। পৃথিবীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক শাসকের প্রেমে পড়লেও ইভা ছিলেন নিরুত্তাপ। তিনি ছিলেন মুখচোরা। তাকে প্রকাশ্যে খুব কমই দেখা যেতো। হিটলার চাইতেন না যে, তাদের সম্পর্কের উপাখ্যান জানাজানি হোক। তিনি মনে করতেন, বিয়ে না করা কোনো মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে জার্মান মহিলাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। এজন্য উভয়ের মৃত্যুর আগে কেউ তাদের রোমান্টিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না।

'ইনসাইড দ্য থার্ড রাইখ' গ্রন্থে নাৎসী জার্মানীর সমরমন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার হিটলার ও ইভা ব্রাউনের সম্পর্ক নিয়ে এক মন্তব্যে লিখেছেন,' দলের পুরনো সহকর্মীরা

www.pathagar.com

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে ইভাকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হতো। তবে কেবিনেট মন্ত্রী পর্যায়ে থার্ড রাইখের কোনো কর্মকর্তা সাক্ষাৎ করতে এলে টেবিল থেকে তিনি উধাও হয়ে যেতেন।' স্পীয়ার আরো লিখেছেন, 'হিটলার ইভাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কঠোর গণ্ডির মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। আমি কখনো কখনো তার কক্ষে যেতাম। তার কক্ষ ছিল হিটলারের শয়নকক্ষের পাশে। তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন, সামান্য হাঁটাহাঁটি করার জন্যও তিনি কক্ষের বাইরে যেতেন না। ধীরে ধীরে আমি এ অসুখী মহিলার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি।'

১৯২৯ সালে হিটলারের সঙ্গে নাৎসী দলের বেতনভুক ফটোগ্রাফার হেইনরিচ হফনারের একজন ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইভার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। হফনারই তাকে হিটলারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে ইভা হিটলারের পকেটে একটি প্রেমপত্র ঢুকিয়ে ফেলেন। হিটলার ইভা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন নিজের ছদ্মনাম 'হের উলফ' নামে। ১৯২০-এর দশকে নিরাপত্তাজনিত কারণে হিটলার তার আসল নাম বদলে ফেলে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দেখাতেই হিটলারের পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হন ইভা। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। ইভা তার বন্ধু মহলে বলে বেড়াতেন যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন এমন এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে যিনি মাথায় ফেল্ট হ্যাট পরেন এবং যার রয়েছে অদ্ভুত গোঁফ।

হিটলার ও ইভা উভয়ের পরিবার ছিল তাদের সম্পর্কের ঘোরতর বিরোধী। তাই তারা তাদের সম্পর্কের কথা গোপন রাখেন। রাজনৈতিক ও নৈতিক কারণে তাদের সম্পর্কের প্রতি ছিল ইভার পিতার আপত্তি। অন্যদিকে, হিটলারের বৈমাত্রেয় বোন এঞ্জেলা রাউবল ইভাকে সমাজের একজন নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৩১ সালে এঞ্জেলার কন্যা গেলি রাউবলের আত্মহত্যার পর ইভার সঙ্গে হিটলারের ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে থাকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মামা হিটলারের সঙ্গে ইভার সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলি আত্মহত্যা করেন। আবার অন্যরা বলছেন যে, হিটলারই গেলিকে হত্যা করিয়েছেন। কোনো কোনো সূত্র দাবি করছে যে, সৎ বোন এঞ্জেলার মেয়ে গেলির সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক ছিল।

ইভার সঙ্গে দীর্ঘদিন মন দেয়া-নেয়ার পর ১৯৪০ সালে হিটলার তার ঘনিষ্ঠজনদের বিষয়টি জানান। তখন থেকেই ইভা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করতে থাকেন। হিটলার ও ইভাকে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেও দেখা যেতো। তবে দেখে বুঝার উপায় ছিল না যে, একজন আরেক জনকে চেনেন। প্রথম পরিচয়ের পর দু'বছর পর্যন্ত হিটলার ও ইভার সম্পর্ক কেমন ছিল, এসময় তাদের আদৌ দেখা হতো কিনা তা জানা যায়নি। ১৯৩২ সাল থেকে ইভা আমৃত্যু হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পূর্ব প্রুশিয়ায় ওবারসালজবার্গে বারঘোফে হিটলারের অবকাশযাপন কেন্দ্রে উঠেন। পরে সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেখান থেকে তিনি বার্লিনে হিটলারের বাংকারে গিয়ে উঠেন। কিন্তু কখনো তিনি বাইরের কারো সামনে আসেননি। বাইরে থেকে কেউ এলে হিটলার তাকে তার একান্ত কক্ষে পাঠিয়ে দিতেন। কেউ তার জীবনে এসেছে-এ কথা তিনি

www.pathagar.com

সরাসরি স্বীকার না করলেও আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ না করে থাকতে পারতেন না। তাকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে, 'একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির বরাবরই উচিত একজন নির্বোধ ও সেকেলে মহিলাকে পছন্দ করা।' কোনো কোনো সময় ইভার সামনেও তিনি এ উক্তি করতেন। নিজের প্রতি হিটলারের এ অসম্মানজনক ধারণা সত্ত্বেও তিনি তাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতেন। হিটলারকে তিনি কৌতুক করে জার্মান ভাষায় 'উলফ' (Wulf) অর্থাৎ বাঘ বলে আখ্যায়িত করতেন।

এডলফ হিটলারের প্রেয়সী ও জীবনের শেষ মুহূর্তের সহধর্মিনী ইভা ব্রাউন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলো ইভার কেটেছে আলস্যে ও অবসরে। এসময় তিনি ব্যায়াম করে ও রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতেন। হিটলারের ইনার সার্কেলের সঙ্গে তার বৈঠকের আয়োজনে সহায়তা করতেন। নগ্নস্নানের প্রতি তার আসক্তির কথা শুনে হিটলার ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ছবি তোলার প্রতি ছিল ইভা ব্রাউনের প্রচণ্ড আগ্রহ। ঘনিষ্ঠজনরা তাকে 'রোলেইফ্লেক্স বালিকা' বলে সম্বোধন করতো। রোলেইফ্লেক্স ছিল তখনকার দিনে একটি জনপ্রিয় ক্যামেরার নাম। ইভা ব্রাউন ছবি তুলে নিজেই ডার্করুম প্রসেসিং সম্পন্ন করতেন। পরবর্তীকালে হিটলারের যেসব স্থির ও মুভি ছবি উদ্ধার করা হয় সেগুলোর বেশীর ভাগই ইভার হাতে তোলা।

১৯৪৩ সালে ইভার বোন গ্রেটলের সঙ্গে হিটলারের সহযোগী হারমেন ফেজেলিয়ানের বিয়ে হয়। লেঃ জেনারেল ফেজেলিয়ান ছিলেন জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল হেইনরিচ হিমলারের লিয়াজোঁ অফিসার। সরকারী অনুষ্ঠানে ইভাকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দানে হিটলার এ বিয়েকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে অন্য এক মহিলাকে নিয়ে সুইডেন পালিয়ে

www.pathagar.com

যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফেজেলিয়ান ধরা পড়েন। এ অপরাধের জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। ইভা ব্রাউন ইচ্ছা করে তার ভগ্নিপতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসেননি।

১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলার এক হত্যা চেষ্টা থেকে রক্ষা পান। তার প্রাণনাশের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে ইভা ভীষণ কষ্ট পান। তিনি তার কাছে আবেগময় ভাষায় একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি বলেন, 'আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি শুধু জীবনে নয়, মরণেও আপনাকে অনুসরণ করবো। আমি শুধু আপনার ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে আছি।' এ চিঠিতে হিটলারের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেটা তার প্রথম ইচ্ছা ছিল না। তার আগে আরো দু'বার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ইভা ব্রাউন কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। তবে অনুমান করা হয় যে,অভিনেত্রী রেনেট মুলারের মতো সুন্দরী নারীদের সঙ্গে হিটলারের দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকায় অভিমানে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ইভা চাইতেন হিটলার তাকে সময় দিক। কিন্তু তিনি তার প্রতি মনযোগ না দিয়ে রাজনীতিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় ইভা ব্যথিত হন। যন্ত্রণা সইতে না পেরে তিনি ১৯৩২ সালে নিজেকে নিজেই গুলী করেন। অল্পের জন্য রক্ষা পান। তার ৩ বছর তিনি অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ইভা তার প্রেমকে এভাবে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করলেও হিটলার তা করতে পারেননি। তবে তিনি তার নিজের মতো করে ইভাকে ভালোবাসতেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করায় ইভার প্রতি হিটলার আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মিউনিখের শহরতলী ওয়াসারবারগারস্ট্রাসিতে তাকে একটি ভিলা ক্রয় করে দেন। আরো দেন একটি মার্সিডিজ ও গাড়ী চালক। বিরাট ভিলায় ইভা ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাই হিটলার তার কোনো আত্মীয়কে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। এ পরামর্শে তিনি তার আপন খালাতো বোন গার্ট্রুড ওয়াইসেকারকে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন। ওয়াইসেকার ছিলেন বয়সে ইভার চেয়ে ১২ বছরের ছোট। বয়সের ব্যবধান তাদের ঘনিষ্ঠতায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। বয়ঃসন্ধিকালে ওয়াইসেকারকে প্রথম ব্রা পরতে দিয়েছিলেন ইভাই। ১৯৪৪ সালে ট্রেনে চেপে মিউনিখে এসে পৌছুলে শুধু ইভা নয়, দু'জন এসএস অফিসারও ওয়াইসেকারকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ভিলায় এসে পৌছানো মাত্র ইভা তাকে তার জুতো পরিবর্তন করতে বলেন। এ সময় একজন গৃহ ভৃত্য একটি ঝুড়িতে ইভার নানা ডিজাইনের জুতো নিয়ে এসে হাজির হয়। জার্মান থার্ড রাইখে মহিলাদের ধূমপান, মদ্যপান ও প্রসাধনী ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। ইভা ব্রাউন ও ওয়াইসেকার দু'জনই এ তিনটি নিষিদ্ধ কাজ করতেন।

ওয়াইসেকার হিটলারের টি হাউসে একটি রেডিও খুঁজে পান। তিনি গোপনে নিয়মিত জার্মান ভাষায় রেডিওতে বিবিসি প্রচারিত সংবাদ শুনে তা ইভাকে অবহিত করতেন। বিবিসি প্রচারিত সংবাদ শুনে ইভা বুঝতে পারেন যে, জার্মানী যুদ্ধে হেরে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। এদিকে, ইভার ভিলায়ও মিত্রবাহিনীর বোমা পড়ে। এতে তিনি ভয় পেয়ে যান। ভয়ে তিনি তার কিছু অলংকার ওয়াইসেকারকে দিয়ে দেন। কেন জানি তার মনে হতো তার অলংকার পরার প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রতি দু'দিন অন্তর হিটলার ইভা ব্রাউনকে টেলিফোন করতেন। সময় মতো টেলিফোন না এলে তিনি ছটফট করতেন। মনে হতো যেন হিটলারের কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়াটাই তার কাছে সবকিছু।

১৯৩৮ সালের ২ মে হিটলার যে উইল করেন তাতে সে কথা প্রকাশ পায়। তিনি তার উইলে যাদের নাম উল্লেখ করেন তাদের শীর্ষে ছিল প্রেয়সী ইভার নাম। হিটলার তার উইলে বলেছিলেন, কোনো কারণে তার মৃত্যু হলে ইভা আমৃত্যু বছরে ৬ শ' বৃটিশ পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ সহায়তা পাবেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ইভা হিটলারের চরম দুঃসময়ে বার্লিনে ফুয়েরার বাংকারে এসে উঠেন। হিটলার তাকে বাংকার ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ নির্দেশ অমান্য করে বলেছিলেন, হিটলারের প্রতি পৃথিবীর শেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন তিনি। ২৯ এপ্রিল হিটলার এক অনাড়ম্বর সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাকে ফ্রাউলিন ব্রাউনের পরিবর্তে ফ্রাউ হিটলার বলে সম্বোধন করতে স্টাফদের নির্দেশ দেয়া হয়। বিয়ের এক রাত পরেই সায়ানাইড পানে ইভা আত্মহত্যা করেন। শত্রুর হাতে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতি এড়িয়ে যেতে তারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। ইভা ও হিটলার দু'জনেই বিষ পান করেন। তবে হিটলার তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য ৭ দশমিক ৬৫ ক্যালিভারের ওয়ালথার পিস্তল ঠেকিয়ে নিজের কপালে গুলী করেন। রুশ সৈন্যরা পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকজন নাৎসী কর্মকর্তা তাদের স্যুটে প্রবেশ করেন। সেখানে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হিটলারের ইচ্ছানুযায়ী তার ও ইভার লাশ গ্যাসোলিন দিয়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। পোড়ানোর কাজ সম্পন্ন না হতে রুশ সৈন্যরা লাশের সন্ধান পেয়ে যায়। বার্লিন ত্যাগের সময় রুশ সৈন্যরা সঙ্গে করে তাদের লাশ নিয়ে যায়। লাশগুলো দিনের বেলা বহন করা হতো এবং রাতে সৈন্যরা যেখানে তাবু ফেলতো সেখানে লাশ দু'টি কবর দেয়া হতো। সাবেক পূর্ব জার্মানীর ম্যাগডেবার্গে রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে পৌঁছানো নাগাদ রুশ সৈন্যরা প্রতিদিন ভোরে হিটলার ও ইভার লাশ কবর থেকে উত্তোলন করতো। ম্যাগডেবার্গে তাদের লাশ ২৫ বছর সমাহিত ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালে হিটলার ও ইভার লাশ স্থায়ীভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরে তাদের লাশের ছাই-ভস্ম ছিটিয়ে দেয়া হয় এলবি নদীতে।

ইভা ব্রাউনের পরিবার যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সে সময় তার পিতা একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। এপ্রিলে তিনি তার পিতার কাছে কয়েক ট্রাঙ্ক বোঝাই জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইভার মা ফ্রান্সিসকা ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে ব্যাভেরিয়ার রোহপোল্ডিয়ে এক পুরনো খামার বাড়ীতে ৯৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে একটি বড়মাপের প্রেম ঝরে পড়ে। ইভা ব্রাউন হিটলারকে কতটুকু ভালোবাসতেন এবং তার প্রতি ইভার ধারণা কত উচু ছিল তা তার উক্তি থেকেই বুঝা যায়। ইভা মন্তব্য করেছিলেন, যদি এমন হয় যে, ১০ হাজার লোকের জীবনের বিনিময়ে হিটলারকে রক্ষা করা সম্ভব তাহলে তাই উত্তম। ভালোবাসা সত্যি অন্ধ! হিটলার তাকে সহমরণে যেতে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার জন্য একটি মূলধন। তিনি হিটলারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তার স্মৃতিচারণমূলক বই লিখে অঢেল অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। যেখানে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ হিটলারকে ঘৃণা করেছে, শত্রু ভেবেছে সেখানে তিনি তাকে ভেবেছেন হৃদয়ের একান্ত মানুষ হিসেবে।

www.pathagar.com

নুরেমবার্গ ট্রায়াল

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল একটি দৃষ্টান্ত। তার আগে আর কখনো কোনো আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়নি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে কেবল পরাজিত নাৎসীদের বিচার হওয়ায় এটা বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিজয়ীরা যুদ্ধের আরেকটি পক্ষ হলেও তারা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জার্মানী পরাজিত না হলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সোভিয়েতদের বিচার করা হতো মস্কোয় এবং ইংরেজদের লন্ডনে।

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার অর্থ এই ছিল না যে, ন্যায়বিচারের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে। বরং এ বিচার ছিল আরেকটি অবিচার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর সঙ্গে বিজয়ী শক্তি যে আচরণ ও অন্যায় করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও দেশটির সঙ্গে একই আচরণ করা হয়। পরাজিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানী তার প্রতি অন্যায়ের কিছুটা হলেও জবাব দিতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে জবাব দিতে পারেনি।

যে মুহূর্তে বৃটিশ বিচারক নুরেমবার্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিলেন ঠিক তখন বৃটিশ সরকার নিজেও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছিল। ভারতবর্ষ ও গ্রীসসহ দেশে দেশে তারা শক্তি প্রয়োগে স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করছিল। যুদ্ধের অন্যান্য প্রতিপক্ষের মতো বৃটিশ শিল্পপতি ও বৃহৎ পুঁজির মালিক যারা যুদ্ধে লাভবান হয়েছিলেন তারা তাদের অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা পান। বৃটিশ হিয়ারস্ট প্রেসের (সাম্রাজ্য) সঙ্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধী রোজেনার্গের সম্পর্ক এবং বৃটেনের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে পেশ করা হলে তা অগ্রাহ্য করা হয়। নুরেমবার্গ আদালত কক্ষে যখন নাৎসী জার্মানীর অনুসৃত বর্ণবাদী নীতি এবং ইহুদী নিধনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছিল তখন মার্কিনীরা ফিলিপাইনে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করছিল এবং আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় চলছিল ঠ্যাঙ্গারে আইন। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বৃটিশ ও আমেরিকানরা অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়া দখলে হিটলারকে সমর্থন দিয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করেছে। কিন্তু যখনি হিটলার তার সামরিক শক্তিকে বৃটিশ ও আমেরিকানদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখনি জার্মানীর প্রতি তারা তাদের নীতি

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে। বৃটিশ ও আমেরিকানদের চোখে হিটলারের এটাই ছিল মারাত্মক অন্যায় যে, তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। একইভাবে নাৎসীদের আগ্রাসী নীতির সমালোচনায় সোচ্চার হওয়ার সময় ফরাসীরা আলজেরিয়া ও ইন্দোচীনে আগ্রাসী শাসন অব্যাহত রেখেছিল। তারা ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের পাইকারী বহিষ্কার নীতির আওতায় ১কোটি জার্মানকে তাদের পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি করে। পূর্ব ইউরোপকে ভাগাভাগি করে নিতে স্টালিন হিটলারের সঙ্গে এ চুক্তি করেন। জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এ চুক্তি ছিল সকল জাতির স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে লেনিনের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। নুরেমবার্গ আদালতে শুনানিকালে এ সত্য প্রকাশিত হয় যে, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র ও বেসারাবিয়ায় নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যই এ চুক্তি করা হয়েছিল। স্টালিন তুরস্ককে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বৈরি হয়ে উঠতে না দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হন এবং দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধজাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দিতেও একমত হন। কিন্তু পরে তিনি বেমালুম এসব সত্য এড়িয়ে যান।

প্রথম মহাযুদ্ধে লেনিন ছিলেন গোপন কূটনীতির ঘোরতর বিরোধী। শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন হলে বলশেভিকরা তৎক্ষণাৎ জার আমলের মোহাফেজখানা খুলে দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আপত্তির মুখে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু নুরেমবার্গ আদালতে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে সোভিয়েত কৌসুলি আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'এ চুক্তিকে এ মামলার একটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ আদালত জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের তদন্ত করছে, মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রনীতি নয়।'

স্টালিন পোল্যান্ডে জার্মানীর দখলদারিত্ব মেনে নিয়েছিলেন। পোল্যান্ড অভিযানের সংবাদ পেয়ে তিনি জার্মানীকে অভিনন্দন জানিয়ে নাৎসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কাছে একটি টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন। আদালতে এ ঘটনা উত্থাপন করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে এমন কোনো তথ্য নুরেমবার্গ আদালত থেকে প্রকাশ করা হয়নি।

৩ শ' দিনব্যাপী নুরেমবার্গ আদালতে বিচারে তারাই ছিলেন বিচারক যারা ছিলেন নাৎসীদের মতোই যুদ্ধাপরাধী। বিশ্বে ভবিষ্যতে শান্তির ভিত রচনা নয়, নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্যই তারা নাৎসীদের বিচার করছিলেন। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল স্বার্থক হতো যদি অভিযুক্ত নাৎসীদের মতো অভিযোগকারী বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশ যুদ্ধাপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করা যেতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টে জড়িত নাৎসীদের দু'টি পৃথক বিচারের সাধারণ নাম নুরেমবার্গ ট্রায়াল বা নুরেমবার্গ বিচার। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত জার্মানীর

www.pathagar.com

নুরেমবার্গ শহরে নুরেমবার্গ প্যালেস অব জাস্টিসে এ বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিচারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিচার ছিল আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত বা আইএমটি'তে মূল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। এ আদালতে নাৎসী জার্মানীর ২৪ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিচার করা হয়। ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত এ বিচার চলে। আমেরিকান নুরেমবার্গ সামরিক ট্রাইব্যুনালে (এএমটি) কন্ট্রোল কাউন্সিল আইনের আওতায় অপেক্ষাকৃত লঘু যুদ্ধাপরাধীদের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচার করা হয়।

১৯৪৫ সাল নাগাদ মিত্রবাহিনীর বিজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় ইহুদীদের সমর্থক বিভিন্ন গ্রুপ ও বিদেশের মাটিতে গঠিত প্রবাসী সরকারগুলো নাৎসী জার্মানীর প্রতিশোধের আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। সহিংসতার বিস্তার রোধে জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ কমিশন (ইউএনডব্লিউসিসি) গঠন করা হয়। এ কমিশন সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা তৈরি করতে থাকে। তবে যুদ্ধ বন্দীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকায় মিত্রবাহিনী নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়।

মার্কিন অর্থমন্ত্রী হেনরি মোরগেনথু জুনিয়র জার্মানীকে পুরোপুরি নাৎসীশূন্য করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এ পরিকল্পনা মোরগেনথু পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় ভার্সাই চুক্তির অনুরূপ নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের দেশ থেকে বহিষ্কার, বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং অর্থনৈতিক শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট উভয়ে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে কুইবেক সম্মেলনে তারা এ পরিকল্পনা অনুমোদন করার চেষ্টা চালান। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দানের ঘোষণা দেয়। মোরগেনথু পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। জনগণের প্রবল আপত্তি আঁচ করতে পেরে রুজভেল্ট এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি এ পরিকল্পনায় সমর্থন আদায়ে আর অগ্রসর হননি। মোরগেনথু পরিকল্পনার অপমৃত্যু হলে নাৎসী নেতৃত্বের বিচারে অন্য একটি বিকল্প খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি স্টিমসন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন যৌথভাবে 'ইউরোপীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হলে ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। নয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দিতে থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বেশ ক'টি বৈঠকের পর নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিস্তারিত চূড়ান্ত করা হয়। ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর নুরেমবার্গ শহরে এ বিচার শুরু হবে।

১৯৪৩ সালে তেহরান, ১৯৪৫ সালে প্রথমে ইয়াল্টা ও পরে পটসড্যাম সম্মেলনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিনটি বৃহৎ শক্তি-যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দানে একমত হয়। ফ্রান্সকেও এ ট্রাইব্যুনালে স্থান দেয়া হয়। ১৯৪৫ সালের ৮আগস্ট ঘোষিত লন্ডন সনদের ভিত্তিতে এ বিচারের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লন্ডন সনদে এ বিচার ইউরোপীয় অক্ষ দেশগুলোর

www.pathagar.com

মূল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এ সনদে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করা হবে না। নুরেমবার্গে প্রায় ২শ' জার্মান যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হয় এবং বিদ্যমান সামরিক আইনে আরো ১ হাজার ৬ শ' যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়। জার্মানীর আত্মসমর্পণের দলিলে বর্ণিত শতাবলী ছিল এ আদালতের এক্তিয়ারের আইনগত ভিত্তি। আত্মসমর্পণ করায় জার্মানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ্যালায়েড কন্ট্রোল কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত হয়। জার্মানীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এ কাউন্সিল আন্তর্জাতিক ও যুদ্ধের আইন লংঘনকারীদের শাস্তি ছিল দানের ক্ষমতা। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের শাস্তিদানের ক্ষমতা এ আদালতের ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল, বৃটেনে নাৎসীদের বিচার করা হোক। তবে যে ক'টি কারণে বিচারের জন্য নুরেমবার্গকে বেছে নেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) নুরেমবার্গ ছিল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন সেক্টরে। তখন জার্মানী ছিল ৪ ভাগে বিভক্ত। (২) দ্য প্যালেস অব জাস্টিসের আয়তন ছিল সুপরিসর। তাছাড়া যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও নুরেমবার্গ ছিল অক্ষত। অন্যদিকে, দ্য প্যালেস অব জাস্টিস কমপ্লেক্সে একটি বিরাট কারাগারও ছিল। (৩) নুরেমবার্গ ছিল নাৎসী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও সমাবেশের একটি শহর। তাই এ শহরে বিচারের একটি প্রতীকী রাজনৈতিক মূল্য ছিল।

এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, বার্লিন হবে আইএমটি'র স্থায়ী আবাস এবং নুরেমবার্গে প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু দু'টি পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় পরবর্তীতে আর কোনো বিচার হয়নি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা ছিলেন জন পার্কার, ফ্রান্সিস বিডল, আলেক্সান্ডার ভোলচকোভ, আইয়োনা নিবিৎচেনকো, জিওফ্রে লরেন্স ও নরম্যান বিরকেত। নুরেমবার্গ ট্রায়ালে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন রবার্ট এইচ, জ্যাকসন (মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি), বৃটেনের পক্ষে হার্টলি শক্রুজ, সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে জেনারেল আর এ, রোডেনকো এবং ফ্রান্সের পক্ষে ফ্রাঙ্কো দ্য মেন্থন ও অগাস্টি শাম্পি টিয়ার দ্য রিবেস।

বিবাদীগণের আপীল করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া বিচারক নিয়োগে তাদের আপত্তি করাও সম্ভব ছিল না। এসব ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকায় বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তি এ ট্রাইব্যুনাল গঠনে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, বিজয়ী শক্তি বিচারক নিয়োগ করায় এ ট্রাইব্যুনাল নিরপেক্ষ ছিল না এবং প্রকৃত বিবেচনায় এটিকে আদালত হিসেবে গণ্য করা যায় না। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ,এল, গুডহার্ট লিখেছেন, 'তত্ত্বগতভাবে এসব যুক্তি শুনতে খুব শ্রুতিমধুর হলেও এতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিরোধিতাকারীরা বলছেন, এ আদালত নাকি প্রতিটি দেশের প্রশাসনিক আইনের পরিপন্থী। যদি তাই হতো তাহলে কোনো দেশে কোনো

www.pathagar.com

গুপ্তচরের বিচার করা যেতো না। গুপ্তচরের মামলা বরাবরই শত্রু দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিচারকরা নিষ্পত্তি করে থাকেন। তবে এখনো কেউ এ মামলায় নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের দাবি করেননি। তবে হ্যাঁ, বন্দীদের এ দাবি করার অধিকার রয়েছে যে, বিচারক তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন। তবে তার মানে এই নয় যে, বিচারকরা নিরপেক্ষ হবেন। লর্ড রাইট যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, এ ট্রাইব্যুনালে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা সাধারণ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ একজন সিঁধেল চোর এ দাবি করতে পারে না যে, সৎ লোকদের একটি জুরি তার বিচার করবে।'

আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল তা একেবারে অমূলক ছিল না। ১৯৩৬-৩৮ সালে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে নিয়োজিত প্রধান সোভিয়েত বিচারক নিকিৎচেনকো স্টালিনের শো ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে নুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। পূর্বে কৃত অপরাধের ভিত্তিতে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। কোনো নির্দিষ্ট দেশের নিজস্ব আইনে এসব অভিযোগ আনা হয়নি। বিবাদী পক্ষের কোনো আইনজীবী ছিল না। আদালতে একচেটিয়া ছিল বিজয়ী মিত্রশক্তির প্রতিনিধিত্ব। আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত সনদের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, এ আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণে টেকনিক্যাল রীতিনীতি মানতে বাধ্য নয়। এতে আরো বলা হয়, এ আদালত রায় দানে যতদূর সম্ভব নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও নন-টেকনিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলে যে কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে।

নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলেও মিত্রদেশগুলোর সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধের কোনো বিচার করা হয়নি। এসব যুদ্ধাপরাধের মধ্যে ছিল লাকোনিয়া ঘটনার মতো রেড ক্রসের পতাকাবাহী জার্মান জাহাজে হামলা এবং জার্মান যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রতিটি সভ্য দেশের সশস্ত্র বাহিনী তাদের আওতাধীন প্রতিটি বাহিনীকে সামরিক আচরণ বিধির আওতায় কোন্ কাজটি করা যাবে এবং কোন্ কাজটি করা যাবে না- তার একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। সামরিক আচরণ বিধির মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে তার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এবং যুদ্ধের প্রচলিত রীতিনীতি। উদাহরণস্বরূপ, অটো স্করজেনির বিচারে তার পক্ষে যুক্তি-তর্কের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ১ অক্টোবর মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ফিল্ড ম্যানুয়েল এবং দ্য আমেরিকান সোলজার্স হ্যান্ডবুক। সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্য তাদের নিজেদের সামরিক আচরণ বিধি অমান্য করলে তাকে সামরিক আদালতের মুখোমুখি হতে হবে। সামরিক আচরণ বিধি লংঘনের দায়ে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সামরিক আদালতের মুখোমুখি হওয়ার নজির রয়েছে। যেমন- বিসকারি গণহত্যার বিচারে।

১৯৪৫ সালের ১৮ অক্টোবর বার্লিনে সুপ্রীম কোর্ট ভবনে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়। সোভিয়েত বিচারক নিকিৎচেনকো প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ২৪ জন মূল যুদ্ধাপরাধী এবং ৬ টি জার্মান সংগঠন (নাৎসী পার্টির

নেতৃত্ব, এসএস, এসডি, দ্য গেস্টাপো, এসএ এবং জার্মান সেনাবাহিনীর হাই কমান্ড) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু হয়। যেসব অপরাধে অভিযোগ গঠন করা হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল (১) শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত, (২) আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা, সূচনা ও শুরু, (৩) যুদ্ধাপরাধ এবং (৪) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

যে ২৪ জনের বিচার এবং শাস্তি দেয়া হয় তারা হলেন (১) মার্টিন বোরম্যান, মৃত্যুদণ্ড। তবে তিনি বিচার চলাকালে অনুপস্থিত ছিলেন। (২) কার্ল ডোয়েনিটস, শাস্তি -১০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন জার্মান ইউ-বোট বহরের অধিনায়ক। হিটলারের মৃত্যুর পর তিনি স্বল্পকালের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। (৩) হ্যান্স ফ্রাঙ্ক, শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। বিচারকালে তিনি কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হন। (৪) উইলহেম ফ্রিক, শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। (৫) হ্যান্স ফ্রিৎজ, তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। গোয়েবলসের পরিবর্তে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। (৬) ওয়াল্টার ফাঙ্ক, শাস্তি -যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৫৭ সালের ১৬ মে স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। (৭) হেরম্যান গোয়েরিং, শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আগের দিন রাতে তিনি আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন জার্মান বিমান বাহিনী লুফটওয়াফের কমান্ডার। (৮) রুডলফ হোয়েস, শাস্তি- যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিনি ১৯৪১ সালে স্কটল্যান্ডে পালিয়ে যান। (১০) আলফ্রেড জোডল, শাস্তি– মৃত্যুদণ্ড। (১১) আর্নেস্ট কার্লটেনব্রুনার, শাস্তি–মৃত্যুদণ্ড। তিনি ছিলেন এসএস'র সর্বোচ্চ জীবিত কর্মকতা। (১২) উইলহেম কিটেল, শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। তিনি ছিলেন হিটলারের অন্যতম সহযোগী ও ফিল্ড মার্শাল। (১৩) গুস্তাভ ক্রুপ ভন বোহলেন, শাস্তি– জানা যায়নি। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে বিচারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। (১৪) রবার্ট লে, শাস্তি–জানা যায়নি। ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন। (১৫) কন্সটান্টিন ভন নিউরাথ, শাস্তি– ১৫ বছরের কারাদণ্ড। (১৬) এরিক রিডার, শাস্তি– যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৫৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি দেয়া হয়। (১৭) জোয়াসিম ভন রিবেনট্রপ, শাস্তি– মৃত। তিনি ছিলেন জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী। (১৮) আলফ্রেড রোসেনবার্গ, শাস্তি– মৃত। তিনি ছিলেন বর্ণবাদী তত্ত্বের উদগাতা। (১৯) ফ্রিৎজ সাউকেল, মৃত। (২০) হাজালমার সাচাট, শাস্তি –খালাস। (২১) বালডুর ভন সিরাচ, শাস্তি-২০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন হিটলারজুগেণ্ড নামে আধা মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধান। (২২) আর্থার সেইচ ইনকোয়াট, শাস্তি- মৃত। (২৩) আলবার্ট স্পীয়ার, শাস্তি-২০ বছরের কারাদণ্ড। তিনি ছিলেন জার্মানীর সমরমন্ত্রী। বিচার কালে তিনি অনুতপ্ত হন। (২৪) জুলিয়াস স্ট্রেইচার, শাস্তি–মৃত। তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের উস্কানিদাতা।

২৪ জন শীর্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ২১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হেরম্যান গোয়েরিং আত্মহত্যা করেন এবং মার্টিন বোরম্যন ছিলেন নিখোঁজ। ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর দণ্ডিতদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। নিম্ন ও উচ্চপদস্থ সব মিলিয়ে মোট ২৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১২৮ জনকে পাঠানো হয় কারাগারে এবং ৩৫জনকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

ব্যক্তির কোন্ কোন্ কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হবে নুরেমবার্গ বিচারের নীতিমালায় বা প্রিন্সিপলস অব নুরেমবার্গ-এ তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। বিচার প্রক্রিয়ায় এ নীতিমালা তৈরি সম্পন্ন হয়। অসুস্থ থাকায় কোনো কোনো সন্দেহভাজন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীর তাৎক্ষণিক বিচার করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তাদের বিচার করা হয়। জার্মান চিকিৎসকদের একটি টীমের মতামতের উপর ভবিষ্যতে তাদের বিচার নির্ভর করতো। এজন্য এ বিচারকে বলা হতো 'ডক্টর্স ট্রায়াল' বা চিকিৎসকদের বিচার।

সকল নাৎসী নেতার বিচার করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে অনেকেই স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জামান। শত শত নাৎসী আমেরিকায়ও পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে পালিয়ে গিয়ে পরিচয় গোপন রেখে এসব নাৎসী বসবাস করতে থাকেন। নুরেমবার্গ আদালতে বিচার শেষ হওয়ার পর অনেকের খোঁজ পাওয়া যায় এবং তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৬২ সালে পোল্যান্ডে বিচারে অসউইত বন্দী শিবিরের কমান্ড্যান্ট হেরম্যান হেসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এডলফ আইখম্যানকে আর্জেন্টিনায় খুঁজে পাওয়া যায়। একই বছর ইসরাইলে বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ নাৎসী যুদ্ধাপরাধী তাদের অপরাধ স্বীকার করেছেন। তবে একইসঙ্গে তারা একথাও বলেছেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা এসব অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে হলোকাস্টের আজগুবি গল্প

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে হলোকাস্ট বা তথাকথিত ইহুদী গণহত্যা নামে খ্যাত একটি শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ শব্দটি আর কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। গ্রীক শব্দ Holokauston থেকে ইংরেজী Holocaust শব্দটির উৎপত্তি। গ্রীক শব্দটির প্রথম অংশ Holo এর অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি এবং পরের অংশটুকু Kauston এর অর্থ হচ্ছে ঝলসানো উপঢৌকন অথবা দেবতার মনতুষ্টির জন্য পুরোপুরি ঝলসানো উপঢৌকন। প্রাচীন রোমান ও গ্রীক ধর্মীয় রীতিতে মর্ত্য এবং পরকালের দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জনে রাতে কালো রংয়ের পুরোপুরি ঝলসানো পশু উপঢৌকন দেয়া হতো। পরে তওরাতে অনুরূপ উপঢৌকন বা কোরবানী দেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। তওরাতে বলা আছে, রাষ্ট্র গঠনের জন্য ৬০ লাখ ইহুদীকে কোরবানী হতে হবে। তওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী ইহুদীরা জীবন কোরবানী দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের সামনে কখনো সে সুযোগ আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদেরকে ঈপ্সিত সুযোগ এনে দেয়। হিটলারের ইহুদী বিরোধী নীতির মধ্যে ইহুদীরা তাদের স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা দেখতে পায়। ইহুদীদের এ মানসিকতা থেকেই হলোকাস্টের জন্ম।

ঐতিহাসিক রবার্ট বি, গোল্ডম্যান লিখেছেন, হলোকাস্ট ছাড়া ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে হলোকাস্টের অনিবার্যতা সম্পর্কে গোল্ডম্যানের এ মন্তব্য খুবই যথার্থ। কথিত হলোকাস্টের জন্য জার্মানীকে দায়ী করা হয় এবং ইহুদীদের জন্য ৬ হাজার ৮শ' কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। ক্ষতিপূরণের এ অর্থ দিয়েই ইহুদীরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে নিজেদের জন্য রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়। তাছাড়া তারা পাশ্চাত্যের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সহানুভূতি ও সমর্থন লাভেও সফল হয়। কথিত হলোকাস্ট রোধে ব্যর্থতার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। এ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পরবর্তী কয়েক দশকে মার্কিন সরকার ইহুদীদের ৩ লাখ কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে।

হলোকাস্টে কত লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ইহুদী ও তাদের সমর্থকরা জোর গলায় দাবি করছে যে, ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে। হলোকাস্টের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবির। এখানে নাকি ৪০ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়। অন্যায়ভাবে একজন ইহুদীকে হত্যা করা হয়ে থাকলেও তা নিন্দনীয় এবং কোনো যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু একদল ইহুদী রয়েছে যারা এ সংখ্যাকে বেদবাক্য জ্ঞান করে। ৬০ লাখ ইহুদী নিহত হওয়ার

www.pathagar.com

ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকে হিটলারের দালাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। শুধু তাই নয়, সন্দেহ পোষণকারীদের উপর হামলাও হয়। একটি চরমপন্থী ইহুদী গ্রুপ এসব হামলা চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৬০ লাখ নয়, ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা গেছে। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ইহুদীদের মতো অন্যান্য ধর্মের লোকও ছিল। এসব লোক অনাহার ও রোগব্যাধিতে মারা যায়। গ্যাস চেম্বারে বন্দী ইহুদীদের ঢুকিয়ে হত্যা করার দাবি ছিল আষাঢ়ে গল্প। গ্যাস চেম্বার বলতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশে জার্মানদের পরিত্যক্ত অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হয়। নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই স্টালিন এ চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসউইচসহ অন্যান্য জার্মান বন্দী শিবিরে লোকজন অনাহারে মারা যায়।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের রিপোর্ট তার জাজ্বল্য প্রমাণ। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, হলোকাস্টে কথিত নিহত ইহুদীদের সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে বাড়িয়ে বলা হয়। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলোর সহানুভূতি আকর্ষণে হলোকাস্টে নিহতদের সংখ্যা বাড়িয়ে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে ১৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে কোনো সূত্র বা উৎসের উল্লেখ না করে বলা হয়, পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়। কয়েক দশক পর্যন্ত কেউ এ সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। কিন্তু ১৯৯৫ সালে অসউইচ মুক্ত হওয়ার ৫০তম বার্ষিকীতে খোদ নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত দু'টি পৃথক রিপোর্টে বলা হয়, পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ নয়, ১০ লাখ কিংবা তার চেয়ে কম লোক নিহত হয়। অবশ্য সর্বপ্রথম ৯০ লাখ ইহুদী নিহত হওয়ার দাবি করা হয়েছিল। এ সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। ইংরেজ লেখক ভিভিয়ান বার্ড 'অসউইচঃ দ্য ফাইনাল কাউন্ট' নামে ১০৯ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অসউইচে ৯০ লাখ নয়, ৭৩ হাজার ১৩৭ জন বন্দী শ্রমিক মারা গেছে। মৃতদের মধ্যে ইহুদী ছিল ৩৮ হাজার ৩১ জন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক ঘটনার মতো হলোকাস্টে ইহুদীদের কথিত গণহত্যার ঘটনাও গভীর রহস্যময়। সত্যি কি হলোকাস্ট বলে কোনো ঘটনা ঘটেছিল? এ প্রশ্নে অনেক ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখক ঘুরপাক খেয়েছেন। সত্যের নাগাল পাওয়ার জন্য তারা অক্লান্তভাবে গবেষণা করেছেন। তাদের একজন হলেন রিচার্ড হার্ডউড। মার্কিন ঐতিহাসিক ও গবেষক রিচার্ড হার্ডউড সমকালীন বই-পুস্তক, ঐতিহাসিক প্রমাণ, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও নুরেমবার্গ আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রভৃতির ভিত্তিতে একটি বই লিখেছেন। তার বইয়ের নাম হচ্ছে Did six million really die? অর্থাৎ সত্যি কি ৬০ লাখ নিহত হয়েছিল? ১৯৯৯ সালের ২৫ এপ্রিল জুন্ডেলসাইট জাগ্রাম নামে একটি ওয়েব সাইটে তার বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

হার্ডউড তার আলোচিত বইয়ে উল্লেখ করেছেন, হলোকাস্টে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। তিনি তার বইয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, হিটলার কোনো ইহুদীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একই কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক আর্নো মেয়ার। মেয়ার তার Why did Heaven's not darken? অর্থাৎ 'স্বর্গ কেন অন্ধকার হয়নি?' শিরোনামে এক বইয়ে বলেছেন, গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ সঠিক নয় এবং এ ধরনের অভিযোগ গ্রহণযোগ্যও নয়। তিনি বলেছেন, অসউইচসসহ অন্যান্য শ্রম শিবিরে মৃত্যুবরণকারীদের অধিকাংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ১৯৯৮ সালে গ্যাস চেম্বার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ফ্রেড এ, লিউচটার প্রণীত রিপোর্টে প্রমাণ করা হয়েছে যে, অসউইচে এ যাবৎকাল গ্যাস চেম্বার হিসাবে যা প্রদর্শন করা হচ্ছে সে ধরনের গ্যাস চেম্বার কখনো সেখানে ছিল না এবং এ ধরনের গ্যাস চেম্বার কখনো ব্যবহার করা হয়নি।

ইহুদীদের মৃতদেহ দিয়ে জার্মানরা স্যাপ তৈরি করেছিল বলে যে অভিযোগ করা হয় তা ছিল একটি যুদ্ধকালীন প্রচারণা মাত্র। ইসরাইলের অধিকাংশ ইহুদী ঐতিহাসিক এ ধরনের ঘটনাকে অবাস্তব বলে স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রম শিবিরের আশপাশে উন্নতমানের সিনথেটিক রাবার, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনকারী নাৎসী জার্মানীর ৪০টি বৃহত্তম ও অত্যাধুনিক শিল্প কারখানাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়ে সেখানে কখনো মিত্রবাহিনী বোমাবর্ষণ করেনি। কেন মিত্রবাহিনী সেখানে বোমাবর্ষণ করেনি তার কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব নেই। সেখানে বোমাবর্ষণ করা হলে এ শ্রম শিবির ধ্বংস হয়ে যেতো এবং বন্দী ইহুদীরা মুক্তি পেতো। বৃটিশ বিমান মাত্র একবার অসউইচে বোমাবর্ষণ করেছিল। বোমাবর্ষণের জন্য বৃটিশ সরকার যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বৃটিশ সরকার অসউইচে বোমাবর্ষণকে একটি 'দুর্ঘটনা' হিসেবে আখ্যায়িত করে। শত শত মার্কিন ও বৃটিশ বিমান প্রতিটি জার্মান শহর ও বেসামরিক জনপদে বেপরোয়াভাবে বোমাবর্ষণ করলেও অসউইচে বোমাবর্ষণ করেনি। যুদ্ধ থেমে যাবার পর অসউইচ বন্দী শিবিরে বোমাবর্ষণ না করার জন্য মার্কিন সরকার ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। অভিযোগ উঠে যে, বড় বড় আমেরিকান কোম্পানীগুলোর সম্পদ রক্ষার জন্যই মার্কিন বিমান অসউইচে বোমাবর্ষণ করেনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অসউইচ কমপ্লেক্সে শিল্প-কারখানার অর্ধেক মালিকানা ছিল আমেরিকান কোম্পানীর। হিটলার সরকার কখনো মার্কিন কোম্পানীগুলোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেনি।

অসউইচ শ্রম শিবির ছিল ইহুদীদের নির্মূল করার একটি বধ্যভূমি- আমেরিকান ও বৃটিশদের এ প্রচারণাকে শানিত করার জন্য সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন জার্মানদের দানবীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে রুশদের ক্ষোভের পেছনে ধর্মীয় মনোভাবও কাজ করেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের অধিকাংশ নেতা ছিলেন ইহুদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ

www.pathagar.com

হওয়ার পর এসব নেতার অনেকেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। স্টালিন নিজেও ছিলেন অর্ধ ইহুদী। তাই তারা ইহুদী বিরোধী জার্মানদের মাথায় মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দেন। মিথ্যা হলেও বার বার প্রচার করা হচ্ছিল যে, হিটলার ও তার সহযোগীরা জার্মান নিয়ন্ত্রিত শ্রম শিবিরগুলোতে ৬০ লাখ ইহুদীকে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে হত্যা করেছিলেন।

অসউইচ শ্রম শিবিরে ৪০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করার দাবি মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব হলে ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করার দাবিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ৪০ লাখ ইহুদীকে যে হত্যা করা হয়নি সে ব্যাপারে অসউইচের বারংকেনিউ জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর ও রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানার পরিচালক ড. ফ্রান্সিজেক পাইপারের সাক্ষ্য সর্বাগ্রে বিবেচনার দাবি রাখে। ২০০৫ সালের ২১ জানুয়ারী ভিডিওতে ধারনকৃত এক বিরল সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ একটি প্রতারণা। তিনি বলেন, প্রতি বছর হাজার হাজার লোককে অসউইচ শ্রম শিবিরে 'ক্রেমা ওয়ান' নামে নরহত্যার যে গ্যাস চেম্বার দেখানো হয় সেটি নকল এবং জোসেফ স্টালিনের সরাসরি নির্দেশে এ গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হয়। তিনি আরো জানান, ১৩ লাখ লোককে অসউইচে আটক রাখা হয়েছিল এবং আটককৃতদের মধ্যে ২ লাখ ২৩ হাজার লোক জীবিত ছিল। মৃতদের মধ্যে ৯ লাখ ৬০ হাজার ছিল ইহুদী, ৭০-৭৫ হাজার পোল, ২৩ হাজার জিপসি ও ১৫ হাজার সোভিয়েত সৈন্য। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি তরুণ ইহুদী তদন্তকারী ডেভিড কোল ড. পাইপারের এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ইহুদী তরুণ ডেভিড কোল অধিকাংশ আমেরিকানের মতো শৈশব থেকেই জেনে আসছিল যে, অসউইচে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪০ লাখ ইহুদীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উপাখ্যান সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু সরকারীভাবে অসউইচ বন্দী শিবিরে নিহতদের সংখ্যা ১১ লাখ বলে উল্লেখ করায় এবং লিউচটার রিপোর্টে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় কোলের মনোভাব পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী মিত্রশক্তি নুরেমবার্গ সামরিক আদালতে অসউইচে ৪০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করার জন্য জার্মানদের অভিযুক্ত করে। সোভিয়েত সরকারের একটি কমিশনের রিপোর্টে ইহুদীদের হত্যা করার এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। এ রিপোর্ট পরবর্তীকালে বিনা চ্যালেঞ্জে গ্রহণ করা হয় এবং আমেরিকার বড় বড় দৈনিক ও ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। এক পর্যায়ে তা কমে এসে দাঁড়ায় সাড়ে ৪ লাখে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে অসউইচসহ সকল জার্মান বন্দী শিবির পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রেড ক্রস কোথাও গণহত্যার কোনো প্রমাণ দেখতে পায়নি। তখন ইউরোপে বসবাসকারী ৩০ লাখ ইহুদীর বেশীর ভাগই ছিল মুক্ত। ১৯৪৪ সালের মার্চ নাগাদ জার্মান কর্তৃপক্ষ ইহুদীদের ফিলিস্তিন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অভিবাসন করার অনুমতি দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান বন্দী শিবিরে জার্মানদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রেড

www.pathagar.com

ক্রস তিন ভলিউমের একটি রিপোর্ট তৈরি করে এবং ১৯৪৮ সালে জেনেভায় এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সূত্রের ভিত্তিতে রেড ক্রস অত্যন্ত সততার সঙ্গে এ রিপোর্ট তৈরি করে। রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, প্রথমদিকে জার্মানরা নিরাপত্তার অজুহাতে বন্দীদের সঙ্গে রেড ক্রসকে সাক্ষাত করতে দিতে অস্বীকার করে। তবে ১৯৪২সালের শেষদিকে রেডক্রস জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে। রেড ক্রস রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়, ১৯৪২সালের আগস্ট থেকে জার্মানীর বড় বড় বন্দী শিবিরগুলোতে খাদ্য বিতরণে রেড ক্রসকে অনুমতি দেয়া হয় এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য সকল শিবির ও কারাগারে রেড ক্রসকে খাদ্য বিতরণের সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগ পেয়ে রেড ক্রস শিগগির শিবিরের কমান্ড্যান্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং একটি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী চালু করে। এ কর্মসূচী ১৯৪৫ সালের শেষ মাসগুলোতেও অব্যাহত ছিল। রেড ক্রসের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়ে ইহুদী বন্দীরা রেড ক্রসের কাছে প্রচুর চিঠি পাঠিয়েছিল। রেড ক্রসের রিপোর্টে যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জার্মান বন্দী শিবিরে ইহুদী বন্দীদের মৃত্যুর সঠিক কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়, মিত্রবাহিনীর হামলার মুখে যুদ্ধের চূড়ান্ত দিনগুলোতে জার্মানীতে চরম বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এসব বন্দী শিবিরে কোনো খাদ্য সরবরাহ ছিল না এবং অনাহারে অধিকাংশ বন্দী মৃত্যু মুখে পতিত হতে থাকে। এতে জার্মান সরকার ভীত হয়ে ১৯৪৫ সালের ১ফেব্রুয়ারী রেড ক্রসকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির চেয়ারম্যান ও এসএস জেনারেল কার্লটেনব্রুনারের মধ্যে আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, তখন থেকে রেড ক্রস ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবে। প্রতিটি শিবিরে রেড ক্রসের একজন করে প্রতিনিধি অবস্থানের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য হয়। তিনটি ভলিউমে তৈরি রিপোর্টে এটাও জোর দিয়ে বলা হয়, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা অক্ষশক্তি নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের কোনো শিবিরে ইহুদীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। রিপোর্টের প্রথম ভলিউমের ২০৪ নং পৃষ্ঠায় ইহুদীদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়, বন্দী শিবিরের ইহুদী ডাক্তারদের জ্বরের চিকিৎসায় পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। ফলে ১৯৪৫ সালে বন্দী শিবিরগুলোতে মহামারী আকারে জ্বর দেখা দিলে তাদের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই ছিল ইহুদীদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। কিন্তু এ সত্যতা অস্বীকার করে বার বার দাবি করা হতে থাকে যে, শাওয়ার বা গোসলখানায় পানি ছাড়ার কলের ছদ্মাবরণে গ্যাস চেম্বারে ইহুদী গণহত্যা পরিচালনা করা হয়। রিপোর্টের তৃতীয় ভলিউমের ৫৯৪ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়,' রেড ক্রস প্রতিনিধিরা শুধু কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা নয়, সকল গোসলখানা ও শাওয়ার পরিদর্শন করেছেন। কোথাও নোংরা কিংবা অপরিচ্ছন্নতা দেখলে পেলে রেড ক্রস প্রতিনিধিরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তারা কর্তৃপক্ষকে এগুলো সম্প্রসারণ অথবা মেরামতের নির্দেশ দিতেন।'

www.pathagar.com

রেড ক্রসের পরিদর্শন টীম প্রায়ই অসউইচ শ্রম শিবির পরিদর্শন করতো। বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য রেড ক্রস প্রতিনিধিদের অনুমতি দেয়া হতো। শিবির ও রেড ক্রস প্রতিনিধিরা যত্নের সঙ্গে খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ পরীক্ষা করতেন। অসউইচ শ্রম শিবিরের ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে ৩ হাজার শিশুর জন্ম রেকর্ড করা হয়। জার্মান নিয়ন্ত্রিত অসউইচে একটি শিশুরও মৃত্যুর রেকর্ড নেই। তবে এখানে ও অন্যান্য শিবিরে এ সুষ্ঠু পরিবেশের অবনতি ঘটে যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রবাহিনীর অবিরাম বোমাবর্ষণে জার্মানীর রেল ও পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে। মহামারি আকারে জ্বর ছড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়। মৃত লোকদের সমাহিত করা হতো। কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হওয়ায় জার্মান স্টাফরা সংক্রমণের শিকার হয়। মহামারি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যায় তাদের মধ্যে শিবিরের কমান্ড্যান্টের স্ত্রীও ছিল। জরুরী পরিস্থিতিতে মৃতদেহের সৎকারে বিকল্প হিসেবে চুল্লী তৈরি করা হয়। শিবিরের বন্দী শ্রমিকরাই এসব চুল্লী তৈরি করেছিল। চুল্লীতে আশপাশের মৃত পোলদের লাশও পোড়ানো হতো। শিবিরের ডাক বাক্স সপ্তাহে দু'বার খালি করা হতো। বন্দীদের কাছে চিঠি আসতো। বন্দীরাও বাইরে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়মিত চিঠি লিখতো। কাউকে গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটলে বন্দীদের বাইরে চিঠি লিখার অনুমতি দেয়া হতো না। একথা প্রত্যেকেই জানে যে, ১৯৪১ সালে জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে ৬০ লাখ ইহুদী ছিল না। আমেরিকান জিউইশ ইয়ার বুকে তাদের সংখ্যা ৩৩ লাখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ ইহুদী পাশ্চাত্য, স্পেন অথবা ইংল্যান্ডে পলায়ন করে। তথাকথিত 'শোয়া' কালে (হীব্রু শব্দ যার অর্থ দুর্যোগ) হিটলার ট্রাকের সঙ্গে অবশিষ্ট ১০ লাখ ইহুদীকে বিনিময় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একথাও সবাই জানে যে, যাকলোন বি নামে কোনো বিষের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে জার্মান ড. ক্রুনো টেসকে অসউইচ শ্রম শিবিরে বিষ সরবরাহ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, নাৎসীরা গ্যাস চেম্বারে বিষ ব্যবহার করে একসঙ্গে ১ থেকে ২ হাজার লোককে হত্যা করে। ড. ক্রুনো ছিলেন একটি কোম্পানীর অংশীদার। তার কোম্পানী উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যাকলোন বি ক্রয় করে সেগুলো অসউইচ শ্রম শিবিরের কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করতো। এটি ছিল কীটনাশক ওষুধ। 'যাকলোন বি, অসউইচ এন্ড দ্য ট্রায়াল অব ড. ক্রুনো' শিরোনামে পরলোকগত প্রখ্যাত মার্কিন রসায়নবিদ উইলিয়াম লিন্ডসের লেখা একটি নিবন্ধে প্রমাণ করা হয়, যাকলোন বি মনুষ্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং ছিল উপকারী। অসউইচ শ্রম শিবিরে আটক বন্দী এবং এ শিবির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএস সদস্যদের উকুন মুক্ত রাখতে, তাদের কাপড়-চোপড় ও শয্যার স্থান ধোয়ামোছা করতে যাকলোন বি ব্যবহার করা হতো। রসায়নবিদ লিন্ডসে নুরেমবার্গ আদালতে ড. ক্রুনোর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পরীক্ষা দেখেছেন যে, সেগুলো ছিল ক্রটিপূর্ণ। ক্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপরাধ ড. ক্রুনোকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। কি দুর্ভাগ্য ড. ক্রুনোর!

www.pathagar.com

ইউরোপের সকল ইহুদীকে বন্দী করা হয়নি। কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তারা ছিল মুক্ত। ইউরোপে বসবাসকারী ৩০ লাখ ইহুদীর বেশীর ভাগ যে শুধু মুক্ত ছিল তাই নয়, পুরো যুদ্ধকালে তাদের অভিবাসন ছিল অব্যাহত। কোথাও কোথাও যুদ্ধের পর জার্মান অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের অভিবাসনের অনুমতি দেয়া হয়। যেমনটি ঘটেছিল পোল্যান্ড দখলের আগে পোলিশ ইহুদীদের ফ্রান্সে অভিবাসন করার সুযোগ দান। রেড ক্রস রিপোর্টের প্রথম ভলিউমের ৬৪৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়, ফ্রান্সে অবস্থানরত পোলিশ ইহুদীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পায় এবং জার্মান দখলদার কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আমেরিকান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর কন্স্যুলেট ইহুদীদের যে ৩ হাজার পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল জার্মান কর্তৃপক্ষ সেগুলোর বৈধতা স্বীকার করে নিতে রাজি হয়।'

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেসিং সার্ভিসের কাছে রক্ষিত দলিলপত্রে জানা যায় যে, অসউইচ শ্রম শিবিরে ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেসিং সার্ভিসের সংরক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে মৃতদের তালিকাসহ সকল বন্দীর দৈনিক দু'বার নাম ডাকার পরিসংখ্যান রয়েছে। অসউইচ বন্দী শিবিরে রক্ষিত মৃত লোকদের তালিকা থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার বন্দীর মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। মৃত লোকদের তালিকা তৈরি করা হয় যুদ্ধকালে জার্মান বন্দী শিবিরে। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে সোভিয়েতরা এসব তালিকা উদ্ধার করলেও তারা সেগুলো প্রকাশ করেনি। এসব তালিকা জাতীয় মোহাফেজখানায় গোপন করে রাখা হয়। ১৯৮৯ সালে রেড ক্রসের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসব গোপন তালিকা হস্তান্তর করে। অসউইচ শ্রম শিবিরে মৃত ব্যক্তিদের সংরক্ষিত তালিকায় ৬৯ হাজার লোকের মৃত্যুর সার্টিফিকেট রয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৩০ হাজার ছিল ইহুদী। যুদ্ধকালে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে সংরক্ষিত তালিকা থেকে জানা যায়, জার্মান বন্দী শিবিরে ৪ থেকে ৫ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অসউইচ শ্রম শিবিরের নাম ফলকে ক্রমান্বয়ে মৃতের সংখ্যা কমছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রক্ষিত নাম ফলকে নিহতের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ। পরে দ্বিতীয় বার সেখানে যে নামফলক তৈরি করা হয় তাতে নিহতদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে ১৫ লাখে এসে দাঁড়ায়।

হলোকাস্ট গবেষণা সংক্রান্ত সাইমন বিসেন্থাল সেন্টারের ডীন ও ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান গভর্নর বলিউডের একসময়ের সাড়া জাগানো অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের উপদেষ্টা রাব্বি মারভিন হেয়ার বলেছেন, ডাকাউ বন্দী শিবিরে কোনো গ্যাস চেম্বার ছিল না। অন্যদিকে, অসউইচ রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানা ৪০ লাখ আদম সন্তান নিহত হওয়ার অর্ধ শতাব্দী পুরনো দাবি সংশোধন করে বলছে যে, ১০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। তবে অসউইচ মোহাফেজখানার এ দাবির স্বপক্ষেও কোনো প্রমাণ নেই। অসউইচ জাদুঘরে পাথরে খোদাই করে ৪০ লাখ লোকের নাম লিখা ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে লাখ লাখ পর্যটক এসব নাম দেখেছে। পরে ২০০৫ সালে জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে জাদুঘর থেকে এ নামফলক অপসারণ করা হয়।

www.pathagar.com

শ্রমিকদের নতুন করে ১০ লাখ লোকের নাম লিখার নির্দেশ দেয়া হয়। তার মানে হচ্ছে, অসউইচ কমপ্লেক্সে ৪৫ বছর ৩০ লাখ ভুয়া নাম পাথরে খোদাই করে রাখা হয়েছিল। নতুন করে আবার ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে সত্য তার নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

জার্মান বন্দী শিবিরগুলো মুক্ত হওয়ার পর আমেরিকান ও বৃটিশরা ডাকাউ, বুচেনওয়ান্ড ও বারজেন-বালসেন বন্দী শিবিরের লোমহর্ষক ছবি তোলে। এসব ছবি বিশ্ববাসী দীর্ঘদিন দেখেছে। যুদ্ধের শেষ মাসগুলোতে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব দিক থেকে জার্মানীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বৃটিশ ও আমেরিকান বিমানগুলো বিরামহীন গতিতে বোমাবর্ষণ করে জার্মানীর সব শহর ও জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিচ্ছিল। তাদের বোমাবর্ষণে পরিবহন, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা ও পয়ঃপ্রণালী পরিসেবা ভেঙ্গে পড়ে। এটাই ছিল বোমাবর্ষণের লক্ষ্য। মিত্রবাহিনীর এ বর্বর হামলাকে মোঙ্গল হামলার পর ইউরোপে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সোভিয়েত অগ্রাভিযানে লাখ লাখ শরণার্থী জার্মানীতে পালিয়ে আসে। পূর্বাঞ্চলীয় শিবিরগুলো থেকে পালিয়ে আসা বন্দীতে জার্মান নিয়ন্ত্রিত অবশিষ্ট শিবিরগুলো বোঝাই হয়ে উঠে। ফলে ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে শিবিরে বন্দীদের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। মহামারী আকারে জ্বর, টাইফয়েড,আমাশয় ও ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনী জার্মান বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে এ মানবিক দুর্যোগকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে স্বার্থকভাবে ব্যবহার করে। স্বাভাবিক রোগে মৃতদের ছবি তুলে প্রচার করা হয় যে, গ্যাস চেম্বারে এদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বুচেনওয়ান্ড, ডাকাউ ও বারজেন-বালসেন বন্দী শিবির থেকে হাজার হাজার সুস্থ বন্দীকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের ছবি তোলার সময় তারাও শিবিরেই অবস্থান করছিল। গৃহীত আলোকচিত্রে তাদেরকে শিবিরের রাস্তায় হাঁটাহাটি করতে এবং কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে। বন্দীরা ছিল উৎফুল্ল এবং তারা তাদের ত্রাণকর্তাদের স্বাগত জানাতে মাথার ক্যাপ শূন্যে ছুঁড়ে মারে।

হলোকাস্টে নিহত ইহুদীদের স্মরণে ইসরাইলে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ইয়াদ ভাসেমের মোহাফেজখানার পরিচালক স্যামুয়েল ক্রাকোভস্কি বলেছেন, কেবলমাত্র ইয়াদ ভাসেমেই ইহুদীদের বিরুদ্ধে জার্মান নৃশংসতার ১০ সহস্রাধিক 'সাক্ষী' ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পোলিশ কর্তৃপক্ষের তরফে প্রকাশিত নয়া পরিসংখ্যানকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করে বলেন, শিবিরের নাৎসী কমান্ডার ক্যাপ্টেন রুডলফ হোয়েসের মুখ ফসকে ৪০ লাখ সংখ্যাটি বের হওয়ার পর অনেকেই তা লুফে নেয় এবং অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে।

এভিলিন লী চেনি ছিলেন জার্মানীর মাউথাউসেন শ্রম শিবিরের একজন সাবেক বাসিন্দা। মাউথাউসেন শ্রম শিবিরের উপর গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, ১৯৪৫ সালের মে মাসে মুক্তির সময় ওই শিবিরে ৬৪ হাজার বন্দী ছিল। ১৯৮৩ সালে ইউএসএ টুডে'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাউথাউসেনে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,' আমি ছিলাম ওই শিবিরের দেড় লাখ

www.pathagar.com

বন্দীর ৩৪ জন জীবিতদের একজন।' গ্যাস চেম্বারে বন্দীদের হত্যা করার অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, 'এটা একটা জঘন্য মিথ্যা।' এনসাইক্লোপিডিয়া জুডাইকার মতে, মাউথাউসেন শ্রম শিবিরে কমপক্ষে ২ লাখ ১২ হাজার বাসিন্দা জীবিত ছিল। সাইমন বিসেন্থাল ছিলেন এ শিবিরের আরেকজন সাবেক বন্দী। ১৯৭৫ সালে একবার এবং ১৯৯৩ সালে আরো একবার প্রকাশ্যে তিনি স্বীকার করেছেন, জার্মান ভূখণ্ডে কোনো গ্যাস চেম্বার ছিল না। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এটাও বলেছেন, বুচেনওয়াল্ড, ডাকাউ এবং জার্মানীর মূল ভূখণ্ডে অন্যান্য বন্দী শিবিরগুলো বধ্যভূমি ছিল বলে যুদ্ধ-পরবর্তী নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল ও পরবর্তীকালে যে দাবি করা হয় সেগুলো সঠিক নয়। থিয়েস ক্রিস্টোফারসেনও একই কথা বলেছেন। ক্রিস্টোফারসেন ছিলেন একজন কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানী। যুদ্ধকালে তাকে সিনথেটিক রাবার উৎপাদনের গবেষণা চালাতে অসউইচ শ্রম শিবিরে পাঠানো হয়। তবে বন্দী হিসেবে নয়। তিনি বন্দীদের প্রাত্যহিক জীবন দেখেছেন। তাদের পাশাপাশি তিনি অবস্থান করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার কথা শুনতে পেয়ে বিস্মিত হন। মিথ্যাচারের প্রতিবাদে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি 'দি অসউইচ লাই' বা অসউইচ মিথ্যাচার শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখতে বাধ্য হন। ১৯৭৩ সালে জার্মানীতে তার এ নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হলে অনেকের চোখ কপালে উঠে।

অন্যদিকে, ইহুদী হলোকাস্ট সম্পর্কে মিথ্যা দাবিদারদের একজন হলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এলি ভিসেল। ১৯৫৬ সালে এডিশ নামে একটি দৈনিকে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ প্রকাশকালে তিনি দাবি করেন যে, জার্মান বন্দী শিবিরে ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। এ মিথ্যাচারই ছিল হলোকাস্ট শব্দের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে কোনো ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেননি যে, ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। ফুটন্ত পানি এবং বৈদ্যুতিক শক দিয়ে ইহুদীদের হত্যা করার অলীক কাহিনীও একসময় উধাও হয়ে যায়। পরে বহাল থেকে যায় কেবল গ্যাস ব্যবহার করে হত্যা করার মিথ্যাচার। গ্যাস প্রয়োগে ইহুদীদের হত্যা করার মিথ্যাচার প্রচার করেছিল আমেরিকানরা এবং ট্রেবলিঙ্কাসহ আরো কয়েকটি বন্দী শিবিরে ফুটন্ত পানিতে হত্যাকাণ্ড চালানোর মিথ্যাচার প্রচার করেছিল পোলরা। একইভাবে সোভিয়েতরা প্রচার করেছিল বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হত্যার কাহিনী। ইহুদীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার মিথ্যাচারের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা অস্পষ্ট। জার্মান শ্রম শিবিরের সাবেক বাসিন্দা এলি ভিসেল এডিশে প্রকাশিত তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 'নাইট' নামে আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, অসউইচ শ্রম শিবিরে বয়স্কদের জন্য একটি এবং শিশুদের জন্য আরেকটি ফুটন্ত পানির খাদ ছিল। তিনি সকল বন্দীকে দৈনিক তিন বার শাওয়ারে গোসল করার জন্য জার্মানদের নির্দেশ দেয়ার অভিযোগও করেছিলেন।

কত মিথ্যা কথাই না বলেছিলেন ভিসেল! তার উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করা মোটেও কষ্টকর নয়। তিনি ও তার পিতা উভয়েই ছিলেন জার্মান বন্দী শিবিরের বাসিন্দা। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে তাদের সামনে বিকল্প ছিল দু'টি। এক, পশ্চাদপরণকারী 'ঘাতক'

www.pathagar.com

জার্মানদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া। দুই, 'মুক্তিদাতা' সোভিয়েত সৈন্যদের অপেক্ষায় শিবিরে অবস্থান করা। কিন্তু পিতা ও পুত্র উভয়ে তাদের আটককারী জার্মানদের সঙ্গেই পালিয়ে যান।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টেও জার্মান বন্দী শিবিরে কথিত গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের হত্যা করার দাবি অসার বলে প্রমাণিত হয়। টরেন্টো স্টারে প্রকাশিত এক রিপোর্টে ১৯৪২ সালে অসউইচে আটক মারিয়া ভানহারওয়ারডেন নামে এক ইহুদী মহিলা বলেন, একজন জিপসি মহিলা তাকে জানান যে, বন্দী শিবিরে পৌঁছা মাত্র তাদের সকলকে শাওয়ারে গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হবে। ট্রেন থেকে নামার পর মারিয়া ও অন্যান্যদের শাওয়ারে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন জিপসি মহিলার কথা অনুযায়ী মারিয়া বিশ্বাস করতে থাকেন যে, তার মৃত্যু অবধারিত। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গোসল করতে যান। কিন্তু শাওয়ারের মুখ দিয়ে গ্যাস বের হওয়ার পরিবর্তে কেবল পানি ঝরতে থাকে। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার ৪৩ বছর পর ১৯৮৮ সালে টরেন্টো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সাক্ষ্যদানকালে তিনি তার এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

অভিযোগ করা হয় যে, ১৯৪৪ সালে অসউইচে জার্মান শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারে প্রতিদিন ২৫ হাজার বন্দীকে হত্যা করা হতো। এ অভিযোগ ছিল বানোয়াট। ইহুদী মহিলা মারিয়া ফ্রাঙ্কের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয়। 'ভয়েসেস ফ্রম দ্য হলোকাস্ট' অর্থাৎ হলোকাস্টে নিহতদের জবানবন্দি নামে একটি বইয়ে মারিয়া ফ্রাঙ্কের সাক্ষ্য স্থান পায়। তিনি তার সাক্ষ্যে অসউইচ শ্রম শিবিরে গ্যাস চেম্বারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০০৪ সালের ৭ জুলাই প্রকাশিত কার্লোস ডব্লিউ পোর্টার 'মেড ইন রাশিয়া' অর্থাৎ রাশিয়ায় তৈরি শিরোনামে একটি নিবন্ধে লিখেছেন, 'রহস্য হচ্ছে এটাই যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত ঘাতকরা তাদের অপরাধ আড়াল করতে সক্ষম হয়।' তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, 'নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে ৬০ লাখ ইহুদী হত্যার অভিযোগসহ আরো কত অভিযোগে জার্মানদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল সে ইতিহাস ক'জন জানে?' তিনি বলেন, 'অসউইচ শ্রম শিবিরের কাছে আণবিক বোমা মেরে ২০ হাজার ইহুদীকে উড়িয়ে দেয়া, সাচেনহাউজেন বন্দী শিবিরে এক মাসে প্যাডেল চালিত মস্তক বিদীর্ণকারী এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে ৮ লাখ ৪০ হাজার রুশ যুদ্ধবন্দীকে হত্যা, পরে রুশদের মৃতদেহ ভ্রাম্যমান চুল্লীতে দাহ করে ফেলা, ইহুদীদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ দিয়ে স্যুপ, হাতব্যাগ, হাতের দস্তানা, ঘোড়ার জীন, ট্রাউজার, পায়ের স্যান্ডেল তৈরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'বগলের নীচের চুল থেকে শুরু করে নোংরা আন্ডারপ্যান্ট কেড়ে নিতে যুদ্ধবন্দী ও শ্রম শিবিরের শ্রমিকদের হত্যা করার অভিযোগও জার্মানদের বিরুদ্ধে আনা হয়।"

আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই হলোকাস্টের আজগুবি গল্প তৈরি করা হয়। মার্কিন অধ্যাপক নরম্যান ফিঙ্কেলস্টেইন তার 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' শিরোনামে এক নিবন্ধে মিথ্যাচার ও উদগ্র লালসা পূরণে হলোকাস্টকে ব্যবহার করার জন্য ইহুদীদের অভিযুক্ত করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, হলোকাস্টের

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর শিল্পায়ন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীবিরোধী মনোভাবের পুনরুজ্জীবনকে উৎসাহিত করছে। ওয়ারশর ইহুদী পল্লী ও শ্রম শিবিরের এক জীবিত ব্যক্তির সন্তান অধ্যাপক ফিঙ্কেলস্টেইন আরো বলেছেন, 'আমি আমার পরিবারের উপর নির্যাতনের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু 'অসহায়' হলোকাস্ট ভিক্টিমদের নামে ইউরোপের কাছ থেকে অর্থ উপার্জনের উদ্যোগে তাদের আত্মদানের নৈতিক মর্যাদা নীচে নেমে যায় এবং এ ধরনের অর্থোপার্জন জুয়ার আসর থেকে অর্থোপার্জনের শামিল। 'হোয়াই ইজ দ্য হলোকাস্ট ইম্পোর্ট্যান্ট' নামে একটি পুস্তকে উইলিস এ, কার্ট মন্তব্য করেছেন, ইসরাইলের জন্য জার্মান ও আমেরিকান করদাতাদের শত শত কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়া ছাড়াও তেলআবিবের সুবিধাজনক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হলোকাস্টকে একটি অত্যন্ত কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যুদ্ধকালে নির্দোষ ইহুদীদের শ্রম শিবিরে পাঠানোই ছিল মানবিক সমস্যার মূল কারণ। শ্রম শিবিরে পাঠানো না হলে মহামারি তাদেরকে কখনো স্পর্শ করতে পারতো না এবং তাদের মৃত্যু নিয়ে কারো নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের সুযোগও হতো না। এজন্য হিটলার অবশ্যই দায়ী। তবে এটাও মনে রাখা উচিত, ইহুদীদের জন্য যারা অশ্রুবর্ষণ করেন তাদের অপরাধের মাত্রা হিটলারের চেয়ে কম নয় বরং বেশী। পোল্যান্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ দখল করে নিরাপত্তার স্বার্থে হিটলার ইহুদীদের বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে নির্বাসনে পাঠানোর যে অমানবিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে সোভিয়েতরা ছিল তার আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়ন গুলাগ শ্রম শিবিরে লাখ লাখ লোককে নির্বাসনে না পাঠালে এ ধরনের নীতি অনুসরণে অন্যান্যরা উৎসাহিত হতো কিনা সন্দেহ। নাৎসী জার্মানরা পরিচালনা করেছে মাত্র কয়েক ডজন শ্রম শিবির। অন্যদিকে, সোভিয়েত কমিউনিস্টরা পরিচালনা করেছে ৪৭৬ টি। এসব শিবিরে কতজন মারা গেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা ছিল স্টালিনের অত্যন্ত পছন্দ। ১৯২৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিরোধী ১ কোটি ৮০ লাখ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সাইবেরিয়ার মৃত্যুকূপ থেকে তাদের কেউ ফিরে আসেনি। অন্যদিকে, ইহুদী কার্ল মার্কসের মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদ কমিউনিজম কায়েমে মার্কসবাদীদের হাতে বিশ্বে ২০কোটি মানুষ খুন হয়েছে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি এবং জার্মানীর ড্রেসডেনে মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণও ছিল মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘণ্য অপরাধ। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত ছিল। তাহলে কারো প্রশ্ন থাকতো না।

www.pathagar.com

হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে কোনো আলোচনায় হিটলারকে প্রচণ্ড ইহুদী বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যেন তখনকার বিশ্বে তিনিই ছিলেন একমাত্র ইহুদী বিরোধী এবং তার আমলে জার্মানী ছাড়া আর কোথাও ইহুদী বিরোধী মানসিকতা ছিল না। এ রকম ধারণা মোটেও সঠিক নয়। সমকালীন ও তার পূর্ববর্তী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, শুধু নাৎসী আমলে জার্মানী নয়, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককালের প্রতিটি স্তরে ইউরোপ ও আরব অঞ্চলসহ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডে ইহুদী বিদ্বেষ সক্রিয় ছিল এবং এখনো তা ক্রিয়াশীল। হিটলার ব্যক্তিগতভাবে খ্রীস্টান হলেও তার ইহুদী বিরোধী মানসিকতার জন্য ধর্মীয় মনোভাব দায়ী নয়। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই ছিল তার ইহুদী বিরোধী মানসিকতার জন্য দায়ী।

প্রথম মহাযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশগ্রহণ করায় যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে এনেছিল ইহুদীরাই। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। বেলফোর ঘোষণার আগে বৃটিশ সরকার ও ইহুদী ধনকুবের স্যার রথচাইণ্ড একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় পৌঁছায়। যুদ্ধে আর্থিক টানাটানি শুরু হলে বৃটিশ সরকার রথচাইল্ডের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। রথচাইল্ড রাজি হন। তবে শর্ত দেন যে, যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে হবে। বৃটিশ সরকার কথা দেয়। রথচাইল্ডকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে বৃটিশ সরকার মার্কিন সরকারকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে প্ররোচিত করতে থাকে। বৃটিশদের প্ররোচনায় যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় জার্মানী কোণঠাসা হতে থাকে। বিপর্যয়ের মুখে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের মূলে ছিল ইহুদী অফিসাররা। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বিশ্বের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর পক্ষ নেয়ায় কাইজারের জার্মানী পরাজিত হয়। চারদিকে হাহাকার রব উঠে। ঘরে ঘরে বিলাপ,হতাশা। শুরু হয় যুদ্ধে পরাজয়ের হিসাব- নিকাশ। তখন ইহুদী ছাড়া জার্মানরা আর কাউকে দায়ী করতে পারছিল না। হিটলারের হিসাবও ছিল একই। তিনি জাতির মনোভাবের অনুকূলে অবস্থান নেন এবং ইহুদী বিরোধী নাৎসী দলে যোগদান করেন। তখনকার জার্মানী ও ইউরোপে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তার পক্ষে ইহুদী বিরোধী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আলোচনা করলে দেখা যাবে, ইহুদীদের প্রতি হিটলার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেগুলো ছিল অতি পুরনো এবং ইউরোপের দেশে দেশে প্রচলিত। সে সময় ইউরোপে এমন কোনো দেশ ছিল না যেখানে ইহুদীরা লাঞ্ছিত হয়নি।

www.pathagar.com

মধ্য যুগে ইহুদী বিদ্বেষের মূলে ছিল ধর্ম। যীশু খ্রীস্টের হত্যাকান্ডের জন্য ইউরোপের রোমান ক্যাথলিকরা সমষ্টিগতভাবে ইহুদীদের দায়ী করতো। 'বোস্টন কলেজ গাইড টু প্যাসন' নামে একটি ধর্মীয় পুস্তকে বলা হয়, 'সময়ের পরিক্রমায় খ্রীস্টানরা এ সত্য অনুধাবন করে যে, গোটা ইহুদী জাতি যীশুর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।' এ পুস্তকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যীশুর হত্যাকাণ্ডের সময় যেসব ইহুদী শেষ নৈশভোজে উপস্থিত ছিল এবং পরবর্তীতে ইহুদী ধর্মে যাদের জন্ম হয়েছে সম্মিলিতভাবে সবাই যীশু খ্রীস্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমানভাবে দায়ী। ধর্মের এ চেতনা থেকেই রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এ চেতনা থেকেই তারা তাদের হত্যা করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ১৯শ' বছর এ ধর্মীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম পোপ পল ১৯৬৪ সালে যীশু খ্রীস্টের হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে ইহুদীদের অব্যাহতি দিয়ে একটি ধর্মীয় ডিক্রি জারি করেন। তারপর থেকে ইহুদীরা নিরাপদ হয়। কিন্তু তার আগে তারা কোথাও নিরাপদ ছিল না।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হেলেনিক সভ্যতায়ও ইহুদী বিদ্বেষের অস্তিত্ব ছিল। ইহুদীদের গ্রীক সভ্যতার মূল ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ইহুদীরা নিজেরাই এ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। ইহুদীদের ধর্মীয় আচার-আচরণ বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির পরিপন্থী বলে গণ্য হওয়ায় তারা এক ঘরে যায়। ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে ইহুদীরা পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করতে চাইতো। সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের ভাগ্য বরাবরই শাসকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। ৪৩৮ সালে দ্বিতীয় থিওডসিয়াস দ্বিতীয় আচরণবিধিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে একমাত্র বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদী বিদ্বেষ আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এক শতাব্দী পরে জাস্টিনীয় আচরণবিধিতে ইহুদীদের বহু অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে চার্চ পরিষদ ইহুদীদের উপর আরো কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করে। ক্যাথলিক মহিলাদের উপর নির্দেশ জারি করা হয় যে, কোনো ইহুদী খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত না হলে তাকে বিয়ে করা যাবে না। আরো নির্দেশ জারি করা হয়, ইহুদীরা খ্রীস্টান উপপত্নী রাখতে পারবে না। ৫৮৯ সালে ক্যাথলিক গ্রীসে তৃতীয় টলেডো পরিষদ শক্তি প্রয়োগে খ্রীস্টান ও ইহুদী দম্পতির সন্তানদের খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ কার্যকর হলে হাজার হাজার ইহুদী হয়তো পালিয়ে যায় নয়তো খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

ইহুদীরা খ্রীস্টানদের তাদের জাতশত্রু বলে মনে করতো। একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করতো। তবে সংখ্যালঘু হিসেবে ইহুদীদের সুযোগ ছিল সীমিত। তাই তারা চক্রান্ত ও নাশকতার আশ্রয় নিতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্লেগে ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ (৩ কোটি ৪০ লাখ) লোক মারা যায়। প্লেগের উৎসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে, ইহুদীরাই প্লেগের জীবাণু ছড়িয়েছে। আজিমেত নামে এক ইহুদী স্বীকারোক্তি করে যে, জেনেভার কাছে চেম্বারির রাবাই পেইরেত তাকে ভেনিস, টুলু ও অন্যান্য এলাকার কূপে প্লেগের জীবাণু ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তার স্বীকারোক্তির পর ১৩৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী স্ট্রাসবুর্গে ইহুদীদের জীবন্ত পুড়িয়ে

www.pathagar.com

হত্যা করা হয়। (সূত্র, জিউশঃ দ্য এসেন্স এন্ড ক্যারেক্টার অব এ পিপলঃ বাই আর্থার হারৎবার্গ এন্ড এ্যারন হার্ট–পৃষ্ঠা ঃ ৮৪)

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শাসক ও চার্চ মাঝে মাঝে অধিকাংশ পেশায় ইহুদীদের নিযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতো। সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট পেশা অবলম্বনে তাদের বাধ্য করা হতো। যেমন- কর ও ভাড়া আদায় এবং অর্থলগ্নি। ক্যাথলিক ধর্মে তখন এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, সুদের বিনিময়ে অর্থলগ্নি করা পাপ। ক্যাথলিকরা বিধিনিষেধের এ বেড়াজালে আটকে পড়ায় ইহুদীরা একচেটিয়া অর্থলগ্নি করার সুযোগ পায়। ঋণদাতাদের সবাই ছিল ইহুদী এবং ঋণগ্রহীতারা খ্রীস্টান। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋণ সংক্রান্ত বিরোধে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করায় খ্রীস্টানরা ভাবতে শুরু করে যে, ইহুদীরা তাদের উপার্জন কেড়ে নিচ্ছে।

দ্বাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করতো, ইহুদীরা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা আরো বিশ্বাস করতো, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে তারা ঐন্দ্রজালিক শক্তি অর্জন করেছে। যীশু খ্রীস্টের নৈশভোজের সঙ্গে মস্করা করতে ইহুদীরা খ্রীস্টান শিশুদের রক্তপান করতো। কৈশোরে পদার্পণ করেনি এমন বয়সের শিশুদের অপহরণ করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর নির্যাতন চালানো হতো। কখনো কখনো ইহুদী গীর্জা বা সিনাগগের সামনেও খ্রীস্টান শিশুদের রক্ত পান করা হতো। এ দৃশ্য দেখার জন্য লোকজন সমবেত হতো। প্রথমেই শিশুটির বিচারে একটি ভুয়া আদালত বসানো হতো। হাত পা বেঁধে শিশুটিকে আদালতের সামনে হাজির করা হতো। আদালত শিশুটির মৃত্যুদণ্ডের রায় দিতো। শিশুটির মাথায় কন্টক মুকুট পরিয়ে কাঠের ক্রুশে তার দু'হাত বিদ্ধ করা হতো। ক্রুশ উত্তোলন করা হলে শিশুটির ক্ষত স্থান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্তে গড়িয়ে পড়তো এবং এসব রক্ত কোনো পাত্র বা গ্লাসে সংগ্রহ করা হতো। পরে হৃদপিণ্ড বরাবর বর্শা, তরবারী অথবা ছোরা মেরে শিশুটিকে হত্যা করা হতো। ক্রুশ থেকে শিশুর মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হতো অথবা মাটি চাপা দেয়া হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাশের উপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা হতো।

ইহুদীরা কত খ্রীস্টান শিশুকে হত্যা করে তাদের রক্তপান করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবে কয়েকটি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। একটি ঘটনা হচ্ছে ১১৪৪ সালে ইংল্যান্ডের নরউইচের উইলিয়ামকে অপহরণের ঘটনা। একজন খ্রীস্টান পাদ্রী সাক্ষ্য দেন যে, ইহুদী যাজকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে তাকে হত্যা করা হয়। ইহুদীদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের শিকার উইলিয়ামকে খ্রীস্টানরা শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং তাকে নরউইচের যাজক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরেকজন ইংরেজ বালক লিটল সেন্ট হিউ অব লিংকনের হত্যাকাণ্ডের বিবরণে জানা যায়, ক্রুশ থেকে তার লাশ সরিয়ে রক্ত সংগ্রহের জন্য একটি টেবিলের উপর রাখা হয়। শুধু তাই নয়, তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা হয়। ১২৫৫ সালের ৩১ জুলাই লিটল সেন্ট হিউ নিখোঁজ হয় এবং ২৯ আগস্ট একটি কূপে তার মৃতদেহ পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। স্থানীয় ইহুদী কোপিন তাকে হত্যা করার কথা স্বীকার করে। কোপিন তার স্বীকারোক্তিতে জানায়, প্রতি বছর ইহুদীদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী একটি খ্রীস্টান বালককে ক্রুশবিদ্ধ করতে হয়। সেন্ট হিউর হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে কোপিনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৪৭৫ সালের ২১ মার্চ ইতালীর ট্রেন্টো শহরে আড়াই বছরের শিশু সাইমন নিখোঁজ হয়। সন্দেহ হওয়ায় ইহুদীদের গ্রেফতার করা হলে ১৭ জন দোষ স্বীকার করে। হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করায় তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হত্যাকারীরা জানায় যে, রক্ত সংগ্রহের জন্য সাইমনের লাশ একটি বিরাট বাটিতে রাখা হয়। শিশু সাইমন নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় ইহুদীদের উপর প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো হয়। তাকে যাজকের মর্যাদায় আসীন করা হয় এবং ১৫৮৮ সালে পোপ সিক্সটাস তাকে পুণ্যাত্মা হিসেবে ঘোষণা করেন।

মধ্য যুগে ইহুদীদের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ সে সব নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। খ্রীস্টান বসতির বাইরে পৃথক জায়গায় ইহুদীদের বসবাস করার অনুমতি দেয়া হতো। তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখা হতো। সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। নিজেদের গ্যাটো বা নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে শহরে এসে বসতি স্থাপন করতে চাইলে তাদের উপর বৈষম্যমূলক করারোপ করা হতো। তাদের পৃথক পোশাক পরতে বাধ্য করা হতো। ১২১৫ সালে ফোর্থ ল্যাটারান কাউন্সিল প্রথম এ মর্মে নির্দেশ দেয় যে, ইহুদীদের এমন পোশাক পরতে হবে যাতে বুঝা যায় যে, তারা ইহুদী। নির্দেশ দেয়া হয়, পোশাক হতে হবে রঙীন কাপড়ের এবং তা হবে গোলাকার অথবা বর্গাকৃতির। তাতে তারকা থাকতে হবে এবং মাথায় হ্যাট পরতে হবে। নতুবা পরণে আলখেল্লা থাকতে হবে। ইহুদীরা তাদের পৃথক সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ব্যাজ পরতো। তবে কেউ কেউ রাজাদের উৎকোচ দিয়ে ব্যাজ পরা এড়িয়ে যেতো। প্রথম তিনটি ক্রুসেডের সহগামী ক্রুসেডাররা জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করে। ট্রেভিস, স্পিয়ার, মেইন্স ও কোলনের মতো কয়েকটি শহরে বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায় প্রথম ক্রুসেডে পুরোপুরি ধ্বংস হয়। মুসলমানদের প্রতি ক্রুসেডারদের ক্রোধ ছিল যতটুকু ইহুদীদের প্রতিও ছিল ঠিক ততটুকু। যদিও প্রথম ক্রুসেডে বিশপ এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডে পোপ ইহুদীদের উপর হামলা রোধের চেষ্টা করেছিলেন। উভয় ক্রুসেডই ছিল ইউরোপে ইহুদীদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যয়কর। ক্রুসেডারদের আবেগে সাড়া দিয়ে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ইহুদী বিরোধী ডিক্রি জারি করায় ইউরোপ থেকে পাইকারীভাবে ইহুদী বিতাড়ন শুরু হয়।

১১৮২ সালে ফিলিপ অগাস্টাস ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্যারিস থেকে তাদের বহিষ্কার করেন। পরে ১২৫৪ সালে চতুর্থ লুই, ১৩২২ সালে চতুর্থ চার্লস, ১৩৫৯ সালে ৫ম চার্লস এবং ১৩৯৪ সালে ৬ষ্ঠ চার্লস গোটা ফ্রান্স থেকে তাদের বহিষ্কার করেন। ওয়েলস বিজয়ে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইহুদী অর্থলগ্নিকারীদের উপর কর আরোপ করেন। ইহুদীরা কর প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে রাজাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করা হয়। গুটি ক'টি পেশায়

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ ইহুদীরা দেখতে পেলো, রাজা এডওয়ার্ড অর্থলগ্নিতে তাদের বিশেষ সুবিধা বিলুপ্ত করে দিচ্ছেন, তাদের চলাচল ও কর্মকাণ্ড সীমিত করে ফেলছেন এবং হলুদ কাপড় পরতে বাধ্য করছেন। তারপরের ইতিহাস আরো ভয়াবহ। ইহুদী পরিবার প্রধানদের গ্রেফতার করা হয়। লন্ডন টাওয়ারে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩শ' জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অন্যদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে হত্যা করা হয়। ১২৯০ সালে ইংল্যান্ড থেকে সকল ইহুদী নির্মূলের ঢেউয়ে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ড সাড়ে তিন শ' বছর ইহুদী শূন্য ছিল। তবে ১৬৫৫ সালে রাজা অলিভার ক্রমওয়েল ইহুদী নিধনের এ নীতি পরিত্যাগ করায় আবার ইংল্যান্ডে তাদের আনাগোনা শুরু হয়।

স্পেনেও ইহুদীদের অবস্থা ছিল তথৈবচ। ১৪৯২ সালে আরাগনের দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ ও কাস্টিলির ইসাবেলা স্পেন থেকে ইহুদীদের বিতাড়নে সাধারণ ডিক্রি জারি করায় বহু সেফার্দি (স্পেন ও পর্তুগালে বসবাসকারী ইহুদী) ইহুদী অটোমান সাম্রাজ্য ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে পালিয়ে যায়। ১৭৪৪ সালে প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ব্রেসলাউয়ে (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পোল্যান্ডের লোয়ার সাইলেশিয়ার রাজধানী) ১০টি 'সংরক্ষিত' পরিবারে ইহুদীদের বসবাস সীমাবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য প্রুশীয় শহরে অনুরূপ চর্চা উৎসাহিত করেন। ১৭৫০ সালে তিনি সংরক্ষিত ইহুদী পরিবারগুলোকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে অথবা বিকল্প হিসেবে বার্লিন ত্যাগের নির্দেশ দেন। একই বছর অস্ট্রিয়া মারিয়া থেরেসার আর্চডাচেস (জার্মান মারিয়া ও পরে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী) ইহুদীদের বোহেমিয়া ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু শিগগির তিনি তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান এই শর্তে যে, ইহুদীদের প্রতি ১০ বছর পুনরায় বসবাসের অনুমতির জন্য অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের অর্থ আদায় 'মাল্কি-গেল্ড' বা রানীর অর্থ হিসেবে পরিচিত। ১৭৫২ সালে তিনি প্রতিটি ইহুদী পরিবারে একটি করে পুত্র সন্তান লাভ সীমিত করেন। ১৭৮২ সালে দ্বিতীয় জোসেফ তার রাজ্যে এসব নিবর্তনমূলক চর্চার অধিকাংশ বিলুপ্ত করেন এই শর্তে যে, সরকারী দলিলপত্রে হিব্রু ও জার্মানীতে প্রচলিত ইহুদীদের ভাষা রহিত করা হবে এবং বিচার বিভাগীয় স্বায়ত্বশাসন বাতিল বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় জোসেফের এসব উদ্যোগ সম্পর্কে জার্মান ইহুদী দার্শনিক মোজেস মেন্ডেলসন মন্তব্য করেছেন, এ ধরনের সহিষ্ণুতা প্রকাশ্য নির্বতনের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক ছিল।

অগাস্টানিয়ান ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার তার 'অন দ্য জিউশ এন্ড দেয়ার লাইজ' নামে পুস্তকে ইহুদীদের মিথ্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। উল্লেখিত পুস্তকে ইহুদীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের জন্য তাকে ইহুদী বিদ্বেষী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। মার্টিন লুথার তার পুস্তকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, তাদেরকে স্থায়ীভাবে উৎপীড়ন অথবা বহিষ্কারের সুপারিশ করেন। ইহুদীদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করায় মার্টিন লুথারের সমালোচনা করে পল জনসন ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত তার 'এ হিস্টি অব দ্য জিউশ' নামে পুস্তকের ২৪২ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'মার্টিন লুথারের লেখা বই হচ্ছে আধুনিক ইহুদী বিদ্বেষের উপর প্রথম বই এবং এটাকে

www.pathagar.com

হলোকাস্টের পথে একটি বিরাট ধাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।' মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে মার্টিন লুথার তার শেষ ধর্মোপদেশে বলেছিলেন, 'আমরা তাদের (ইহুদীদের) খ্রীস্টের ভালোবাসা দিয়ে বরণ করতে চাই এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা ধর্মান্তরিত হয় এবং ঈশ্বরকে গ্রহণ করে। (উয়েমার সংস্করণ, ভলিউম ৫১, পৃষ্ঠা নং-১৯৫)।

লুথারের ইহুদী বিষয়ক মন্তব্যকে অনেকে মধ্যযুগে ইহুদী বিদ্বেষের একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছেন। ইহুদী ধর্ম ও ইহুদীদের বিরোধিতা করার প্রবণতা পরিত্যাগের বিরামহীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে ক্যাথলিক চার্চে কট্টর ইহুদী বিরোধীরাই নেতৃত্বে আসতেন। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইহুদীদের মুক্তি দেয়ার পর ৭ম পোপ পায়াস (১৮০০-১৮২৩) রোমে দেয়াল নির্মাণ করে গ্যাটোতে ইহুদীদের পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ১৮৪৬-৭৮ সালে সর্বশেষ রোম শাসনকারী পোপ ৯ম পায়াসের মেয়াদকালেও ইহুদীরা গ্যাটোতে সীমাবদ্ধ ছিল। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ক্যাথলিক চার্চভুক্ত ছিলেন কিনা এটা স্পষ্ট না হলে ইহুদী বংশোদ্ভূত কেউ খ্রীস্টান জেসুইটে প্রার্থী হতে পারতো না। ১৯৪৬ সাল নাগাদ এ নিয়ম চালু ছিল। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ডেভিড কার্টজাব 'দ্য পোপস অ্যাগেইনস্ট দ্য জিউশ' নামে পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতাকে সমর্থন করতো। তিনি বলেন, 'নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতা থেকে ইহুদী বিদ্বেষের জন্ম নিয়েছে।' নির্দোষ ইহুদী বিরোধিতায় বিশ্বাসীরা সংবাদপত্র, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ কুক্ষিগতকরণে ইহুদী চক্রান্তের সমালোচনা করতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এ চিন্তা খুব প্রবল হয়ে উঠে যে, ইহুদীরা সেমিটিক জনগোষ্ঠীর একটি উপদল মাত্র। অধিকাংশ ইউরোপীয় আরো মনে করতো, সেমিটিক জনগোষ্ঠী আর্য অথবা ইন্দো-ইউরোপীয়দের থেকে পৃথক। সুতরাং ইহুদীদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তখন ইউরোপে ধর্মীয় নয়, বংশগত বিচারে ইহুদীদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হতো। জার্মানীর বেশ কয়েকজন লেখক ইহুদীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গেলে তাদেরকে 'ফিলিস্তিনী' হিসেবে উল্লেখ করতেন। ইউরোপের যেসব দেশে ইহুদীদের বসবাস ছিল সেসব দেশে তাদেরকে একটি পৃথক জাতি কিংবা বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বলশেভিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ইহুদীদের অবস্থা ছিল খুবই করুন। রুশ জার দ্বিতীয় আলেক্সান্ডারকে হত্যার অভিযোগে ইহুদীদের অভিযুক্ত করা হয় এবং ১৮৮১ সালে দক্ষিণ রাশিয়ার ১৬৬ টি শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা, ইহুদী নারীদের ধর্ষণ এবং তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। নয়া জার তৃতীয় আলেজান্ডার দাঙ্গার জন্য ইহুদীদের দায়ী করেন এবং তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেন। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় দাঙ্গা চলতে থাকে। ১৯০৩-১৯০৬ সালে আরো বৃহত্তর দাঙ্গায় ২ হাজার ইহুদী নিহত এবং বহু আহত হয়। ১৯১৪-২১ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেনে ৮৮৭টি দাঙ্গায় আড়াই লাখ ইহুদী নিহত হয়। এসব

www.pathagar.com

দাঙ্গার মধ্যে অন্তত একটির পেছনে রুশ ওখরাঙ্কার সমর্থন ছিল। ১৯০৩ সালে কিশিনেভে দাঙ্গার প্রথম ৩ দিন রুশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছিল উদাসীন। এসময়ের মধ্যে গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী ইহুদীদের উপর বিধিনিষেধ জারি করে 'মে লজ' (১৮৮২ সালের ১৫ মে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের ঘোষিত অস্থায়ী বিধিনিষেধ) নামে একটি আইন কার্যকর হয়। উচ্চ শিক্ষা ও কয়েকটি পেশায় ইহুদীদের ক্ষেত্রে কঠোর কোটা আরোপ করা হয়। নিবর্তনমূলক আইন কার্যকর হওয়ায় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে থাকায় ইহুদীদের গণহারে অভিবাসন শুরু হয়। ১৯২০ সাল নাগাদ ২০ লাখের বেশী রুশ ইহুদী যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনে অভিবাসন করে। ইহুদীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকায় রাশিয়ায় ইহুদী বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে উঠে। সে দেশে জার আমলে গুপ্ত পুলিশের এক গোপন রিপোর্টে (দ্য প্রটোকল অব দ্যা এল্ডার্স অব জায়ন) বলা হয়, ইহুদীরা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্ত করছে। বলশেভিক বিপ্লবে ইন্ধন যোগানোর জন্য ইহুদীদের দোষারোপ করা হয়। বলশেভিকদের অনেকেই জন্মগতভাবে ইহুদী হলেও তারা ইহুদীবাদ ও জায়নবাদকে উৎখাত করতে চেয়েছেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে তারা ইয়েভসেকৎসিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪-এর দশকের শেষদিকে সাবেক সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইয়েভসেকৎসিয়াসহ সকল ইহুদী সংগঠন নির্মূল করে ফেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও অন্যান্য দেশে ইহুদী বিরোধী দাঙ্গা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও দাঙ্গা হয়। রুমানিয়ায় দাঙ্গায় নিহত হয় ১৪ হাজার ও পোল্যান্ডে ৩৮০ জন। ১৯৪৬ সালে ইউরোপে শেষ ইহুদী বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

১২৬৪ সালে পোল্যান্ডের পঞ্চম বোলেসলাউস ইহুদীদের বসবাস এবং তাদের সুরক্ষার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন এই আশায় যাতে ইহুদী বসতি পোলিশ অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। ১২৪৪ সালে অস্ট্রিয়ার রাজা ইহুদীদের জন্য যে সনদ ঘোষণা করেছিলেন তার সঙ্গে অর্থলগ্নিতে উৎসাহদানকারী এ সনদের হেরফের ছিল খুব সামান্য। ষোড়শ শতাব্দীতে পোল্যান্ড ইউরোপীয় ইহুদীদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দেশটি ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি সবচেয়ে সহনশীল দেশ হিসেবে গণ্য হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ সহনশীলতা ইহুদী বিরোধী মনোভাব উস্কে দেয়। প্রতি-সংস্কারের বলিষ্ঠ সমর্থক সুইডিশ হাউস অব ভাসার রাজা তৃতীয় সিগমন্ড পোলিশ সিংহাসনে আরোহন করে ওয়ারশ কনফেডারেশনের নীতিমালা এবং পোলিশ-লিথুয়ানীয় কমনওয়েলথে স্বীকৃত ইহুদীদের প্রতি সহিষ্ণুতাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। টালমুদসহ (ইহুদী ধর্মের আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা) অন্যান্য হিব্রু প্রকাশনায় ক্যাথলিক ধর্মের সমালোচনা করায় ১৬২৮ সালে রাজা তৃতীয় সিগমন্ড ক্রোধান্বিত হন। ১৬৫০ সালে পোলিশ-লিথুয়ানিয়ায় সুইডিশ আগ্রাসন এবং কোসাক বিদ্রোহে এ কমনওয়েলথের ১ কোটি লোক হয় ধ্বংস নয়তো পালিয়ে যায়। ১৬৪৮-৫৫ সালে পোল্যান্ডের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয়দের নেতৃত্বে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকালে প্রায় ১ লাখ ইহুদীকে হত্যা করা হয়। পোলিশ ও রুথেনীয় কৃষকরাও ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। ১৬৯৬ সালে একজন পোলিশকে হত্যার ঘটনায়

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত হয়ে একদল জনতা পোল্যান্ডের পোসিনে বসবাসকারী ইহুদীদের গণহত্যার হুমকি দেয়। এ পরিস্থিতিতে একজন পোলিশ মহিলা হত্যাকাণ্ডের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ইহুদীদের রক্ষা করেন। ১৭১৬ সালে পোলিশ ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৭২৩ সালে গদানস্কের বিশপ শত শত ইহুদী হত্যায় প্ররোচনা। ১৭৪৯ সালের ২৪ মে ওয়ালেনতিন পোটোকি নামে ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত এক সম্ভ্রান্ত পোলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পূববর্তী বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। কার্লস কাফলিন ও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ইহুদীদের নিন্দা করেছিলেন এবং হেনরি ফোর্ড তার দৈনিকে 'দ্য প্রটোকল অব দ্যা এল্ডার্স অব জায়ন' পুনর্মুদ্রণ করেন। ১৯১৯-৫০-এর দশক পর্যন্ত ইহুদী ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান ভর্তি রোধে হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, কর্নেল, বোস্টন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা রকম শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কম-বেশী ইহুদী বিরোধিতা ছিল না। অতীত কালের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি বিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রেও। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে নাৎসী জার্মানীকে এককভাবে ইহুদী বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। ইহুদী বিদ্বেষী রীতি-নীতি অনুসরণের জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী তদানীন্তন ইউরোপ ও আমেরিকা। পরবর্তীতে পরিস্থিতি যাই হোক, একসময় সবাই জার্মানীর ইহুদী বিরোধিতাকে মেনে নিয়েছিল। ১৯৩৫ সালে জার্মানীতে নুরেমবার্গ লজ নামে পরিচিত ইহুদী বিরোধী আইন প্রণীত হয়। ১৯৩৮ সালে এভিয়ান সম্মেলনে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করলেও তাদের কেউ ইহুদীদের প্রতি হিটলারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করেননি এবং জার্মানী থেকে ইহুদীদের পালিয়ে যাবার পক্ষেও মতামত দেননি। তাতে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, নাৎসী জার্মানীতে চালু ইহুদী বিরোধী নীতিতে এ অভিশপ্ত জাতির প্রতি সার্বজনীন নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল?

www.pathagar.com

ইহুদী ষড়যন্ত্র

এ যুগের প্রায় সকলেই জানে এবং বিশ্বাস করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করেছেন। পোল্যান্ডের অসউইচ বন্দী শিবিরে গ্যাস চেম্বারে নিহত ইহুদীদের জন্য অশ্রুপাত করা হয়। কিন্তু কেন হিটলার ইহুদীদের হত্যা করেছিলেন? হিটলারের হাতে নিহত ইহুদীদের সংখ্যাই বা কত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কিভাবে? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যাবে হিটলারের হাতে ইহুদী নিধনের জন্য ইহুদীরাই দায়ী। শুধু তাই নয়, হিটলারের হাতে নিহত ইহুদীদের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয়, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। প্রচারণার স্বার্থে বিশ্ববাসীকে মিথ্যা কথা শোনানো হচ্ছে। জার্মানী থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে স্থানান্তর করার গভীর চক্রান্ত বাস্তবায়নে এ প্রচারণা চালানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও করা হয় এ উদ্দেশ্যে।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার আগে হিটলার কখনো তাদের প্রতি বৈরি ছিলেন না। জার্মান সরকারর জ্ঞাতসারে কোথাও ইহুদীদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য এককভাবে যে ঘটনাকে দায়ী করা হয়, তা হচ্ছে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণা। এডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ইন্টারন্যাশনাল জিউইশ কম্যুনিটি জার্মানীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৩ সালের ২৪ মার্চ লন্ডনের দ্য ডেইলি এক্সপ্রেস-এ জার্মানীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান সম্বলিত একটি নিবন্ধে হিটলারের নেতৃত্বাধীন সরকার উৎখাতে জার্মানীর নাজুক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জার্মান পণ্য বর্জনের ডাক দেয়া হয়। নিবন্ধের শিরোনাম ছিল' ইহুদীরা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। দুনিয়ার ইহুদী এক হও। জার্মান পণ্য বর্জন কর। ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করো' ইত্যাদি।

ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার পরই জার্মানী তাদের উপর পাল্টা আঘাত হানে। বিশ্ববাসীর সামনে সত্য কথা প্রকাশ করলে এটাই প্রকাশ করতে হতো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাটি জার্মানীর থার্ড রাইখ নায়, ছুঁড়েছিল ইহুদীরাই। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন নিউইয়র্কের এটর্নি স্যামুয়েল ইউনটার্মায়ার ছিলেন তাদের অন্যতম। স্যামুয়েল ইউনটার্মায়ার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে ক্রুসেড বলে অভিহিত করেছিলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে আন্ত র্জাতিক ইহুদী নেতৃত্বের যুদ্ধ ঘোষণায় নাৎসীদের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাই কেবল উজ্জীবিত হয়নি, হিটলার সরকার ও জায়নবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠে। আন্তর্জাতিক জায়নবাদী আন্দোলন মনে করতো যে,

www.pathagar.com

ইহুদী ও জার্মানীর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ব্যাপকহারে ইহুদী অভিবাসন ঘটবে।

আজকের দিনে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে এডলফ হিটলার চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলে জার্মান সরকার নিজ দেশে ইহুদীদের বন্দী শিবিরে পাঠানোসহ তাদের উপর জুলুম শুরু করে। তবে একথা ঠিক হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মানীতে ইহুদীদের উপর কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকারের সম্মতি ছিল না। জার্মান সরকার ইহুদীদের উপর সহিংসতাকে উৎসাহিত করেনি। সত্যি কথা হচ্ছে, জার্মানীসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ইহুদীবিরোধী মনোভাব নতুন কিছু ছিল না। এমনকি ইহুদীবিরোধী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করছেন, ইউরোপের ইতিহাসে বরাবরই কম-বেশি ইহুদীবিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল। কোনোভাবেই ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে হিটলার জার্মানীর অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন না। সশস্ত্র বাহিনীর উপরও তার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন একটি জোট সরকারের শক্তিশালী অংশীদার মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে সরকার থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও জার্মানীর বাইরের ইহুদী নেতৃবৃন্দ প্রচার করছিলেন, জার্মানীর নয়া সরকার পরিকল্পিতভাবে ইহুদীবিরোধী সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে। 'ভেরেইন' নামে পরিচিত জার্মান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনও এ অভিযোগ সমর্থন করতে পারেনি। হিটলার সরকার এ হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত নয়—একথা উল্লেখ করে ভেরেইন এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, আমাদের সহযোগী জার্মান নাগরিকগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িতে নিজেদের লিপ্ত হতে দেবেন।' জার্মান ভেরেইনের এ অভিমত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ইহুদী নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, হিটলার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অপরিহার্য।

১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ আমেরিকান জিউইশ কংগ্রেস ২৬ মার্চ মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটি বিশাল প্রতিবাদ বিক্ষোভের ডাক দেয়। একই সময়ে প্রবীণ ইহুদী সৈন্যদের কমান্ডার-ইন-চীফ জার্মান পণ্য বর্জনে আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৩ হাজার ইহুদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নর্থ জার্মান লয়েড ও হামবুর্গ-আমেরিকান শিপিং লাইন্সের বাইরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটে জার্মান পণ্য বর্জন শুরু হয়।

১৯৩৩ সালে ২৪ মার্চ লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেসের এক নিবন্ধে বলা হয়, ইহুদীরা ইতোমধ্যেই জার্মানী ও তার সরকারকে বয়কটে তাদের আন্দোলন শুরু করেছে। ডেইলি এক্সপ্রেসে প্রকাশিত নিবন্ধে গণবিক্ষোভ প্রদর্শনে বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, 'বিশ্বের সকল ইহুদী জার্মানীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ ঘোষণায় ঐক্যবদ্ধ। নয়া জার্মানীর প্রতীক হিসেবে স্বস্তিকার আবির্ভাব হচ্ছে ইহুদীদের পুরনো যুদ্ধের প্রতীককে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা। নিজ দেশের জনগণের উপর নিপীড়নকারী জার্মান উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১ কোটি ৪০ লাখ ইহুদী যেন একটি মানুষের অভিন্ন সত্তার মতো ঐক্যবদ্ধ। হিটলারের লোকজনের বিরুদ্ধে পবিত্র ক্রুসেডে যোগদানে ইহুদী পাইকারি

www.pathagar.com

দোকানদার তার বাড়ি, ব্যাংকার তার স্টক এক্সচেঞ্জ, বণিক তার ব্যবসা এবং ভিক্ষুক তার পর্ণ কুটির পরিত্যাগ করবে।'

ডেইলি এক্সপ্রেসের নিবন্ধে আরো বলা হয়, লন্ডন, প্যারি, ওয়ারশ ও নিউইয়র্কে জার্মানী বর্তমানে তার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কলকারখানায় আন্তর্জাতিক বয়কটের মোকাবিলা করছে। ইহুদী ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক ক্রুসেডে যোগদানে ঐক্যবদ্ধ। প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শনে বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতি চলছে-একথা উল্লেখ করে নিবন্ধে আরো বলা হয়, প্রাচীন ও ঐক্যবদ্ধ ইসরাইল জাতি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আধুনিক ও নয়া অস্ত্রশস্ত্র লাভ করছে।

ডেইলি এক্সপ্রেসে প্রকাশিত এ নিবন্ধকে সত্যিকার অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম গোলাবর্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। একই ভাষায় ইহুদী পত্রিকা নাৎচা রেৎচ মন্তব্য করে, 'ইহুদী সম্প্রদায়ের সকলকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যে কোনো সভা-সমাবেশ ও সম্মেলনে এ যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। এভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের স্বার্থকে আদর্শগতভাবে প্রাণবন্ত করে তুলবে, যা জার্মানীকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন।' ২৬ মার্চ জার্মান জায়োনিস্ট এসোসিয়েশন নাৎসীদের (ন্যাশনাল সোসালিস্ট) বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জায়নবাদীদের অভিযোগকে প্রচারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে একটি টেলিগ্রাম বের করে। ইহুদীদের হুমকিতে হিটলার সরকার আতঙ্কিত হয়ে জার্মানীর ভেতর ও বাইরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিরসনের উদ্যোগ নেয়।

জায়নবাদীরা প্রথমে নাৎসী সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। পরে তারা দেখতে পায় একমাত্র ইহুদীবিরোধী হিটলারই জার্মান ইহুদীদের জায়নবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারেন। এটাই ছিল তথাকথিত 'ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট' বা স্থানান্তর চুক্তির ভ্রূণ। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে জার্মান ইহুদীদের স্থানান্তরের লক্ষ্যে নাৎসী সরকার ও জায়নবাদী ইহুদীদের মধ্যে এ চুক্তি হয়। ইহুদী ঐতিহাসিক ওয়াল্টার ল্যাকার ও অন্যান্যদের মতে, জার্মান ইহুদীরা একথা বিশ্বাস করতো না যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অভিবাসনই ইহুদী সমস্যার একমাত্র সমাধান। অধিকাংশ জার্মান ইহুদী জায়নবাদীদের তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরের মাধ্যমে ইহুদী সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসায় হিটলার জায়নবাদীদের রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের সহযোগিতা দিয়েছিলেন। ইহুদী ঐতিহাসিক এডউইন ব্ল্যাক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, অধিকাংশ ইহুদী ফিলিস্তিনে পালিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু নাৎসী জার্মানীতে জায়নবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ইহুদীরা জার্মানী থেকে ফিলিস্তিনে পালিয়ে যাবার একটি সম্ভাবনা দেখতে পায়। অন্য কথায়, ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট নামে খ্যাত চুক্তিতে এ সুযোগ দেখা দেয়। এ এগ্রিমেন্টে কেবলমাত্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদীদের পুঁজি প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়া হয়। কোনো ইহুদী লেভেন্টে যেতে চাইলে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে সে জার্মানী ত্যাগ করতে পারতো। ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়। চুক্তিতে শর্ত ছিল বর্তমান ইসরাইলের হাইফা নগরী অথবা অন্য কোথাও এসে পৌঁছানোর পর একজন অভিবাসীকে এক হাজার পাউন্ড

www.pathagar.com

স্টার্লিং পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক টানাপড়েনে বিপর্যস্ত জার্মানীতে নগদ অর্থের সংস্থান করা ছিল দুরূহ। নিউইয়র্ক ও আমস্টারডামের ইহুদীরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল- একথা সত্যি। কিন্তু জার্মানীর সহায়তাই তারা টিকে থাকতে চেয়েছে। জায়নবাদীরা এক পর্যায়ে দেখতে পায় ফিলিস্তিনে তাদের অর্থনৈতিক ভাগ্য জার্মান অর্থনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ উপলব্ধি থেকে জার্মান ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের সম্পদ প্রত্যাহারের স্বার্থে জার্মানীকে বয়কট করার উদ্যোগ নস্যাতে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। ইহুদী হুমকি মোকাবিলায় জার্মানীর জবাব ছিল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। এ সত্য সঠিকভাবে তুলে ধরা হলে অনাকাঙ্খিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ইহুদীদের যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় হিটলার কেন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা বুঝতে হলে জার্মানীর তখনকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৩৩ সালে জার্মানীর অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। ৬০ লাখ জার্মান তরুণ ছিল বেকার। প্রায় ৩০ লাখ জার্মান সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিল। অতিমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমে জার্মান বিরোধী প্রচারণা জার্মানীর শত্রু বিশেষ করে পোলিশ ও তাদের সামরিক কমান্ডের আত্মবিশ্বাসকে জোরদার করছিল। ইহুদীরা জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক যুদ্ধের ডাক দিয়েছিল, তা কোনো কল্পনাবিলাস ছিল না। এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে জার্মানীর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার জন্য জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ইহুদীদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে জার্মানীকে দেউলিয়া করে দেয়া, যাতে সে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে অক্ষম হয় এবং সে সামরিকভাবে নপুংষক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বয়কটে জার্মানী পঙ্গু হয়ে যায়। এডউইন ব্ল্যাকের মতো ইহুদী পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন, বয়কটের পরিণামে জার্মানীর রপ্তানির পরিমাণ ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। এসময় বিদেশী ব্যাংকগুলোতে জার্মান সম্পদ আটকের জন্য অনেকে দাবি তোলে। এডউইন ব্ল্যাক তার 'ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট—দ্য আনটল্ড স্টোরি অব দ্য প্যাক্ট বিটুইন থার্ড রাইখ অ্যান্ড জিউইশ প্যালেস্টাইন' শীর্ষক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতারা জোর গলায় জার্মানীর নৃশংসতার নিন্দা করতেন। বর্তমান ইসরাইলী নেতৃত্বও একইভাবে নাৎসী জার্মানীর নিন্দায় মুখর। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন। নাৎসী জার্মানীর সহযোগিতাই ইসরাইলী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। মিথ্যাচারের মধ্য দিয়েই ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। একই মিথ্যাচার করা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা নিয়ে। এ যুদ্ধের জন্য নাৎসী হিটলার যতটুকু দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী অভিশপ্ত ইহুদীরা। ইহুদী হলোকাস্টকে যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয় প্রকৃত ইতিহাস তা নয়। প্রচারণার স্বার্থে ইহুদী হত্যাকাণ্ডকে বাড়িয়ে প্রচার করা হয়।

www.pathagar.com

চীন-জাপান যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে এবং যুদ্ধকালে চীনের পূর্বাঞ্চলে জাপানের সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের স্মৃতি এখনো চীনাদের পীড়া দেয়। তাদের পক্ষে এ স্মৃতি ভুলে যাওয়া কঠিন। ২০০৫ সালের আগস্টে জাপানের এক আদালত রায় দিয়েছে যে, চীনে জাপানী সৈন্যদের নৃশংসতা কোনো কল্পকাহিনী নয়। জাপানের রাজকীয় বাহিনীর দু'জন সাবেক লেফটেন্যান্টের নৃশংসতার পক্ষে রায় দিয়ে বিচারক এ মন্তব্য করেন। অভিযুক্ত দু'জন লেফটেন্যান্ট ১শ' চীনা বন্দী সৈন্যের মাথা কার আগে কে কাটবে সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। ১৯৩৭-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চীনের পূর্বাঞ্চলে জাপানী দখলদারিত্বকালে যে যুদ্ধ হয় তাকে চীন-জাপান দ্বিতীয় যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুদ্ধকালে কত বীভৎস ঘটনা ঘটেছে তার হিসাব কে রাখে!

১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চীনে জাপানের দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। চীনের উপকূলীয় পূর্বাঞ্চল দখলের আগে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার অন্যতম কারণ। চীন-জাপানের মধ্যকার যুদ্ধকে চীনারা বলে 'জাপান বিরোধী চীনা গণ প্রতিরোধ যুদ্ধ', 'জাপান বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ' 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' অথবা '৮ বছরের প্রতিরোধ যুদ্ধ' ইত্যাদি। অন্যদিকে, জাপানে এ যুদ্ধ 'সি অপারেশন' 'দ্য চাইনিজ ইনভেশন' অথবা 'জাপানীজ-চাইনিজ ওয়ার' হিসেবে পরিচিত। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে জাপানীদের একটি মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীন দখলের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন 'চীনা ঘটনাবলী' হিসেবে পরিচিত। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আগ্রাসনকে 'মুকাদেন ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব 'ঘটনা'র শেষ ঘটনাকে 'লুগাউচিয়াও' অথবা 'মার্কো পোলো ব্রিজ ইনসিডেন্ট' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই লুগাউ ব্রিজ ঘটনা বা মার্কো পলো ব্রিজ ঘটনাকে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, সমসাময়িক চীনা ঐতিহাসিকগণ ১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'মুকদেন ঘটনা'কে যুদ্ধের শুরু হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। মুকদেন ঘটনার পর জাপানের গুয়ানদং আর্মি মাঞ্চুরিয়া দখল করে এবং ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাঞ্চুকু রাজ্যে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। জাপান মাঞ্চুকুর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দানে চীনের উপর চাপ দেয়। ১৯৩৭ সালে লুগাউ ব্রিজে যুদ্ধের পর জাপান সাংহাই, নানজিং ও উত্তরাঞ্চলীয় শাংচি দখল করে। এ যুদ্ধে প্রায় ২ লাখ জাপানী সৈন্য ও উল্লেখযোগ্য ভাড়াটিয়া চীনা সৈন্য অংশগ্রহণ করে। চীনা ঐতিহাসিকরা দাবি করছেন যে, নানজিংয়ের পতনের পর

www.pathagar.com

সেখানে প্রায় ৩ লাখ লোক গণহত্যার শিকার হয়। মার্কো পলো ব্রিজ ঘটনা শুধু চীন ও জাপানের মধ্যে খোলাখুলি ও অঘোষিত যুদ্ধেই রূপ নেয়নি, এ ঘটনা জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (সিসিপি)'র মধ্যকার মিত্রতাকে ত্বরান্বিত করে। একে অপরের সহযোগী হলেও তাদের মধ্যে অবিশ্বাস কাজ করতো। জিয়ান ঘটনায় চিয়াং কাইশেককে ছিনতাই করা হয়। এ ঘটনায় আক্ষরিক অর্থে বন্দুকের নলের মুখে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কুওমিনটাংয়ের মিত্রতা গড়ে উঠে। উত্তরাঞ্চলীয় চীনে জাপানের ভূখণ্ডগত বিজয় লাভ সত্ত্বেও ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে উভয়ের এ অস্বস্তিকর আঁতাতে ভাঙ্গন ধরে। ১৯৪০ সালের পর জাপানী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছিল। সুবিধাজনক স্থানগুলোতে কমিউনিস্টদের প্রভাব সম্প্রসারিত হতে থাকে। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদীরা কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করছিল।

প্রত্যক্ষভাবে চীন শাসনে জাপানীদের সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জাপানী স্বার্থের অনুকূল বন্ধুভাবাপন্ন পুতুল সরকার কায়েম করা। তারা একটি পুতুল সরকার কায়েমও করে। কিন্তু জাপানীদের নৃশংসতায় এ সরকার অজনপ্রিয় হয়ে পড়ে এবং জাপান জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি উভয়ের সঙ্গে আলোচনায় অস্বীকৃতি জানায়।

জাপানের তুলনায় চীন ছিল যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত। তাছাড়া দেশটির সামরিক শিল্প বলতে গেলে ছিল না। যান্ত্রিক ডিভিশন ছিল খুবই সামান্য। সাঁজোয়া বাহিনীতে ছি দুর্বল। ১৯৩০'র দশকের মাঝামাঝি নাগাদ চীন আশা করতো যে, জাতিপুঞ্জ জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কুওমিনটাং সরকার ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে ক্লান্ত। এসব প্রতিকূলতা চীনকে এমন একটি কৌশল গ্রহণে বাধ্য করে যার প্রথম লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা। নাজুক পরিস্থিতিতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা ছিল আত্মহত্যার শামিল। তবে শত্রুকে কোণঠাসা এবং চীনের বিশাল ভূখণ্ডে তাদের প্রশাসনকে দুরূহ করে তোলার লক্ষ্যে অধিকৃত অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ চলতে থাকে।

চীনের কুওমিনটাং সরকারের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করতে হলে চীনকে লড়াই করার সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে হবে। দ্রুত পশ্চাদপসরণ করা হলে বিদেশীরা সহায়তা প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে একথা ভেবে তিনি সাংহাইয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। চিয়াং কাইশেক চীনের বৃহত্তম ও শিল্পোন্নত বাণিজ্যিক শহর সাংহাই রক্ষায় জার্মান প্রশিক্ষিত তার এলিট ফোর্সকে পাঠান। উভয়পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং চীনাদের পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শেষ হয়। এ যুদ্ধ একটি সামরিক বিপর্যয় হলেও এটা প্রমাণিত হয় যে, চীনারা পরাজয় স্বীকারে আগ্রহী নয় এবং এতে বিশ্বের সামনে তাদের দৃঢ় মনোবল ফুটে উঠে। এ যুদ্ধ তিন মাস স্থায়ী হয়। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় জাপানীরা তিন দিনে সাংহাই দখল এবং তিন মাসে গোটা চীন দখলে যে বাগাড়ম্বর করেছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের সূচনা লগ্নে এক দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আরেক দেশের সেনাবাহিনীর সরাসরি লড়াই এবং

www.pathagar.com

গুটিকয়েক বিজয়ের বিনিময়ে চীনাদের অগণিত পরাজয়ে যুদ্ধ স্থবির হয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে চীন তার বিশাল ভূখণ্ড হারানো সত্ত্বেও জাপানীদের অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিদেশী সহায়তা এসে পৌঁছানো নাগাদ যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করাই ছিল চীনাদের কৌশল। জাপানীদের অগ্রযাত্রা মন্থর করার লক্ষ্যে চীনারা পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করে। বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ায় ১৯৩৮ সালে হোয়াংহো নদী প্লাবিত হয়। ১৯৪০ সাল নাগাদ উভয় পক্ষ কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে না পারায় যুদ্ধ নির্জীব হয়ে পড়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে চীনারা অগ্রসরমান জাপানী হামলা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে এবং তাদের ভূখণ্ড রক্ষা করে। অধিকৃত অঞ্চলগুলোয় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠায় জাপানীদের জন্য বিজয় লাভ করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এতে তারা হতাশ হয় এবং 'সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করো, সবকিছু ধ্বংস করো'-এ নীতি অবলম্বন করা হয়। এ সময়েই জাপানীরা নৃশংসতায় মেতে উঠে।

চীনের কুওমিনটাং প্রেসিডেন্ট মার্শাল চিয়াং কাইশেক

১৯৪১ সালে জাপানীরা পার্ল হারবারে হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করে। চীন তার আগে অস্বীকৃতি জানালেও ৮ ডিসেম্বর সে আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ সময় চীনের রণনীতিতে পরিবর্তন আসে। প্রেসিডেন্ট চিয়াং উপলব্ধি করতে পারেন যে, উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আমেরিকানরাই জাপানের বিরুদ্ধে মূল লড়াই চালাবে। তাই তিনি তার সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড সীমিত করেন এবং যুদ্ধের পর সম্ভাব্য গণযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৯৪৫ সাল নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জাপানীরা শিগগির পরাজিত হবে। এ হিসাব থেকে চীনা সেনাবাহিনী একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

যুদ্ধকালে চীন যে সমর নীতি অনুসরণ করছিল তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগ : ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই লুগাউ ব্রিজ যুদ্ধ থেকে ১৯৩৮ সালের ২৫ অক্টোবর হাঙ্কুর পতন পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে চীনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণনীতি ছিল 'সময়ের জন্য অপেক্ষা করা।' এ নীতি অনুযায়ী চীনা সৈন্যরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোতে জাপানীদের অগ্রযাত্রা মন্থর করার লক্ষ্যে প্রতীকী প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে হোম ফ্রন্টকে পশ্চিমে চোংকিংয়ে পশ্চাদপরণের সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয় ভাগ : ১৯৩৮ সালের ২৫ অক্টোবর হাঙ্কুর পতন থেকে ১৯৪৪ সালের জুলাই পর্যন্ত। এ সময়ে চীনা সেনাবাহিনী চৌম্বকীয় রণনীতি অনুসরণ করে। এ রণনীতির লক্ষ্য ছিল অগ্রসরমান জাপানী সৈন্যদের নিজেদের শক্তিশালী ঘাঁটির কাছাকাছি প্রলুব্ধ করে নিয়ে এসে তাদের উপর হামলা করা, জাপানীদের অবস্থান এড়িয়ে পার্শ্ব থেকে হামলা চালানো এবং বড় বড় লড়াইয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলা। এ কৌশলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে চাংশা প্রতিরক্ষায় বেশ কয়েকবারের সাফল্য।

তৃতীয় ভাগ : ১৯৪৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে চীনারা জাপানীদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং পাল্টা হামলা চালায়।

চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনাকালে জাপানী সেনাবাহিনীতে ছিল ১৭টি ডিভিশন। প্রতিটি ডিভিশনে ছিল ২২ হাজার সৈন্য, ৫,৮০০ ঘোড়া, ৯,৫০০ রাইফেল ও সাবমেশিনগান, ৬শ' ভারি মেশিনগান, ১০৮টি কামান ও ২৪ টি ট্যাংক। তাছাড়া, স্পেশাল ফোর্সও ছিল। সে সময় জাপানী বিমান বাহিনীতে ছিল ২,৭০০ বিমান। জাপানী নৌ-বাহিনী ছিল তখনকার বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। যুদ্ধকালে জাপানী নৌ-বাহিনী যে ক'টি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে সেগুলোর মোট পরিবহন ক্ষমতা ছিল ১৯ লাখ টন। শক্তিতে প্রতিটি জাপানী ডিভিশন ছিল তিনটি নিয়মিত চীনা ডিভিশনের সমান। চীনা সেনাবাহিনীতে ছিল ৮০ ডিভিশন সৈন্য, ৯টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, ৯টি ক্যাভালরি ডিভিশন, ২টি গোলন্দাজ ব্রিগেড, ১৬টি রেজিমেন্ট এবং একটি কিংবা দু'টি সাঁজোয়া ডিভিশন। চীনা নৌ-বাহিনী যুদ্ধকালে মোট ৫৯ হাজার টন পরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে। চীনা বিমান বাহিনীতে ছিল ৬ শ' বিমান। সামরিক শক্তি হিসেবে জাপানের বিপরীতে নগণ্য হলেও আকার ও আয়তনের দিক থেকে চীন ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে। দেশটি ভূখণ্ডগত দিক থেকে ছিল জাপানের তুলনায় ৩১ গুণ বড় এবং জনসংখ্যা ছিল জাপানের চেয়ে ৫ গুণ বেশী। জাপান যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রাম্যমান সামর্থ্যের অধিকারী হলেও দেশটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল না। ফলে টোকিও দ্রুত অভিযান চালিয়ে ত্বরিত বিজয় লাভের একটি কৌশল অবলম্বন করে। প্রথম তিন মাসে তারা 'জাপান-চায়না ইনসিডেন্ট' নামে পরিচিত যুদ্ধে দ্রুত অগ্রগতি লাভে সক্ষম হয়। এ সময়ে জাপানী সৈন্যদের শক্তি ক্ষয় করে তাদের দুর্বল করে দেয়ার লক্ষ্যে চীনারা আত্মরক্ষামূলক কৌশল নেয়।

www.pathagar.com

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং

১৯৪০ সাল নাগাদ যুদ্ধে অচলাবস্থা দেখা দেয়। অধিকৃত ভূখণ্ডে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে জাপানীরা পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের অধিকাংশ অঞ্চল ধরে রাখার চেষ্টা চালায়। মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট গেরিলাদের হুমকি মোকাবিলার আশংকায় চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী সরকার প্রাদেশিক রাজধানী শহর চোংকিংয়ের অভ্যন্তর থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। চিয়াং কাইশেক তার সেনাবাহিনীর শক্তি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেন এবং জাপানীরা বিদায় নিলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে- এ হিসাব থেকে তিনি জাপানীদের সঙ্গে বড় ধরনের লড়াই এড়িয়ে যেতে থাকেন। চিয়াং কাইশেক জাপানীদের চেয়ে কমিউনিস্টদের তার বড় শত্রু বলে মনে করতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'জাপানীরা হচ্ছে চর্ম রোগ এবং কমিউনিস্টরা হৃদরোগ।' সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনী না থাকায় এবং কুওমিনটাং সরকার ও চীনের অভ্যন্তরে আপত্তি থাকায় তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাননি। সাংহাই রক্ষায় তিনি তার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুসজ্জিত বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হারান এবং এলিট ফোর্সের বাদবাকি অংশ সেনাবাহিনীকে রক্ষায় ব্যবহার করেন। সমরাস্ত্র কারখানাগুলোর অধিকাংশ জাপানী নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকায় অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণের কাছাকাছি হওয়ায় কুওমিনটাং সরকার লড়াই অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে না বলে অধিকাংশ সামরিক বিশ্লেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

বৃহৎ শক্তিগুলো চীনকে সামরিক সহায়তা দানে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের অনাগ্রহের পেছনে দু'টি যুক্তি কাজ করছিল। একটি ছিল তারা ধারণা করতো যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে চীন পরাজিত হবে। অন্যটি যুক্তিটি ছিল তারা জাপানীদের বৈরি করে তুলতে ইচ্ছুক ছিল

www.pathagar.com

না। এশিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আগে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কুওমিনটাং সরকারকে সহায়তা দিয়েছে। জাপানীদেরকে সাইবেরিয়ায় আক্রমণ চালানো থেকে বিরত রাখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন সরকারকে ব্যবহার করেছে। এ কৌশল গ্রহণ করে সোভিয়েত রাশিয়া দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করার হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুওমিনটাং সরকারের সম্ভাব্য উদ্যোগ যাতে ব্যর্থ হয় সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান ও চীনের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত কামনা করতো। সোভিয়েত টেকনিশিয়ানরা চীনের সমরাস্ত্র সরবরাহকারী কয়েকটি পরিবহন পরিচালনা ও আধুনিকায়নে সহায়তা করেছে। মার্শাল জর্জি ঝুকভসহ সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টাগণ চীনে এসেছিলেন। মার্শাল ঝুকভ তায়ার-ঝুয়াংয়ে লড়াই প্রত্যক্ষ করেন। একইসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকেও সহায়তা করতো। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সকল সম্পদ বার্লিনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করায় সে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে সহায়তা দানে অক্ষম হয়ে পড়ে। এদিকে, কমিউনিস্ট বিরোধী নীতিমালা অনুসরণ করায় জার্মানী চিয়াং কাইশেককে সমরাস্ত্র সরবরাহ করতো। জার্মান উপদেষ্টাগণ কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চিয়াং কাইশেকের দ্বিতীয় ছেলেসহ কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর অফিসাররা জার্মান সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। পুরোপুরি জার্মান সমরাস্ত্রে সজ্জিত ৩০টি নয়া ডিভিশন গঠন করার একটি পরিকল্পনা চলছিল। কিন্তু জার্মানী জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করায় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য বিশ্বশক্তি একটি পর্যায় পর্যন্ত কুওমিনটাং সরকারকে সামরিক সহায়তা প্রদানে কেবলমাত্র সরকারী চুক্তিগুলো মেনে চলে। তবে পার্ল হারবারে জাপানী হামলা তাদের মনোভাবে আমূল পরিবর্তন আনে। ১৯৪১ সালের পর থেকে সামরিক সরবরাহ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কুওমিনটাং সরকারের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সামর্থ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তাদের প্রতি মার্কিন জনগণের সমর্থন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ত্রিশ দশকের শুরুতে পরিচালিত এক জনমত জরিপে জাপানীদের প্রতি মার্কিনীদের সমর্থনের ঝোঁক ধরা পড়ে। তবে 'ইউএসএস প্যানে'-তে হামলার মতো কয়েকটি ঘটনায় জাপানীদের নিষ্ঠুরতায় দ্রুত মার্কিন জনমত তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৯৪১ সালের শুরুতে চীনা বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র 'ফ্লাইং টাইগার্স' নামে পরিচিত আমেরিকান ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ গঠন করে। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র তেল ও স্টীল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় চীনা ভূখণ্ডে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া জাপানের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও স্টীল নিষেধাজ্ঞাই ছিল পার্ল হারবারে জাপানী হামলার কারণ।

পার্ল হারবারে হামলার কয়েকদিন পর যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর থেকে চিয়াং কাইশেক যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল সামরিক সহায়তা পেতে থাকেন। চীনের যুদ্ধক্ষেত্র অচিরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশীয় রণাঙ্গনে পরিণত হয়। ১৯৪২ সালে চিয়াং কাইশেককে চীনা রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত করা হয়। মার্কিন জেনারেল স্টিলওয়েল কিছুদিন

www.pathagar.com

চিয়াং কাইশেকের চীফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে জেনারেল স্টিলওয়েল চীন বার্মা ও ভারত রণাঙ্গনে মার্কিন বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন। তবে চীনা সরকারের দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার কারণে স্টিলওয়েল ও চিয়াং কাইশেকের মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ৫শ' কোটি ডলারের মার্কিন সামরিক সহায়তা সত্ত্বেও চীনা সেনাবাহিনী জাপানীদের সঙ্গে বড় ধরনের সংঘাত এড়িয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তারা অস্ত্র মজুদ করছিল। জেনারেল স্টিলওয়েল মার্কিন প্রচার মাধ্যম এবং প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কাছে যুদ্ধ পরিচালনায় চীন সরকারের আচরণের সমালোচনা করেন। এভাবে মিত্রপক্ষ চীন সরকারের যোগ্যতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে। যুক্তরাষ্ট্র চীনা রণাঙ্গনকে বিপুল সংখ্যক জাপানী সৈন্যকে ব্যস্ত রাখার একটি উপায় এবং দেশটিতে মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপনের একটি সম্ভাব্য স্থান হিসেবে দেখতে পায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানীদের অবস্থানের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় তারা চীনা বিমান ঘাঁটিতে হামলা চলানোর জন্য অপারেশন 'ইচিগো' পরিচালনা করে। এতে হুবেই, হেনান ও গুয়াংজি প্রদেশে জাপানী নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সৈন্য স্থানান্তরের সম্ভাবনা নিষ্ফল হলেও জাপানীরা তাদের 'শো প্ল্যান'-এর আওতায় কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া থেকে গুয়ানদং আর্মি'র শক্তি বৃদ্ধি করে।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধকালে একটি মহা সামরিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ঘটলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা ছিল একটি স্থবির জাতি এবং তারা ছিল একটি সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর লালন-পালন, জাতীয়তাবাদীদের মুনাফাখোরী ও মজুতদারী প্রভৃতি কারণে অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বন্যায় হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইয়াল্টা সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিণামে চীনের পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে। ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি টানার জন্য সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া প্রবেশ করে। ইয়াল্টা সম্মেলনে চীন সরকার ছিল অনুপস্থিত। তবে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। তারা সোভিয়েত সৈন্যদের মাঞ্চুরিয়া প্রবেশে সম্মত হয় এই আশায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র কুওমিনটাং সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। কিন্তু ইয়াল্টা চুক্তির ছদ্মাবরণে সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ায় নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে জাপানীদের পরিত্যক্ত শিল্প সরঞ্জামের অর্ধেকের বেশী ধ্বংস কিংবা অপসারণ করে। উত্তর-পূর্ব চীনে সোভিয়েতদের উপস্থিতির সুযোগে চীনা কমিউনিস্টরা জাপানী সেনাবাহিনীর সমর্পিত অস্ত্রশস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে।

www.pathagar.com

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চীন সরকার মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সরকারের অনুসৃত নীতিতে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে, জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং তারা একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। ইয়ানান এবং অন্যান্য মুক্তাঞ্চলে মাও সে তুং মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ কায়েমে সক্ষম হন। তিনি জনগণের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে, তাদের অনুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে এবং তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম হতে দলের ক্যাডারদের নির্দেশ দেন। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুক্তাঞ্চলে সক্রিয় কর্মীদের বলা হতো 'রেড' বা লাল এবং শত্রু অধিকৃত ভূখণ্ডে গোপন তৎপরতায় লিপ্ত ক্যাডারদের বলা হতো 'হোয়াইট' বা সাদা। কমিউনিস্ট সৈন্যরা যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেদের একটি দক্ষ বাহিনীতে পরিণত করে। মাও সে তুং তার শক্তিশালী ঘাঁটি ইয়ানান থেকে অনেক দূরে একটি নয়া চীন গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি সংহত করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন। তার দেয়া শিক্ষাই ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মূলমন্ত্র এবং একসময়ে এসব শিক্ষা মাও সে তুয়ের চিন্তাধারা নামে পরিচিতি লাভ করে। সুসংগঠিত সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচারণায় কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টির্র কর্মীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১ লাখ সেখানে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তা ১২ লাখে উন্নীত হয়। এক পর্যায়ে কুওমিনটাং সরকার ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যায়। এ লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে কুওমিনটাংরা তাইওয়ানে পালিয়ে যায় এবং কমিউনিস্টরা মূল ভূখণ্ডে বিজয়ী হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ আরো এক বছর স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হলেও হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দু'টি আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় নাটকীয়ভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। চীনে অবস্থানকারী জাপানী সৈন্যরা ১৯৪৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৩ সালে কায়রো সম্মেলনের শর্ত অনুযায়ী মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান ও পেসকাদোরস দ্বীপপুঞ্জ চীনের কাছে ফেরত দেয়া হলেও রায়ুকিউ দ্বীপপুঞ্জ জাপানী ভূখণ্ড হিসেবে বহাল থাকে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে জাপানের দখলদারিত্ব ও নৃশংসতাকে কখনো মহিমান্বিত আবার কখনো বা এসব ঘটনায় মিথ্যার প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। চীনে জাপানের দখলদারিত্বকালে নানজিংয়ে গণহত্যা, 'ইউনিট ৭৩১' এবং কমফোর্ট উইমেন নামে খ্যাত ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলো ঘটে।

চীনে অভিযানকালে জাপানের রাজকীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ লাখ। ২১ লাখ সৈন্যের একটি তাঁবেদার চীনা বাহিনীও গড়ে তোলা হয়েছিল। অন্যদিকে, চীনের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪৩ লাখ এবং অনিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ১৩ লাখ। যুদ্ধ স্থায়ী হয় ৯৭ মাস তিন দিন। চীনা সৈন্য নিহত হয় ৩২ লাখ ২০ হাজার, ক্রসফায়ারে নিহত বেসামরিক চীনাদের সংখ্যা ছিল ৯১ লাখ ৩০ হাজার। যুদ্ধ বহির্ভূত ঘটনায় আরো হতাহত হয় ৮৪ লাখ। এ যুদ্ধে ৯ কোটি ৫০ লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়।

www.pathagar.com

জাপানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীনাদের কোন্ পক্ষের অবদান বেশী তা এখনো একটি বিতর্কিত বিষয়। মার্কো পলো ব্রিজে চীনা জনগণের জাপানবিরোধী প্রতিরোধ লড়াইয়ের স্মারক শোভা পেলেও গণচীন জোর দিয়ে দাবি করছে যে, কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র শক্তি যারা জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীনা জনগণকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে জাপানী আগ্রাসন প্রতিহত করেছে। তবে পরে কমিউনিস্ট গণচীন স্বীকার করছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী জেনারেলও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাদামাটাভাবে 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত না করে 'চীনা জনগণের জাপান বিরোধী প্রতিরোধ লড়াই' হিসেবে চিহ্নিতকরণে গণচীনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এ কথার আংশিক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। গণচীনের সরকারী অভিমত হচ্ছে যে, জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাংরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তাদের শক্তি সংরক্ষণের অশুভ আশায় জাপানীদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লড়াই এড়িয়ে গেছে। কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে জাপানী সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

কুওমিনটাং সূত্রের বাইরে জাপানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো তৃতীয় সূত্রগুলোর মতে, জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সত্যিকারভাবে কমিউনিস্টরা গৌণ ভূমিকা পালন করেছে। কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং কুওমিনটাংয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ে আফিম বিক্রি করেছে। চীন ও জাপানের মধ্যে বড় ধরনের যে ২২ টি লড়াই হয়েছিল কমিউনিস্টরা সেগুলোতে মূল শক্তি ছিল না। এটাই সত্যি কথা যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যোদ্ধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কোয়াডে বিভক্ত হয়ে গেরিলা হামলা চালিয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সোভিয়েত লিয়াজোঁ পিটার ভ্লাদিমিরভ বলেছেন, তিনি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কখনো কমিউনিস্টদের দেখতে পাননি। কমিউনিস্ট পার্টি তাকে অগ্রবর্তী অবস্থান সফরে যেতে বাধা দেয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাপানীরা কমিউনিস্টদের চেয়ে জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাংয়ের তাদের প্রধান শত্রু বলে ভাবতো। জাতীয়তাবাদীদের যুদ্ধকালীন রাজধানী চোংকিংয়ে জাপানীরা এমন ভয়াবহ বোমাবর্ষণ করে যে, তখন পর্যন্ত এত বোমা আর কোনো শহরে ফেলা হয়নি। কুওমিনটাংদের শক্তি ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে তিনগুণ বেশী। সংখ্যায় অধিক হওয়ায় জাপানীরা জাতীয়তাবাদীদের তাদের জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করছেন যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনা ওয়ারলর্ড বা যুদ্ধবাজরাই মূলত লড়াই চালিয়েছে। চিয়াং কাইশেকের সেনাবাহিনীর বিরাট অংশের নেতৃত্ব দিয়েছে যুদ্ধবাজরাই। কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীরা একে অপরের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার কৌশল গ্রহণ করায় তাদের কেউ জাপানীদের বিরুদ্ধে পুরো শক্তি ব্যবহার করেনি। এ অবস্থায় যুদ্ধবাজরাই দখলীকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অথচ এ সত্য খুব কম লোকই জানে। কমিউনিস্ট ও কুওমিনটাং উভয়েই ছিল যুদ্ধবাজদের বিপক্ষে।

www.pathagar.com

পার্ল হারবারে জাপানী হামলা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ক'টি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ। এটাই হচ্ছে ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বার বৈদেশিক আক্রমণ। প্রথম দফা হামলা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডে। হামলাকারী ছিল সাবেক উপনিবেশিক শক্তি গ্রেট বৃটেন। দ্বিতীয় দফা বৈদেশিক হামলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ড থেকে হাজার মাইল দূরে দেশটির ৫০তম অঙ্গরাজ্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালের মে'তে। এখনো এ যুদ্ধের আলোচনা শেষ হয়নি। পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের পটভূমি বিশ্লেষণে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এ নৌ ঘাঁটিতে জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে সঠিক গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলও জানতেন। তবে তারা জেনেও পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ রোধে ছিলেন পুরোমাত্রায় নিষ্ক্রিয়। চার্চিলের নিষ্ক্রিয়তাকে মেনে নিলেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিষ্ক্রিয়তাকে কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। নিজ দেশে বিদেশী আক্রমণের গোয়েন্দা তথ্য পেয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কেন নীরবতা পালন করেছিলেন- এ প্রশ্ন অনেকের মনকেই আলোড়িত করছে। বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে ধরা পড়ে যে, দেশপ্রেম কিংবা কর্তব্যবোধের অভাব থেকে নয়, জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনেই তিনি পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধে ছিলেন উদাসীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ করার স্বার্থে পার্ল হারবারের মতো একটা ট্রাজেডির প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজনের তাগিদেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপানীদের হামলা চালানোর সুযোগ দিয়েছেন। এবার এ হামলা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পার্ল হারবারে জাপানী হামলা

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ভোরে জাপানের রাজকীয় নৌ-বাহিনীর জঙ্গীবিমান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ ও আর্মি ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে। এ হামলা ইতিহাসে পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ এবং পার্ল হারবারের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ২৬ নভেম্বর কঠোর গোপনীয়তার ভেতর ভাইস এডমিরাল চুইচির নেতৃত্বে ৬টি বিমানবাহী রণতরীর একটি জাপানী নৌ-বহর পার্ল হারবারের উদ্দেশে হিতোকাপু উপসাগর ত্যাগ

www.pathagar.com

করে। ৭ ডিসেম্বর ভোরে জাপানী নৌ-বহরের জঙ্গীবিমানগুলো পার্ল হারবারে হিকাম সামরিক ঘাঁটিসহ অন্যান্য ঘাঁটি এবং এ দ্বীপে নোঙ্গর করা মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করে। জাপানী বোমাবর্ষণে ঘাঁটিতে রক্ষিত প্রায় প্রতিটি মার্কিন জঙ্গীবিমান বিধ্বস্ত হয়। মাত্র কয়েকটি উড়ে যেতে সক্ষম হয়। বেঁচে যাওয়া এসব বিমান আক্রমণ মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১২টি যুদ্ধজাহাজ হয়তো ধ্বংস হয় নয়তো ডুবে যায়। ১৮৮টি জঙ্গীবিমান ধ্বংস হয় এবং ২,৪০৩ জন আমেরিকান নিহত হয়। বিস্ফোরিত হয়ে রণতরী ইউএসএস আরিজোনা ডুবে যায় এবং ১ হাজার ১শ' নাবিক প্রাণ হারায়। ইউএসএস আরিজোনার খোল পার্ল হারবারে জাপানী হামলার স্মারক হিসেবে এখনো দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

ইউএসএস ওয়ার্ড নামে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ জাপানের একটি সাবমেরিন ডুবিয়ে দিলে পার্ল হারবারে প্রথম জাপানী গোলাটি বর্ষিত হয়। পার্ল হারবারে ৫টি জাপানী সাবমেরিন এসে ওঁৎ পেতে থাকে। এগুলোর লক্ষ্য ছিল বোমাবর্ষণ শুরু হওয়া মাত্র মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলোতে টর্পেডো নিক্ষেপ করা। তবে জাপানী সাবমেরিনগুলো অক্ষত যেতে পারেনি। ৫ টির মধ্যে ৪টি সাবমেরিন ফিরে যেতে পেরেছিল। পার্ল হারবারে যেসব জাপানী বিমানবাহী রণতরী অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে ছিল আকাগি, হিরায়া, কাগা, শুকাকো, সোরায়া ও যুইকাকু। এসব বিমানবাহী রণতরীতে ছিল বোমারু ও টর্পেডো নিক্ষেপকারী বোমারু বিমানসহ ৪৪১টি যুদ্ধবিমান। যুদ্ধে ৫৫টি জাপানী যুদ্ধ বিমান খোয়া যায়। বিমানগুলো দু'টি তরঙ্গে হামলা চালায়। এডমিরাল নগুমো প্রত্যাহারের স্বার্থে তৃতীয় দফা হামলার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

পার্ল হারবারে আক্রমণের লক্ষ্য

পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌশক্তিকে ক্ষণকালের জন্য হলেও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। জাপানী এডমিরাল ইয়ামামোতো অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পার্ল হারবারে জাপানী হামলা সফল হলেও জাপানী যুদ্ধজাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে বড়জোর এক বছর স্বাধীনভাবে তৎপরতা চালাতে পারতো। ১৯৩১ সালে চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ শুরু হয় এবং এ যুদ্ধে জাপান ১৯৩৪ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। চীনের আরো গভীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে পার্ল হারবারে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। রাজকীয় জাপানী নৌ-বাহিনীর কয়েকটি মহড়া চালানোর পর এ অভিযান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং সে বছরের মাঝামাঝি এ মিশনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। পার্ল হারবারে হামলা চালানোর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে দেয়া। ওয়াশিংটনস্থ জাপানী দূতাবাসের বিশেষ প্রতিনিধি এডমিরাল কিমুরাসহ কূটনীতিকরা গ্রীষ্মে ইন্দোচীনে জাপানের অগ্রাভিযানে মার্কিন বিরোধিতা প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। পার্ল হারবারে হামলার সামান্য আগে জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ওয়াশিংটনস্থ দূতাবাসে একটি

www.pathagar.com

বার্তা পাঠানো হয়। হামলা শুরু হওয়ার একটু আগে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হালের কাছে বার্তাটি হস্তান্তরে দূতাবাসকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বার্তার পাঠোদ্ধার এবং টাইপে বিলম্ব ঘটায় এটি যথাসময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। প্রকৃত হামলা শুরু হওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বার্তাটি পৌঁছানো হয়। বার্তাটি বিলম্বে পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আরো বেশী ক্ষেপে যায়। এডমিরাল ইয়ামামোতো বার্তা প্রেরণে বিলম্বের কথা সেদিনই জানতে পারেন। এতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা বোধ হয় একটি ঘুমন্ত দৈত্যকে জাগিয়ে দিলাম এবং প্রতিশোধ গ্রহণে এ দৈত্যকে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণে বাধ্য করলাম।'

জাপানী দূতাবাস বার্তাটির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হওয়ার অনেক আগে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বার্তাটির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়। বার্তার পাঠোদ্ধার করার পর জেনারেল মার্শাল সেদিন ভোরে হাওয়াইয়ে হুঁশিয়ারি সংকেত পাঠান। এ বার্তাটি হামলা শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর বাইসাইকেল আরোহী জাপানী বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান তরুণ পার্ল হারবারে জেনারেল শর্টের কাছে হস্তান্তর করে। বার্তায় 'জরুরি বার্তা' কথাটি লেখা না থাকায় এবং বিতরণে বিলম্ব ঘটায় যথাসময়ে এটি পৌঁছতে পারেনি।

পার্ল হারবারে হামলার পটভূমি

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি দক্ষিণাঞ্চলীয় ইন্দোচীনে জাপানী অগ্রাভিযানে বিশ্বের বৃহৎশক্তিগুলো জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। সে বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক সরকার জাপানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাপানের অর্থনীতির প্রতি এ হুমকি দেশটিকে ইন্দোচীনে অগ্রাভিযান পুনর্বিবেচনা করতে এবং আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে বাধ্য করে। পার্ল হারবার জাপানী ভূখণ্ডের খুব কাছাকাছি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের একটি বিরাট অংশ এখানে মোতায়েন করা হয়। পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ-বাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ ছিল ইন্দোচীনে জাপানী অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তির তৎপরতা জাপানী সামরিক বাহিনীকে আরো ভূখণ্ড দখল এবং অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ বৃহৎ শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় জাপানের সীমিত তেল উৎপাদন এবং জ্বালানি মজুদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা জাপানী নেতৃবৃন্দকে এশিয়ার বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের সরবরাহ দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করে। জাপানীরা এ কথা ভাবেনি যে, তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে যুক্তরাষ্ট্র নীরব থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ বিনষ্ট করে দেয়ার জন্যই এডমিরাল ইয়ামামোতো প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করতে থাকেন। পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে আঘাত হানার চিন্তাভাবনা ছিল এ পরিকল্পনার অংশ। জাপানী সূত্র জানায় যে, এডমিরাল ইয়ামামোতো ১৯৪১ সালের গোড়াতেই পার্ল হারবারে আঘাত হানার

www.pathagar.com

সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে থাকেন এবং কিছু প্রাথমিক পর্যালোচনা করার কয়েক মাস পর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অপারেশনাল কাজকর্ম শুরু করেন। খোদ জাপানী নৌ-বাহিনীতেই এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চরম আপত্তি ছিল। এক পর্যায়ে এডমিরাল ইয়ামামোতো হুমকি দেন যে, এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। গ্রীষ্মের শেষদিকে সম্রাট হিরোহিতোর সভাপতিত্বে এক রাজকীয় সম্মেলনে এ অপারেশনের প্রাথমিক অনুমতি দেয়া হয়। নভেম্বরে আরেকটি সম্মেলনে এ অভিযানের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

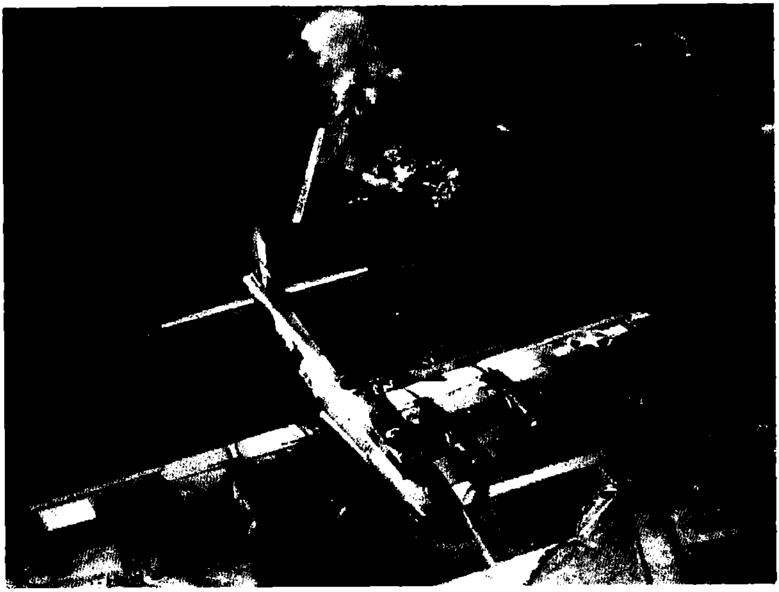

পার্ল হারবারে জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণ

তাৎক্ষণিক ফলাফল

স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে পার্ল হারবারে জাপানী হামলার কৌশলগত সাফল্য ছিল অভাবিত যা সমকালীন সামরিক ইতিহাসে বিরল। পরবর্তী ৬ মাসে মার্কিন নৌ-বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে অন্যান্য দেশের নৌ উপস্থিতির ভীতি থেকে জাপান রক্ষা পায়। এ কৌশলগত সুবিধা জাপানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয় লাভে সহায়তা করে।

দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল

দীর্ঘমেয়াদে পার্ল হারবারে জাপানী হামলার ফলাফল ছিল দেশটির জন্য একটি চরম বিপর্যয়। পার্ল হারবারে জয়লাভ করার অর্থ এই ছিল না যে, পুরো মার্কিন নৌ-শক্তির

www.pathagar.com

উপর জাপানের বিজয়। পার্ল হারবারে জাপানী হামলার মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ধ্বংস করে দেয়া। কারণ এ তিনটি বিমানবাহী রণতরীর বিমানগুলোই প্রশান্ত মহাসাগরে তৎপরতা চালাতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিমানবাহী রণতরীগুলো রক্ষা পেয়ে যায়। তবে অন্যান্য মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে দেয়া ছিল জাপানের জন্য এক বিরাট সাফল্য। পার্ল হারবারে মোতায়েন যুদ্ধ জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে বিমানবাহী রণতরী ও সাবমেরিনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। বিমানবাহী রণতরী ও সাবমেরিনের সাহায্যেই পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র জাপানী হামলা মোকাবিলা করে। পার্ল হারবারে মোতায়েন যুদ্ধ জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের যতটুকু ক্ষতি হবে বলে জাপানীরা ধারণা করেছিল ততটুকু ক্ষতি হওয়ার হিসাব করা ছিল ভুল। বরং জাপানের এ হামলা দ্বিধাবিভক্ত মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। এমন একটি ট্রাজেডি ছাড়া মার্কিনীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো কিনা সন্দেহ। পার্ল হারবারে জাপানী হামলা যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করে এবং মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানীদের আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করে তোলে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, পার্ল হারবারে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ডিপো অথবা সমরাস্ত্র কারখানা কিংবা ওই তিনটি বিমানবাহী রণতরী ধ্বংস কিংবা নিমজ্জিত হলেও দেশটির ক্ষতি খুব একটা হতো না এবং তাতে জাপানের ভাগ্যেরও হেরফের ঘটতো না। যুদ্ধে তার পরিণতি যা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তাই হতো ।

মার্কিন জবাব

১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর মার্কিন কংগ্রেস জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একজন মাত্র সদস্য যুদ্ধের বিপক্ষে ভোটদান করেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তিনি আগেরদিন পার্ল হারবারে জাপানী হামলাকে একটি 'কালো দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার সামরিক সমাবেশ ঘটাতে শুরু করে।

১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে জাপানী হামলার ৪ দিন পর ১১ ডিসেম্বর নাৎসী জার্মানী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণার কারণ কি- এ প্রশ্ন এখনো রহস্যাবৃত। অক্ষশক্তির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অথচ দেশটির বিরুদ্ধে তিনি বিনা উস্কানিতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে মার্কিন জনগণ আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয় এবং বৃটেনকে যুদ্ধে সহায়তা দানে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে প্ররোচিত করে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

লেক্সিনটন ও কনকর্ডের যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধও ইতিহাসের মোড় পরিবর্তকারী একটি ঘটনা। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ডুবিয়ে দিতে জাপানী নৌ-বাহিনী ব্যর্থ হওয়ায় এ যুদ্ধের সামরিক গুরুত্ব খুব সামান্য। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ধ্বংস কিংবা ডুবে

www.pathagar.com

গেলেও দীর্ঘমেয়াদে জাপানের কোনো লাভ হতো না। পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রকে তার অমিত অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে যার ফলে বিশ্বব্যাপী অক্ষশক্তি পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর জয়লাভ এবং একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রতিক্রিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ একটি বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত হলেও এতে মাত্র ৫টি রণতরী স্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে যায়। রণতরীগুলো হচ্ছে ইউএসএস আরিজোনা, ইউএসএস ওকলাহোমা ও ইউএসএস ওটাহ্ এবং ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস ক্যাসিন ও ইউএসএস ডাউন্স। ইউএসএস আরিজোনার পেছনের দিকের দু'টি টারেট (কামান দাগার নল) উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএস ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও ইউএসএস নেভাদাসহ বাদবাকি যে ৪টি রণতরী নিমজ্জিত হয় সেগুলোও পরে মেরামত করে ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়। এ যুদ্ধে যে ২২টি জাপানী রণতরী অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি জাহাজ রক্ষা পায়। অনেকেই বলছেন যে, পার্ল হারবারে তৃতীয় দফা হামলা চালিয়ে তেল সংরক্ষণ স্থাপনা, মেশিন শপ ও ড্রাই ডক ধ্বংস করে দেয়া হতো জাপানীদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। এসব স্থাপনা ধ্বংস হলে মার্কিন নৌ-বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতো। কারণ কয়েক হাজার মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল ছাড়া হাওয়াইয়ের নিকটবর্তী আর কোনো নৌ-ঘাঁটি ছিল না। বিভিন্ন কারণে এডমিরাল চুইচি নগুমো তৃতীয় দফা হামলা চালাতে চাননি। কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, (১) দ্বিতীয় দফা হামলায় হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রথম দফা হামলার চেয়ে প্রচুর। তৃতীয় দফা হামলা চালালে হতাহতের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতো। (২) দু'দফা হামলায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত জঙ্গীবিমানগুলো অংশ নেয়। তৃতীয় দফা হামলা চালানোর প্রয়োজনে জঙ্গীবিমানগুলোকে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হতো। এতে যে সময় লাগতো সে সময়ের মধ্যে আমেরিকানরা নগুমোর সৈন্যদের খুঁজে বের করে ফেলতো। (৩) জাপানী বিমানগুলো পার্ল হারবারের উপকূলে বোমাবর্ষণের জন্য ইতিপূর্বে অনুশীলন করেনি। (৪) জাপানীদের জ্বালানির পরিমাণ ছিল সীমিত। পরবর্তী হামলা চালাতে গেলে তাদের জ্বালানি ঘাটতি দেখা দিতো। (৫) তৃতীয় দফা হামলা চালাতে গেলে বোমাবর্ষণের পর বিমানবাহী রণতরীতে জঙ্গীবিমানগুলোর ফিরতে রাত হয়ে যেতো। ১৯৪১ সালে জাপানী বিমানবাহী রণতরী শৈশব অতিক্রম করছিল। এ অপরিপক্ক অবস্থায় বিমানবাহী রণতরী থেকে রাতের অন্ধকারে অপারেশন চালানো ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, রাতে রণতরী থেকে জঙ্গীবিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণ দু'টিই ছিল তখন জাপানীদের কাছে অপরিচিত। (৬) দ্বিতীয় দফা হামলাতেই জাপানীদের কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। এ হামলায় আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর অকেজো হয়ে যায়।

www.pathagar.com

(৭) শেষ কথা হলো প্রায় একই অবস্থান থেকে হামলা চালানো ছিল বিপজ্জনক। জাপানীরা খুবই ভাগ্যবান যে, তারা ইনল্যান্ড সী থেকে হাওয়াইয়ে হামলা চালালেও মার্কিন নজরদারি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পার্ল হারবারে জাপানী হামলায় চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রচুর আমেরিকান কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একজন নন-কমিশন্ড অফিসার জাপানী হামলাকালে তার যুদ্ধজাহাজ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ অফিসারের নাম ডোরিস মিলার। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ডোরিস মিলার তার দায়িত্বের চেয়েও বেশী কিছু করেছিলেন। তিনি একটি অব্যবহৃত মেশিনগান তুলে নিয়ে ঘাঁটি রক্ষায় বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে নেভি ক্রস পদকে ভূষিত করা হয়েছিল।

পার্ল হারবারে জাপানী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী জাপানীদের অন্তরীণ করা হয়। জাপানীদের অন্তরীণ করার পেছনে ছিল পার্ল হারবারে জাপানের আকস্মিক হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে পরবর্তীতে যুদ্ধাবস্থা। অন্যদিকে, জাপানীদের অন্তরীণ করার পেছনে মার্কিনীদের বর্ণবাদী মানসিকতাও কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলের কমান্ডার- ইন -চীফ জেনারেল জন ডুয়িট আইসেনহাওয়ারও (পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট) বর্ণবাদী মানসিকতা পোষণ করতেন। জেনারেল আইসেনহাওয়ার দাবি করতেন যে, জাপানী বংশোদ্ভূতরা অন্তর্ঘাত এবং গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত। সন্দেহভাজন জাপানীদের বন্দী করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে সুপারিশ করেন। তবে জাপানীদের প্রতি তার সন্দেহের কোনো প্রমাণ ছিল না।

১৯৯১ সালে গুজব রটে যে, জাপান পার্ল হারবারে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইবে। তবে এ গুজব সত্যি হয়নি। জাপান ক্ষমা চায়নি। তবে জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, পার্ল হারবারে যে মুহূর্তে হামলা শুরু হয়, জাপান ঠিক তার ২৫ মিনিট আগে রাত ১ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিলম্ব ঘটায় হামলা শুরু হওয়ার পরও জাপানী রাষ্ট্রদূত এ ঘাষণা দিতে পারেননি। এজন্য জাপান সরকার ক্ষমা চাইছে।

আগাম তথ্য লাভের বিতর্ক

১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকেই এ বিতর্ক চলছে যে, যুক্তরাষ্ট্র কেন এবং কি কারণে জাপানী হামলা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা কখন এবং কিভাবে জাপানী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলেন সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলছেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তা এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও বৃটিশ কর্মকর্তারা জাপানী হামলা সম্পর্কে আগাম তথ্য পেয়েছিলেন। তারা জাপানী হামলা প্রত্যাশা করতেন এমনকি উৎসাহও যোগাতেন যাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যুক্তরাষ্ট্রের অজুহাত তৈরি হয়। ঐতিহাসিক স্টিনেটের একটি বইয়ে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়। স্টিনেট বলেছেন, ১৯৪১ সালের ৭ অক্টোবর নেভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের লেঃ কমান্ডার আর্থার ম্যাককুলাম এ অফিসের ডিরেক্টরের জন্য যে স্মারকপত্র তৈরি করেছিলেন তার একটি কপি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দু'জন সামরিক উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার এ্যান্ডারসন ও ডুডলে নক্সের কাছেও পাঠিয়েছিলেন। এ স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, শুধুমাত্র মার্কিন স্বার্থের উপর সরাসরি একটি আক্রমণই আমেরিকান জনমতকে ইউরোপীয় যুদ্ধ বিশেষ করে বৃটেনের সমর্থনে যুদ্ধে নামতে প্রভাবিত করতে পারে। এন্ডারসন ও নক্স জাপানকে প্ররোচিত করতে ৮টি পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, এ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হলে জাপান কোনো না কোনোভাবে হামলা চালাতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে খুবই চমৎকার হবে। ওই স্মারকলিপির বিবরণও পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিভিন্নভাবে প্রতিপক্ষের পর্যাপ্ত গোপনীয় তথ্য ফাঁস হয় এবং সেগুলো হাতবদল হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের হস্তগত হয়। এসব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহারে ব্যর্থতার দরুণ কোথাও কোথাও গুজব তৈরি হয়। মার্কিন সরকার পার্ল হারবারে হামলার ব্যাপারে ৯টি আনুষ্ঠানিক তদন্ত পরিচালনা করেছে। এগুলোর মধ্যে ছিল ১৯৪১ সালে নৌসচিব নক্সের নেতৃত্বে একটি তদন্ত, ১৯৪১-৪২ সালে রবার্ট কমিশন, ১৯৪৪ সালে হার্ট তদন্ত, ১৯৪৪ সালে আর্মি পার্ল হারবার বোর্ড, একই বছরে নেভাল কোর্ট তদন্ত, হিউট তদন্ত, দ্য ক্লার্ক তদন্ত, ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেসের তদন্ত এবং ১৯৪৫ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিমসনের নেতৃত্বে তদন্ত এবং ১৯৪৫ সালে হেনরি ক্লসেনের তদন্ত।

একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পার্ল হারবারে জাপানীদের হামলা চালানো ছিল সত্যি দুরূহ। এ পোতাশ্রয়ের গভীরতা তত বেশী ছিলা না। অগভীর পানিতে টর্পের্ডো হামলা চালানো দুঃসাধ্য। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত টর্পেডো খুব সহজেই অগভীর পানিতে তলিয়ে যায়। পরে এগুলো পানির উপরে ভেসে উঠে এবং অসময়ে বিস্ফোরিত হয়। এভাবে টর্পেডোগুলো জাহাজের উপরিভাগে কিংবা উপকূলের কাঁদামাটিতে বিস্ফোরিত হয়। এতে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা খুবই কম। তবে বৃটিশরা ১৯৪০ সালের ১১ নভেম্বর টারান্টোতে ইতালীয় নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলায় অগভীর পানিতে পরিবর্তিত মডেলের টর্পেডো নিক্ষেপ করে সাফল্য অর্জন করেছিল। মার্কিন বাহিনী টর্পেডো নিক্ষেপে এ পরিবর্তিত কৌশল সম্পর্কে ধারণা রাখতো না। জাপানীরা ১৯৪১ সালে অনুশীলনের সময় কৃত্রিম অগভীর পানিতে পরিবর্তিত মডেলের টর্পেডো নিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ব করেছিল।

১৯৪১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংকেত ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের ও অতুলনীয়। কিন্তু পার্ল হারবারে হামলার আগে মার্কিন সামরিক বাহিনী জাপানীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই পেয়েছিল। জাপান সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ পররাষ্ট্র দপ্তরকে আস্থায় আনতে পারতো না এবং পররাষ্ট্র দপ্তরকে তারা পরিত্যাগ করেছিল। এ দু'টি গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ফলে পার্ল হারবারে জাপানী হামলা ত্বরান্বিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

পার্ল হারবারে জাপানীদের হামলায় কমপক্ষে দু'জন জার্মান এজেন্ট সহায়তা দিয়েছিল। এদের একজন ছিল অটো কাহন এবং আরেকজন দাস্কু পোপভ। অটো কাহন হাওয়াইয়ে তার পরিবার নিয়ে বসবাস করতো। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ক্রিয় এজেন্ট। দাস্কু পোপভ ছিলেন একজন যুগোস্লাভ ব্যবসায়ী। দাস্কু ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করলেও লোকাটি ছিল বৃটিশদের প্রতি অনুগত। তিনি যেসব গোয়েন্দা তথ্য পেতেন সেগুলো বৃটিশদের মাধ্যমে পৌঁছে দিতেন মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে।

১৯৪১ সালের পুরোটা বছর যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও হল্যান্ড উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পেয়েছিল যে, জাপান নতুন করে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে। তবে পার্ল হারবারে জাপানী হামলা ছিল একটি সাইড অপারেশন। তাদের মূল যুদ্ধ ছিল মালয় ও ফিলিপাইনে। পার্ল হারবারে হামলায় যত সম্পদ নিয়োজিত করা হয়েছিল, জাপানী রাজকীয় বাহিনী তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ নিয়োজিত করেছিল এ দু'টি রণাঙ্গণে। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধে জাপানের অধিক গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফরাসী ইন্দোচীন, ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দেয়া হচ্ছিল। ১৯৪১ সালে জাপানে নিযুক্ত পেরুর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পার্ল হারবারে জাপানী হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারে। মার্কিন অথবা বৃটিশ কোনো গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টেই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে হামলার কোনো প্রমাণ ধরা পড়েনি। তবে সকল গোয়েন্দা তথ্যেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে বৈদেশিক হামলা আসন্ন। এ ধরনের ইঙ্গিত পেয়েও পরাশক্তি আমেরিকা আসন্ন বৈদেশিক হামলার ব্যাপারে মোটেও উদ্বিগ্ন ছিল না। সকল তথ্য প্রমাণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পার্ল হারবারে জাপানী হামলা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত। এ হামলা আমেরিকাকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার ধার পরীক্ষা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

জাপানে সোভিয়েত সামরিক অভিযান

বিলুপ্ত কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালে জাপানে যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল তার ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন আগস্ট স্টর্ম।' এ অপারেশনের আওতায় বর্তমান মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার মেনজিয়াং, শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অভিযান চালানো হয়। বর্তমানে গণচীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাঞ্চুরিয়া ছিল তখন জাপানের দখলে। মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন ছিল ১০ লাখ জাপানী সৈন্য। হোক্কাইডো, কিয়ুশু, হনশু ও শিকুকু দ্বীপ নিয়ে গঠিত জাপানের হোম আইল্যান্ড বা মূল ভূখণ্ডে তখনো ২৩ লাখ সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। বার্মা, ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ক'টি ভূখণ্ড হারানোর পর দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও জাপানের ইম্পেরিয়াল মিলিটারি কমান্ড বিশ্বাস করতো যে, কাঁচামালের যোগানদাতা মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলে তারা হোম আইল্যান্ডে মিত্রবাহিনীর যে কোনো অগ্রাভিযানের মুখে লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কিন্তু ৮ হাজার ২শ' সোভিয়েত সৈন্যের বিপরীতে ৮৩ হাজার সৈন্য নিহত এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হোক্কাইডো দ্বীপের অদূরে কুরিল দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটায় টোকিও অনিবার্য পরাজয় স্বীকার করে নেয়। জাপানীদের সঙ্গে ১৯৪৫ সালেই প্রথম নয়, তার আগেও আরো একবার সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা হয়। ১৯৩৯ সালে কোয়ানটাং আর্মি মঙ্গোলিয়া দখল করতে গিয়ে সোভিয়েত জেনারেল জর্জি ঝুকভের কাছে পরাজিত হয়।

জাপানে সোভিয়েত সামরিক অভিযানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এটি কোরীয় যুদ্ধের বীজ বপন করে এবং ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৩ সালে কায়রো সম্মেলনে মিত্রবাহিনী কোরিয়াকে একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গঠন করার অঙ্গীকার করলেও সোভিয়েত রেড আর্মি বা লাল ফৌজ সেখানে প্রবেশ করেই ৩৮তম অক্ষরেখা সীল করে দেয়। ফলে দেশটি দু'টুকরো হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট মধ্যরাতের পর সোভিয়েত সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে। ৯ দিনের মাথায় তারা ৫ থেকে সাড়ে ৯ শ' কিলোমিটার এগিয়ে যায়। আগস্ট মাসে শুরু হয়েছিল বলে এ অপারেশনের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন আগস্ট স্টর্ম।' ইনার মঙ্গোলিয়া থেকে জাপান সাগর পর্যন্ত ৪ হাজার ৪ শ' বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে তদানীন্তন সোভিয়েত লাল ফৌজ অভিযান চালায়। রণাঙ্গনের বিশালতা ছিল গোটা পশ্চিম ইউরোপের সমান। এটি ছিল জাপান সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত সামরিক অভিযান। মাত্র এক সপ্তাহে জাপানীরা পরাজিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন মাসের মাথায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশ নেবে বলে ইয়াল্টা সম্মেলনে পশ্চিমা মিত্রদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইউরোপে জার্মানী ৮ মে আত্মসমর্পণ করে। জার্মানীর আত্মসমর্পণের ঠিক তিন মাস পর ৮ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানে হামলা চালায়। যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল। তাই জাপানে এ হামলা ছিল চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন। নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের আগের দিন সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান আক্রমণ করে।

১৯৪৫ সালের মার্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। এপ্রিলে ইউরোপীয় রণাঙ্গন থেকে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম দূরপ্রাচ্যে স্থানান্তর শুরু হয়। দু'টি পৃথক রুটে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করা হতো। ফার ইস্টার্ন ফ্রন্টে আগে থেকেই সোভিয়েত সৈন্যদের একটি অংশ মোতায়েন করা ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র সোভিয়েতরা পূর্ব রণাঙ্গনে মনোযোগ দেয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের আনন্দে তারা ছিল তখন উদ্বেলিত। মে-জুলাই নাগাদ পূর্ব ইউরোপ থেকে ফার ইস্টার্ন ফ্রন্টে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়। মে-জুন নাগাদ ৩০ ডিভিশন সৈন্য স্থানান্তর সম্পন্ন হয়। ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে কার্যতঃ সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন শেষ হয়ে যায়। সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম বহনে ১ লাখ ৩৬ হাজার রেল কার ব্যবহার করা হয়। জুন-জুলাইয়ে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল লাইনে প্রতিদিন ৩০-৩২ টি করে ট্রেন চলাচল করেছে। সোভিয়েতরা জাপানীদের ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। সৈন্য ও রসদ সরবরাহের জন্য তারা রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয়। উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারদের নাম পরিবর্তন করে জুনিয়র অফিসার পরিচয়ে মাঞ্চুরিয়ায় পাঠানো হতে থাকে। সোভিয়েতরা এ কৌশল অবলম্বন করায় জাপানীরা তাদের শক্তিকে খাটো করে দেখতে থাকে। অধিকাংশ জাপানী ধারণা করেছিল যে, সোভিয়েতরা ১৯৪৫ সালের শরৎ কিংবা ১৯৪৬ সালে বসন্তের আগে হামলা চালাতে সক্ষম হবে না। আগস্টে হামলা হতে পারে-এ কথা খুব কম জাপানীই ভাবতো। জাপানীরা বিশ্বাস করতো যে, ইউরোপে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যস্থতা করবে।

মার্শাল আলেক্সান্ডার, এম, ভাসিলেভস্কির আওতায় ফার ইস্টার্ন কমান্ড এ হামলা পরিচালনা করে। ১৯৪৫ সালের জুনে তাকে ফার ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। ইউরোপ থেকে সোভিয়েত সামরিক সদর দপ্তর দূরপ্রাচ্যে স্থানান্তর করা হয়। ৩০ জুলাই ফার ইস্টার্ন কমান্ড গঠন করা হয়। ফ্রন্ট কমান্ডার পদে আরো দু'জন মার্শালকে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন মার্শাল আর, মালিনোভস্কি ও মার্শাল কে,এ, মেরেৎস্কভ। জেনারেল এম,ভি জাখারভ ও এ,এন ক্রুটিকভকে ফ্রন্ট চীফ অব স্টাফ পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। এছাড়া আরো ৪ জন জেনারেলকে আর্মি কমান্ডার

www.pathagar.com

হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন জেনারেল এ,পি বেলোবোরদভ, আই এম, ক্রিস্টিয়াকভ, এন ডি, জাখবাতায়েভ ও এ,এ লুসিনস্কি।

রেড আর্মির তিনটি ফ্রন্টের সমন্বয়ে ফার ইস্টার্ন কমান্ড গঠন করা হয়। প্রথম ফ্রন্টের নাম ছিল ট্রান্স বৈকাল ফ্রন্ট। এ ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল মেনজিয়াং ও পশ্চিমাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়া দখল করা। এতে ছিল সেভেন্টিন্থ আর্মি, থারটি সিক্সথ আর্মি , থারটি নাইন্থ আর্মি, ফিফটি থার্ড আর্মি, সিক্সথ গার্ডস ট্যাংক আর্মি, ক্যাভালরি-ম্যাকানাইজড গ্রুপ, টুয়েবলথ এয়ার আর্মি।

ফার্স্ট ইস্ট ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল পূর্বাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়া দখল। এ ফ্রন্টে ছিল সেকেন্ড রেড ব্যানার আর্মি, ফিফটিন্থ আর্মি, সিক্সটিন্থ আর্মি ও টেন্থ এয়ার আর্মি। সেকেন্ড ফার ইস্টার্ন ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল উত্তরাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়া দখল করা। এ ফ্রন্টে ছিল ফার্স্ট রেড ব্যানার আর্মি, ফিফথ আর্মি, থারটি ফাইভ আর্মি, চুগুইভস্ক অপারেশনাল গ্রুপ ও আমুর রিভার ফ্লোটিলা।

জাপানে হামলার আগে মঙ্গোলিয়ায় মোতায়েন সোভিয়েত সৈন্যদের অবস্থান ছিল এরূপ। প্রতিটি ফ্রন্টে ছিল ফ্রন্ট ইউনিট। এসব ফ্রন্ট ইউনিট সেনাবাহিনীর পরিবর্তে সরাসরি ফ্রন্টে সংযুক্ত ছিল। ৮০ টি ডিভিশনে বিভক্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ৭৭ হাজার ২২৫, ট্যাংক ছিল ৫ হাজারের বেশী (তার মধ্যে ৩ হাজার ৭শ' ছিল টি-৩৪এস), ২৮ হাজার কামান, ৫ হাজার ৩৬৮টি বিমান (তার মধ্যে ৩ হাজার ৭ শ' দ্রুতগামী)। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তির আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ মঙ্গোলিয়ায় পাঠানো হয়। ফার ইস্ট-এ সোভিয়েত নৌ-বহরে ছিল ১২ টি বৃহদায়তনের যুদ্ধজাহাজ, ৭৮ টি সাবমেরিন, অসংখ্য উভচর যান ও আমুর রিভার ফ্লোটিলা। আমুর রিভার ফ্লোটিলায় ছিল প্রচুর গানবোট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌ-যান। জার্মানদের সঙ্গে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে সোভিয়েতরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার সবগুলো অভিজ্ঞতা তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগায়। জাপানীদের উপর সোভিয়েতরা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে হামলা করতো।

সোভিয়েত হামলা মোকাবিলায় জেনারেল ওতোসুজো ইয়ামাদার নেতৃত্বাধীন কোয়ানটাং আর্মি ছিল জাপানী প্রতিরক্ষার মূল স্তম্ভ। এটি ছিল মাঞ্চুরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় জাপানী দখলদার বাহিনীর মূল অংশ। এতে ছিল তিনটি এরিয়া আর্মি ও তিনটি স্বতন্ত্র আর্মি। একটি সুঙ্গারিয়ান নেভাল ফ্লোটিলা কুয়ানটাং আর্মিকে নৌ সহায়তা দিতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গেলে জাপানের ইম্পেরিয়াল হাই কমান্ড ৩৪ তম ও সপ্তদশ আর্মিকে কোয়ানটাং আর্মির সঙ্গে সংযুক্ত করে। ১৯১৯ সালে কোয়ানটাং ভূখন্ড রক্ষায় এ আর্মি গঠন করা হয়। ১৯৪১ সালে এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ লাখ। তবে ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে কোয়ানটাং আর্মির দক্ষ ডিভিশনগুলো মাঞ্চুরিয়া থেকে প্রত্যাহার করা হয়। কোয়ানটাং আর্মিতে ছিল দু'টি ট্যাংক ও ৬ টি মিশ্র স্বতন্ত্র ডিভিশনসহ ২৪ টি ডিভিশন। এতে ছিল ১,২১৫ টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান, ৬ হাজার ৭ শ' কামান ও ১ হাজার ৮ শ' বিমানবিধ্বংসী কামান এবং ১ হাজার ২১৫টি বিমান। অধিকাংশ ট্যাংক ও কামান ছিল হাল্কা। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো ছিল

www.pathagar.com

সেকেলে। উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন ফার্স্ট এরিয়া আর্মিতে ছিল থার্ড আর্মি ও ফিফথ আর্মি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন থার্ড এরিয়া আর্মিতে ছিল ত্রিশতম ও চুয়াল্লিশতম আর্মি। স্বতন্ত্র এরিয়া আর্মিতে ছিল ফোর্থ ও থারটি ফোর্থ আর্মি। ফোর্থ আর্মির দায়িত্ব ছিল উত্তরাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়াকে রক্ষা করা। থারটি ফোর্থ আর্মিকে থার্ড ও সেভেনটিন্থ আর্মির মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। জেনারেল কিতা সেইচির নেতৃত্বাধীন ফার্স্ট এরিয়া আর্মিতে ছিল থার্ড ও ফিফথ আর্মি গ্রুপ। প্রতিটি আর্মি গ্রুপে ছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন। ফার্স্ট আর্মিতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২২ হাজার ১৫৭ জন। জেনারেল ইউশিরোকু জুনের নেতৃত্বাধীন থার্ড এরিয়া আর্মিতে ছিল ৪ টি পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়ে ৩০তম আর্মি, একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড। ৪৪ তম আর্মিতে ছিল ৩ টি পদাতিক ডিভিশন, একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড। থার্ড আর্মির সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮০ হাজার ৯৭১ জন। লেঃ জেনারেল ইউমুরা মিকিওর নেতৃত্বাধীন ফোর্থ সেপারেট আর্মিতে ছিল ৩ টি পদাতিক ডিভিশন ও ৪ টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড। সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯৫ হাজার ৬৬৪ জন।

মেনজিয়াং রক্ষার দায়িত্বে ছিল কোয়ানটাং ডিফেন্স আর্মি। দক্ষিণ কোরিয়া রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেভেনটিন্থ এরিয়া আর্মির উপর। প্রতিটি জাপানী এরিয়া আর্মির আয়তন ছিল পাশ্চাত্যের আর্মির সমান। প্রতিটি এরিয়া আর্মিতে ছিল হেডকোয়ার্টার্স ইউনিট। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সৈন্য ছাড়াও ছিল ৪০ হাজার সৈন্যের মাঞ্চুকু ডিফেন্স ফোর্স। মাঞ্চুকু ডিফেন্স ফোর্সের অস্ত্রশস্ত্র ছিল নিম্নমানের ও প্রশিক্ষণের মানও ছিল নীচু। মাঞ্চুরিয়ার প্রতিরক্ষায় জাপানী রাজকীয় নৌ-বাহিনী কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। কৌশলগত কারণে জাপানী নৌ-বাহিনী বরাবরই মাঞ্চুরিয়ায় দখলদারিত্বের বিরোধিতা করতো। জাপানী ডিভিশনগুলো তাদের অনুমোদিত অস্ত্রশস্ত্র পায়নি। তাছাড়া ভারি সমর সম্ভারগুলোর অধিকাংশই প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ফলে কোয়ানটাং আর্মির ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে এটি একটি হাল্কা পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হয়। অধিকৃত চীনে জাপানীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও কাঁচামাল সরবরাহের মূল উৎস ছিল মাঞ্চুরিয়া। এক কথায় সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের কোনো তুলনায়ই ছিল না। জাপানীরা দাবি করছে যে, মাঞ্চুরিয়ায় তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ১৩ হাজার ৭২৪ জন। তাহলে এ হিসাবের ভিত্তিতে যুদ্ধকালে মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন সোভিয়েত ও জাপানী সৈন্যদের অনুপাত ছিল $১\frac{১}{২}$ঃ১। ট্যাংক ও কামানের অনুপাত ছিল $৪\frac{৮}{১০}$ঃ১। বিমান শক্তির অনুপাত ছিল ২ঃ১। সোভিয়েত সৈন্যরা ছিল তখনকার বিশ্বে সবচেয়ে সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত বাহিনী।

মাঞ্চুরিয়া ছিল সোভিয়েত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ১৫ লাখ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ বিশাল ভূখণ্ডের কৌশলগত গুরুত্বের জন্য এখানে প্রথমে চীনা ও জাপানী এবং পরে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন হামলা চালাতে প্রলুব্ধ হয়। ১৯৪১ সালে জার্মানী লেনিনগ্রাদ ও স্টালিনগ্রাদ অবরোধ করলে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের সম্ভাব্য হামলার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এ ভয় থেকে সে দূরপ্রাচ্যে দু'টি ট্যাংক ও দু'টি মোটর

www.pathagar.com

সজ্জিত রাইফেল ডিভিশনসহ মোট ৪০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। তবে জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দেশটি কিছুটা স্বস্তিতে ছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় দ্বিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণ চালানো হয়। রেড আর্মি তাদের রিসাপ্লাই রেলওয়ের অনেক দূর দিয়ে মঙ্গোলিয়া থেকে মরুভূমি ও পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে। এতে জাপানী সামরিক বিশ্লেষকগণ সোভিয়েতদের লজিস্টিক সহায়তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয় এবং অরক্ষিত অবস্থানে জাপানীরা পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। লড়াইয়ের প্রথম ১৮ঘন্টায় জাপানী কমান্ডার নিরুদ্দেশ ছিলেন এবং যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে অগ্রবর্তী ইউনিটগুলোর সঙ্গে জাপানীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জাপানীরা এ ভুল ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল যে, অক্টোবরে সোভিয়েত হামলা হবে। স্থল সৈন্যদের অগ্রাভিযানের স্বার্থে সোভিয়েতরা বিমান বন্দর ও শহরের কেন্দ্রস্থল দখলে ছত্রী ইউনিটগুলোকে ব্যবহার করে। যেসব ইউনিট সরবরাহ লাইনের বাইরে চলে গিয়েছিল তাদের কাছে জ্বালানি সরবরাহ পৌছাতে ছত্রী সেনাদের ব্যবহার করা হয়। ১৬ আগস্টের মধ্যে আক্রমণকারী সোভিয়েতরা কার্যকরভাবে বিজয়ী হয়। ১৫ আগস্ট জাপান সম্রাট হিরোহিতো 'গায়োকুয়ন-হোসো' বা আত্মসমর্পণে রাজকীয় বাণী পাঠ করেন এবং পরদিন থেকে এ অঞ্চলে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। কার্যতঃ এক সপ্তাহ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এ সময়ের মধ্যে জাপানীদের সাহসিকতাপূর্ণ এবং আত্মঘাতি পাল্টা হামলা সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশে সক্ষম হয়। তারা মাঞ্চুরিয়ায় তাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে এবং ২০আগস্টের মধ্যে তারা মুকদেন, চেংচুন ও কুইকিহারে পৌছে যায়। একই সময় রেড আর্মি ও তার মঙ্গোলীয় মিত্ররা 'গুইহুয়া'র সহায়তায় মেনজিয়াংয়ে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত তা দখল করে নেয়। ১৮ আগস্ট স্থল হামলা শুরুর আগে কয়েকটি উভচর অবতরণ ঘটানো হয়। এসব উভচর অবতরণ অভিযানের মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় কোরিয়ায় পরিচালনা করা হয় তিনটি, শাখালিনে একটি এবং কুরিল দ্বীপপুঞ্জে আরো একটি। উভচর অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় যে, সোভিয়েত সৈন্যরা কোরীয় উপদ্বীপে আগেই পৌছে গিয়েছিল এবং পূর্বাহ্নে পৌছে যাওয়া সৈন্যরা স্থল সৈন্যদের এগিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিল। শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সোভিয়েতদের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বিমানে সরবরাহ পৌছানো অসম্ভব হয়ে উঠায় কোরীয় উপদ্বীপের প্রবেশ মুখে ইয়ালু নদীর অদূরে সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। সোভিয়েত সৈন্যরা কোরীয় উপদ্বীপের উত্তরাংশে ৩৮ তম অক্ষরেখা বরাবর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পরে এই ৩৮ তম অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়া উপদ্বীপ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৮ সেপ্টেম্বর মার্কিন অস্টম ও ষষ্ঠ আর্মির সৈন্যরা ইনচনে অবতরণ করলে গোটা কোরীয় উপদ্বীপ দখলে সোভিয়েতদের উচ্চাশা ব্যর্থ হয়। মার্কিন অস্টম আর্মিতে ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য। ৬টি কোর, ১১টি ডিভিশন, ৩ টি রেজিমেন্টাল কম্ব্যাট টীম ও শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট নিয়ে এ আর্মি গঠিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের এ শক্তিশালী বাহিনীকে ষষ্ঠ আর্মি বরাবরই সহায়তা দিয়ে যেতো। আত্মসমর্পণের দলিলে জাপানের

www.pathagar.com

স্বাক্ষর দানের ৬ দিনের মাথায় মার্কিন সৈন্যরা কোরীয় উপদ্বীপে অবতরণ করে। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েতরা হোক্কাইডোতে কখনো হামলা চালায়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অপারেশন আগস্ট স্টর্ম' পরিচালনা এবং জাপানের হনশু দ্বীপের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনা জাপানীদের আত্মসমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করে। বিশ্বের দু'টি পরাশক্তি একযোগে হামলা চালালে জাপান মাথা নত করে। জাপানীরা দ্বীর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, হোম আইল্যান্ড রক্ষা করার আশাও তাদের নেই। কোনো কোনো সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও জাপানী সূত্র উল্লেখ করছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের চেয়ে মাঞ্চুরিয়ার পতন এবং চীনে পূর্ণ বিপর্যয়ের আসন্ন হুমকি জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তবে এটা সত্যি, জাপানীরা কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে যাবার আগে পুঁজিবাদী আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণে আগ্রহী ছিল।

জাপানে সোভিয়েত সামরিক অভিযানে উভয়পক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে একপক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের হিসাব মিলে না। সোভিয়েতদের হিসাব মতে, নিহত জাপানী সৈন্য সংখ্যা ৮৩ হাজার ৭৩৭ এবং যুদ্ধবন্দী ৫ লাখ ৯৪ হাজার। তবে জাপানীরা দাবি করছে যে, তাদের নিহত সৈন্য সংখ্যা ২১ হাজার। একইভাবে জাপানীদের হিসাব মতে, নিহত সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা হলো ২০ হাজার এবং আহত ৫০ হাজার। অন্যদিকে, সোভিয়েতদের হিসাব মতে, তাদের সৈন্য নিহত হয়েছে ৮ হাজার ২১৯ এবং আহত হয়েছে ২২ হাজার ২৬৪ জন।

সোভিয়েত দখলীকৃত মাঞ্চুরিয়া তদানীন্তন চীনের কুওমিনটাং সরকারের বিরুদ্ধে মাও সে তুয়ের কমিউনিস্ট বাহিনীর একটি মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী ৪ বছর চীনে গৃহযুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছে। মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক অভিযানে বিজয়ী হওয়ায় পশ্চিমা মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চীনে ঘাঁটি গাড়তে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করলে মিত্রবাহিনী তাদের কাছে বিজিত ভূখণ্ড হস্তান্তর করে। ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় তাকে শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ উপহার দেয়া হয়। পোর্ট আর্থার এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগসহ দাইরেনের উপর তাদের স্বার্থ স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে দাইরেন গণচীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ আজো সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উত্তরসূরি রাশিয়ার দখলে। ১৯৫৬ সালে মস্কো ও টোকিওর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও হোক্কাইডো দ্বীপের কাছাকাছি 'নর্দান টেরিটোরিজ' ফেরত দেয়া নাগাদ জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানায়।

কোরীয় উপদ্বীপে তৎকালীন দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব পরবর্তীতে বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দেয় এবং কোরিয়াকে বিভক্ত করে রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিজম এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ও ইন্ধনে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম হয়। উত্তর কোরিয়া থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আজো মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি।

www.pathagar.com

হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ

জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তাৎক্ষণিক নিহত হয় ১ লাখ ২০ হাজার লোক এবং পরে প্রাণ হারায় তার দ্বিগুণ। আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর ১৫ আগস্ট জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এ বোমা ব্যবহারে ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র ঘটনা। প্রতি বছর ৬ আগস্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবস পালিত হয়। ৬ আগস্ট সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মহাপ্রলয় থেকে একটি ঘড়ি রক্ষা পায়। সে ঘড়ির কাটা ৮ টা ১৫ মিনিটে এসে থেমে রয়েছে।

আণবিক বোমা ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা শুরু থেকেই তুমুল বির্তকের জন্ম দিয়েছে। মার্কিনীরা এ অভিমত পোষণ করতো যে, আণবিক বোমা নিক্ষেপ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নয়তো জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত অভিযানে উভয়পক্ষে আরো প্রচুর লোক হতাহত হতো। অন্যদিকে, জাপানীদের অভিমত, এ বোমা ব্যবহার করা ছিল অপ্রয়োজনীয়। আণবিক বোমার হাত থেকে যারা বেঁচে রয়েছে তাদেরকে বলা হয় 'হিবাকুশা'। এটি একটি জাপানী শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত লোক। আণবিক বোমার ভয়াবহতা জাপানকে বিশ্ব থেকে এ অস্ত্র নির্মূলে উদ্বুদ্ধ করে।

'ম্যানহাটন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্র গোপনে হিরোশিমায় ব্যবহৃত দ্বিতীয় এবং নাগাসাকিতে ব্যবহৃত তৃতীয় আণবিক বোমাটি তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রকে এ দু'টি আণবিক বোমা তৈরিতে যুক্তরাজ্য ও কানাডা সহায়তা করে। আমেরিকা ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে 'ট্রিনিটি' ছদ্মনামে প্রথম আণবিক বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বোমা পরীক্ষার ছদ্মনাম ছিল দ্য গ্যাজেট। ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র না হওয়ায় বোমাটির এ ধরনের নামকরণ করা হয়। আণবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, ট্রুম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৩ লাখ লোক নিহত হয়। অর্ধেক লোক নিহত হয় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। ধ্বংস এবং আরো ধ্বংসের ভীতি সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি টানাই ছিল আণবিক বোমা নিক্ষেপে নির্দেশ দানে ট্রুম্যানের আনুষ্ঠানিক যুক্তি। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

ট্রুম্যান নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন : 'জাপানী জনগণকে চরম ধ্বংস থেকে রক্ষায় ২৬ জুলাই পটসড্যাম চরমপত্র দেয়া হয়। তাদের নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিক এ চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হুমকি দেয়া হয়েছিল যে, তারা আমাদের শর্তে রাজি না হলে তাদের উপর এমন বোমা নিক্ষেপ করা হবে যা পৃথিবী কখনো দেখেনি।'

১৯৪৫ সালের ১০-১১ মে লস অ্যালামোসের টার্গেট কমিটি নিম্নোক্ত টার্গেটগুলো বোমাবর্ষণের জন্য বাছাই করে : কিয়োটো, হিরোশিমা, ইয়োকোহোমা, কোকুরা অস্ত্রাগার, নিগাতা এবং সম্রাটের প্রাসাদ। রবার্ট জাংকের ভাষায়, হিরোশিমা, নিগাতা ও কাকুরা ছাড়া সংক্ষিপ্ত তালিকায় বোমা নিক্ষেপের জন্য অন্যান্য যেসব টার্গেট নির্বাচন করা হয় সেগুলোর বাইরে কিয়োটো ছিল জাপানের মন্দিরের শহর। এ ভয়াবহ সংবাদ শুনে জাপান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এডউইন ও' রেইচার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে তার চীফ মেজর আলফ্রেড ম্যাককোরম্যাকের অফিসে ছুটে যান। অধ্যাপক এডউইনের কাছ থেকে এ ভয়াবহ সংবাদ পেয়ে নিউইয়র্কের মানবতাবাদী মেজর আলফ্রেড ম্যাককোরম্যাক আবেগে কেঁদে ফেলেন এবং টার্গেট লিস্ট থেকে কিয়োটোর নাম বাদ দিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেনরি এল, স্টিমসনকে রাজি করান।

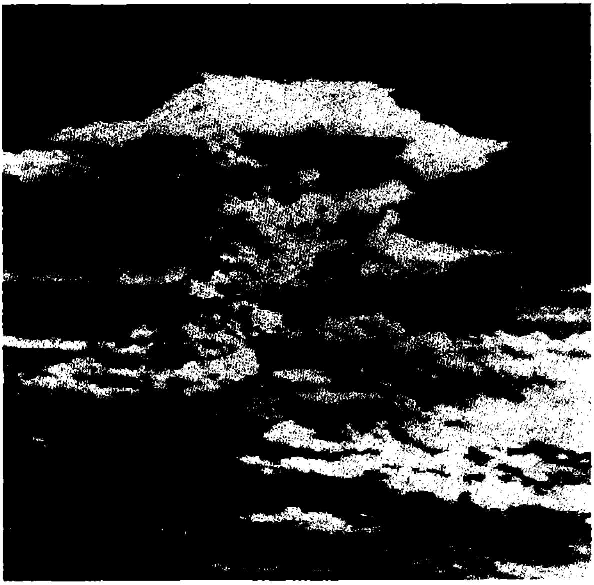

হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দৃশ্য

১৯৮৬ সালে অধ্যাপক এডউইন রেইচার তার 'মাই লাইফ বিটুউইন জাপান এন্ড আমেরিকা' নামে পুস্তকের ১০১ পৃষ্ঠায় এ ঘটনা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ ধরনের সুযোগ পেলে সম্ভবত আমি তাই করতাম। কিন্তু তার এক বিন্দুও সত্যি নয়। আমার বন্ধু কিয়োটোর দোশিশার ওটিস ক্যারি যথার্থভাবে প্রমাণ করেছেন যে,

www.pathagar.com

কিয়োটোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কৃতিত্ব এককভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যানরি এল, স্টিমসনের। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসন কিয়োটো নগরীকে চিনতেন। কয়েক দশক আগে সেখানে মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের পর থেকে তিনি শহরটির ভূয়সী প্রশংসা করতেন।'

রিচার্ড রোডস এ বক্তব্য আংশিকভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, জেনারেল লেসলি গ্রোভের প্রস্তাব উপেক্ষা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসন কিয়োটোতে আণবিক বোমা নিক্ষেপে অস্বীকার করেন।

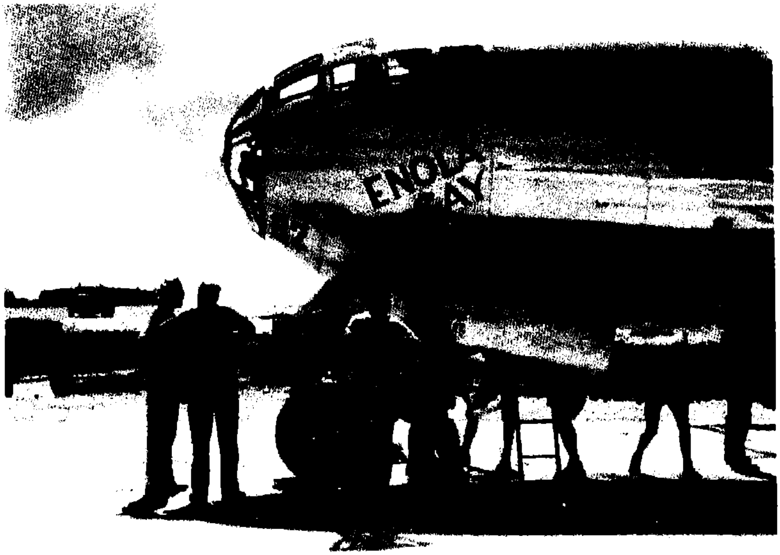

এই সেই অভিশপ্ত মার্কিন বোমারু বিমান এ্যানোলা গে যা জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে

বোমাবর্ষণকালে হিরোশিমার উল্লেখযোগ্য শিল্প ও সামরিক গুরুত্ব ছিল। হিরোশিমার কাছাকাছি কয়েকটি সামরিক স্থাপনা ছিল। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পঞ্চম ডিভিশনের সদর দপ্তর এবং ফিল্ড মার্শাল হাতার নেতৃত্বাধীন সেকেন্ড জেনারেল আর্মি হেডকোয়ার্টার্স। হাতার নেতৃত্বাধীন এ আর্মি হেডকোয়ার্টার্স পুরো দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতো। হিরোশিমা ছিল জাপানী সামরিক বাহিনীর একটি প্রধান সরবরাহ ও লজিস্টিক ঘাঁটি। শহরটি ছিল একটি যোগাযোগ ও মজুদ কেন্দ্র এবং সৈন্যদের সমবেত হওয়ার স্থান। মিত্রবাহিনীর পূর্ববর্তী বোমা হামলায় শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা নিরূপণের একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবে এটিকে বেছে নেয়া হয়। শহরটিকে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। মহিলা, শিশু এবং সামরিক অফিস ও সামরিক কলকারখানায় কর্মরত কোরীয়দের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয় এবং যে কোনো আগ্রাসন মোকাবিলায় তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল কংক্রীটের তৈরি শক্তিশালী ভবন। তাছাড়া ছিল

www.pathagar.com

হাল্কা ভবন। শহরের কেন্দ্রস্থলের বাইরের জায়গাটি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের দোকানে ঠাসা। শহরতলীতে ছিল কয়েকটি বৃহদায়তনের শিল্প কারখানা। জাপানীদের ঘরবাড়ি ছিল কাঠের তৈরি। তবে ছাদ ছিল টাইলসের। বেশ ক'টি শিল্প কারখানার কাঠামো ছিল কাঠের। সবদিক থেকে শহরটি ছিল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মতো।

যুদ্ধের শুরুতে হিরোশিমার লোকসংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার অতিক্রম করেছিল। কিন্তু জাপান সরকারের নির্দেশে লোকজনকে পর্যায়ক্রমে অন্যত্র স্থানান্তর করায় আণবিক বোমাবর্ষণের আগে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। আণবিক বোমা হামলার সময় শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লাখ ৫৫ হাজার। জাপানীদের সংরক্ষিত তালিকা অনুযায়ী হিরোশিমার লোকসংখ্যার এ হিসাব পাওয়া যায়। তবে এ সংখ্যার মধ্যে শহরে যেসব অতিরিক্ত শ্রমিক ও সৈন্য আনা হয়েছিল তারা সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আণবিক হামলার লক্ষ্যবস্তু। বিমানে জাপান থেকে আনুমানিক ৬ ঘন্টা দূরে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় টিনিয়ান বিমান ঘাঁটি থেকে এনোলা গে উড্ডয়ন করে। টিনিয়ান হচ্ছে গুয়াম থেকে কয়েক শ' মাইল উত্তরে নর্থান মেরিয়ানাসের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। লক্ষ্যবস্তুর উপরে আগে থেকে ঘন মেঘের আস্তরণ থাকায় ৬ আগস্ট বোমাবর্ষণের তারিখ ঠিক করা হয়। বিমান উড্ডয়নের সময় আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ক্রু ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করছিল। নেভির ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন্স উড্ডয়নের পর বিমানটিকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করেন। উড্ডয়নকালে ঝুঁকি হ্রাসে বিমানে আণবিক বোমা তোলা হয়নি। পরিকল্পনা-মাফিক হামলা চালানো হয়। বোমাটির ওজন ছিল ৬০ কেজি বা ১৩০ পাউন্ড।

বোমাবর্ষণের এক ঘন্টা আগে জাপানী পূর্ব সতর্কীকরণ রাডারে দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপান অভিমুখে কয়েকটি আমেরিকান বিমান এগিয়ে আসার দৃশ্য ধরা পড়ে। সতর্কতা ঘোষণা করা হয় এবং অনেকগুলো শহরে রেডিও সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। হিরোশিমাও ছিল তাদের একটি। অনেক উঁচু দিয়ে বিমানগুলো জাপান উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রায় ৮ টার দিকে হিরোশিমার রাডার অপারেটর নিশ্চিত হয়, খুব অল্প সংখ্যক সম্ভবত দুই থেকে তিনটি বিমান এগিয়ে আসছে। বিমানের সংখ্যা এত কম হওয়ায় সতর্কতা তুলে নেয়া হয়। যে তিনটি বিমান এগিয়ে আসছিল তাদের একটি ছিল 'এনোলা গে'। এ বোমারু বিমানটি আণবিক বোমা বহন করছিল। বিমানের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল পল টিবেটস। ১৯৪৫ সালের ৫ আগস্ট টিবেটস আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৪-৮৬২৯২ নম্বরের বোমারু বিমানকে 'এনোলা গে' নামকরণ করেন। এনোলা গে ছিল তার মায়ের নাম। তার নানার একটি প্রিয় উপন্যাসের নায়িকার নাম ছিল এনোলা গে। টিবেটসের নানা উপন্যাসের নায়িকার নামানুসারে তার মেয়ের নাম রেখেছিলেন এনোলা গে। জাপান উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা আরেকটি বিমানের নাম ছিল 'দ্য গ্রেট আর্টিস্ট'। এটি ছিল একটি রেকর্ডিং ও জরিপকারী বিমান। তৃতীয় বিমানটির নাম ছিল 'নেস্যাসারি ঈভিল'। নেস্যাসারি ঈভিল ছিল একটি ফটোগ্রাফিক বিমান। স্বাভাবিক রেডিও সতর্কতার মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়, বি-২৯ বোমারু

www.pathagar.com

বিমান দেখা গেলে তাদেরকে শেল্টারে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হবে। ৮ টা ১৫ মিনিটে বি-২৯ এনোলা গে হিরোশিমার ঠিক কেন্দ্রস্থলে 'লিটল বয়' নামে বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। বিমানটি চালাচ্ছিলেন কর্নেল পল টিবেটস। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বোমাটির সময় লেগেছিল প্রায় এক মিনিট। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ফুট উচুঁতে ১৩ কিলোটন শক্তিতে 'লিটল বয়' বিস্ফোরিত হয়। যেখানে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় সে জায়গাটিকে বলা হয় 'এ-বোম্ব ডোম।' বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ৮০ হাজার বেসামরিক লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হিরোশিমায় আণবিক বোমাবর্ষণ কত ভয়ংকর ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বোমাবষর্ণের পর পর বিমানটি একটি তীব্র আলোতে পূর্ণ হয়ে যায়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। নীরব নিথর। এভাবে কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। প্রথমে মুখ খোলেন কো-পাইলট রবার্ট লুই। তিনি বোমাবর্ষণকারী কর্নেল পল টিবেটসের পিঠে একটি ধাক্কা দিয়ে বললেন, ঐদিকে তাকাও, ঐদিকে তাকাও। তিনি ধাক্কা দেয়ায় টিবেটস পেছন ফিরে হিরোশিমার দিকে তাকান। তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একটি ছাতার মতো ভয়ংকর ঘন মেঘে শহরটি ঢাকা পড়ে গেছে। শহরটি ফুটছে। ঝলসে যাচ্ছে। রবার্ট লুই আণবিক বোমার বিদারণের স্বাদ পাচ্ছিলেন। তার কাছে এ স্বাদ সীসার মতো মনে হচ্ছিল। কোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধ একটি শহর ধ্বংস্তুপে পরিণত হওয়ার দৃশ্য দেখে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর আমরা একি করলাম!'

জাপানী ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের টোকিও কন্ট্রোল অপারেটর আকস্মিকভাবে হিরোশিমা স্টেশনের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারলেন। তিনি অন্য একটি টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পুনরায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। প্রায় ২০ মিনিট পর টোকিও রেইলরোড টেলিগ্রাফ কেন্দ্র উপলব্ধি করতে পারলো যে, হিরোশিমার ঠিক উত্তরে মূল টেলিগ্রাফ লাইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। শহরের ১০ মাইলের মধ্যে কয়েকটি ছোট্ট রেলগাড়ী থামে এবং হিরোশিমায় বিস্ফোরণের বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করে। এসব রিপোর্ট জাপানী জেনারেল স্টাফের হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানো হয়। সামরিক হেডকোয়ার্টার্স হিরোশিমায় আর্মি কন্ট্রোল স্টেশনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা চালায়। শহরের পুরো নিস্তব্ধতায় হেডকোয়ার্টার্স হতবাক হয়ে পড়ে। হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত সামরিক অফিসারগণ বিশ্বাস করতেন, হিরোশিমায় শত্রুদের বড় ধরনের কোনো হামলা হতে পারে না। তারা আরো জানতেন, হিরোশিমায় বিস্ফোরণ ঘটার মতো বিশাল কোনো বিস্ফোরক মজুদ নেই। এ পরিস্থিতিতে জাপানী জেনারেল স্টাফের একজন তরুণ অফিসারকে অবিলম্বে হিরোশিমায় অবতরণ করে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নিয়ে টোকিওতে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। হেডকোয়ার্টার্সে সাধারণভাবে ধারণা করা হতো, হিরোশিমায় গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেনি। যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো গুজব। স্টাফ অফিসার বিমান বন্দরে ছুটে যান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়ে যেতে থাকেন। তিন ঘন্টা উড্ডয়ন করে তিনি হিরোশিমার ১শ' মাইলের মধ্যে পৌঁছে যান। ততটুকু দূর থেকে এ অফিসার ও তার পাইলট হিরোশিমার আকাশে একটি ঘন মেঘের বিশাল কুণ্ডলী দেখতে পেলেন।

www.pathagar.com

সেদিনের উজ্জ্বল দুপুরে হিরোশিমা তখনো জ্বলছিল। তাদেরকে বহনকারী বিমানটি শহরে পৌঁছে আকাশে চক্কর দিতে লাগলো। এসময় তারা যা দেখছিলেন তা ছিল অবিশ্বাস্য। ভূমিতে একটি বিরাট গর্ত, অবশিষ্ট ঘরবাড়ী জ্বলছে, ধোয়ার একটি বিশাল কুণ্ডলীতে গোটা শহর আচ্ছাদিত। তারা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবতরণ করেন এবং টোকিওতে ফিরে আসার পরই স্টাফ অফিসার ত্রাণ সংগ্রহে নেমে পড়েন।

টোকিও কর্তৃপক্ষ হিরোশিমাতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ জানতে পারে হোয়াইট হাউসের ঘোষণা থেকে। আণবিক বোমা নিক্ষেপের ১৬ ঘন্টা পর হোয়াইট হাউস এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেয়। বিস্ফোরণের পর যারা জীবিত ছিলেন তাদের আনুমানিক ১ শতাংশ মানুষ বিস্ফোরণ-পরবর্তী তেজস্ক্রিয়তায় মারা যায়। ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ এক হিসাবে বলা হয়, বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তায় আরো ৬০ হাজার লোক মারা গেছে। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৪০ হাজারে। এরপর তেজস্ক্রিয় সংক্রান্ত কারণে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২০০৪ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত হিরোশিমায় আণবিক বোমাবর্ষণে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬২ জন। তবে তাদের মধ্যে বোমার প্রতিক্রিয়ায় কত জন মারা গেছে তা ছিল অস্পষ্ট। ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ জাপানে বোমায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার।

ভূমিকম্পের আশংকায় হিরোশিমায় কংক্রীটের তৈরি কয়েকটি ভবন অত্যন্ত মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এসব ভবনের কাঠামো ভেঙ্গে পড়েনি। বোমাটি আকাশে বিস্ফোরিত হওয়ায় বিস্ফোরণের তীব্রতা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে নিম্নগামী হয়। এ কারণে গ্রাউন্ড জিরো থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে প্রিফেকচার‍্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন হল রক্ষা পায়। চেক স্থপতি জ্যান লেতজেল এ ভবন নির্মাণ করেছিলেন। হিরোশিমার ধ্বংসযজ্ঞকে হিরোশিমা পীস মেমোরিয়াল বা হিরোশিমা শান্তি স্মারক বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইউনেস্কো ১৯৯৬ সালে এটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে গ্রহণ করে।

কর্নেল পল টিবেটস হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করায় কখনো দুঃখ প্রকাশ করেননি। ২০০৫ সালের মার্চে তিনি সদম্ভে বলেছেন,' অনুমতি পেলে আমি আবার একই কাজ করবো।' অন্য একবার তিনি বলেছিলেন, মাছি মারলে গণনা করার প্রয়োজন হয় না।

বোমাবর্ষণকালে পল টিবেটস ছিলেন কর্নেল। ১৯৫৯ সালে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালের ৩১ জুলাই তিনি মার্কিন বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ষাটের দশকে তাকে ভারতে সামরিক এ্যাটাশে হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ভারতের সকল রাজনৈতিক দল টিবেটসের উপস্থিতির বিরোধিতা করায় তার নিয়োগ বাতিল করা হয়। পল টিবেটস বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন এ নির্দেশের সঙ্গে একমত। এজন্য মানবজাতি তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

www.pathagar.com

নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় আণবিক বোমাবর্ষণ

হিরোশিয়ার তিনদিন পর ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নাগাসাকিতে ১৯-২৩ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন আণবিক বোমাবর্ষণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হয়। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তৎক্ষণাৎ ৭০ হাজার লোক নিহত এবং পরে বোমার প্রতিক্রিয়ায় তার চেয়ে বেশি লোকের মৃত্যু হয়। নাগাসাকি ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানের অন্যতম বৃহৎ সমুদ্র বন্দর। যুদ্ধকালে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য রণ সম্ভার তৈরি হওয়ায় শহরটির সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হুঁশিয়ারি ছাড়াই নাগাসাকিতে মানব বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। ৮ আগস্ট লীফলেট ফেলা হলেও সেগুলো ১০ আগস্টের আগে পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তবর্তীকালীন কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা জাপানীদের কোনো হুঁশিয়ারি দিতে পারি না। এ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও রেডিও সাইপেনের মাধ্যমে জাপানকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছিল।

নাগাসাকি তখন আজকের মতো সুরম্য অট্টালিকা সজ্জিত শহর ছিল না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ শহরের অধিকাংশ বসত ঘর ছিল জাপানের পুরনো রীতিতে তৈরি। ভবনগুলো ছিল কাঠের তৈরি। ভবনের দেয়ালগুলোও ছিল কাঠের। ছাদ ছিল টাইলসের। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল কাঠ অথবা এ জাতীয় দাহ্য সামগ্রীতে তৈরি। বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলো কোনোক্রমেই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। একটি অপরিকল্পিত শহর হিসেবে নাগাসাকি গড়ে উঠেছিল। লোকজনের বসত ঘর ছিল কলকারখানার খুব কাছাকাছি।

আণবিক বোমা হামলার আগে নাসাসাকিতে কখনো বড় ধরনের কোনো বোমা হামলা হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১ আগস্ট এ শহরে বেশ ক'টি উচ্চ বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এসব বোমার ক'টি পতিত হয় শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শিপইয়ার্ড ও ডক এলাকায়। ক'টি বোমা আঘাত হানে মিৎসুবিশি স্টীল এন্ড আর্মস ওয়ার্কসে। নাগাসাকি মেডিকেল স্কুল ও কলেজে পতিত হয় ৬ টি বোমা। সেখানকার ভবনগুলোর উপর তিনটি বোমা সরাসরি আঘাত হানে। এ স্বল্পসংখ্যক বোমা হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হলেও নাগাসাকির অধিবাসী বিশেষ করে স্কুল ছাত্রদের জন্য তা বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিরাপত্তার জন্য স্কুল ছাত্রদের গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তর করা হয়। ফলে আণবিক বোমা হামলার সময় শহরের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট মেজর চার্লস সুইনি আণবিক বোমা বহনকারী একটি বি-২৯ সুপারফোর্টরেস 'বক্সকার' নিয়ে তার প্রথম টার্গেট কাকুরার আকাশে এসে চক্কর দিতে থাকেন। তখন কাকুরার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। জ্বালানি স্থানান্তরে সমস্যা দেখা দেয়ায় জ্বালানি ফুরিয়ে আসায় তিনি কাকুরার আকাশে তিন বার চক্কর দিয়ে দ্বিতীয় টার্গেট নাগাসাকির দিকে এগিয়ে যান। জাপানের স্থানীয় সময় সকাল ৭ টা ৫০ মিনিটে নাগাসাকিতে সাইরেন বেজে উঠে। তবে সকাল সাড়ে ৮ টায় বিপদমুক্ত সংকেত দেয়া হয়। ১০ টা ৫৩ মিনিটে দু'টি সুপারফোর্টরেস গোচরীভূত হলেও জাপানীরা ধারণা করেছিল, এ দু'টি বিমান বোধ হয় গোয়েন্দা মিশনে টহল দিচ্ছে। এ ধারণা থেকে বিমান আক্রমণের কোনো সংকেত দেয়া হয়নি। তার কয়েক মিনিট পর বেলা ১১ টায় 'দ্য গ্রেট আর্টিস্ট' নামে আরেকটি বি-২৯ সুপারফোর্টরেস পর্যবেক্ষণকারী বিমান থেকে তিনটি প্যারাশূটে সংযুক্ত করে কিছু সামগ্রী ভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়। এ বিমানটি চালাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন ফ্রেডারিক সি, বক। বিমান থেকে যেসব সামগ্রী ফেলা হয় তার মধ্যে ছিল পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক রায়োকিচি সাগানির কাছে লেখা কয়েকটি চিঠি। যে তিনজন বিজ্ঞানী আণবিক বোমা তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক রায়োকিচি তাদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তার উদ্দেশে এসব চিঠি ফেলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ এ চিঠি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১১ টা ২ মিনিটে নাগাসাকির আকাশ মেঘমুক্ত হলে বক্সকার-এর বোম্বার্ডিয়ার ক্যাপ্টেন কারমিট বীহানের দৃষ্টিসীমায় তার লক্ষ্যস্থল ধরা পড়ে। শহরের শিল্পাঞ্চলে ৮ কেজি ওজনের প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সমৃদ্ধ 'ফ্যাটম্যান' নামে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ভূমি থেকে ১৫ শ' ৪০ ফুট উপরে মিৎসুবিশি স্টীল এন্ড আর্মস ওয়ার্কস এবং মিৎসুবিশি ইউরাকামি অর্ডন্যান্স ওয়ার্কসের মধ্যবর্তী জায়গায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। নাগাসাকির ২ লাখ ৪০ হাজার লোকের মধ্যে ৭৫ হাজার লোক নিহত হয়। পরে আণবিক বোমার বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তাজনিত কারণে তার চেয়ে বেশি লোকের মৃত্যু হয়। আরেক পরিসংখ্যানে বলা হয়, নাগাসাকির লোকসংখ্যা ৪ লাখ ২২ হাজার থেকে ৩ লাখ ৮৩ হাজারে নেমে এসেছিল এবং তাদের মধ্যে ৩৯ হাজার লোক নিহত ও ২৫ হাজার আহত হয়। আগে ও পরে সব মিলিয়ে মোট ১ লাখ লোকের মৃত্যু হয়।

আণবিক বোমা হামলার সমর্থকরা স্বীকার করছেন যে, ফিলিপাইনের লুজনে মিত্রবাহিনীর অভিযানের পর জাপানের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাগণ সর্বসম্মতভাবে যে কোনো আলোচনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, জাপানের বেসামরিক নেতৃত্ব ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী থেকে গোপন কূটনৈতিক চ্যানেলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। বেসামরিক নেতৃত্বের কেউ কেউ নিজ উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে আলোচনা চালালেও তাদের কারো যুদ্ধবিরতি কিংবা আত্মসমর্পণের আলোচনা চালানোর ক্ষমতা ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দেশ হিসেবে জাপান কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত অনুমোদনসাপেক্ষে কোনো শান্তি চুক্তিতে উপনীত হতে পারতো। তবে মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জাপানী রাজকীয়

www.pathagar.com

সেনা ও নৌ-বাহিনীর সমরবাদী কর্মকর্তা। এসব কর্মকর্তার সবাই ছিলেন শান্তি চুক্তির বিপক্ষে। ব্যাপক হতাহত ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাপানী সামরিক কর্মকর্তারা লড়াই অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় জাপানের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের মধ্যে একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দেয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভিক্টর ডেভিস হান্সন ক্রমবর্ধমান জাপানী প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে জাপানীদের সংকল্প প্রমাণিত হয়।

জাপানের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাত্র ৮ সপ্তাহ আগে ওকিনাওয়ায় লড়াই হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের এ রণাঙ্গনে ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি জাপানী ও ১২ হাজার আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং 'অপারেশন আগস্ট স্টর্ম' ছদ্মনামে একটি অভিযান চালালে মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন সরবরাহ বঞ্চিত ও দুর্বল সৈন্য বাহিনীকে জাপানী রাজকীয় হাইকমান্ড শেষ সৈন্যটি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন জাপানী সৈন্যরা এ নির্দেশ পালন করে। জাপানী ইম্পেরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন শাখার প্রধান মেজর জেনারেল মাসাকাজু আমানু বর্ণনা করেছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন, '১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি যে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা হোম আইল্যান্ডে মিত্র বাহিনীর যে কোনো আগ্রাসন ন্যূনতম হতাহত সাপেক্ষে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম ছিল।' বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদা ও অহংকারের ঐতিহ্য থাকায় জাপানীরা সহজে পরাভূত হতো না। অনেকেই সামুরাই কোড অনুসরণ করতো এবং শেষ লোকটি জীবিত থাকা নাগাদ লড়াই চালিয়ে যেতো। আণবিক বোমাবর্ষণে হিরোশিমা নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জাপানের বেসামরিক নেতৃত্ব স্থির বিশ্বাসে পৌঁছে যে, যুদ্ধে জাপান পরাজিত হবে। এ উপলব্ধি থেকে তারা ইয়াল্টা ঘোষণা মেনে নিতে সম্মত হয়। নাগাসাকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পরও মন্ত্রিসভায় অচলাবস্থা নিরসনে সম্রাটকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

কোনো কোনো জাপানী ঐতিহাসিকের মতে, আত্মসমর্পণে বিশ্বাসী জাপানী বেসামরিক নেতৃত্ব আণবিক বোমা হামলার মধ্যে নিজেদের রক্ষার সম্ভাবনা দেখতে পান। জাপানী সামরিক বাহিনী দৃঢ়ভাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে থাকায় শান্তিবাদী অংশ আণবিক বোমাবর্ষণকে আত্মসমর্পণের পক্ষে একটি নয়া যুক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। সম্রাট হিরোহিতোর ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা কোইচি কিডো বলেছেন, 'আণবিক বোমা হামলা যুদ্ধাবসানে আমাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে।' ১৯৪৫ সালে জাপানের চীফ কেবিনেট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী হিসাতসুনে সাকোমিজু আমেরিকার আণবিক বোমাবর্ষণকে যুদ্ধাবসানে জাপানের জন্য একটি স্বর্গীয় সুযোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসব ঐতিহাসিক ও অন্যদের মতে, হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ শান্তিবাদী জাপানের বেসামরিক নেতৃত্বকে সামরিক বাহিনীকে এটা বুঝাতে সাহায্য করেছিল যে, যত শক্তি ও দক্ষতা অথবা সাহস থাকুক না কেন, সেগুলো জাপানকে আণবিক বোমার বিরুদ্ধে জয়লাভে সহায়তা করতো না।

www.pathagar.com

আণবিক বোমাবর্ষণের সমর্থকরা একথাও বলছেন যে, জাপানীদের আত্মসমর্পণের জন্য অপেক্ষা করাও ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। জাপানে প্রতি সপ্তাহে প্রচলিত বোমাবর্ষণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাজার হাজার লোক নিহত হচ্ছিল। সাবমেরিন অবরোধ এবং 'অপারেশন স্টারভেশন' ছদ্মনামে মার্কিন বিমান বাহিনীর মাইনিং অপারেশনে জাপানের আমদানি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। শস্যবহুল হোমল্যান্ডস থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় হনশুর শহরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে জাপানের রেলওয়ের বিরুদ্ধে আরেকটি বিকল্প অপারেশনও শুরু হতে যাচ্ছিল। এতে জাপানে দুর্ভিক্ষ ও অপুষ্টি দেখা দিতো। সে ক্ষেত্রে আণবিক বোমা হামলায় যত লোক নিহত হয়েছে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা না হলে প্রাণহানি ঘটতো তার চেয়ে বেশী। ঐতিহাসিক দাইকিচি আরোকাওয়া উল্লেখ করেছেন, কারো কারো ধারণা ছিল যে, জাপানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে আনুমানিক ১ কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে। দক্ষিণাঞ্চলীয় চীন ও মালয়েশিয়ায়ও আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। যুদ্ধে এশিয়ায় প্রতি মাসে ২ লাখ বেসামরিক লোক মারা যাচ্ছিল।

আমেরিকানরা জাপানে পরিকল্পিত হামলায় বহু সৈন্যের প্রাণহানির আশংকা করছিল যদিও সম্ভাব্য হতাহতের সংখ্যা নির্ভর করছিল কতগুলো বিষয়ের উপর। যেমন- প্রতিরোধ লড়াইয়ে জাপানীদের দৃঢ়তা ও সামর্থ্য কিংবা আমেরিকানরা ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে শুধুমাত্র কিয়ুশুতে হামলা চালাতো কিনা অথবা ১৯৪৬ সালের মার্চে টোকিওর কাছে আমেরিকানরা অবতরণ করতো কিনা এসব বিষয়ের উপর। যুদ্ধের বহু বছর পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বায়ারনিস দাবি করেন যে, ৫ লাখ সৈন্য নিহত হতো। পরে অনেকেই তার আওড়ানো সংখ্যার পুনরুক্তি করেছেন। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন সেনাবাহিনীর পরিকল্পনাবিদরা হিসাব করেছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে জাপানে পরিকল্পিত হামলায় ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ১০ হাজার সৈন্য নিহত এবং তার দ্বিগুণ সৈন্য আহত হবে। অনেক সামরিক উপদেষ্টা ধারণা করেছিলেন, পরিস্থিতি চরম প্রতিকূল হলে ১০ লাখ আমেরিকান সৈন্য হতাহত হতে পারে।

আণবিক বোমা ব্যবহৃত হওয়ায় এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটে। জাপানী বন্দী শিবির থেকে ২ লাখ ওলন্দাজ ও ৪ লাখ ইন্দোনেশীয়সহ হাজার হাজার পশ্চিমা নাগরিক মুক্ত হয়। তাছাড়া, লাখ লাখ চীনাদের উপর জাপানীদের নৃশংসতার অবসান ঘটে।

বোমাবর্ষণের সমর্থকরা ১৯৪৪ সালের ১ আগস্ট জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেন। জাপানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হোম আইল্যান্ড বা মূল ভূখন্ড আক্রান্ত হলে লক্ষাধিক যুদ্ধবন্দীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর একটি নির্দেশ দিয়েছিল। আণবিক বোমা নিক্ষেপ করার পরিবর্তে মিত্রবাহিনী জাপানীদের আত্মসমর্পণের অপেক্ষায় থাকলে যুদ্ধবন্দীরা নিহত হতো।

অগণিত বেসামরিক লোকের হত্যাকান্ড একটি অমার্জনীয় অন্যায় এবং এটা যুদ্ধাপরাধ- এ যুক্তির বিপক্ষে বোমবর্ষণের সমর্থকরা আরো বলছেন, জাপানই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কলকারখানায় কর্মরত নারী ও শিশুসহ বহু বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

টোকিওর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক দর্শনের অধ্যাপক ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ফাদার জন এ, সিমেন্স লিখেছেন, 'আণবিক বোমা ব্যবহারের নৈতিকতা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। অনেকে এটাকে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের সমতুল্য হিসেবে মতামত দিয়েছেন এবং বেসামরিক লোকজনের উপর এ বোমা ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। তবে অন্যরা মন্তব্য করেছেন যে, সর্বাত্মক যুদ্ধে বেসামরিক লোক ও সৈন্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রক্তপাত বন্ধ এবং জাপানকে আত্মসমর্পণ ও চরম ধ্বংসের হুঁশিয়ারি প্রদানে আণবিক বোমা ছিল একটি কার্যকর শক্তি। আমি মনে করি যারা নীতিগতভাবে সর্বাত্মক যুদ্ধকে সমর্থন করেন তারা বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমালোচনা করতে পারেন না।'

কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, মার্কিন কৌশলবিদরা জাপান অধিকৃত ভূখন্ডে সম্ভাব্য সোভিয়েত দখলদারিত্ব রোধে দ্রুত যুদ্ধ শেষ করতে চেয়েছিলেন। অনেকেই বলছেন, আণবিক বোমা ব্যবহারের অনেক আগে জাপান পরাজিত হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে আণবিক বোমার ব্যবহার ছিল অপ্রয়োজনীয়। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে জেনারেল ডুয়িট আইসেনহাওয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যানরি এল, স্টিমসনকে আণবিক বোমা ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আইসেনহাওয়ার তার 'দ্য হোয়াইট হাউস ইয়ার্স' নামে বইয়ে লিখেছেন, '১৯৪৫ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসন জার্মানীতে আমার সদর দপ্তর সফরকালে আমাকে জানান যে, আমাদের সরকার জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপের জন্য তৈরি হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জোরালো কারণ ছিল বলে যারা অনুভব করতেন আমি ছিলাম তাদের একজন। জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপের সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিয়ে তিনি আলাপ করতে থাকলে আমি বিষন্ন বোধ করছিলাম। আমি তখন তাকে আমার অমতের কথা জানালাম। আমার অমত প্রকাশের পেছনে প্রথম কারণ ছিল যে, জাপান ইতোমধ্যেই পরাজিত হয়েছে এবং এ পরিস্থিতিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হবে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। আমার অমত প্রকাশের দ্বিতীয় কারণ ছিল আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, আমেরিকানদের জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য নয় এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে আমার দেশ বিশ্ব জনমতকে আহত করতে পারে।'

জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্তের কথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারও জানতেন না। পরে তিনি বলেছিলেন, সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা ছিল পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। একই অভিমত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চীফ অব স্টাফ ফ্লীট এডমিরাল উইলিয়াম লীহি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক এয়ার ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কার্ল স্পাজ, ইউএস নেভাল অপারেশন্সের চীফ এডমিরাল আর্নেস্ট কিং, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌ-বহরের কমান্ডার-ইন-চীফ ফ্লীট এডমিরাল চেস্টার ডব্লিউ নিমিৎস, মেজর জেনারেল কার্টিস লিমে, সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার কার্টার ক্লার্ক প্রমুখ।

www.pathagar.com

জাপানের আত্মসমর্পণের পর 'ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্র্যাটেজিক বোম্বিং সার্ভে' শত শত বেসামরিক জাপানী ও সামরিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি এক রিপোর্টে মন্তব্য করে যে, 'সকল তথ্য-প্রমাণ বিচার এবং সংশ্লিষ্ট জীবিত জাপানী নেতৃবৃন্দের সাক্ষ্য সাপেক্ষে সার্ভে'র মতামত হচ্ছে, অবশ্যই সকল সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বরের আগে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা না হলেও জাপান আত্মসমর্পণ করতো। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে প্রবেশ না করলে কিংবা দেশটি সামরিক অভিযানের কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন না করলে অথবা সে ধরনের চিন্তা না করলেও।'

অন্যরা বলছেন, অন্তত দু'মাস ধরে জাপান আত্মসমর্পণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্ত জুড়ে দিয়ে জাপানের আত্মসমর্পণে বিলম্ব ঘটাচ্ছিল। কতিপয় কূটনীতিক আত্মসমর্পণের পক্ষে থাকলেও জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ কিয়ুশু দ্বীপে নিষ্পত্তিকারী লড়াইয়ের জন্য ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ। পরবর্তীকালে সম্মানজনক শর্তে যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছার আশায় তারা সেখানে চূড়ান্ত লড়াই করতে চেয়েছিল। জাপানীদের সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার করে আমেরিকানরা একথা জানতে পেরেছিল। জাপান সরকার কি কি শর্তে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করবে ৯ আগস্টের আগ পর্যন্ত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। জাপানের সুপ্রীম কাউন্সিল ছিল তখনো দ্বিধাবিভক্ত। কট্টরপন্থীরা রণাঙ্গন থেকে জাপানী সৈন্য প্রত্যাহারের পাশাপাশি দাবি করছিল যে, কোনো যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাবে না এবং জাপানকে দখল করতে দেয়া হবে না। সম্রাট হিরোহিতোর সরাসরি হস্তক্ষেপে এ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। জাপানের আত্মসমর্পণ ঠেকাতে অভ্যুত্থান ঘটানোর একটি চেষ্টাও করা হয়।

আরেকটি পক্ষ বলছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে প্রবেশ করায় তার ফলাফল কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। জাপান না জানলেও যুক্তরাষ্ট্র জানতো যে, ভি-ই ডে'র ৩ মাস পর ১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। পটসড্যাম ঘোষণা মেনে নিতে জাপানী সেনাবাহিনীকে বাধ্য করতে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম বাহিনী লাল ফৌজের যুদ্ধে যোগদান ছিল যথেষ্ট। অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, আণবিক বোমা ব্যবহার করা ছাড়া যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয় কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করলে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হতো না। মাঞ্চুরিয়া, শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সোভিয়েত আক্রমণের প্রাক্কালে জাপানের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তবে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মিত্রবাহিনী কিয়ুশুতে হামলা চালানোর আগেই সোভিয়েতরা হোক্কাইডোতে হামলা চালাতে সক্ষম হতো।

অন্যান্য জাপানী সূত্র বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা ব্যবহারই জাপানের আত্মসমর্পণের মূল কারণ নয়। তারা বলছেন, ৬ ও ৯ আগস্ট ব্যবহৃত আমেরিকান আণবিক বোমা নয়, ৮ আগস্ট স্টালিনের যুদ্ধ ঘোষণার পরের সপ্তাহে জাপানের মূল ভূখন্ডে সোভিয়েত লাল ফৌজের ত্বরিত ও ক্ষিপ্র বিজয় জাপানকে ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। আমেরিকার আণবিক বোমা নিক্ষেপ এবং জাপানে সোভিয়েত হামলা-এ দু'টি ঘটনাই জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে।

www.pathagar.com

তবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয় স্বীকার করার পেছনে সোভিয়েত দখলদারিত্বের ভীতি কাজ করেছে বেশি।

হিরোশিমার পীস পার্কে স্মৃতি স্তম্ভে খোদাই করে লেখা রয়েছে, 'তোমারা চির শান্তিতে ঘুমাও। আর যেন এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়।' বিষয়টির রাজনীতিকীকরণ করা ছাড়া হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপে নিহতদের স্মরণে এ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। এমনকি ঘটনা ঘটার আগেও হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত ছিল বিতর্কিত।

ম্যানহাটন প্রকল্পকে নাৎসী জার্মানীর আণবিক বোমা কর্মসূচীর একটি পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং জার্মানীকে পরাজিত করাই ছিল ম্যানহাটন প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্য। এ প্রকল্পে কর্মরত বেশ ক'জন বিজ্ঞানী এ অভিমত পোষণ করতেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রথমেই আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত হবে না। আণবিক বোমা ব্যবহারের বিপক্ষে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও ছিলেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লিও সিজিলার্ড আণবিক বোমা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বলেছিলেন, 'জার্মানরা আমাদের শহরগুলোতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে আমরা তাদের আণবিক বোমাবর্ষণকে একটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতাম এবং এ অপরাধে আমরা জার্মানদের নুরেমবার্গে মৃত্যুদন্ড দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলাতাম।'

লাখ লাখ বেসামরিক লোক নিহত এবং বেসামরিক লোকজনের বসতিকে বোমাবর্ষণের স্থান হিসেবে বেছে নেয়ায় আণবিক বোমা ব্যবহারকে বর্বরোচিত কান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ বিধ্বংসী বোমা ব্যবহারের কয়েকদিন আগে মার্কিন পরমাণু পদার্থবিদ এডওয়ার্ড টেলারসহ অনেক বিজ্ঞানী যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, প্রাণহানি ঘটানো ছাড়াও আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়।

ব্যাপকভাবে বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও আন্তর্জাতিক আইনে বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহারকে একটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। অনেকেই বলছেন, তেজস্ক্রিয়তাজনিত অসুস্থতা এবং ভয়াবহ দহনসহ আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য আমেরিকানদের আরো বেশি গবেষণা করা উচিত ছিল। অনেক সমালোচক বিশ্বাস করেন, ম্যানহাটন প্রকল্পে ২শ' কোটি ডলার বিনিয়োগের যৌক্তিকতা প্রমাণ, আণবিক অস্ত্রের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা, পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিজের সামর্থ্য প্রদর্শনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ম্যানহাটন প্রকল্পে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বোমা তৈরির কাজ শেষ করার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ করার সময় সীমার সঙ্গে মিল রেখে ম্যানহাটন প্রকল্পে বোমা তৈরির সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ওকিনাওয়া দখলে মার্কিন অভিযান

জাপানের রায়ুকইউ দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া দ্বীপে সংঘটিত যুদ্ধ 'ওকিনাওয়া যুদ্ধ' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এটি ছিল বৃহত্তম উভচর হামলা। ইতিহাসে এ যুদ্ধ বৃহত্তম নৌ, বিমান ও স্থল যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। কোনো পক্ষই ভাবতে পারেনি যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এটাই হবে শেষ বৃহত্তম লড়াই। আমেরিকা জাপানের মূল ভূখণ্ডে 'অপারেশন ডাউনফল' পরিচালনা করার পরিকল্পনা করলেও সে পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রয়োজন হয়নি। তাই ওকিনাওয়ার যুদ্ধকে দু'টি দেশের মধ্যে সংঘটিত বৃহত্তম যুদ্ধ বলা হয়।

ওকিনাওয়ার যুদ্ধকে ইংরেজীতে বলা হয়, 'টাইফুন অব স্টীল'। ওকিনাওয়াবাসীদের কাছে এ যুদ্ধ 'টেটসু নো বফু' হিসেবে পরিচিত। টেটসু নো বফু'র অর্থ হচ্ছে ইস্পাতের বৃষ্টিপাত অথবা ইস্পাতের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়। যুদ্ধে গোলাবর্ষণের তীব্রতা বুঝানোর জন্যই এ ধরনের নামকরণ করা হয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ইউরোপে জার্মানীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়তে থাকলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানীরা মার্কিন অগ্রাভিযানে অব্যাহত বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। জাপানীদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি টানা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করে। জাপানকে নতি স্বীকারে বাধ্য করার লক্ষ্যে ওকিনাওয়া অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। এখানে মার্কিন অভিযানের লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপথে জাপানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে দেশটির অন্যান্য অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া। ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ (জেসিএস) জাপানকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে রায়ুকইউ দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ ওকিনাওয়ায় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাপানের মূল ভূখণ্ডে মার্কিন বিমান হামলা বৃদ্ধির স্বার্থে ওকিনাওয়া দখল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন সৈন্যরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে থাকায় ওকিনাওয়ার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বদলে যায়। ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল লেঃ জেনারেল মাসাও ওয়াতানাবে ওকিনাওয়ায় ডিউটির জন্য ৩২তম আর্মিকে প্রস্তুত করে তোলেন। পরবর্তী ১২ মাসে এ জাপানী বাহিনী ওকিনাওয়ার সর্বত্র কংক্রীটের সুরক্ষিত চৌকি, বাংকার, ট্যাংক ধ্বংসের ফাঁদ ও

www.pathagar.com

মাইন স্থাপন করে দ্বীপের প্রতিরক্ষা জোরদার করে। ১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে ওকিনাওয়ার দেড় হাজার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মারিয়ানায় জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে যাওয়ায় এ দ্বীপের প্রতিরক্ষা সংহত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়। এ সময় লেঃ জেনারেল ইউশিজিমা জেনারেল ওয়াতানাবের স্থলাভিষিক্ত হন।

একজন সৈনিককে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার

ওকিনাওয়া দ্বীপে ছিল কয়েকটি জাপানী বিমানঘাঁটি এবং দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয়। ১৯৪৫ সালের ১ এপ্রিল খ্রীস্টানদের ধর্মীয় উৎসবের দিন ইস্টার ডে-তে অপারেশন আইসবার্গ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনায় এডমিরাল র‍্যামন্ড এ, স্প্রুয়ান্সের ৫ম নৌ-বহরের সঙ্গে ৪০টি বিমানবাহী রণতরী, ১৮টি যুদ্ধজাহাজ, ২শ' ডেস্ট্রয়ার ও শত শত এসকর্ট জাহাজ যোগদান করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিযুক্ত মার্কিন কমান্ডার এডমিরাল চেস্টার নিমিৎসের সার্বিক দিকনির্দেশনায় ওকিনাওয়া অভিযানের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল প্যাসিফিক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ টাস্কফোর্সের আওতাধীন ভাইস এডমিরাল রিচমন্ড কে, টার্নারের নেতৃত্বে জয়েন্ট এক্সপিডিশনারী টাস্ক ফোর্স 'ফিফটি ওয়ান'-কে ওকিনাওয়া দখলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। টাস্কফোর্স ফিফটি ওয়ান ছিল সেনা, নৌ ও মেরিন কোরের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফোর্স। গ্রাউন্ড এক্সপিডিশনারী ফোর্স ছাড়াও এতে ছিল টাস্কফোর্স ফিফটি সিক্স। তাছাড়া ছিল সহায়ক পরিবহন যুদ্ধজাহাজ, বিমান ও নৌ- ইউনিট। ওকিনাওয়া দখলে টাস্কফোর্স ফিফটি সিক্সের সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্কিন ১০ম আর্মির কমান্ডার লেঃ জেনারেল সাইমন বলিভার বাকনার জুনিয়র।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত আইয়োজিমার মতো কয়েকটি যুদ্ধে কোনো বেসামরিক লোক নিহত হয়নি। অন্যদিকে, বেসামরিক লোকে ঠাসা থাকায় ওকিনাওয়া যুদ্ধে কমপক্ষে ১ লাখ ৩০ হাজার নিরীহ লোক নিহত হয়। মার্কিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজারের বেশী। এ হিসাবের মধ্যে ১৮ হাজার ৯শ' নিহত কিংবা নিখোঁজ আমেরিকানের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত। আইয়োজিমা ও গুয়াডালক্যানালে সম্মিলিত-ভাবে যত আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল ওকিনাওয়ায় নিহত হয়েছিল তার দ্বিগুণ। যুদ্ধ থেমে যাবার পর আহত কিংবা অন্যান্য কারণে আরো কয়েক হাজার সৈন্য মারা যায়। হতাহতদের তালিকায় তাদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত নয়। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে এ দ্বীপে অথবা তার আশপাশে অবস্থানকারী জাপানী ও আমেরিকানদের এক-চতুর্থাংশ নিহত হয়। ১ লাখ ৭ হাজার জাপানী সৈন্য নিহত কিংবা যুদ্ধবন্দী হয়। নিহতদের এ তালিকায় সেপ্পুকু (গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করার জাপানী প্রতিশব্দ) কৌশলে আত্মবিসর্জনকারী জাপানী সৈন্যও রয়েছে। জাপানীরা মনে করতো, আমেরিকান সৈন্যরা বর্বর। তারা নৃশংসভাবে তাদের পরিবার-পরিজনকে হত্যা করছে। তাই তাদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। এ বিশ্বাস থেকে জাপানী সৈন্যরা তাদের পেটে গ্রেনেড বেঁধে রাখতো। বন্দী হওয়ার আশংকা দেখা দিলেই তারা গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহত্যা করতো। ওকিনাওয়া যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে জাপানীদের মধ্যে প্রথামাফিক আত্মহত্যা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। একজন জাপানী সৈন্য ১৮৪তম মার্কিন পদাতিক ডিভিশনের একটি ফিল্ড আর্টিলারি চৌকির কাছাকাছি এসে ইংরেজীতে বোধগম্য ভাষায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, 'এই দেখো, আমি আমার মাথা উড়িয়ে দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে গ্রেনেড ফাটিয়ে তার মাথা উড়িয়ে দেয়।

লেঃ জেনারেল সাইমন জুনিয়রের কমান্ডে দু'টি কোর নিয়ে গঠিত ১০ম আর্মি ওকিনাওয়ায় স্থল অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। আমেরিকার ১০ম আর্মির একটি কোরে ছিল ১ম ও ৬ষ্ঠ মেরিন ডিভিশন এবং ভাসমান রিজার্ভ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ২য় মেরিন ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ৩য় উভচর কোর এবং অন্যটি ছিল ৭ম, ২৭তম, ৭৭তম ও ৯৬তম পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ২৪তম কোর। অভিযানের শেষ পর্যায়ে ১৮ জুন জেনারেল বাকনার গোলা বিস্ফোরণে নিহত হন। তার পরদিন নিহত হন ৯৬তম মার্কিন পদাতিক ডিভিশনের সহকারী কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্লডিয়াস এম, ইয়াসলে। জেনারেল বাকনার ছিলেন গোটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধে নিহত মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদের সামরিক কর্মকর্তা। জেনারেল বাকনার নিহত হলে সিনিয়র কমান্ডার জেনারেল গেইগার ১০আর্মির কমান্ড গ্রহণ করেন এবং তিনি ওকিনাওয়া যুদ্ধকে বিজয়ের চূড়ান্ত ধাপে নিয়ে যান।

ওকিনাওয়ার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত জাপানী সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত ৩২তম আর্মি। এ আর্মিতে ছিল ৯ম, ২৪তম ও ৬২তম পদাতিক ডিভিশন এবং ৪৪তম স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড। ওকিনাওয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত লড়াই ছিল ভয়াবহ ও তীব্র। এখানে প্রতিরোধ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল

www.pathagar.com

মিৎসুরু ইউশিজিমা। যুদ্ধে বিপর্যয়ের শেষ পর্যায়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। ওকিনাওয়ার উত্তরাংশে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল তাকেহিদো উদো।

১৯৪৪ সালের শেষদিকে আমেরিকান সাবমেরিনগুলো জাপানী জাহাজের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছিল। ওকিনাওয়া আসার পথে ইউএসএস স্টারগন (এসএস-১৮৭) সৈন্যবাহী জাপানী যুদ্ধজাহাজ তোইয়ামা মারুকে ডুবিয়ে দিলে ৫ হাজার ৬ শ' সৈন্য নিহত হয়। ওকিনাওয়ায় মার্কিন স্থল অভিযান শুরু হওয়ার ৯ মাস আগে এ যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হয়। একই সময়ে সৈন্য স্থানান্তরে নিয়োজিত যুদ্ধজাহাজ সুশিমা মারু নিমজ্জিত হলে ১ হাজার ৪শ' ৮৪ জন নারী ও শিশু প্রাণ হারায়। ১৯৪৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন বি-২৯ বোমারু বিমান ওকিনাওয়া ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোতে প্রাথমিক টহলদারি মিশন পরিচালনা করে। ১০ অক্টোবর এ অরক্ষিত দ্বীপে এডমিরাল উইলিয়াম হ্যালসের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় নৌ-বহরের প্রায় ২শ' বোমারু বিমান ওকিনাওয়ার রাজধানী নাহায় ৫ দফা বোমাবর্ষণ করায় শহরের ৮০ শতাংশ ধ্বংস এবং ৬৫টির বেশী নৌ যান নিমজ্জিত হয়। জাপানী বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো দ্রুতগতি-সম্পন্ন মার্কিন বিমান ঘায়েলে ছিল অক্ষম। যুদ্ধের সূচনালগ্নে অপারেশন টেন গো নামে পরিচিত পাল্টা জাপানী অভিযানকালে ওকিনাওয়ার পথে অগ্রসরমান জাপানী যুদ্ধজাহাজ ইয়ামাতো নিমজ্জিত হয়। ইয়ামাতোকে ওকিনাওয়া উপকূলে নোঙ্গর করিয়ে একটি স্থল ব্যাটারী হিসেবে ব্যবহার করা ছিল জাপানীদের পরিকল্পনা।

১৯৪৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৮২ দিন পর্যন্ত ওকিনাওয়ায় স্থল যুদ্ধ স্থায়ী হয়। মার্কিন সৈন্যরা তুলনামূলকভাবে কম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে দ্বীপের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে অগ্রসর হয়। ইয়া দাকি পাহাড়ে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়লেও তারা প্রতিরক্ষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল উত্তরাংশ দখল করে নেয় এবং কাদেনা ও ইউমিতান বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে। ২০০5 সাল নাগাদ কাদেনা ছিল এশিয়ায় বৃহত্তম মার্কিন বিমানঘাঁটি। এ বিমানঘাঁটির রানওয়েতে সুপরিসর বিমান উঠানামা করতে পারে। কাদেনা ও ইউমিতান বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাপানীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তারা খুব সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ২০ এপ্রিল গোটা উত্তর ওকিনাওয়ার পতন ঘটে। খুব কম সংখ্যক আমেরিকানই 'হাবু স্নেক'(জাপানী চোরাগুপ্তা অবস্থান) এর মুখোমুখি হয়। তবে দক্ষিণে তাদের জন্য ভয়াবহ লড়াই অপেক্ষা করছিল। উত্তর ওকিনাওয়ার লড়াই ছিল দক্ষিণ ওকিনাওয়ায় লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

দক্ষিণ ওকিনাওয়ায় ভয়াবহ লড়াই হয়। জাপানী সৈন্যরা গর্তে লুকিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকানদের অগ্রযাত্রা ছিল অপ্রতিহত। ওকিনাওয়ার ভবিষ্যত গভর্নর মাশাহিদে ওতাসহ কতিপয় জাপানী লড়াই অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও ২১ জুন দ্বীপের পতন ঘটে। আমেরিকান হতাহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যুদ্ধের সংবাদ প্রেরণকারী সাংবাদিক আর্নি পাইল। ওকিনাওয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অদূরে এ্যামি-শিমায় জাপানী চোরাগুপ্তা হামলায় তিনি নিহত হন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, ওকিনাওয়া লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকানদের সরাসরি আণবিক বোমা ব্যবহারে ঠেলে দেয়। এ মতের

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ সমর্থক হলেন ভিক্টর ডেভিস হানসন। তিনি তার 'রিপলস অব ব্যাটলস' নামে বইয়ে এব্যাপারে বিস্তারিত যুক্তি তুলে ধরেছেন। একটি যুক্তি হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ও সরবরাহ বঞ্চিত অবস্থায় স্থানীয় ওকিনাওয়াবাসীসহ জাপানীদের অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ। আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, ব্যাপক আমেরিকান সৈন্য হতাহত হওয়ার ঘটনা। তিনি মনে করেন এসব কারণে মিত্রপক্ষের কৌশলবিদরা মূল ভূখণ্ডে জাপানীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে সরাসরি হামলার পরিবর্তে বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার জন্য মাথা ঘামাচ্ছিলেন। আণবিক বোমা ব্যবহার করা ছিল সে বিকল্প। আণবিক বোমা ব্যবহার করায় জাপান আত্মসমর্পণ করেছে- একথা সত্যি। তবে এটাও সত্যি যে, ওকিনাওয়ায় অভিযান শুরুর কয়েক মাস আগে জাপানের বড় বড় শহরগুলোতে আমেরিকার প্রচলিত বোমাবর্ষণে বেসামরিক লোক হতাহত হয়েছিল আণবিক বোমা ব্যবহারে হতাহতদের চেয়ে অনেক বেশী। আমেরিকানরা প্রচলিত বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখলে কিংবা বোমাবর্ষণের পরিধি বিস্তৃত করলে কোনো না কোনোভাবে জাপান আত্মসমর্পণ করতোই।

জাপানের ওকিনাওয়া উপকূলে মার্কিন নৌ-বহর থেকে সৈন্যদের অবতরণের দৃশ্য

১৯৪৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী আইয়োজিমার পতন ঘটলে জাপানীদের অন্তঃস্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। আইয়োজিমায় অর্জিত বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মিত্রশক্তি ওকিনাওয়া দখল করে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। ৪৮০ বর্গমাইল আয়তনের ওকিনাওয়া ছিল জাপানের মূল ভূখণ্ড থেকে ৩৬০ মাইল দূরে। এ দ্বীপকে জাপান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৪৪ সালে জাপানীরা এ দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করে তোলে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার অংশ হিসেবে সেখানে ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত

www.pathagar.com

৩২তম আর্মিকে পাঠানো হয়। জাপানীরা মিত্রবাহিনীর হামলা নস্যাতে ছিল বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে তারা শত শত বিমান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌ যান ও মনুষ্য চালিত টর্পেডোর সমাবেশ ঘটায় এবং আত্মঘাতী প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে।

ওকিনাওয়া হচ্ছে ৬০ মাইল দীর্ঘ এবং ২ থেকে ১৬ মাইল প্রশস্ত একটি দ্বীপ। এ দ্বীপের ভৌগলিক প্রতিকূলতা জাপানীদের প্রতিরক্ষায় সহায়ক হয়। মার্কিন অভিযানের প্রাক্কালে দ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল ৫ লাখ। ১৯৪৫ সালে মার্চের শেষদিকে ওকিনাওয়া ও রায়ুকইউ দ্বীপপুঞ্জে অপারেশন আইসবার্গ-এ অংশগ্রহণে মিত্রবাহিনীর প্রায় ১ হাজার ৩ শ' যুদ্ধজাহাজ এসে সমবেত হয়। এসব জাহাজের মধ্যে ৩৬৫টি ছিল উভচর জাহাজ। অপারেশন আইসবার্গের পরিধি ছিল ইউরোপে পরিচালিত নরম্যান্ডি অপারেশনের সমান। প্রথমে বুঝা না গেলেও পরে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জাপানের আত্মসমর্পণের আগে এটাই ছিল বৃহত্তম সামরিক অপারেশন। মিত্রবাহিনী ৩টি মেরিন ও সেনাবাহিনীর ৪টি পদাতিক ডিভিশনসহ এ অপারেশনে ৫ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়োগ করে। ১৯৪৫ সালের ২৬ মার্চ ওকিনাওয়া থেকে ১৫ মাইল দূরে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা প্রথম অবতরণ করে। পরবর্তীতে পর পর আরো তিনটি অবতরণ ঘটানো হয়। ৩১ মার্চ নাগাদ মার্কিন সৈন্যরা কারেমাস দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। ৩১ মার্চ তারা ওকিনাওয়ার রাজধানী নাহার ৮ মাইল পশ্চিমে ৪টি দ্বীপের সমাহার কেইস শিমায় বিনা প্রতিরোধে অবতরণ করে। এখানে ওকিনাওয়া আক্রমণে সহায়তা দানে ২৪ টি ১৫৫ মিলিমিটার কামানসহ দু'টি গোলন্দাজ ব্যাটালিয়ন অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের ১ এপ্রিল ইস্টার সানডে-তে নৌ-বাহিনীর ভয়াল গোলাবর্ষণের ছত্রছায়ায় ওকিনাওয়ায় মার্কিন সৈন্যদের মূল অবতরণ (এল-ডে) ঘটে। প্রথম দিনের হামলায় পার্ল হারবারে জাপানী হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া ইউএসএস টেনিসি, মেরিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মতো ১০টি পুরনো মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, ৯ টি ক্রুজার, ২৩ টি ডেস্ট্রয়ার ও ১১৭ টি রকেটবোট অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম ২৪ ঘন্টায় এসব যুদ্ধজাহাজের সম্মিলিত গোলাবর্ষণের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮শ' টন। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে মিত্রবাহিনী আকাশ ও সমুদ্রে নিজেদের নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সৈন্য পাঠায়। এল-ডে'র প্রথম ঘন্টায় নৌ ও উপকূলীয় রক্ষীদের সহযোগিতায় হাগুশি উপকূলে ১৬ হাজার সৈন্য অবতরণ করে। রাত নাগাদ ৬০ হাজার সৈন্য উপকূলে এসে ভিড়ে। ২ এপ্রিল ৭ম পদাতিক ডিভিশনের সৈন্যরা ওকিনাওয়ার পশ্চিম থেকে পূর্ব উপকূল অতিক্রম করে। পরদিন ১ম মেরিন ডিভিশনের সৈন্যরা ওকিনাওয়ার পূর্ব উপকূলে পৌঁছে যায় এবং জাপানী সৈন্যদের দু' ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। প্রতিরোধ না দেখে মার্কিনীরা হতবাক হয়। ৭ম ডিভিশনের একজন সৈন্য অবতরণের পর পর বিশি নদীর দক্ষিণে একটি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বললো, 'যতক্ষণ বেঁচে থাকবো বলে আশা করেছিলাম আমি এতক্ষণে তার চেয়ে বেশী সময় বেঁচে রয়েছি।'

বিনা প্রতিরোধে মার্কিন সৈন্যদের অবতরণ এবং দ্রুত অগ্রগতি ছিল একটি ফাঁদ। সাইপেন অভিজ্ঞতার আলোকে জাপানীরা একটি সুপরিকল্পিত প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ করে। ১৯৪৪ সালের মধ্য জুলাই নাগাদ জাপানের ৩২তম আর্মি ওকিনাওয়া উপকূলে

www.pathagar.com

সম্ভাব্য মার্কিন অবতরণ ক্ষেত্রে লড়াই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেও পরে রাতারাতি তারা তাদের প্রতিরক্ষা কৌশল পাল্টে ফেলে। তারা উপকূলে স্থল সৈন্য মোতায়েন করার পরিবর্তে দ্বীপের গভীরে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলার এবং এসব শক্তিশালী ঘাঁটির আশপাশে আগ্রাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মার্কিন সৈন্যদের মূল অবতরণের পরই জাপানী নৌ ও বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং এসব ইউনিট আমেরিকার নৌ-বহর ও পুনঃজ্বালানি সরবরাহে নিয়োজিত জাহাজগুলোর উপর হামলা চালিয়ে আগ্রাসী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ওকিনাওয়া উপকূলের দু'একটি জায়গায় হাল্কা মর্টারের গোলাবর্ষণ এবং নামমাত্র বিমান হামলা চালানো ছাড়া জাপানীরা কোথাও মার্কিন সৈন্যদের অবতরণে বাধা দেয়নি। মার্কিন সৈন্যরা অবতরণ করার পরই জাপানীরা তাদের রণকৌশলের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। জাপানের ৩২তম আর্মি পশ্চিম উপকূলের ইউচিতোমারি থেকে পূর্ব উপকূলে সুভা পর্যন্ত 'শুরি লাইন'-এ ওকিনাওয়া যোজকে তাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। ভূমি অসমান হওয়ায় পবর্ত শৃঙ্গে সুরক্ষিত চৌকি, গর্ত ও বাংকার কারো চোখে পড়তো না। খাড়া ও এবড়ো থেবড়ো ভূমিতে গোলাবর্ষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। রণাঙ্গনের ভূ-প্রকৃতি ছিল জাপানীদের অনুকূলে। জাপানীরা বিপুলসংখ্যক স্বল্পপাল্লার অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ৮শ' মাইল পেছনে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রসারিত দূরপাল্লার বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনীর সমর্থন নিয়ে রায়ুকইউ দ্বীপপুঞ্জের পানি সীমায় একটি বৃহত্তম রণাঙ্গনে লড়াই করার পরিবর্তে আমেরিকানরা হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে হাতাহাতি লড়াই করতে বাধ্য হয়। ৬ এপ্রিল আত্মঘাতী বিমান ও মনুষ্য চালিত টর্পেডোর সাহায্যে দ্বীপের অদূরে মার্কিন বহরের বিরুদ্ধে জাপানীদের পাল্টা হামলা শুরু হয়। এসব আত্মঘাতী হামলায় ৬টি যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত, ৭টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আরো ৪টি জাহাজ সামান্য ঘায়েল হয়। জাপানীরা একটি বা দু'টি ডেপথ চার্জ বোঝাই ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী বোটের সাহায্যে পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল। তবে পাল্টা হামলা চালানোর আগে এসব ক্ষুদ্র বোটের অধিকাংশ হয় আটক নয়তো ধ্বংস হয়। ৬ এপ্রিল জাপানীরা একটি ক্রুজার ও ৮টি ডেস্ট্রয়ারসহ বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ ইয়ামাতোর নেতৃত্বে কিয়ুশু থেকে একটি ভাসমান বহর হিসেবে হামলা চালানোর জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা একসময় হামলা করেও বসে। জাপানী বহরের নিরাপত্তা দানে কোনো বিমান ছিল না। ইয়ামাতোতে জ্বালানি ছিল শুধু ওকিনাওয়ায় পৌঁছানোর মতো। তাতে ফিরে যাবার জ্বালানি ছিল না। নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, ইয়ামাতো ওকিনাওয়া উপকূলে পৌঁছে ধ্বংস হওয়া নাগাদ লড়াই করবে। আমেরিকান সাবমেরিন হ্যাকলবেক ইয়ামাতোর অবস্থান টের পেয়ে রণতরীতে অবস্থানরত বোমারু বিমানগুলোকে সঙ্কেত দেয়। এ সঙ্কেত পেয়ে পরদিন ৭ এপ্রিল ভাইস এডমিরাল মার্ক মিশার নির্দেশে মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর ৩শ' বিমান জাপানী বহরের উপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করতে থাকে। দু'ঘন্টায় ইয়ামাতোতে ১২টি বোমা ও ৭টি টর্পেডো বিস্ফোরিত হয়। বিমানবাহী রণতরী স্যান জ্যাসিন্টোর বিমানগুলো

www.pathagar.com

জাপানী ডেস্ট্রয়ার হামাকাজেকে ধ্বংস করে দেয়। জাপানী হাল্কা ক্রুজার ইয়াহাগি বোমায় ঘায়েল হয়ে নিমজ্জিত হয়। জাপানী বহরের আরো ৩টি ডেস্ট্রয়ার এত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, সেগুলোকে পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। মাত্র ৪টি ডেস্ট্রয়ার জাপানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। একটি ক্রুজার ও ৩টি ডেস্ট্রয়ারসহ ৭২ হাজার টন ওজনের ইয়ামাতো নিমজ্জিত হলে ৩ হাজার ৭শ' জাপানী সৈন্য প্রাণ হারায়। অন্যদিকে, মার্কিন বিমান ধ্বংস হয় ১০টি এবং পাইলট নিহত হয় ১২জন।

৬ষ্ঠ মেরিন ডিভিশন দ্রুতগতিতে ওকিনাওয়ার উত্তরাঞ্চলের অর্ধেক দখল করে নেয়। তবে তারা শুরি প্রতিরক্ষা লাইনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। সুরক্ষিত চৌকি, কংক্রীটের প্রাচীর ও সুরক্ষিত গর্ত এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে জাপানীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করছিল। এক পর্যায়ে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলে উভয় পক্ষে হাজার হাজার সৈন্য হতাহত হয়। ওকিনাওয়ার শুরি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং প্রাচীন রাজকীয় রাজধানী ছিল মার্কিন অভিযানের মূল লক্ষ্যস্থল। এ দু'টি লক্ষ্যস্থল ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং এগিয়ে যাওয়া ছিল দুরূহ।

১২-১৮ মে ৬ষ্ঠ মেরিন ডিভিশন জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যূহের পশ্চিম প্রান্তে সুগার লুফ নামে ৫০ ফুট উঁচু ও ৩ শ' গজ দীর্ঘ একটি কৌশলগত পর্বত দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। ৭ দিনের লড়াইয়ে এ মেরিন ডিভিশনের ২ হাজার ৬ শ' সৈন্য হতাহত এবং আরো ১ হাজার ৩ শ' সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুগার লুফ একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। ১৪ মে মেরিনরা সুগার লুফের পূর্ব দিকে ওয়ানা রীজ এবং ওয়ানা ড্র-তে প্রবেশ করে। তবে মাসের শেষদিকে জাপানীরা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত মার্কিন সৈন্যরা সুরক্ষিত অবস্থানে অবস্থানকারী জাপানী সৈন্যদের পুরোপুরি কাবু করতে পারেনি। ভয়াবহ লড়াইয়ের পর ১৮ মে ৬ষ্ঠ মেরিন সুগার লুফ কমপ্লেক্সের পশ্চিমাংশ দখল করে নেয়। ২১ মে ৯৬তম পদাতিক ডিভিশন শুরি লাইনের পূর্ব প্রান্তে কোনিক্যাল পাহাড় দখল করে নেয়। শুরি প্রতিরক্ষা লাইনকে জয় করা তখন আর আমেরিকানদের জন্য অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

১৯৪৫ সালের মে মাসের শেষদিকে ওকিনাওয়া দখলের লড়াই দু'মাসে পৌঁছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রাণহানি, শক্তিক্ষয় এবং অসহনীয় ক্লান্তির পর দক্ষিণাঞ্চলীয় ওকিনাওয়ার শুরি ক্যাসলের কেন্দ্রস্থলে মার্কিন অভিযানে সাফল্য আসে। প্রতিরক্ষা অবস্থান ভেঙ্গে পড়তে থাকায় ৩২তম জাপানী আর্মির কমান্ডার জেনারেল ইউশিজিমা মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়ানা ড্র এবং শুরি লাইন থেকে তার সৈন্যদের পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করেন। ২৩ মে রাতে জাপানী সৈন্যরা পিছু হটে। এ সময় বিষাক্ত মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে আহত সৈন্যদের মেরে ফেলা হয়। অবশেষে ২৯ মে মেরিনরা শুরি ক্যাসলে প্রবেশ করে। তারা খুব সামান্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। জেনারেল ইউশিজিমা সাগরের কাছে কিয়ামি উপদ্বীপে একটি গর্তে তার শেষ কমান্ড পোস্টে হটে যান এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ওকিনাওয়ার প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষায় তীব্র ও শেষ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মার্কিন ৭ম পদাতিক ডিভিশনের সৈন্যরা ২০ জুন নাগাদ তিন সপ্তাহ লড়াই করে মাবুনি শহরের কাছে হিল এইটি নাইনের (৮৯নং পাহাড়) শীর্ষে

www.pathagar.com

ইউশিজিমার সদর দপ্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ২৩ জুন ইউশিজিমা ও তার চীফ অব স্টাফ লেঃ জেনারেল ইসামু চো হারিকিরিতে আত্মহত্যা করায় ওকিনাওয়ায় লড়াই শেষ হয়ে যায়। জাপানীরা কামিকাজে হামলা চালিয়ে মার্কিন অগ্রাভিযান রোধ করার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ মার্চ তারা প্রথম কামিকাজে হামলা চালায়। জাপানী হামলায় ওকিনাওয়া অভিযানে ৩৪ টি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত ও ৩৬৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৭৬০ টি বিমান ধ্বংস হয়। পক্ষান্তরে, জাপানীরা হারায় ৭ হাজার ৮৩০টি বিমান ও ১৬ টি যুদ্ধজাহাজ।

সৈন্য ও সমরাস্ত্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২৩ জুন প্রায় ৩ মাস লড়াই করে মার্কিন সেনা ও মেরিনদের ওকিনাওয়া দখল করতে হয়েছে। ওকিনাওয়া যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর অন্যতম। মার্কিনীরা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ না চালালে এ যুদ্ধ আরো রক্তক্ষয়ী হতো। ১৯৪৫ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মার্কিন ৫ম নৌ বহরের বিমানবাহী রণতরীর যুদ্ধবিমানগুলো ওকিনাওয়ায় প্রায় ৫০ লাখ প্রচারপত্র নিক্ষেপ করে। এসব প্রচারপত্রে প্রতিরোধ না করার জন্য জাপানী সৈন্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রচারপত্রে বলা হয় যে, জাপানীদের প্রতিরোধ হবে নিষ্ফল। আশ্বাস দেয়া হয়, প্রতিরোধ ছাড়া আত্মসমর্পণ করলে জাপানী সৈন্যদের প্রতি মানবিক আচরণ করা হবে। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে টাংক ও বিমানও বিরাট ভূমিকা পালন করে। ট্যাংক ও বিমানের লাউডস্পীকার থেকে জাপানীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। জাপানী সৈন্যদের অবস্থানের পেছনে প্যারাশূটের সাহায্যে দূরনিয়ন্ত্রিত রেডিও ফেলা হয়। প্রতিপক্ষ মার্কিনীদের উদ্দেশ্যপূর্ণ অপপ্রচারে অধিকাংশ জাপানী বিভ্রান্ত হওয়ায় তাদের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। নয়তো ওকিনাওয়া দখলে মার্কিনীদের আরো রক্ত দিতে হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলেও ওকিনাওয়ায় দীর্ঘদিন মার্কিন দখলদারিত্ব বজায় থাকে। এ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জাপানীরা ফুঁসে উঠলে ১৯৭২ সালে এক চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে দ্বীপটির সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করে। গণভোটে মার্কিন ঘাঁটি প্রত্যাহারের পক্ষে ওকিনাওয়াবাসী রায় দেয়া সত্ত্বেও ২০০৫ সাল নাগাদ সেখানে মার্কিন ঘাঁটি বিদ্যমান ছিল। এ নিয়ে দু'টি দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে সংকট দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি জাপানী কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ওকিনাওয়া থেকে মার্কিন ঘাঁটি প্রত্যাহারের আওয়াজ উঠে। ১৯৯৫ সালে লক্ষ লক্ষ লোকের এক বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওকিওয়া যুদ্ধে পরাজিত প্রবীণ জাপানী সৈনিক ও ওকিনাওয়ার গভর্নর মাশাহিদে ওতা।

www.pathagar.com

কামিকাজে : আত্মঘাতি হামলায় জাপানী রীতি

'কামিকাজে' একটি জাপানী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ 'স্বর্গীয় ঝড়।' কামিকাজের এ ধরনের নামকরণের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১২৭৪ সালে মোঙ্গল শাসক কুবলাই খানের একটি নৌ- হামলা থেকে জাপানকে রক্ষা করেছিল একটি অলৌকিক টাইফুন বা সামুদ্রিক ঝড়। জাপানে কেবলমাত্র অনুরূপ টাইফুনকে কামিকাজে বলা হয়। তবে ইংরেজীতে কামিকাজে বলতে বুঝায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধজাহাজে জাপানী ক্রুদের পরিচালিত আত্মঘাতি হামলা। কামিকাজে অপারেশনের মূল অংশ ছিল বিমান নিয়ে হামলা। বিস্ফোরক বহনকারী জাপানী সৈন্য এবং নৌ-ক্রুদের আত্মঘাতি হামলাও কামিকাজে হিসেবে পরিচিত। আত্মঘাতি হামলা পরিচালনাকারী বিশেষ আক্রমণকারী ইউনিটকে বুঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জাপানী ভাষায় কামিকাজেকে সংক্ষেপে 'টক্কোটাই'-ও বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানী রাজকীয় নৌ-বাহিনীর আত্মঘাতি স্কোয়াডগুলোকে 'শিনপু টকুবেতসু কোগেকি টাই' বলা হতো।

প্রকৃত অর্থ না বুঝার জন্য অনেক সময় কামিকাজের সঙ্গে অন্যান্য হামলাকে গুলিয়ে ফেলা হয়। আত্মঘাতি হামলা হলেই তা কামিকাজে হামলা বলে গণ্য হতে পারে না। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর 'সেলবস্টোপার', ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা এবং ইসরাইলে ফিলিস্তিনীদের আত্মঘাতি হামলা কামিকাজে নয়। এসব হামলার সঙ্গে কামিকাজে হামলার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কামিকাজে মিশনে নিয়োজিত জাপানী বৈমানিকদের লক্ষ্যস্থল ছিল বিশুদ্ধ সামরিক। অন্যদিকে, উল্লেখিত হামলাগুলোর লক্ষ্য সামরিক ছিল না।

প্যাসিফিক ওয়ার বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের শুরুতে জাপানী সৈন্যরা যে অসীম মনোবল নিয়ে লড়াই চালাচ্ছিল ১৯৪২ সালে মিডওয়ে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাদের সে মনোবলে মারাত্মক চিড় ধরে। ১৯৪৩-৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল শিল্প ও অর্থনৈতিক সম্পদ রণক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ায় মিত্র পক্ষের সৈন্যরা দ্রুত জাপানের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। আমেরিকায় তৈরি জঙ্গীবিমানের তুলনায় জাপানী জঙ্গীবিমানের মান নীচু বলে গণ্য হতে থাকে। তাছাড়া জাপানী জঙ্গীবিমানের সংখ্যাও ছিল কম। সে সময় মিত্রপক্ষের সৈন্যরা যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত যেসব জঙ্গীবিমান ব্যবহার করছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল এফ-৪ ইউ করসিয়ার ও পি-৫১ মুস্টাং। বিরামহীন যুদ্ধে জঙ্গীবিমান খোয়া যাওয়ায় জাপানীদের দক্ষ পাইলটের ঘাটতি দেখা দেয়। খুচরা যন্ত্রাংশ ও জ্বালানি দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠায় স্বাভাবিক বিমান উড্ডয়নও ব্যাহত হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৪ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানীদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সাইপেনের পতন ঘটায় মার্কিন বিমান বাহিনী দূরপাল্লার বি-২৯ সুপারফোর্টরেসের মাধ্যমে জাপানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার সুযোগ পেয়ে যায়। সাইপেনের পতন ঘটায় জাপানী হাই কমান্ড হিসাব করে দেখতে পায় যে, ফিলিপাইন হচ্ছে মিত্রবাহিনীর হামলার পরবর্তী টার্গেট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তেল ক্ষেত্র এবং জাপানের মধ্যবর্তী জায়গায় ভৌগলিক অবস্থানের জন্য ফিলিপাইন ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৪ সালের ১৭ অক্টোবর মিত্রবাহিনী সুলুয়ানে হামলা শুরু করলে জাপানীদের আশংকা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। শুরু হয় লেইতি উপসাগরীয় যুদ্ধ। পরিকল্পনা করা হয় যে, লেইতি উপসাগরে জাপানী যুদ্ধজাহাজ হামলা চালিয়ে আমেরিকান বিমানবাহী রণতরীগুলোকে ঘায়েল করবে। হামলাকালে ম্যানিলাভিত্তিক জাপানী রাজকীয় নৌ-বাহিনীর ফার্স্ট এয়ার ফ্লীট জাপানী যুদ্ধজাহাজকে সহায়তা দেবে। ঐ সময় জাপানী ফার্স্ট এয়ার ফ্লীটে ছিল ৪০টি বিমান। বিমানগুলোর মধ্যে ৩৪টি ছিল মিৎসুবিশি জিরো, ৩টি টর্পেডো বহনকারী বোমারু নাকাজিমা বি-৬ এন, একটি মিৎসুবিশি জি-৪এম, দু'টি ইউকোসুকু পি-১ওয়াই এবং একটি টহলদানকারী বিমান। এ সামান্য ক'টি বিমানের সাহায্যে আমেরিকান রণতরীতে হামলা চালানো দুরূহ ছিল। এ পরিস্থিতিতে ফার্স্ট এয়ার ফ্লীট কমান্ড্যান্ট ভাইস এডমিরাল তাকিজিরো ওনিশি একটি কামিকাজে স্পেশাল ইউনিট এ্যাটাক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ওনিশিকে কামিকাজের জনক বলা হয়। ১৯ অক্টোবর ২০১তম নেভি ফ্লাইং কোর সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে তিনি ম্যানিলার কাছে ম্যাগরাকাট বিমানঘাঁটিতে এক বৈঠকে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে, একটি জিরো ২৫০ কেজি বিস্ফোরক নিয়ে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের উপর গিয়ে বোমাবর্ষণ করতে পারবে। তাই একমাত্র বিকল্প হচ্ছে সরাসরি বিমান নিয়ে টার্গেটের উপর বিধ্বস্ত হওয়া। তাহলে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে অকেজো করে দেয়া সম্ভব।'

ভাইস এডমিরাল ওনিশির এ মতামতের পর কমান্ডার আসাইকি তামাই ২৩ জন মেধাবী ছাত্র পাইলটের গ্রুপকে স্পেশাল এ্যাটাক ফোর্সে যোগদান করার আহ্বান জানান। তিনি এসব পাইলটকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পাইলটগণ উভয় হাত তুলে অপারেশনে অংশগ্রহণে সম্মতি জানায়। তামাই লেঃ সেইকি ইউকিওকে এ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানান। শোনা গেছে যে, সেইকি চোখ বন্ধ করে মাথা নুইয়ে মাত্র ১০ সেকেন্ড চিন্তা করে তামাইকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আমাকে নিশ্চিন্তে এ মিশনের দায়িত্ব দিতে পারেন।' এভাবে সেইকি ২৪ তম কামিকাজে পাইলট হিসেবে নির্বাচিত হন।

কামিকাজে স্পেশাল এ্যাটাক ফোর্সকে ৪ টি সাব-ইউনিটে ভাগ করা হয়। এ ৪টি ইউনিটের নাম ছিল ইউনিট শিক্সিশিমা, ইউনিট ইয়ামাতো, ইউনিট আসাহি ও ইউনিট ইয়ামাজাকুরা। জাপানী প্রাচীন কবি মতুরী নোরিনাগার লেখা ৪ টি দেশাত্মবোধক কবিতার নামানুসারে এ ৪ টি ইউনিটের নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম কামিকাজে অপারেশনে জাপানী যুদ্ধবিমানগুলো 'ইউএসএস ইন্ডিয়ানা' ও 'ইউএসএস রেনো'র উপর বিধ্বস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে, তামাই ইউনিট নয়, অন্য একটি অজ্ঞাতনামা জাপানী বিমান প্রথম কামিকাজে হামলা চালায়। ১৯৪৪ সালে লেইতি দ্বীপের অদূরে ২শ' কেজি বিস্ফোরক বোঝাই একটি জাপানী বিমান অস্ট্রেলীয় নৌ-বাহিনীর ফ্লাগশীপ ভারি ক্রুজার 'এইচএমএএস অস্ট্রেলিয়া'য় আঘাত হানে। বিমানটি অস্ট্রেলিয়া'র উপরি কাঠামোতে বিধ্বস্ত হলে চারদিকে জ্বালানি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়। বিমানে বহনকারী বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি। বিস্ফোরিত হলে অস্ট্রেলীয় যুদ্ধজাহাজ মারাত্মকভাবে ঘায়েল হতো। জাপানী কামিকাজে হামলায় অস্ট্রেলীয় জাহাজের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন এমিলি ডেকাইনেক্সসহ কমপক্ষে ৩০ জন ক্রু নিহত হয়। আহতদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলীয় বাহিনীর কমান্ডার কমোডর জন কলিন্স। ২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া'র উপর আবার কামিকাজে হামলা হয়। ফলে মেরামতের জন্য এটিকে নিউ হেব্রিজে পাঠানো হয়। একইদিন সেইকির নেতৃত্বে ৫টি জাপানী জিরো জঙ্গীবিমান ইউএস এসকর্ট ক্যারিয়ার 'ইউএসএস সেন্ট লো'তে হামলা চালায়। ম্যানিলার ৮০ কিলোমিটার উত্তরে একটি অখ্যাত বিমানঘাঁটি থেকে প্রথম কামিকাজে বিমান উড্ডয়ন করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঐতিহাসিক ডানিয়েল ডিজন ছিলেন তখন ১৪ বছরের কিশোর। তিনি কামিকাজে অপারেশনে নিয়োজিত জাপানী পাইলটদের আকাশে উড্ডয়ন করতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, উড্ডয়নকালে পাইলটদের আনন্দ দেখে তার মনে হয়েছিল তারা যেন কোথাও বনভোজনে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে একটি কামিকাজে বিমান ইউএসএস সেন্ট লো'তে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। বোমা বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। রণতরীর বোমা ম্যাগাজিন বিস্ফোরিত হলে এটি ডুবে যায়। বাদবাকি কামিকাজে বিমানগুলো মিত্রবাহিনীর অন্যান্য যুদ্ধজাহাজে আঘাত হানে। ফ্লাইট ডেক কাঠের তৈরি হওয়ায় মার্কিন বিমানবাহী রণতরীগুলো কামিকাজে হামলার সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, এ অঞ্চলে তৎপর বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের ডেক ইস্পাতের তৈরি হওয়ায় এগুলো কিছুটা রক্ষা পায়।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে 'এইচএমএএস অস্ট্রেলিয়া' আবার রণাঙ্গনে ফিরে আসে। আরো ৬ বার কামিকাজে হামলা হলেও এ জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। তবে তার ৮৬ জন ক্রু নিহত হয়। কামিকাজে হামলায় উপর্যুপরি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মিত্রবাহিনীর যেসব জাহাজ রক্ষা পেয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল এ্যাসেক্স ক্লাস বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস ইন্ট্রেপিড' ও 'ইউএসএস ফ্রাঙ্কলিন।' মিত্রবাহিনীর সেন্ট লো বিমানবাহী রণতরী ডুবিয়ে দেয়ার মতো সফলতা অর্জিত হলে জাপানীরা তাদের কামিকাজে অপারেশনের পরিধি বিস্তৃত করে। পরবর্তী দু'মাসে প্রায় ২ হাজার বিমান অনুরূপ হামলায় অংশ নেয়। ইউকোসুকা এমএক্সওয়াই-৭ ওক্কা রকেট, বিস্ফোরক বোঝাই ক্ষুদ্র বোট এবং কেইটেন নামে পরিচিত মনুষ্যচালিত

www.pathagar.com

টর্পেডোসহ অন্যান্য ধরনের হামলাও কামিকাজে হামলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কামিকাজে জঙ্গী ও বোমারু বিমানের কোনো ল্যান্ডিং গীয়ার ছিল না। বিশেষভাবে নির্মিত প্রোপেলার চালিত বিমান 'নাকাজামা কি-১১৫ তাসুরুগি' ছিল খুবই সাদাসিধে। কাঠের ফ্রেমে ইঞ্জিন বসিয়ে এসব বিমান তৈরি করা হতো। উড্ডয়নের পর পরই এসব বিমান বোমাবর্ষণ করতো এবং পরে এগুলোকে অন্যান্য বিমানে ব্যবহার করা যেতো।

১৯৪৫ সালের ৬ এপ্রিল ওকিনাওয়া যুদ্ধ শুরু হলে কামিকাজে হামলা তুঙ্গে উঠে। এ যুদ্ধে কিকুসাই নামে পরিচিত অপারেশনে শত শত বিমান দফায় দফায় হামলা চালায়। প্রথমে মিত্রবাহিনীর বাধাদানকারী ডেস্ট্রয়ারগুলোতে কামিকাজে হামলা কেন্দ্রীভূত ছিল এবং পরে সে বছরের মাঝামাঝি বিমানবাহী রণতরীগুলোতেও কামিকাজে হামলা বিস্তৃত হয়। ১ হাজার ৪৬৫ টি বিমানের মুহূর্মুহূ হামলায় মিত্রবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কামিকাজে হামলায় ২১টি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হয়। আরো কয়েক ডজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিত্রবাহিনীর অন্যান্য শরীকদের যুদ্ধজাহাজও ঘায়েল হয়। ১৯৪৪ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৪৫ সালের জুন পর্যন্ত ওকিনাওয়া যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ জাপানীরা ২ হাজার ৫৫০টি কামিকাজে হামলা চালায়। জাপানী ব্যাটলশীপ ইয়ামাতো তৎপরতায় জড়িত হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কামিকাজে মিশনে অংশগ্রহণকারী পাইলটদের প্রশিক্ষণের মান নীচু হওয়ায় মিত্রবাহিনীর অভিজ্ঞ পাইলটরা তাদের সহজেই কাবু করে ফেলতে পারতো। কামিকাজে হামলা ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মিত্রবাহিনীর ক্রুরা নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতো। এসব কৌশলের মধ্যে একটি ছিল সমুদ্র পৃষ্ঠে উড্ডয়নকারী হামলাকারী বিমানের সামনে সাগরে বড় বড় কামান থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ। ওক্কা ও অন্যান্য দ্রুতগামী বিমানের ক্ষেত্রে এ কৌশল কার্যকর না হলেও এগুলো বিমানবিধ্বংসী কামান থেকে গোলাবর্ষণ এবং মিত্রবাহিনীর জঙ্গীবিমান উড্ডয়নে হুমকি সৃষ্টি করে।

১৯৪৫ সালে জাপানের মূল ভূখণ্ডে মিত্রবাহিনীর সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশে জাপানী সামরিক বাহিনী শত শত তাসুরুগি, ওক্কা রকেট, আত্মঘাতি বোট প্রভৃতি মজুদ করে। তবে এগুলোর খুব সামান্যই তারা ব্যবহার করতে পেরেছে। মার্কিনীরা আইয়োজিমা দখলের পর তারা জাপানের মূল ভূখণ্ডে বিমান হামলায় দূরপাল্লার বি-২৯ ব্যবহার করতে থাকে। তখনকার দিনে সর্বাধুনিক এ মারণাস্ত্র ধ্বংসে জাপানীরা আত্মঘাতি হামলা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বি-২৯ বোমারু বিমানগুলো দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং যুদ্ধজাহাজের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তনের হওয়ায় জাপানীদের আত্মঘাতি হামলা চালানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ ও অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। বি-২৯ মডেলের মার্কিন বোমারু বিমানগুলো দুর্ভেদ্য হওয়ায় এ ধরনের বিমানের বিরুদ্ধে আত্মঘাতি হামলা চালাতে জাপানী আত্মঘাতি পাইলটদের উঁচু মানের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে জাপানী নৌ-বাহিনীর ২ হাজার ৫২৫ জন কামিকাজে পাইলট নিহত হয়। সেনাবাহিনীর এয়ার ফোর্স হারায় আরো ১ হাজার ৩৮৭ জন পাইলট। জাপানের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, কামিকাজে মিশন শত্রুপক্ষের ৮১টি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৫ টি ঘায়েল করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে লড়াইয়ে যেসব মার্কিনী হতাহত হয় তাদের ৮০ শতাংশই কামিকাজে হামলায় হতাহত হয়। মার্কিন বিমান বাহিনীর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, 'আনুমানিক ২ হাজার ৮ শ' কামিকাজে হামলায় ৩৪ টি যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত, ৩৬৮টি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত, ৪ হাজার ৯ শ' নাবিক নিহত এবং ৪ হাজার ৮ শতাধিক আহত হয়। বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলাবর্ষণ, মিত্রবাহিনীর বিমানের ধাওয়া এবং রাডারে ধরা পড়া সত্ত্বেও ১৪ শতাংশ কামিকাজে হামলাকারী বেঁচে যেতো। তারা পরে আবার অন্য একটি জাহাজে হামলা করতো। কামিকাজে বৈমানিকেরা যেসব জাহাজের উপর হামলা চালাতো সেগুলোর প্রায় ৮ শতাংশ ধ্বংস হতো। জাপানী কামিকাজে পাইলটদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ৫টি বিমান ও ৫টি জীবনের বিনিময়ে অন্তত একটি শত্রু জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া।

কামিকাজে মিশনে স্বেচ্ছাসেবক রিক্রুটে জাপানী সেনাবাহিনীকে কখনো কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। কামিকাজে বিমানের চেয়ে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ছিল তিন গুণ বেশী। ফলে অভিজ্ঞ পাইলটদের কদর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে তাদেরকে খুব মূল্যবান বলে বিবেচনা করা হতো। কামিকাজে পাইলটদের গড় বয়স ছিল ২০ বছর। তাদের অধিকাংশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। শুধু দেশপ্রেম নয়, পরিবারের মযার্দা বৃদ্ধি এবং নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করাও ছিল কামিকাজে মিশনে যোগদানের লক্ষ্য। কামিকাজে কৌশলে যুদ্ধের ফলাফল প্রভাবিত না হলেও পরোক্ষভাবে এ কৌশল অগণিত জাপানীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা করে। আত্মঘাতী হামলায় শত্রুপক্ষের বৈমানিকদের মধ্যে প্রচণ্ড আতংক সৃষ্টি হয়। আতংক সৃষ্টি হওয়ায় বি-২৯ মার্কিন বোমারু বিমানের ২ সহস্রাধিক মিশন ব্যর্থ হয়। জাপানের মূল ভূখণ্ডে বেসামরিক ও শিল্প সমৃদ্ধ টার্গেটে বোমার্বষণের লক্ষ্য নিয়ে বি-২৯ উড্ডয়ন করলেও কামিকাজে হামলার ভয়ে এসব বিমান তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে এবং কিয়ুশুতে কামিকাজে ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে।

কামিকাজে মিশনের অব্যবহিত আগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এখানে পাইলটদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের জন্য প্রার্থনা করতো। পাইলটদের সামরিক পদক দেয়া হতো। এ ধরনের অনুষ্ঠান কামিকাজে মিশনকে গৌরবান্বিত ও পাইলটদের আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করতো। ধর্মীয় প্রেরণাও জাপানীদের কামিকাজে হামলায় অনুপ্রাণিত করতো। জাপানীরা বিশ্বাস করতো যে, কামিকাজে পাইলটরা শত্রুর উপর হামলা চালিয়ে মৃত্যুবরণ করলে সরাসরি স্বর্গে আরোহন করবে। জাপানে প্রচলিত শিন্টো ধর্মমত অনুয়ায়ী সম্রাটকে ঈশ্বরের বংশধর হিসেবে

www.pathagar.com

গণ্য করা হতো। তাই সম্রাটের ইচ্ছা ও সম্মান রক্ষার জন্য জীবন দান করাকে জাপানীরা ঈশ্বরের জন্য জীবন দান হিসেবে জ্ঞান করতো। জাপানীদের রণধ্বনি ছিল 'বাঞ্জাই' বা সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন। জনশ্রুতি আছে যে, কামিকাজে মিশনের তরুণ পাইলটরা জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯২২ মিটার (৩ হাজার ফুট) উঁচু পর্বত শৃঙ্গ কাইমনের উপর দিয়ে উড়ে যেতো। এটি ছিল সাতসুমা ফুজিওমা পাহাড়ের শৃঙ্গ। আত্মঘাতি মিশনের পাইলটরা জাপানের মূল ভূখণ্ডের সর্ব দক্ষিণের এ পাহাড় দেখার জন্য তাদের কাঁধের মধ্য দিয়ে পেছন ফিরে তাকাতো। আকাশে উড্ডয়নের পর তারা এ পাহাড়কে অভিবাদন করতো এবং এটাকে লক্ষ্য করে বলতো 'চিরবিদায়।' কিকাইজিমা দ্বীপের অধিবাসীরা জানিয়েছে, আত্মঘাতি মিশনের পাইলটরা তাদের চূড়ান্ত মিশনে রওনা হবার প্রাক্কালে আকাশ থেকে ফুল ছিটিয়ে দিতো। তারা বিশ্বাস করতো কিকাইজিমা বিমান বন্দরের পাদদেশের পাহাড়-গুলোতে গ্রীষ্মের শুরুতে শষ্যক্ষেতে আবার এসব ফুল প্রস্ফূটিত হবে।

www.pathagar.com

মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানের আত্মসমর্পণ

১৯৪৫ সালের ৮ মে ইউরোপে জার্মানী আত্মসমর্পণ করলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তখনো যুদ্ধ চলছিল। জাপানীরা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু মার্কিন আণবিক বোমাবর্ষণে দু'টি সমৃদ্ধ নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে জাপান সম্রাট হিরোহিতো আত্মসমর্পণে সম্মত হন। আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বীরত্ব ও সাহস যুগ যুগ ধরে প্রবাদের মতো স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে জাপানীদের মূল রণকৌশল ছিল 'কামিকাজে'। জাপানীদের আত্মহত্যা করার রীতি 'কামিকাজে' হিসেবে পরিচিত। যুদ্ধে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে এ মরণপণ কৌশল অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে। এখনো অসম যুদ্ধে জাপানীদের এ কৌশল খুবই জনপ্রিয়।

১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের পরিস্থিতি ছিল মরণাপন্ন। বড় বড় শহরগুলো হয়তো আণবিক নয়তো প্রচলিত বোমাবর্ষণে ছিল বিধ্বস্ত। নিহতের সংখ্যা ছিল লাখ লাখ। তাছাড়া আরো লাখ লাখ লোক দেশছাড়া হয়। মানুষের মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ১২শ'র নীচে নেমে আসে। রণতরীগুলো ছিল অকেজো। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো সাগরে ভাসতে পারছে না। তেল মজুদ নিঃশেষিত। রাবার ও স্টীলের সরবরাহ বন্ধ। চীনের মাঞ্চুরিয়া ছাড়া আর কোথাও জাপানী সৈন্য অবশিষ্ট ছিল না। মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানকারী 'কুয়ানটাং আর্মি'র বিরুদ্ধেও সোভিয়েত লাল ফৌজ ধেয়ে আসছিল। কুয়ানটাং আর্মি ছিল ক্ষুধার্ত ও সরবরাহ বঞ্চিত। যুদ্ধকালে যেসব জাপানী ডিভিশনকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তর করা হয়েছিল সেসব ডিভিশনের সৈন্যরাও দ্বীপে দ্বীপে লড়াইয়ে প্রাণ হারায়। এ পরিস্থিতিতে জাপানের জন্য আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবিশ্বাস্য হলেও বহু জাপানী সৈন্য তখনো আত্মসমর্পণ করার চেয়ে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করতো। ১৯৪৫ সালে জুনের গোড়ার দিকে জাপানী মন্ত্রিসভা নিরপেক্ষ দেশ সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। শুধু এতটুকু শর্ত দিয়েছিল যে, জাপান সম্রাটের সিংহাসনের অস্তিত্ব যেন অব্যাহত থাকে। প্রস্তাব গ্রহণে অনাগ্রহ অথবা প্রস্তাবের অস্পষ্টতার জন্য মিত্র পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ২৬ জুলাই পটসড্যাম ঘোষণা গ্রহণ করা হয়।

জাপান সম্রাট হিরোহিতো ছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। অন্যদিকে, জাপানী মন্ত্রিসভায় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ ছিলেন আত্মসমর্পণের বিপক্ষে। এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী সুজুকিকে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোথাও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে সম্রাট হিরোহিতো নিহত হতে পারতেন। সেনা ও নৌ উভয়

www.pathagar.com

বাহিনীর কারো কারো কাছে এটা অবিশ্বাস্য ছিল যে, সম্রাট হিরোহিতো আত্মসমর্পণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী সুজুকি দু'জন জেনারেল ছাড়া আত্মসমর্পণের পক্ষে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের মতামত আদায় করেন। ২৮ জুলাই জাপান সরকার অত্যন্ত সাবধানী ভাষায় পটসড্যাম ঘোষণার প্রতি সাড়া দেয়। তবে সরকারী বিবৃতিতে ব্যবহৃত একটি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় দু'রকম। ইংরেজী ভাষায় ওই শব্দকে 'ইগনোর' বলে প্রচার করা হয়। যার অর্থ দাঁড়ায় যে, জাপান মিত্রপক্ষের দাবি অগ্রাহ্য করছে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এ শব্দের অর্থ এভাবেই গ্রহণ করে। জাপানী বিবৃতির ভুল অর্থ অনুধাবন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, তিনি জাপানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন এবং আণবিক বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দিচ্ছেন।

জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার

অন্যদিকে, জাপান সম্রাট পটসড্যাম ঘোষণা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের একটি দলিল পাঠানোর নির্দেশ দেন। সুইস চ্যানেলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ দলিল পাঠানো হয়। তবে এতে এ কথা উল্লেখ করা হয় যে, সম্রাটকে অবশ্যই তার সিংহাসনে থাকতে দিতে হবে। জাপানের এ প্রস্তাবের জবাবে মিত্রপক্ষ জানায় সম্রাটের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে এ্যালায়েড অক্যুপেশন কমান্ডার। জাপানী মন্ত্রিসভা যে মুহূর্তে বিতর্কে লিপ্ত ছিল ঠিক তখন সম্রাট গোপনে আত্মসমর্পণের একটি বিবৃতি রেকর্ড করান। রাজকীয় রক্ষীরা এ বিবৃতি উদ্ধারে সরকারী অফিসে ব্যর্থ তল্লাশি চালায়। ১৪ আগস্ট এটি প্রচার করা হয়। জাপানী জনগণ বুঝতে পারছিল না যে, সম্রাট আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন নাকি অব্যাহত প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে তার প্রজাদের

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করছেন। ঘোষক জাপানী জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, যুদ্ধ শেষ। সেদিন রাতে জাপানী সেনা ও নৌ-বাহিনীর একদল দক্ষিণপন্থী অফিসার সম্রাটকে জিম্মি করার একটি ব্যর্থ চেষ্টা চালায় এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন পুড়িয়ে দেয়। মেজর কেনজি হাতানাকার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা রাজপ্রসাদ দখলের চেষ্টা চালায় এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চায়। বিদ্রোহীরা রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারকে হত্যা করে এবং তার নামে নির্দেশ জারি করে। কিন্তু ভোরে এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দেয়া হয়। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে জাপানের যুদ্ধমন্ত্রী আত্মহত্যা করেন।

পরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন ১৫ আগস্ট যুদ্ধ শেষ। তার ঘোষণা অনুযায়ী যুদ্ধ শেষ না হলেও মিত্রবাহিনীর প্রতিটি রাজধানী ও বড় বড় শহরে উন্মত্ত আনন্দ শুরু হয়। মার্কিন সেনাবাহিনীর জেনারেল ডগলাস সি, ম্যাকআর্থার ওই দিন আৎসুগি বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছান। তার স্টাফদের সঙ্গে ছিল পিস্তলের মতো হাল্কা অস্ত্র। তাদের সন্দেহ হচ্ছিল যে, তাদেরকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় কিনা। বিমান বন্দরে এসে পৌঁছুলে জেনারেল ম্যাকআর্থারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাকে বহনকারী বিমানের আশপাশে হাজার হাজার জাপানী সমবেত হয়। এসময় থেকে জাপানে মার্কিন দখলদারিত্ব শুরু হয়।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর টোকিও উপসাগরে মিত্রবাহিনীর প্রায় ২শ' যুদ্ধ জাহাজ এসে নোঙ্গর করে। ইউএসএস মিসৌরির ডেকে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ছিল আধা ঘন্টার চেয়ে কম। মার্কিন রণতরী মিসৌরির ডেকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পতাকাও উড়ানো হয়। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান এ রণতরীতে জাপানের আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে জেনারেল ম্যাকআর্থারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিজ রাজ্যের নাম ছিল মিসৌরি। তার রাজ্যের নামানুসারে ওই ঐতিহাসিক রণতরীর নামকরণ করা হয়েছিল 'মিসৌরি'। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানে মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারকে। রণতরী মিসৌরির ডেকে মিত্রবাহিনীর হাজার হাজার প্রতিনিধি ও ক্রু জাপানের আত্মসমর্পণের দৃশ্য অবলোকন করেন। জেনারেল ম্যাকআর্থার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তার সঙ্গে ছিলেন জেনারেল ওয়েনরাইট। জেনারেল ওয়েনরাইট ছিলেন তার সাবেক অধঃস্তন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি ছিলেন যুদ্ধবন্দী। আত্মসমর্পণ দলিলে জাপান সরকারের পক্ষে প্রথম সই করেন জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মামোরু শিজেমিভমু। পরে জাপান সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে সই দেন জেনারেল ইউশিজিরো ইউমেবু। জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিজেমিভমু ও জাপানী জেনারেল ইউমেবু যে মুহূর্তে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছিলেন তখন উপস্থিত জাপানীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। দু'জন জাপানী কর্মকর্তার স্বাক্ষর শেষ হওয়ার পর মিত্রবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর দেন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার। তারপর স্বাক্ষর করেন মার্কিন এডমিরাল চেস্টার নিমিৎসসহ মিত্রবাহিনীর আরো ৮জন

www.pathagar.com

জেনারেল। জাপানের স্থানীয় সময় ৯ টা ৪ মিনিটে এ অবিস্মরণীয় আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ইতিহাসে দিবসটি 'ভি-জে ডে' বা ভিক্টোরি অভার জাপান অর্থাৎ জাপান বিজয় দিবস হিসেবেও পরিচিত।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর আত্মসমর্পণের দলিল তৈরি করে। এ দলিলে ৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ ছিল। প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা ছিল, 'জাপান সম্রাটের নির্দেশ ও পক্ষে আমরা স্বাক্ষর দান করছি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা ছিল মূল কথা, 'এত দ্বারা আমরা মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানী রাজকীয় জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ও জাপানের সকল সশস্ত্র বাহিনী এবং যে কোনো স্থানে অবস্থানরত জাপানীদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সশস্ত্র বাহিনী নিঃশর্তে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিচ্ছি'। ৬ সেপ্টেম্বর কর্নেল বার্নার্ড থেইলেন জাপানীদের স্বাক্ষর সম্বলিত আত্মসমর্পণের দলিল ওয়াশিংটনে নিয়ে যান এবং পরদিন তিনি হোয়াইট হাউসে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে এ দলিল হস্তান্তর করেন। পরে দলিলটি জাতীয় মোহাফেজখানায় প্রদর্শন করা হয়।

পরবর্তী ৬ সপ্তাহে গণহারে জাপানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ১৯৪৫ সালের ৭ অক্টোবর নাগাদ চীনের রাজধানী পিকিং (বর্তমান বেইজিং)-এ ১০ লাখ জাপানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। বহু জাপানীকে দেশে পাঠানো হয়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বন্দী জাপানীদের ঘরে ফেরার জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়। মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা ছিল না জাপানের। জাপানীরা বিমান, মটর লঞ্চ, সাবমেরিন ও মনুষ্যবাহী টর্পেডোর সাহায্যে 'কামিকাজে' কৌশল গ্রহণের চিন্তাও করছিল। মূল ৪ টি জাপানী দ্বীপে চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য তারা শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছিল। এ চিন্তা থেকে তারা আক্রমণকারী মার্কিন বি-২৯ বোমারু বিমানকেও বাধা দেয়নি। কিন্তু তাদের কোনো পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। বিশ্বের তদানীন্তন দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ভাবতে থাকে যে, এ অস্ত্র প্রয়োগ করলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে এবং জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে। এ ধারণা থেকে মার্কিনীরা ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা নগরীতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ইতিহাসে এটাই ছিল আণবিক বোমা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত। বিধ্বংসী এ বোমাবর্ষণে হিরোশিমায় তাৎক্ষণিকভাবে ৮০ হাজার লোক নিহত হয়। তাছাড়া আরো হাজার হাজার লোক হয় আহত। আণবিক বোমাবর্ষণের কোনো পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। কেননা তখনো পর্যন্ত দেশটি আণবিক শক্তির অধিকারী হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে 'অপারেশন অলিম্পিক' নামে জাপানে একটি দুর্ধর্ষ নৌ-হামলা চালানোর। হিসাব করা হয়েছিল এ অপারেশনে ফ্রান্সের নরমান্ডিতে মিত্রবাহিনীর সৈন্য অবতরণে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে ১০ গুণ বেশী ক্ষয়ক্ষতি হবে। জুনের শেষদিকে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ওকিনাওয়া দখলের পর যুক্তরাষ্ট্র এ অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেননা

www.pathagar.com

ওকিনাওয়া থেকে জাপানের মূল ভূখণ্ডে নৌ-হামলা চালানো ছিল সহজতর। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউমেক্সিকোর মরুভূমিতে আণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণের পর যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় নতুন চিন্তার উদয় হয়। আণবিক বোমা হাতে আসায় সে নভেম্বরে নৌ-হামলা চালানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে জাপানে এ বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা পরীক্ষার ১০দিন পর মিত্রশক্তি পটসড্যাম ঘোষণা ইস্যু করে। পটসড্যাম ঘোষণায় নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য জাপানের প্রতি দাবি জানানো হয়। হুমকি দেয়া হয় যে, এ দাবি প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে জাপান ও জাপানী সশস্ত্র বাহিনীর পুরোপুরি ধ্বংস।

২৮ জুলাই জাপানী প্রধানমন্ত্রী কান্তারো সুজুকি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তার সরকার মিত্রবাহিনীর চরমপত্রে মোটেও কর্ণপাত করছে না। জাপানী প্রধানমন্ত্রীর এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাব ছিল হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ। ৬ আগস্ট ইউএস বি-২৯ এ্যানোলা গে নামে একটি বোমারু বিমান এ বোমা নিক্ষেপ করে। হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর জাপানের সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিলের একটি অংশ পটসড্যাম ঘোষণা মেনে নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে তখনো ওয়ার কাউন্সিলের বেশীর ভাগ সদস্য ছিলেন আত্মসমর্পণের বিপক্ষে। ৮ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দেশটির অবস্থা আরো নাজুক হয়ে পড়ে। ঠিক পরদিন সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ায় হামলা শুরু করে। রাশিয়া ১৯৪৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী মিত্রপক্ষের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ইয়াল্টা চুক্তির শর্ত মানতে বাধ্য ছিল। ইয়াল্টা চুক্তিতে বলা হয়েছিল 'ভি-ই' দিবস বা ভিক্টোরী ইন ইউরোপ সম্পন্ন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধে যোগদান করবে। ফলে ইয়াল্টা চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের তাগিদে ৫ এপ্রিল সোভিয়েতরা জাপানের সঙ্গে ১৯৪১ সালের ১৩ এপ্রিল স্বাক্ষরিত 'নিউট্রালিটি প্যাক্ট' মেনে চলতে অস্বীকার করে। ৯ আগস্ট মস্কোয় নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূতকে তলব করে জানানো হয় যে, শান্তি ত্বরান্বিত করতে এবং মিত্রপক্ষের অনুরোধে তারা উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তি বাতিল করছে। এ ঘোষণা দেয়ার দু'ঘন্টা পর সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সৈন্যদের উপর হামলা চালায়।

এ চরম দুঃসময়ে ৯-১০ আগস্ট মধ্য রাতে সম্রাট হিরোহিতো সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিলের বৈঠক ডাকেন। ওয়ার কাউন্সিলের ৬ জন সদস্য কয়েকটি শর্তের আওতায় আত্মসমর্পণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। ৩ জন জাপানের মূল দ্বীপে চূড়ান্ত লড়াই নাগাদ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে মত দেন। ৫ জন কোনো মতামত দেননি। সে রাতে বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো ছিল-সম্রাট তার স্বপদে বহাল থাকবেন, জাপান নিজে তার সশস্ত্র বাহিনীকে নিরস্ত্র করবে। তবে বিদেশী শক্তির কাছে অস্ত্রসমর্পণ করবে না এবং জাপান নিজে তার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। বৈঠক চলাকালেই খবর আসে যে, নাগাসাকিতে দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করায় জাপানের মনোবল

www.pathagar.com

পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়। সম্রাট হিরোহিতো উভয়পক্ষের মতামত শোনেন। ওয়ার কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আনুগত্য ছাড়া তাদের উপর সম্রাটের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'এটা হচ্ছে অসহনীয় বিষয় সহ্য করার সময়'। দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি পটসড্যাম ঘোষণা গ্রহণ করার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী সুজুকির একটি প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দেন।

এদিকে, আত্মসমর্পণের শর্তাবলী চূড়ান্তভাবে গৃহীত্ব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের ঘোষণা প্রচার করা না পর্যন্ত সেনাবাহিনী সৈন্যদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। নির্দেশে বলা হয়, 'আমরা চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত লড়াই করবো এবং আমরা আমাদের বিশ্বাসের উপর অটল থাকবো যে, মৃত্যুতেই আমরা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করি। শুধু তাই নয়, আমরা উদ্বত শত্রুকেও ধ্বংস করবো'। সেনাবাহিনীর এ ঘোষণায় শান্তিবাদীরা বিচলিত হয়ে পড়েন। তারা যুদ্ধবাদীদের এ ঘোষণাকে প্রতিহত করার জন্য নিজেদের উদ্যোগে আরেকটি পাল্টা ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মোর্স কোড ছিল সরকার পরিচালিত সংবাদ সংস্থার বার্তা বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম এবং যা ছিল সামরিক বাহিনীর সেন্সরসীপের আওতামুক্ত। কূটনৈতিক চ্যানেলে জাপান আত্মসমর্পণের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা গ্রহণের গতিকে ত্বরান্বিত এবং তৃতীয় আরেকটি শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আশায় শান্তিবাদীরা এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। আশা করা হচ্ছিল যে, শান্তিবাদীদের এ উদ্যোগে যুদ্ধাবসানে মিত্রবাহিনীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হবে তাতে তাদের পক্ষে জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব হবে। অন্যদিকে, ১১ আগস্ট সকালে জাপানের সেনাবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তবে তারা কোনো সহিংসতার আশ্রয় নেয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় সম্রাট জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি জাতির কাছে প্রচারে সম্মত হন।

কি কি শর্তে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে তা তাদের জানানোর জন্য মিত্রপক্ষও সেদিন রেডিওতে একটি কঠোর জবাব প্রচার করে। কূটনৈতিক চ্যানেলে আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার ১৮ ঘন্টা আগে ১১-১২ আগস্ট মধ্য রাতে জাপান মিত্রবাহিনীর এ জবাব গ্রহণ করে। জাপান সরকার যে মুহূর্তে আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখন ১৩ আগস্ট মধ্য রাতে বিজয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ২০ লাখ জাপানীর প্রতি একটি আবেদন প্রচার করা হয়। ১৪ আগস্ট ভোরে মিত্রবাহিনী বিমান থেকে প্রচারপত্র নিক্ষেপ করায় কূটনৈতিক চ্যানেলে গোপনে যে আলাপ-আলোচনা চলছিল তা ফাঁস হয়ে যায়। একইদিন দুপুরে রাজকীয় সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিসভার তিনজন সামরিক প্রধান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে সম্রাট মিত্রবাহিনীর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দেন। তিনি মতামত দেয়ার পরক্ষণে মন্ত্রিসভা বৈঠকে মিলিত হয় এবং সম্রাটের অভিপ্রায় অনুমোদন করে। অপরাহ্ন ৩টা নাগাদ সরকারী মোর্স কোড স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মিত্রবাহিনীর প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে শিগগির একটি ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। জাপানের এ উদ্যোগের পর মিত্রবাহিনীর হামলা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সতর্কতা বজায় রাখা হয় মাত্র।

www.pathagar.com

১৫ আগস্ট দুপুরে সম্রাট হিরোহিতোর বাণীবদ্ধ ভাষণ রেডিওতে জাতির উদ্দেশে প্রচার করা হয়। তবে তার ভাষণ শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝা যায়নি যে, তা আত্ম-সমর্পণের ঘোষণা কিনা। নৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে জাপানী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং যুবরাজ তুজো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পটসড্যাম ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট :

* পটসড্যাম ঘোষণায় জাপান সম্রাটের ব্যাপারে তেমন কিছু বলা হয়নি। তবে এতটুকু বলা হয় যে, সম্রাট ও সরকারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডারের আওতায়।
* জাপানের ভূখণ্ড ততদিন পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর দখলে থাকবে যতদিন এ প্রমাণ না পাওয়া যাবে যে, দেশটির যুদ্ধ করার ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে।
* জাপান ৫টি মূল দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষদ্র দ্বীপগুলোর ভাগ্য নির্ধারণ করবে মিত্রপক্ষ। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
* জাপানের সশস্ত্র বাহিনীকে নিরস্ত্র হতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল জীবনে ফিরে যেতে হবে।
* যুদ্ধাপরাধীদের কঠোর বিচার হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।
* শিল্পোৎপাদন ও বিশ্ব বাণিজ্যের অনুমতি দেয়া হবে। তবে সশস্ত্র বাহিনীকে পুনরায় অস্ত্র সজ্জিত হতে দেয়া হবে না।
* লক্ষ্য অর্জিত হলে মিত্রবাহিনী সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং একটি অবাধ ও শান্তির প্রতি আস্থাশীল সরকার কায়েম করা হবে।
* হয়তো শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ নয়তো চূড়ান্ত ধ্বংস।

মিত্রবাহিনী পটসড্যাম ঘোষণা মেনে নেয়ার চরমপত্র দেয়ার পর রাজ পরিবারের সদস্য, সরকারী ও সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাগণ দূরবর্তী সামরিক ইউনিটগুলো সফরে গিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন যে, সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী মিত্রবাহিনীর দেয়া এ চরমপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। আমৃত্যু যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে জাপানী সশস্ত্র বাহিনীর অভিপ্রায় এবং মিত্রবাহিনীর আকস্মিক ব্যাপক হামলার হুঁশিয়ারি- এ দু'টি বিষয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর নাগাদ দু'সপ্তাহ স্থগিত রাখা যায় কিনা সে ব্যাপারে জাপানী মন্ত্রিসভা ছিল উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগ থেকে রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আঞ্চলিক সামরিক নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে যান এবং তাদের জানান যে, সম্রাট চান তারা যুদ্ধ বন্ধ করুক।

১৪ আগস্ট জাপান পটসড্যাম ঘোষণা গ্রহণ করে এবং আত্মসমর্পণে রাজি হয়। ১৫ আগস্ট জাপানে বোমাবর্ষণে মিত্রবাহিনীর দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। বিমানগুলো তাদের বোমা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে রণতরীতে ফিরে যায়। তবে প্রথম বিমান হামলায় ৪৫ জন জাপানী রক্ষীর ২৬ জনই নিহত হয়। জাপানের ৪টি বিমানও

www.pathagar.com

ভূপাতিত হয়। সেদিন মিত্রবাহিনীর খোয়া যায় ৩ টি বিমান। ২৫ আগস্ট মার্কিন রণতরীতে অবস্থানরত বিমানগুলো জাপানী বিমান ঘাঁটির উপর টহলদান, জাহাজ চলাচলের উপর নজরদারি এবং যুদ্ধবন্দী শিবিরগুলো খুঁজে বের করার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। ২৭ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় নৌ-বহর টোকিও উপসাগরের প্রবেশমুখে সাগামি ওয়ান-এ অবস্থান নেয়। ২৮ আগস্ট মার্কিন বিমানের টেকনিশিয়ানরা টোকিওর কাছে আৎসুগি বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে। জাপানে এটাই ছিল আমেরিকান সৈন্যদের প্রথম অবতরণ। ২৯ আগস্ট যুদ্ধবন্দীদের জাপান থেকে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। ৩০ আগস্ট মার্কিন তৃতীয় নৌ-বহর, নৌ-বাহিনী ও ইউএসএএএফ বিমানের বোমাবর্ষণের ছত্রছায়ায় টোকিও উপসাগরে দখলদার সৈন্যরা অবতরণ করে। ২ সেপ্টেম্বর জাপান অবমাননাকর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর দান করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

জাপানে যে মার্কিন অভিযান চালানো হয়নি

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র জাপানে একটি সর্বাত্মক সামরিক অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। দু'দফা আণবিক বোমার আঘাত সইতে না পেরে টোকিও আত্মসমর্পণ করায় এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয়। দানবীয় শক্তিসম্পন্ন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায় তার গুরুত্বকে কোনোক্রমেই খাটো করে দেখা সম্ভব নয়। আণবিক বোমা নিক্ষেপ করার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র এ সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেলে আক্রান্ত জাপানীদের মতো আক্রমণকারী মার্কিনীদের রক্তপাতও হতো প্রায় সমান। কোরীয় উপদ্বীপ ভেঙ্গে গিয়ে যেভাবে ৩৮ তম অক্ষরেখা দাঁড়িয়ে যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানে মার্কিন অভিযান চালানো হলে দেশটির পরিণতি হতো ঠিক তাই।

জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের হাজার হাজার পৃষ্ঠার দলিল প্রায় ৪ দশক গোপন রাখা হয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন জাতীয় মোহাফেজখানার গোপন কুঠুরিতে এ দলিল তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। জাপানে পরিকল্পিত মার্কিন সামরিক অভিযানের গোপনীয় দলিলপত্রের খামের উপর লেখা ছিল 'অতি গোপনীয়।' পরিকল্পিত সামরিক অপারেশনের ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন ডাউনফল।' এ অপারেশনের ছিল দু'টি অংশ। একটির ছদ্মনাম ছিল 'অপারেশন অলিম্পিয়া' এবং আরেকটির 'অপারেশন করোনেট।'

জাপানের মূল ভূখণ্ড বা হোম আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব কম সংখ্যক আমেরিকানই জানতো। আমেরিকার নেতৃত্বে মিত্রবাহিনীর পরিকল্পিত হামলা নস্যাতে জাপানীদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আজো অনেকে সামান্যই জানে। ১৯৪৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে অপারেশন ডাউনফল চূড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনায় পর পর দু'টি ব্যাপক সামরিক অভিযান পরিচালনা করার কথা ছিল। এ দু'টি সামরিক অভিযান পরিচালিত হতো জাপান সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডে। পরিকল্পনা ছিল যে, ১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর অতি প্রত্যুষে 'অপারেশন অলিম্পিয়া' ছদ্মনামে প্রথম অভিযানে আমেরিকার স্থল সৈন্যরা জল ও অন্তরীক্ষে হামলার মাধ্যমে জাপানী ভূখণ্ডে অবতরণ করবে। ব্যাপক নৌ ও বিমান হামলার ছত্রছায়ায় ১৪ টি স্থল ও মেরিন ডিভিশনের সৈন্যরা জাপানের মূল ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণে সুরক্ষিত কিয়ুশুতে এসে পৌঁছাবে। 'অপারেশন করোনেট' ছদ্মনামে দ্বিতীয় অভিযানে হনশুর মূল ভূখণ্ড ও

www.pathagar.com

টোকিওর সমতল ভূমিতে ১০ লাখ জাপানী সৈন্যের বিপরীতে ২২ ডিভিশন মার্কিন স্থল সৈন্য পাঠানো হবে। তাদের লক্ষ্য হবে জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন বৃটিশ নৌ-বহরের সহায়তা ছাড়া পুরো অপারেশন ডাউনফল ছিল আমেরিকান। এ অপারেশনে গোটা মেরিন কোর, সমগ্র প্যাসিফিক নৌ-বহর, সপ্তম আর্মি এয়ার ফোর্স, অস্টম এয়ার ফোর্স, দশম এয়ার ফোর্স এবং আমেরিকান ফার ইস্ট এয়ার ফোর্স ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। স্থির করা হয় যে, দু'টি উভচর হামলায় ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য অংশগ্রহণ করবে। তাদের সহায়তায় থাকবে আরো ৩০ লাখ সৈন্য অথবা সকল রিজার্ভ বাহিনীর ৪০ শতাংশ সদস্য।

হতাহতের সংখ্যা ব্যাপক হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এডমিরাল উইলিয়াম লীহি হিসাব করেছিলেন যে, এককভাবে কিয়ুশু দ্বীপে ২ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য হতাহত হবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল চার্লস উইলোবি ধারণা করেছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের শরৎ কাল নাগাদ পুরো অভিযানে ১০ লাখ সৈন্য হতাহত হবে। হতাহতের সংখ্যা এত বেশী করে হিসাব করা সত্ত্বেও জেনারেল উইলোবির গোয়েন্দা স্টাফ এ সংখ্যাকে নগণ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন।

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে এ ধরনের একটি বড় মাপের অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার মতো সময় ছিল আমেরিকার হাতে খুব কম। তবে জাপানে সামরিক অভিযান পরিচালনার পক্ষে শীর্ষ সামরিক নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন একমত। জাপানের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ কার্যকর বলে বিবেচিত হলেও জেনারেল ম্যাকআর্থার নৌ-অবরোধে জাপান আত্মসমর্পণ করবে বলে বিশ্বাস করতেন না। অভিযানের সমর্থকরা একমত হন যে, নৌ-অবরোধে জাপানের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কারো প্রাণহানি ঘটছে না। বোমাবর্ষণে শহর-বন্দর ধ্বংস হলেও জাপানের সশস্ত্র বাহিনী ছিল অক্ষত। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ২৫ মে ব্যাপক আলোচনার পর জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ কিয়ুশুতে অভিযান চালানোর বিষয়ে এগিয়ে যেতে ম্যাকআর্থার, এডমিরাল চেস্টার নিমিৎস এবং আর্মির এয়ার ফোর্স জেনারেল 'হ্যাপ' আর্নল্ডের প্রতি অতি গোপনীয় নির্দেশ জারি করে। টাইফুন বা সামুদ্রিক ঝড়ের পর তারিখ স্থির করা হয়। ২৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। তার দু'দিন পর জাতিপুঞ্জ পটসড্যাম ঘোষণা প্রচার করে যাতে জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের চরমপত্র দেয়া হয় এবং হুঁশিয়ারি দেয়া হয় যে, এ চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করলে তাকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। তিনদিন পর জাপানের সরকারী বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়, জাপান পটসড্যাম ঘোষণা অমান্য করবে এবং আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানাবে। একই সময়ে জাপানী রেডিও'র শ্রুত সংবাদে বলা হয়, জাপান সকল স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যুদ্ধের জন্য তৈরি করছে। বেসামরিক লোকজনকে অস্ত্রসজ্জিত, সুরক্ষিত পরিখা খনন এবং ভূগর্ভস্থ বাংকার তৈরি করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অপারেশন অলিম্পিকের আওতায় কিয়ুশুতে ৪ দফা হামলা চালানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ঐ দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন, হোম আইল্যান্ডের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ জোরদার, জাপানী সশস্ত্র বাহিনীর মূল অংশকে ধ্বংস এবং টোকিওর সমতল ভূমিতে পরবর্তী অভিযানে সহায়তা দান। কিয়ুশুর দক্ষিণ-পশ্চিম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে ৪০তম পদাতিক ডিভিশন অবতরণ করা মাত্র ২৭ অক্টোবর প্রাথমিক অভিযান শুরু হবে। একই সময়ে ১৫৮তম রেজিমেন্টাল কম্ব্যাট টীম কিয়ুশু দ্বীপের ২৮ মাইল দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে হামলা চালিয়ে তা দখল করবে। এসব দ্বীপে সীপ্লেনের ঘাঁটি এবং অগ্রসরমান বহরকে আগাম হুঁশিয়ারি প্রদানে রাডার স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, প্রথম দিনের অপারেশনে ব্যাঘাত ঘটলে অধিকৃত দ্বীপগুলো বিমানবাহী রণতরীতে মোতায়েন বোমারু ও জঙ্গীবিমানের দিকনির্দেশনা কেন্দ্র এবং অগ্রসরমান নৌ-বহরের পোতাশ্রয় হিসেবে কাজ করবে। সর্বাত্মক অভিযান আসন্ন হয়ে উঠলে তৃতীয় ও পঞ্চম নৌ-বহরের সমন্বয়ে গঠিত মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিশাল শক্তি জাপানের দিকে এগিয়ে যাবে। এডমিরাল 'বুল' হ্যালসির নেতৃত্বাধীন তৃতীয় নৌ-বহর তার ভারি কামান ও নেভাল এয়ারক্র্যাফটসহ হনশু ও হোক্কাইডো অপারেশনে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করবে। যুদ্ধজাহাজ, ভারি ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, কয়েক ডজন সহায়ক জাহাজ ও তিনটি দ্রুতগামী ক্যারিয়ার টাস্ক গ্রুপের সমন্বয়ে হ্যালসির নৌ-বহর গঠন করা হবে। এসব বিমানবাহী রণতরী থেকে নৌ-বাহিনীর শত শত জঙ্গী, ডাইভ বোমারু বিমান ও টর্পেডো বহনকারী বিমান হনশু জুড়ে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। এডমিরাল র‍্যামন্ড স্প্রুয়ান্সের নেতৃত্বে ৩ হাজার জাহাজের এ নৌ-বহর অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের বহন করবে।

অভিযান শুরুর কয়েকদিন আগে যুদ্ধজাহাজ, ভারি ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্যবস্তু-গুলোতে হাজার হাজার টন উচ্চ বিস্ফোরক নিক্ষেপ করবে। অবতরণকারী সৈন্যদের স্থল হামলা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তারা বিরামহীন গতিতে বোমাবর্ষণ করতে থাকবে। ১ নভেম্বর খুব ভোরে পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু হবে। কিয়ুশু উপকূলের পূর্ব ও দক্ষিণ এবং পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল বরাবর হাজার হাজার স্থল ও মেরিন সৈন্য অবতরণ করবে। ৬৬টি বিমানবাহী রণতরী থেকে হেলডাইভারস, ডন্টলেস ডাইভ বোমারু বিমান, এ্যাভেঞ্জার্স, কোরসিয়ার্স ও হেলকেটস বিমানগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে কিয়ুশু সৈকতে জাপানী সৈন্য সমাবেশ, গান স্থাপনা ও প্রতিরক্ষা অবস্থানে বোমাবর্ষণ ও রকেট নিক্ষেপ করবে। ২৫তম, ৩৩তম ও ৪১তম পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ইস্টার্ন এ্যাসল্ট ফোর্স মিয়াসাকির কাছে অস্টিন, বিউক, ক্যাডিলাক, শেভ্রলে, ক্রিসলার ও ফোর্ড ছদ্মনামে উপকূলগুলোতে অবতরণ করবে এবং মিয়াসাকি শহর ও শহরের পার্শ্ববর্তী বিমানঘাঁটি দখলের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে। ফার্স্ট ক্যাভালরি ও অ্যামেরিক্যাল ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত সাউদার্ন ফোর্স আরিয়াক উপসাগরে লাবেলেদ দেইসতো, দুসেনবার্গ, এ্যাসেক্স, ফোর্ড ও ফ্রাঙ্কলিন ছদ্মনামে সৈকতগুলোতে অবতরণ করবে এবং শিবুশি ও

www.pathagar.com

কনোয়া শহর ও কানোয়া শহরের বিমানঘাঁটি দখল করবে। কিয়ুশুর পশ্চিম উপকূলে পোনটিয়াক, রিও, রোলস রয়েস, স্যাক্সন, স্টার, স্টুডেবাকার, স্টুৎস, উইন্সটন ও জিফার সৈকতে পঞ্চম উভচর কোরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম পদাতিক এবং মেরিন ডিভিশনের সৈন্যরা অবতরণ করবে এবং এসব সৈন্যের অর্ধেক এগিয়ে যাবে সেন্দাই এবং বাকি অর্ধেক এগিয়ে যাবে বন্দর শহর কাগোসিমায়। ৪ নভেম্বর ৮১ ও ৯৮তম পদাতিক ও ১১তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন অন্য কোথাও প্রয়োজন না হলে কাইমোন্দাকির কাছে লকোমোবাইল, লিঙ্কন, লাসালে, হুপমোবাইল, মুন, মার্সেডিজ, ম্যাক্সওয়েল, অভারল্যান্ড, ওল্ডমোবাইল, প্যাকার্ড ও প্লিমাউথ ছদ্মনামে সৈকতে অবতরণ করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ার সৈন্যদের সঙ্গে করমর্দন করছেন

অলিম্পিয়া কোনো আক্রমণ পরিকল্পনা নয়, এটি ছিল বিজয় অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা। আশা করা হয়েছিল যে, অপারেশন অলিম্পিয়া ৪ মাসে তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এ সময়ে অপারেশনকে সমর্থন দানে প্রতি মাসে নতুন করে ৩ ডিভিশন আমেরিকান সৈন্য অবতরণ করবে। অপারেশন অলিম্পিয়া সম্পন্ন হলে ১৯৪৬ সালের ১ মার্চ অপারেশন করোনেট শুরু হবে। অপারেশন করোনেটের আয়তন হবে দ্বিগুণ। এ অপারেশনের আওতায় ২৮ডিভিশন আমেরিকান সৈন্য হনশুতে অবতরণ করবে। টোকিওর পূর্ব উপকূল বরাবর চতুর্থ ও ষষ্ঠ মেরিন ডিভিশনের পাশাপাশি আমেরিকান ফার্স্ট আর্মির পঞ্চম, সপ্তম, সাতাশ, চুয়াল্লিশ, ছিয়াশি ও সাতানব্বইতম ডিভিশন অবতরণ করবে। পুরো অস্টম ও দশম আর্মি টোকিওর ঠিক দক্ষিণে সাগামি উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে আঘাত হানবে এবং ইয়োকোহামা

www.pathagar.com

পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। টোকিওর দক্ষিণে অবতরণকারী সৈন্যরা হবে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অস্টম, চব্বিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, সাইত্রিশ, আটত্রিশ ও সাতাশিতম পদাতিক এবং ত্রয়োদশ ও বিশতম সাঁজোয়া ডিভিশনের। প্রাথমিক হামলার পর আরো ৮টি ডিভিশন অবতরণ করবে। ডিভিশনগুলো হবে দ্বিতীয়, আটাশ, পয়ত্রিশ, একানব্বই, পচানব্বই, সাতানব্বই ও একশো চারতম পদাতিক এবং একাদশতম এয়ারবোর্ন ডিভিশন। অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন হলে ইউরোপ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ শেষে দ্রুত তাদের জাপানে পাঠানো হবে এবং তখনি হবে চূড়ান্ত অভিযান।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ডগলাস পি. ম্যাকআর্থার

উদ্ধারকৃত জাপানী দলিলপত্র এবং যুদ্ধোত্তরকালে জিজ্ঞাসাবাদে জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ হোম আইল্যান্ডের প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত জাপানী যুদ্ধবিমানের সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত এসব তথ্য চমকে উঠার মতো। কেননা মিত্রবাহিনীর হিসাব মতে ঐ সময় জাপানের কোনো বিমান অবশিষ্ট ছিল না। কেবলমাত্র ওকিনাওয়া যুদ্ধে জাপানী কামিকাজে (আত্মঘাতি) জঙ্গীবিমান মিত্রবাহিনীর ৩২টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং আরো ৪ শতাধিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মে আমেরিকার শীর্ষ সামরিক নেতৃবৃন্দ দাবি করছিলেন যে, জাপানী বিমান বাহনীর শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় সে দেশের আকাশে প্রতিদিন মিত্রবাহিনীর জঙ্গীবিমানগুলো অক্ষত অবস্থায় টহল দিচ্ছে। মিত্রপক্ষ এ সত্য জানতো না যে, জুলাইয়ের শেষ দিকে জাপানীরা তাদের সকল বিমান, জ্বালানি ও পাইলটদের সংরক্ষণ করছিল এবং তাদের পিতৃভূমি

www.pathagar.com

রক্ষায় চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মরিয়া হয়ে আরো নতুন নতুন যুদ্ধবিমান তৈরি করছিল। 'কেতসু-গো' ছদ্মনামে পরিকল্পনার আওতায় জাপানীরা দক্ষিণাঞ্চলীয় কিয়ুশুতে ভূগর্ভস্থ হ্যাঙ্গারসহ ২০টি আত্মঘাতি অবতরণ ক্ষেত্র নির্মাণ করছিল। তাদের আরো ৩৫টি গোপন বিমান ক্ষেত্র এবং সীপ্লেনের জন্য আরো ৯টি ঘাঁটি ছিল। আমেরিকার পরিকল্পিত অভিযানের পূর্ব রাতে ৫০টি জাপানী সীপ্লেন বোমারু বিমান, একসময়ে বিমানবাহী রণতরীতে ব্যবহৃত ১শ' এবং সেনাবাহিনীর আরো ৫০টি জঙ্গীবিমান একযোগে আমেরিকান নৌ-বহরের উপর আত্মঘাতি হামলা চালাতো। কোরিয়া, পশ্চিমাঞ্চলীয় হনশু ও শিকোকুতে জাপানীদের আরো ৫৮টি বিমানঘাঁটি ছিল। এসব বিমানঘাঁটি ব্যাপক আত্মঘাতি হামলায় ব্যবহৃত হতো। মিত্রপক্ষের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে, জাপানীদের কাছে ২ হাজার ৫শ'র বেশী বিমান নেই এবং এসব বিমানের ৩ শ' তারা ব্যবহার করবে আত্মঘাতি মিশনে। তবে মিত্রপক্ষের গোয়েন্দাদের এ তথ্য জানা ছিল না যে, ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানীদের তখনো ৫ হাজার ৬৫১ টি আর্মি ও ৭ হাজার ৭৪ টি নেভাল জঙ্গীবিমান সব মিলিয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের মোট ১২ হাজার ৭২৫ টি জঙ্গীবিমান ছিল। জাপানের প্রতিটি গ্রামে কোনো না কোনো ধরনের জঙ্গীবিমান নির্মাণের তৎপরতা ছিল। কয়লা খনি, রেলওয়ের সুড়ঙ্গ, বড় বড় সেতুর নীচে এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভূগর্ভে নতুন নতুন বিমান তৈরি করা হতো। তাছাড়া, জাপানীরা অনেকটা জার্মান ভি-১ টাইপের ওক্কা রকেটচালিত বোমার কার্যকর ও নতুন মডেল তৈরি করছিল। আত্মঘাতি পাইলটরা এগুলো নিয়ে উড্ডয়ন করতো। অভিযান আসন্ন হয়ে উঠলে কেতসু-গো পরিকল্পনার আওতায় আমেরিকার ৮ শ' যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসে ৪ দফা বিমান হামলার পরিকল্পনা করা হয়। তবে তখনো মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলো ছিল গভীর সমুদ্রে। সেগুলো এগিয়ে এলে কিয়ুশুর আকাশ নিয়ন্ত্রণে জাপানী সেনা ও নৌ-বাহিনীর ২ হাজার জঙ্গীবিমান প্রথম দফা আত্মঘাতি হামলা চালাতো। আমেরিকার টাস্ক ফোর্সের মূল অংশকে গোলাগুলীতে ব্যস্ত রেখে তাদের মজুদ ফুরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাপানী নৌ-বাহিনীর ৩৩০ জন পাইলট তার উপর দ্বিতীয় দফা হামলা চালাতো। এ দু'দফা হামলা চালানোর সময় ৮২৫টি জঙ্গীবিমান সৈন্যবাহী আমেরিকান পরিবহন জাহাজের উপর তৃতীয় দফা আত্মঘাতি হামলা চালাতে এগিয়ে আসতো। আক্রমণকারী বহরগুলো নোঙর ফেলার জন্য এগিয়ে এলে ২ হাজার জঙ্গীবিমানের আরেকটি আত্মঘাতি বহর ঘন্টায় ২-৩ শ' করে দফায় দফায় হামলা চালাতো। অভিযানের প্রথম দিন ভোর নাগাদ আমেরিকার ভূমিভিত্তিক অধিকাংশ জঙ্গীবিমানকে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বাধ্য করা হতো। সে ক্ষেত্রে মার্কিন বিমানবাহী রণতরীতে মোতায়েন জঙ্গীবিমানের পাইলটদের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হতে এবং জ্বালানি ভরতে বার বার অবতরণ করতে হতো। জাপানী জঙ্গীবিমান তাড়াতে গিয়ে অব্যাহত গোলাবর্ষণে আমেরিকার কামানগুলো অকেজো হয়ে যেতো এবং গোলাগুলী ফুরিয়ে যেতো। রাতে আমেরিকান ক্রুরা ক্লান্ত হয়ে যেতো। তবে জাপানীদের কামিকাজে হামলা অব্যাহত থাকতো। উপকূলে আক্রমণকারী নৌ-বহর

www.pathagar.com

তখনো অবস্থান করলে অবশিষ্ট জাপানী জঙ্গীবিমানগুলো বিরামহীন গতিতে আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে যেতো। ১০ দিন পর্যন্ত এ ধরনের আত্মঘাতি হামলা চলতে থাকতো। কিয়ুশুর ১৮০ মাইল দূরে আক্রমণকারী মার্কিন নৌ-বহর যখন অবস্থান করছিল ঠিক তখন জাপানীরা রাজকীয় নৌ-বাহিনীর অবশিষ্ট ৪০টি সাবমেরিনের সঙ্গে তাদের বিমান হামলার সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা করছিল। কয়েকটি সাবমেরিন ছিল ২০ মাইল পাল্লার লং ল্যান্স টর্পেডো সজ্জিত। জাপানের রাজকীয় নৌ-বাহিনীতে তখনো ২৩ টি ডেস্ট্রয়ার ও ২ টি ক্রুজার কর্মক্ষম ছিল। এসব যুদ্ধজাহাজ আক্রমণকারী আমেরিকান বহরের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাতে ব্যবহার করা হতো। শেষ মুহূর্তে বেশ কয়েকটি ডেস্ট্রয়ারকে আক্রমণ প্রতিরোধক গান প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য সৈকতে নোঙর করানো হতো। আমেরিকান বহরকে শুধু আকাশ থেকে শত্রুর বিমান হামলাই নয়, সমুদ্র থেকে আত্মঘাতি হামলার মোকাবিলাও করতে হতো। জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাবমেরিন, মানব টর্পেডো ও বিস্ফোরকসজ্জিত মটর বোটের সাহায্যে একটি আত্মঘাতি নৌ-ইউনিট গঠন করেছিল। জাপানীদের লক্ষ্য ছিল অবতরণ করার আগেই আক্রমণকারীদের অভিযান নস্যাত করে দেয়া। জাপানীরা বিশ্বাস করতো যে, তাদের প্রচণ্ডতম প্রতিরোধের মুখে আমেরিকানরা পিছু হটবে নয়তো তারা এত হীনবল হয়ে পড়বে যে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চেয়েও লজ্জাজনক পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হবে এবং জাপানীরা বিজয়ের হাসি হাসবে।

জাপান উপকূল ও জাপানী ভূখণ্ডে সম্ভাব্য স্থল যুদ্ধে আমেরিকান বাহিনীকে এমন কঠিন ও বেপরোয়া প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হতো যার নজির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খুঁজে পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ। হাজারো দ্বীপের সমাহার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধকালে বরাবরই মিত্রপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল জাপানীদের তুলনায় বেশী। কোথাও তাদের সৈন্য সংখ্যার অনুপাত ছিল ২ঃ১ কোথাও বা ৩ঃ১। তবে মূল জাপান ভূখণ্ডে যুদ্ধের চিত্র হতো ভিন্নতর। বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও চমৎকার সামরিক বিশ্লেষণের সাহায্যে জাপানের বেশ ক'জন সামরিক কর্মকর্তা মার্কিন সৈন্যরা কোথায় এমনকি কখন প্রথম অবরতরণ করবে তাও ধারণা করতে পেরেছিলেন। কিয়ুশুতে অবতরণকারী ১৪ ডিভিশন আমেরিকান সৈন্যকে ১৪ টি জাপানী ডিভিশন, ৭ টি স্বতন্ত্র মিশ্র ব্রিগেড, ৩টি ট্যাংক ব্রিগেড এবং নৌ-বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতে হতো। সেখানে প্রতিকূলতার আনুপাতিক হার থাকতো জাপানীদের অনুকূলে। সাড়ে ৫ লাখ মার্কিন সৈন্যকে ৭ লাখ ৯০ হাজার শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতো হতো। আমেরিকানরা ইতিপূর্বে দুর্বল ও অর্ধসজ্জিত জাপানী বাহিনীর মোকাবিলা করলেও কিয়ুশুতে তাদের মোকাবিলা করতে হতো শক্তিশালী ও সুসজ্জিত জাপানী সৈন্যদের। প্রতিরোধকারী জাপানী সৈন্যরা হতো হোম আর্মির কট্টর অংশ। এসব সৈন্য ছিল সুসজ্জিত। ভূমির সঙ্গে ছিল তারা পরিচিত, তাদের গোলাগুলী ও রসদের কোনো ঘাটতি ছিল না। তারা এমন একটি কার্যকর পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যা আকাশ থেকে বিমানের চোখে পড়ার কথা ছিল না। এসব জাপানী সৈন্যের অনেকেই ছিল আর্মির এলিট এবং

www.pathagar.com

আমৃত্যু লড়াই করার একটি চেতনায় উজ্জীবিত। উপকূলের দূরবর্তী অঞ্চলে নিমজ্জিত মাইন, হাজার হাজার আত্মঘাতী দক্ষ ডুবুরী এবং সৈকতে পুঁতে রাখা মাইনের সমন্বয়ে জাপানের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল। মিয়াজাকিতে আমেরিকান ইস্টার্ন উভচর সৈন্যরা উপকূলে এসে অবতরণ করলে তাদেরকে ৩ ডিভিশন জাপানী সৈন্যের মোকাবিলা করতে হতো। আরো ২ ডিভিশন ছিল হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত। আরিয়াক উপসাগরে অপেক্ষমান আক্রমণকারী বাহিনীকে একটি গোটা জাপানী ডিভিশন এবং আরেকটি মিশ্র পদাতিক ব্রিগেডের মোকাবিলা করতে হতো। কিয়ুশুর পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলে মেরিনদের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হতো। আক্রান্ত উপকূল বরাবর ৩ টি জাপানী ডিভিশন, একটি ট্যাংক ব্রিগেড, একটি মিশ্র পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি গোলন্দাজ কমান্ড ছিল। আরো দু'টি পদাতিক ডিভিশনের কয়েকটি ইউনিট পাল্টা হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। সৈকতে প্রাথমিক অবতরণে শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন না হলে ৪ নভেম্বর আমেরিকান রিজার্ভ ফোর্স কাগোশিমা উপসাগরে একটি ঘাঁটিতে অবতরণ করতো। সেখানে তাদের সঙ্গে জাপানের দু'টি মিশ্র পদাতিক ব্রিগেড, দু'টি পদাতিক ডিভিশনের কয়েকটি অংশ এবং হাজার হাজার নৌ-সেনার মোকাবিলা হতো। উপকূল জুড়ে আমেরিকান সৈন্যদের সেখানে মোতায়েন কামান, ট্যাংকবিধ্বংসী পরিখা, সুরক্ষিত বাংকার, পিল বক্স ও ভূগর্ভস্থ দুর্গের একটি নেটওয়ার্কের মুখোমুখি হতে হতো। আমেরিকানরা উপকূলে ভিড়ে কংক্রীটের জঞ্জাল ও কাঁটা তারের বেড়া অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেই তাদেরকে তীব্র গোলন্দাজ ও মর্টার হামলার মুখোমুখি হতে হতো।

উপকূল এবং উপকূল থেকে বহু দূরে জাপানী মেশিনগানের শত শত অবস্থান, মাইন পোঁতা সৈকত, চোরা ফাঁদ, পানিতে নিমজ্জিত মাইন ও স্নাইপার ইউনিট ছিল। মার্কিন সৈন্যরা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাদেরকে 'মাকড়সার গর্তে' লুক্কায়িত আত্মঘাতী ইউনিটের মুখে পড়তে হতো। যুদ্ধ তুঙ্গে উঠলে টেলিফোন ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে আমেরিকান প্রতিরক্ষা লাইনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য জাপানের অনুপ্রবেশকারী ইউনিটগুলোকে পাঠানো হতো। কোনো কোনো সৈন্যের পরণে থাকতো আমেরিকান ইউনিফর্ম। কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখতে, পিছু হটতে এবং শত্রুদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভুয়া নির্দেশ দিতে আমেরিকান রেডিও ট্রাফিক সিস্টেমে ঢোকার জন্য ইংরেজীভাষী জাপানীদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বুকে ও পিঠে বিস্ফোরক বাঁধা অন্যান্য অনুপ্রবেশকারী জাপানী সৈন্যরা আমেরিকার ট্যাংক, কামান ও গোলাবারুদ মজুদ উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। উপকূলে হামলাকারী সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণের জন্য উপকূল থেকে দূরে বিপুল সংখ্যক কামান মোতায়েন করা ছিল। এসব দূরপাল্লার অধিকাংশ কামান বসানো ছিল রেললাইনের উপর। চারপাশে কংক্রীটের দেয়ালের আড়ালে বাংকারে এসব কামান বসানো ছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালে কনফেডারেট আর্মির কমান্ডার লেঃ জেনারেল সাইমন বলিভার বাকনারের ভাষায় জাপানের মূল ভূখণ্ডে লড়াইয়ে জেতার যুদ্ধ হতো 'প্রেইরী ডগ ওয়ারফেয়ার।' ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন মার্কিন স্থল সৈন্যরা এ ধরনের লড়াইয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। যেসব মার্কিন সৈন্য ও মেরিন তারাওয়া, সাইপেন, আয়োজিমা ও কিনাওয়ার মতো

www.pathagar.com

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদের কাছে এ লড়াই হতো অদ্ভুত। প্রেইরি ডগ ওয়ারফেয়ার হচ্ছে প্রতি গজ, ফুট ও ইঞ্চির জন্য মরণপন লড়াই। এটা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ, সুরক্ষিত ও পিছু হটতে অনিচ্ছুক একটি শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর, ভয়াবহ ও বিপজ্জনক একটি লড়াই। জাপানী সৈকতের পেছনে পাহাড়গুলোতে ছিল ভূগর্ভস্থ গর্ত, বাংকার, কমান্ড পোস্ট ও হাসপাতালের একটি নেটওয়ার্ক। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সুড়ঙ্গের এ নেটওয়ার্ক ছিল প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন পথের সঙ্গে সংযুক্ত। এসব ভূগর্ভস্থ স্থাপনার কোনো কোনোটিতে ১ হাজার সৈন্য পর্যন্ত অবস্থান করতে পারতো। বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়াও জাপানীরা তাদের বেসামরিক লোকজনকে রণাঙ্গনে পাঠাতো। অপারেশন অলিম্পিয়া শুরু হলে 'সম্রাট ও জাতির জন্য ১০ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত'- বলে জাপানীরা যে শ্লোগান দিতো সেই জাতীয়তাবাদী শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে বেসামরিক জাপানীরা লড়াই করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতো। ২ কোটি ৮০ লাখ জাপানী ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কম্ব্যাট ফোর্সের সদস্য ছিল। তারা প্রাচীন আমলের রাইফেল, মাইন, বিস্ফোরক, মলোটভ ককটেল ও মর্টার সজ্জিত ছিল। অন্যান্যরা ছিল তরবারী, লম্বা ধনুক, কুঠার ও বাঁশের ফলায় সজ্জিত। বেসামরিক ইউনিটগুলোক আমেরিকার দুর্বল অবস্থানে নৈশকালীন ও চোরাগুপ্তা হামলা, বিলম্বিতকরণ তৎপরতা ও ব্যাপক আত্মঘাতি হামলা চালাতে ব্যবহার করা হতো। লড়াইয়ের প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রতি ঘন্টায় ১ হাজার মার্কিন ও জাপানী সৈন্য নিহত হতো।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং তার তিনদিন পর নাগাসাকিতে আরেকটি আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় জাপানে আমেরিকার পরিকল্পিত অভিযান বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করার পরিবর্তে নির্ধারিত সময়ে পরিকল্পিত এ অভিযান শুরু করলে যুদ্ধে লাখ লাখ জাপানী নিহত হতো। জাপানের প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডের জন্য আমেরিকান ও জাপানী উভয়কে চরম মূল্য দিতে হতো। প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে কত জাপানী নিজ নিজ বাড়ীঘরে আত্মহত্যা করতো তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, ১০ লাখ মার্কিন সৈন্যেরও প্রাণহানি ঘটতো। ১৯৪৫ সালে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য ও সামরিক বাহিনীর হিসাব এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, জাপানে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তা হতো আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। যুদ্ধ বেধে গেলে একটি জাতি ও একটি সভ্যতা হিসেবে জাপানীদের কী পরিণতি হতো তা ভাবতে গেলে শরীর শিউরে উঠে। স্থল হামলার আগে কয়েক মাসব্যাপী জাপানী শহরগুলোতে একটানা বোমাবর্ষণ করা হতো। পরিকল্পিত হামলার আগে এসব ভয়াবহ বোমাবর্ষণে যত বেসামরিক জাপানী হতাহত হতো তার তুলনায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমায় হতাহতদের সংখ্যা নগণ্য বলে বিবেচিত হতো। আমেরিকান সৈন্যরা জাপানের দক্ষিণে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে কোনো বাধাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেশটির উত্তরাংশে প্রবেশে বাধা দিতে সক্ষম হতো না। এ পরিস্থিতিতে জাপান হতো কোরিয়া ও জার্মানীর মতো দ্বিখণ্ডিত। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করায় বিশ্ব অপারেশন

www.pathagar.com

ডাউনফলের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় যেসব আমেরিকান বিমানবাহী রণতরী, ক্রুজার ও পরিবহন জাহাজের জাপানে পরিকল্পিত হামলায় সৈন্য বহন করার কথা ছিল সেগুলো পরে অপারেশন ম্যাজিক কার্পেটের আওতায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুব কম লোকই পরিকল্পিত এ অভিযান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর অপারেশন ডাউনফল সংক্রান্ত গোপনীয় দলিলপত্র, মানচিত্র, নকশা ও বর্ণনাগুলো বাক্সে বোঝাই করা হয় এবং পরে এগুলো জাতীয় মোহাফেজখানায় মজুদ করে রাখা হয়। জাপানে সর্বাত্মক হামলার পরিকল্পনায় বস্তুত এমন এক বর্ণনা পাওয়া গেছে যা বাস্তবায়িত হলে তা হতো মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর অভিযান। জাপান ও আমেরিকা উভয়ের ভাগ্য ভালো যে, এ রক্ষক্ষয়ী অভিযান পরিত্যক্ত হয়। আজ এ পরিকল্পিত অভিযান কেবলি একটি উপ্যাখ্যান, একটি বিস্মৃত অধ্যায়।

www.pathagar.com

যুদ্ধের ধাক্কায় বৃটিশদের ভারত ত্যাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু বিশ্ব মানচিত্র নয়, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকেও ত্বরান্বিত করেছে। এ যুদ্ধে উপনিবেশিক প্রভু বৃটেন দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ভারত শাসনে রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। এ উপলব্ধি থেকেই যুদ্ধোত্তর বৃটেনে নিবার্চনে বিজয়ী শ্রমিক দলীয় সরকার ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশ থেকে বিদায় নেয়ার পরিকল্পনা নেয়। অন্যদিকে, ভারতীয়রা বিশেষ করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো তেজস্বি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটেনকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিতাড়িত করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করা ছাড়া যুদ্ধে ভারতকে জড়ানোর জন্য ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়। বৃটেনে জার্মান হামলাকে ভারতবাসীরা তাদের গোলাম করে রাখার একটি প্রাকৃতিক প্রতিশোধ হিসেবে বিবেচনা করে। ভারতের মতো বিশাল বিশাল উপনিবেশ না থাকলে পুচকে বৃটেনের পক্ষে কোনোদিন দু'টি মহাযুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে ভারতের বিপুল সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। বৃটিশ ও কমনওয়েলথ বাহিনীর খাদ্য ও রসদ যুগিয়েছে ভারত। এমনকি বৃটেনকেও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ভারতের সম্পদ দিয়ে। ভারতের ভূখণ্ডকে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও শত্রু দেশে হামলার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

যুদ্ধকালে বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। ভারতের পঞ্চম ডিভিশন প্রথমে সুদানে ইতালীয় এবং পরে লিবিয়ায় জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তেলক্ষেত্র রক্ষায় এ ডিভিশনকে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইরাকে প্রেরণ করা হয়। আরো ৮টি ভারতীয় ডিভিশনের সঙ্গে এ ডিভিশনকে বার্মা রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। ভারতের পঞ্চম ডিভিশন মালয় দখল করে। জাপানী গ্যারিসনকে নিরস্ত্র করতে এ ডিভিশনকে জাভায় পাঠানো হয়। চতুর্থ ভারতীয় ডিভিশন উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সাইপ্রাস ও ইতালীতে লড়াই করে। মন্টি ক্যাসিনো দখলে এ ডিভিশন ভারতের অস্টম ও দশম ডিভিশনের সঙ্গে যোগদান করে। পরে এ ডিভিশনকে গ্রীসে পাঠানো হয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বার্মায় জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ২ লাখ ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ করে। এসব ভারতীয় সৈন্য কোহিমা ও ইম্ফলে লড়াই করেছে। তাছাড়া, আরাকান উপকূল বরাবর উইংগেটে দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন, মান্দালয়, মেইকটিলা ও রেঙ্গুন পুনর্দখলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রয়াল ভারতীয় নৌ-বাহিনী (আরআইএন) ও ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) এসব অপারেশনে সহায়তা দিয়েছে। আরআইএন বঙ্গোপসাগর ও লোহিত সাগরে অপারেশন

www.pathagar.com

চালিয়েছে। বার্মার আরকান উপকূল পুনর্দখলে তারা বীরোচিত ভূমিকা পালন করেছে। বার্মা থেকে মিত্রবাহিনীর পিছু হটার সময় ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনী বৃটিশ রয়্যাল বিমান বাহিনীকে কৌশলগত সহায়তা দিয়েছে। পরে বার্মা মুক্ত করার অপারেশনে তারা সে দেশে টহলদারিত্ব করেছে এবং জাপানী সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করেছে। যুদ্ধকালে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানগুলো ১৬ হাজার বার উড্ডয়ন করে। আকাশে তাদের উড্ডয়নকাল ছিল ২৪ হাজার ঘণ্টা। শত্রুর গুলীতে ৬৮৮জন ভারতীয় বিমান সেনা নিহত ও ৩৬৭ জন আহত হয়। তাছাড়া, নিজেদের ঘাঁটি থেকে উড্ডয়নকালে আরো ২৩১ জন ভারতীয় বিমান সেনা নিহত হয়। ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনীতে ছিল ২৫ হাজার সদস্য। হ্যারিকেন ও স্পিটফায়ার স্কোয়াড্রনের সমন্বয়ে ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনী গঠন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৩৬ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিহত অথবা নিখোঁজ এবং ৬৪ হাজার ৩৫৪ জন সৈন্য আহত হয়। বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ৪ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয়। ৩১ জনকে দেয়া হয় ভিক্টোরিয়া ক্রস। এদের ৪ জন ছিলেন চতুর্থ ভারতীয় ডিভিশনের। গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যে ফিজির কর্পোরাল সেফানাইয়া সুকানাইভালু ছাড়া আর কেউ ভিক্টোরিয়া ক্রস পাননি। বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ বীরত্ব পদক ভিক্টোরিয়া ক্রস পদকে ভূষিতদের একজন ছিলেন হাবিলদার গাজী ঘালি। হাবিলদার গাজী ছিলেন পঞ্চম রয়্যাল গুর্খা রাইফেলসের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের ডি প্লাটুনের কমান্ডার। ডি প্লাটুনের কমান্ডার গাজী মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও বার্মার টিডিয়াম রোডে জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন।

সামরিক শৃঙ্খলার কারণে ভারতীয় সৈন্যরা যখন বৃটিশের স্বার্থে দুনিয়ার এখানে সেখানে লড়াই করছিল ঠিক তখন নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এটা ছিল অনেকটা ভ্রাতিঘাতি লড়াই। মুষ্টিমেয় অফিসার বাদে বৃটিশ বাহিনীর প্রায় সবাই ছিলেন ভারতীয়। বৃটিশ অফিসারদের নির্দেশে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের ভারতীয় ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটে। আন্দামান দ্বীপের নাম রাখা হয় 'শহীদ' এবং নিকোবর দ্বীপের 'স্বরাজ।' নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে বলে বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। তাকে গৃহবন্দী করা হয়। গৃহবন্দী অবস্থা থেকে তিনি ১৯৪১ সালে জার্মানীতে পালিয়ে যান। তিনি বৃটিশের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা দানে জার্মানী ও জাপানের সহায়তা কামনা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সেখান থেকে জার্মান সাবমেরিন যোগে জাপান গিয়ে পৌঁছান। জাপানে গিয়ে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। টোকিওতে তিনি একটি প্রবাসী ভারত সরকার গঠন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের ঘন জঙ্গলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে। উঁচুমানের প্রশিক্ষণ ও উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় আসাম ও

www.pathagar.com

মনিপুরের গভীর জঙ্গলে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার যোদ্ধা নিহত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি জাপান সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকলেও তাদের সহায়তার পরিমাণ ছিল নগণ্য। এ জন্য নেতাজি সুভাষ বোসের সংগ্রাম কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি।

১৯৪৫ সালে জাপান সরকার মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিরোধ লড়াইয়ে ভাটা পড়ে। ১৯৪৫ সালের আগস্টে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসু নিহত হলে তার নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র সংগ্রাম থেমে যায়। সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় রাজনৈতিক দল বিশেষ করে কংগ্রেস একমত হতে না পারলেও কেউ তার বিরোধিতা করেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের অনুসারীদের যে দৃষ্টিতে দেখতো ঠিক একই দৃষ্টিতে দেখতো আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের। দলটি আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত যোদ্ধাদের 'শহীদ' এবং জীবিত যোদ্ধাদের 'বীর' হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত যোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহায়তা দানে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে।

জওহরলাল নেহরু সহাস্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলছেন

সুভাষ বসু সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশদের তাড়াতে ব্যর্থ হলেও তিনি ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হন। বলতে গেলে তারই অনুসৃত নীতিতে প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বাইয়ে এক প্রস্তাবে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাস করতে বাধ্য হয়। গান্ধীজী অহিংস উপায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। তার ডাকে সারা দিয়ে ভারতবাসীরা বৃটিশ রাজের

www.pathagar.com

আইন অমান্য করতে থাকে। একদিকে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন এবং অন্যদিকে বার্মা সীমান্তে শত্রু জাপানী সৈন্যদের উপস্থিতিতে বৃটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট গান্ধীকে পুনাতে আগাখান প্রাসাদে গৃহবন্দী করা হয়। আরো বহু ভারতীয় রাজনীতিবিদকে অন্তরীণ করা হয়। তাকে ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে ইয়েমেন কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়ার জন্য একটি যুদ্ধজাহাজও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ভয়ে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করেও পরে তারা এ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভা এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তবে হিন্দু চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএস'র হাজার হাজার কর্মী এ আন্দোলনের সফলতার জন্য মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট এ্যাকশনের ডাক দেয়। চারদিক থেকে চাপের মুখে পড়ে বৃটিশ সরকার ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে কংগ্রেস বৃটিশকে সহায়তা দানের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে শর্ত ছিল যে, এ সহায়তার বিনিময়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। বৃটিশ সরকার এ শর্তে রাজি না হওয়ায় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে সহায়তা দানের উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে যায়। অবশ্য এক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন,'এখন আমি ভারতের মুক্তির চিন্তা করছি না। ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। আর বৃটেন বা ফ্রান্সের পতন ঘটলে ভারতের স্বাধীনতার মূল্য কি?'

ভারতীয়দের আশা-আকাংখা ও তাদের অধিকার খর্ব করায় অধিকাংশ ভারতীয়ই ছিল বৃটিশদের প্রতি ক্ষুব্ধ। তবে কেউ কেউ মনে করতেন যে, যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সমর্থন দিলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সহজতর হবে। এ হিসাব থেকে মুষ্টিমেয় ভারতীয় বৃটিশদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো দেশীয় রাজা সমর্থন দানের নামে মূলত বাড়াবাড়ি করেছেন। এসব দেশীয় রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিকানীর ও নব নগরের মহারাজাদ্বয়।

১৯৩৯ সালের ২২ সপ্টেম্বর বিকানীরের মহারাজা স্বীয় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের সময় বলেন, 'যুদ্ধের সময় কোনো প্রকৃত সৈনিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতায় গৃহকোনে বসে থাকতে পারে না। এ সময় রণক্ষেত্রই তাদের একমাত্র ঠিকানা। রাঠোর রাজপুত হিসেবে যুদ্ধে যোগদানই আমার অন্তরের একমাত্র অভিপ্রায়। অনেক আগে আমি আমার তরবারি ও প্রিয় পুত্রকে মহামান্য সম্রাটের সেবায় নিয়োজিত করেছি। অনেকে বলছেন, আমি এখন ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। কাজেই যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি যে যুবক নই তা আমি স্বীকার করি। ২৫ বছর আগে আমি যখন মিসর, ফ্লান্ডার্স ও ফ্রান্সে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছিলাম আজ আমার স্বাস্থ্য তখনকার মতো নয়। তবুও আমি জোরের সঙ্গে বলছি যে, বৃদ্ধ হলেও রাজপুত কখনো তরবারি ধারণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।'

নব নগরের মহারাজা জাম সাহেবও অনুরূপ ঘোষণা দেন। তিনি তার ঘোষণায় বলেন, 'মহামান্য সম্রাট যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ায় দেশীয় রাজন্যবর্গের সকলেই তার পক্ষে যুদ্ধ করবে। ধর্মের পবিত্র অনুশাসন, সন্ধিচুক্তির শর্তাবলী ও রাজ ভক্তির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের

www.pathagar.com

অনুসরণ করে ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা কল্পে প্রত্যেক দেশীয় রাজন্য আজ সম্রাটের সিংহাসনের চারদিকে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে প্রাণ ও সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছে।'

কোনো কোনো ভারতীয় রাজনীতিবিদ ছিলেন বৃটিশের অন্ধ ভক্ত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কেন্দ্রীয় আইন সভার উর্ধতন নেতা স্যার জগদীশ প্রসাদ। স্যার প্রসাদ ১৯৩৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বলেন, 'ভারতের ভবিষ্যত ইউরোপের রণক্ষেত্রেই নির্ধারিত হবে। নাৎসী একনায়কতন্ত্র জয়লাভ করলে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও আইন-শৃংখলার সমর্থকদের সর্বনাশ হবে। বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আমাদের ধর্মগুরুদের সুশিক্ষার অনুসরণ করে লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে এ সংগ্রামে যোগদান করাই আমাদের কর্তব্য।'

অনুগত ও তাঁবেদার ভারতীয়দের আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বড়লাট ভারতবাসীর কাছে নিম্নোক্ত বেতার বার্তা পাঠান। তাতে তিনি বলেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান সংগ্রামে বৃটিশ বা দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই বিরাট দেশের সকলেই আমাদেরকে সর্বান্তঃকরণে পূর্ণ সমর্থন দেবেন। আমি আরো বিশ্বাস করি, মানব সভ্যতার এই চরম দুর্দিন ও সংকটে ভারতবর্ষ পশুবলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করবে এবং বিশ্ব দরবার ও পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ভারত যে সুউচ্চ আসনের অধিকারী তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করবে।'

বড়লাটের অনুকরণে ১১ সেপ্টেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন,'মানব সভ্যতার এই ঘোর দুর্দিনে আমরা যে জীবন মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি তাতে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে আমি পরম প্রীতি অনুভব করছি। ভারতীয় জনগণ ও রাজন্যবর্গ যে মুক্তহস্তে সাহায্য প্রদান করেছেন আমি সেসব সাহায্য-সহযোগিতা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে গ্রহণ করেছি।

বর্তমান বিপদ শুধু আমাদের নয়, এ বিপদ ভারতেরও। আমার স্থির বিশ্বাস, আমি এবং আমাদের জাতি যে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছি তাতে ভারতীয় উপমহাদেশের সকলেই পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য বৃটেন এ সংগ্রামে ব্রতী হয়নি। মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে মূল্যবান আদর্শ ও নীতি রক্ষার জন্যই বৃটেন অস্ত্রধারণ করেছে। এই আদর্শ ও নীতির সুমহান শিক্ষা এই যে, সভ্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক পশুশক্তি নয়, যুক্তি ও আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। যার ফলে মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করে মানব জাতির বৈচিত্রময় ভবিষ্যত গড়ে তুলবে।'

বড়লাট মুখ দিয়ে এসব কথা উচ্চারণ করলেও তিনি জানতেন যে, তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বৃটিশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এডমিরাল মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনিই ছিলেন ভারতে শেষ বৃটিশ ভাইসরয়। তার একমাত্র কাজ ছিল ভারত থেকে সম্মানজনকভাবে বৃটিশের বিদায়ের পথ খুঁজে বের করা। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ১৯০ বছর পর দখলদার বৃটিশরা উপমহাদেশ থেকে বিদায় নেয়।

www.pathagar.com

সুভাষ বসুর রহস্যময় মৃত্যু

বিশ্বে যে ক'টি মৃত্যুর ঘটনা গভীর রহস্যের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে নেতাজী সুভাষ বসুর মৃত্যু একটি। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, তিনি ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বর্তমান তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। কিন্তু অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করছেন না। স্বয়ং ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মনেও যথেষ্ট খটকা ছিল। ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সুভাষ বসুর বড় ভাই অশোক বসুর সঙ্গে আলাপে তিনি তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করেন এবং এ রহস্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তবে সুযোগ পেয়েও তিনি সে চেষ্টা করেননি। কেন করেননি তাও আরেক রহস্য। এ রকম ধারণাও প্রচলিত রয়েছে যে, সুভাষ বসু সোভিয়েত সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং তখন তিনি বন্দী হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নেই অবস্থান করছিলেন। আরো বলা হচ্ছে যে, সোভিয়েত বন্দী হিসেবে সাইবেরিয়ায় তার মৃত্যু হয়। আরেকটি মত হচ্ছে যে, অক্ষশক্তির পরাজয়ের আভাস পেয়ে সুভাষ বসু সোভিয়েতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সোভিয়েত অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় আশ্রয় নেন।

তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন অনুজ ধর নামে একজন ভারতীয় সাংবাদিক। এ সাংবাদিক এক অনুসন্ধানী মিশনে তাইওয়ানে গেলে সে দেশের সরকার তাকে জানায় যে, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হতে পারে না। কেননা, ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর নাগাদ সে দেশে কোনো বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। তাইওয়ান থেকে দুর্লভ তথ্য-প্রমাণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক অনুজ ধর বিমান দুর্ঘটনায় সুভাস বসুর মৃত্যুর দাবি নাকচ করে দিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে, 'ব্যাক ফ্রম ডেড ঃ ইনসাইড দ্য সুভাষ বোস মিস্ট্রি।'

সুভাষ বসু সত্যি সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করছিলেন কিনা তা তদন্ত করে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ইউনিয়ন রেলওয়ে মন্ত্রী শাহ নেওয়াজ খানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু এ কমিশন সোভিয়েত ইউনিয়নে খোঁজ-খবর না নিয়ে তড়িঘড়ি করে তৈরি এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করেন, তাইহোকু (জাপানী ভাষায় তাইপের নাম) বিমান দুর্ঘটনায় বসুর নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। কমিশন জাপানের রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাই-ভস্ম দেশে ফিরিয়ে এনে সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ সুপারিশ রক্ষা করেনি।

www.pathagar.com

ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সঠিক বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা, এ কমিটির প্রধান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আইএনএ'র সাবেক মেজর জেনারেল শাহ নেওয়াজ খান ছিলেন নেহরু পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ। জনাব খান ১৯৪৭ সালে একবার পাকিস্তানে অভিবাসন করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু তাকে সেখান থেকে বলতে গেলে একপ্রকার জোর করে ভারতে ফিরিয়ে আনেন। ভারতে ফিরিয়ে এনে তাকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেন। সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন সাবেক আইএনএ'র হাজার হাজার সদস্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করা হলে শাহ নেওয়াজ খানের পক্ষে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব হতো না। আইএনএ সদস্যদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জেনারেল শাহ নেওয়াজ মন্ত্রী হয়েছিলেন। শাহ নেওয়াজ খানের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার অর্থ ছিল এটাই যে, নেহরু ও তার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কোনো একটি বিষয়ে বুঝাপড়া হয়েছিল। কী বিষয়ে বুঝাপড়া হয়েছিল তা প্রকাশ করা না হলেও বুঝা যায় যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য ধামাচাপা দিতে উভয়ে একটি মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন। শাহ নেওয়াজ খান ১৯৫৬ সালে মাত্র ৪ মাস তদন্ত পরিচালনা করেই ইতি টানেন। এ ধরনের একটি জটিল মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ৪ মাস কখনো যথেষ্ট সময় বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া, শাহ নেওয়াজ খান নিজেও কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে তিনি রিপোর্ট পেশ করেন। এতেই বুঝা যায় যে, রেলমন্ত্রী জনাব খান নেহরুকে সন্তুষ্ট করতে তদন্তের দ্রুত যবনিকাপাত ঘটিয়ে এ উপসংহারে পৌঁছান যে, সুভাষ বসু কোনো হত্যাকাণ্ডের শিকার নন, বরং বিমান দুর্ঘটনার শিকার।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারও নেতাজি সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে খোসলা কমিশন গঠন করে। পাঞ্জাব হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জি, ডি, খোসলার নেতৃত্বে এ কমিশন ছিল এক সদস্যবিশিষ্ট। কমিশন সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও রেঙ্গুনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন এবং বহুলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও ঘটনাস্থল তাইপেতে যায়নি। তাই ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত খোসলা কমিশনের তদন্ত রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়।

বিচারপতি খোসলার পেশকৃত রিপোর্টের ভিত্তি ছিল জাপানী ডাক্তার তামিউশির মেডিকেল রিপোর্ট। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইসহ অনেকে তার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ধারণা করা হয় যে, খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি খোসলার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন ঘটেছিল। সুভাষ বসুর সঙ্গে বিচারপতি খোসলার ছিল পুরনো শত্রুতা। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে উভয়ের দেখা হয়। সুভাষ বসু তখন আইসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খোসলাও ছিলেন পরীক্ষার্থী। সুভাষ বসু পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিভিল সার্ভিসে যোগদানে ভারতে ফিরে এলে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়। তাই সন্দেহ করা হয় যে, বিচারপতি খোসলার তৈরি রিপোর্টে তার বিদ্বিষ্ট মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করলে দেখা দেখা যাবে যে, কংগ্রেস সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্যের জট খুলতে চায়নি। এ থেকে সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠে। জাপানের রেঙ্কোজি মন্দিরে যে দেহাবশেষ সংরক্ষিত রয়েছে তা সুভাষ বসুর নাকি অন্য কারো তাও সন্দেহের উর্ধে নয়। বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে তাইওয়ান থেকে একটি লাশের সঙ্গে জাপানী ভাষায় পাঠানো ডেথ সার্টিফিকেটই ছিল একমাত্র প্রমাণ। পরে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রণাঙ্গনে মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপে এক জাপানী সৈন্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এটি হচ্ছে তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট।

নেতাজী সুভাষ বসু

সুভাষ বসুর লাশ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ায় একেক সময় একেক কথা শোনা গেছে। একথাও শোনা গেছে যে, তিনি জীবিত রয়েছেন এবং গুমনামি বাবা সন্ন্যাসি হিসেবে উত্তরপ্রদেশের ফাইজাবাদ শহরে একটি মন্দিরে বসবাস করছেন। এ নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হলে তদন্ত করা হয়। কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সুভাষ বসুর চেহারার সঙ্গে গুমনামি বাবার চেহারার হুবহু মিল ছিল। অমিলের মধ্যে ছিল শুধু লম্বা দাঁড়ি।

সুভাষ বসুর রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের উপ্যাখ্যান আগাগোড়া খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার এবং পরবর্তীতে ভারত সরকার ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। বৃটিশ সরকারকে প্রথম শ্রেণীর একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদের হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিমান

www.pathagar.com

দুর্ঘটনার কল্প-কাহিনী তৈরি করা হয়। সুভাষ বসুর ভাগ্যে সত্যি কি ঘটেছিল তা বৃটিশ সরকার ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম থেকে জানা সম্ভব হয়নি। বৃটিশরা ছিল তার প্রতিপক্ষ। তাই তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ বর্ণনা আশা করা যায় না। ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যে, বিজয়ী পক্ষ বিজিতের প্রতি সুবিচার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশরা ছিল বিজয়ী। অন্যদিকে, সুভাষ বসু ও তার পৃষ্ঠপোষক জাপান ও জার্মানী ছিল পরাজিত। এ বাস্তবতার আলোকে এটাই মনে করা স্বাভাবিক যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্ব যা জানতে পেরেছে তা হচ্ছে বিজয়ী পক্ষের মর্জিমাফিক তৈরি করা আষাঢ়ে গল্প।

কংগ্রেস সরকারের মতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারও সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ২০০০ সালে বিচারপতি জে, সি, মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু সময় বহুদূর গড়িয়ে যাওয়ায় এ কমিশনের তদন্ত কাজ দুরূহ হয়ে উঠে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করায় এবং অধিকাংশ নথিপত্র গায়েব হয়ে যাওয়ায় ২০০৫ সালের শেষ নাগাদও মুখার্জী কমিশন সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে কোনো কূল-কিনারা করতে পারেনি। আর কোনোদিন এ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে তাও আশা করা যায় না। বিচারপতি মুখার্জী ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রিপোর্টের উপসংহারে পৌঁছতে তার দীর্ঘ ৬ বছর লেগেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতাজিকে আটক করেছিল বলে যে কথা প্রচারিত হয় তার সত্যতা যাচাইয়ে তিনি ২০০৫ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়া সফর করেন। রাশিয়া সফরের ফলাফল কি অথবা সুভাষ বসুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি সে ব্যাপারে তিনি মুখ খুলেননি। অন্যদিকে, মুখার্জী কমিশনের একটি সূত্র জানায় যে, ফরমোজায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর সরাসরি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বৃটিশ ডঃ গর্ডনের ভাষ্য অনুযায়ী সুভাষ বসু ১৬ আগস্ট বিমান যোগে ব্যাংককে আসেন এবং পরদিন তিনি সায়গনে পৌঁছান। তার সঙ্গে ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান, কর্নেল প্রিতম সিং, মেজর আবিদ হাসান, এস, এ, আয়ার ও দেবনাথ দাস। সায়গনে এসে অন্য একটি বিমানে তাইপেতে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সুভাষ বসুকে জানানো হয় যে, তাইপেতে যাবার জন্য মাত্র একটি ফ্লাইট রয়েছে এবং পরে সেটি দাইরেনে (মাঞ্চুরিয়া) যাবে। বিমানে দু'টি সীট রাখা হয়। একটি সুভাষ বসুর জন্য এবং অন্যটি কর্নেল হাবিবুর রহমানের। দাইরেনগামী বিমানে তার জাপানী সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ জাপানী রাজকীয় বাহিনীর লেঃ জেনারেল শিদাই। মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানরত কুওমিনটাং আর্মির কমান্ড গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন। ছোট আকৃতির একটি '৯৭-২' নং ফ্লাইটে সুভাষ বসু ও কর্নেল হাবিবুর রহমান আরোহন করেন। তার কাছে ছিল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার বোঝাই দু'টি ভারি স্যুটকেস। তাদের সঙ্গে আরো ১০ জন জাপানীও ছিলেন। ১৮ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে সোয়া ৫টার মধ্যে তুরেইন থেকে

www.pathagar.com

বিমানটি উড্ডয়ন করে জাপান অধিকৃত তাইহোকুর পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাইওয়ানে এসে বিমানটি আবার উড্ডয়ন করে এবং ৩০ ফুট উঁচুতে উঠেই বিস্ফোরিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়। তখন সময় ছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিকেল ৫টা। বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর ট্রাকে করে একটি সামরিক হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জাপানী রাজকীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন ডাঃ ইউশিমি তামিউশি তার চিকিৎসা করেন। কিন্তু চিকিৎসা করেও তিনি তাকে বাঁচাতে পারেননি। হাসপাতালে নেয়ার ৪ ঘন্টা পর তিনি মারা যান। ডাক্তার তামিউশি নাকি সুভাষ বসুকে তার অন্তিম সময়ে ভারতবাসীর জন্য একটি বিবৃতি দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু বিবৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। সুভাষ বসু তার মৃত্যুর আগে ভারতবাসীর জন্য কোনো বিবৃতি দিতে চাননি বলে ডাক্তার তামিউশির উদ্ধৃতি দিয়ে যে ভাষ্য প্রচার করা হচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। যিনি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য সবর্স্ব ত্যাগ করেছেন তিনি তার মৃত্যুর আগে দেশবাসীর কাছে তার শেষ কথা বলে যাবেন না- এ হতে পারে না। এ যুক্তিতে ডাক্তার তামিউশির ভাষ্য গুরুতর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে।

ডাক্তার তামিউশির এ ভাষ্য ছাড়া সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে আর কারো উক্তি বা অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। খ্যাতনামা মোহাফিজবিদ ও ঐতিহাসিক ডঃ টি আর সারীণ সরকারী নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে এতটুকু তথ্য প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে ডঃ গর্ডন এ তথ্যই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বসুর মৃত্যু সম্পর্কে ডাঃ তামিউশির ভাষ্য হচ্ছে ফরমোজা বা তাইওয়ানে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বৃটিশ লিয়াজোঁ ব্রাঞ্চের ইন-চার্জ ক্যাপ্টেন এ, আর, টার্নারের কাছে পেশকৃত রিপোর্টের একটি অংশ। ধারণা করা হয় যে, সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে বড় ধরনের একটি বিতর্ক এড়িয়ে যেতে বৃটিশদের চাপের মুখে ডাক্তার তামিউশি এ বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুভাষ বসুর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে প্রথম তদন্ত কমিটি গঠন করেন ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। শোনা যায় যে, ব্যাপক তদন্তের পর কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে। তবে কমিটি এ রিপোর্ট দিলেও বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। বৃটিশ সরকারের পক্ষে সে ধরনের কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভবও ছিল না। তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও একথা জানা গেছে যে, বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল।

১৯৪১ সালে বৃটিশ সরকার অক্ষশক্তির সঙ্গে সুভাষ বসুর যোগাযোগের ঘটনা জানতে পেরে ঘাবড়ে যায়। তখন বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টদের তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়। আইরিশ ঐতিহাসিক ও ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ ইউনান ও'হানপিন এ দাবি করেছেন। তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপের উপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এসব বইয়ে তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রকাশিত দলিলপত্র ব্যবহার করেছেন। সুভাষ বসুকে হত্যায় বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার স্পেশাল অপারেশন্স এক্সিকিউটিভ (এসওই)-কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা প্রকাশ

www.pathagar.com

করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ও'হানপিন অতি গোপনীয় এ দলিলপত্রের ভিত্তিতে এ দাবি করেছেন। বৃটিশরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছিল যে, সুভাষ বসু দূরপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন। কিন্তু একটি ইতালীয় কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তিনি কাবুলে অবস্থান করছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর দিয়ে জার্মানী পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছেন। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কে অবস্থানরত এসওই'র দু'জন এজেন্টকে তাদের লন্ডনস্থ সদর দপ্তর জার্মানী পৌঁছানোর আগেই বসুকে গ্রেফতার ও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তবে তিনি মধ্যএশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে জার্মানী পৌঁছায় বৃটিশদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুভাষ বসুকে হত্যা করার নির্দেশ বহাল রয়েছে কিনা জানতে চেয়ে যতবার এ দু'এজেন্ট লন্ডনে বার্তা পাঠিয়েছে ততবারই তাদের জানানো হয় যে, তাকে হত্যার নির্দেশ বলবৎ রয়েছে এবং পেলেই তাকে হত্যা করতে হবে। মিঃ ও'হালপিনের মতে, সুভাষ বসুকে হত্যা করার এ নির্দেশ দান ছিল খুবই অস্বাভাবিক, বিরল ও অভাবিত। সুভাষ বসুকে হত্যার নির্দেশ দান থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, বৃটিশরা তাকে কতটুকু গুরুত্ব দিতো। তারা ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুকে একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে এবং আতংকিত হয়ে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

বৃটিশের প্রতিপক্ষ জাপান ও জার্মানীর সশস্ত্র সহায়তায় ভারতকে মুক্ত করার সংগ্রামে যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে সুভাষ বসু ছিলেন পুরো মাত্রায় সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেও তিনি জানতেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ যে কোনো ওছিলায় বৃটিশ সরকার তাকে আবার কারাগারে পাঠাতে পারে। এ আশংকা থেকে তিনি পলায়নের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবর শাহের সহায়তায় তিনি পলায়ন করেন। সুভাষ বসু পশতু ভাষা জানতেন না। তাই আকবর শাহ তাকে বোবা ও কালা সেজে দাড়ি রেখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাড়ি দেয়ার পরামর্শ দেন। ১৯৪১ সালের ১৯ জানুয়ারী তিনি পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আকবর শাহ, মোহাম্মদ শাহ ও ভগৎ রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুভাষ বসুকে আকবর শাহের বিশ্বস্ত বন্ধু আবাদ খানের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ জানুয়ারী তিনি ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হন। পাঠান বীমা এজেন্ট 'জিয়াউদ্দিন' ছদ্মনামে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে ইতালীয় অভিজাত 'কাউন্ট অরল্যান্ডো মাজোটা' ছদ্মনামের পাসপোর্টে তিনি মস্কো যান। মস্কো থেকে রোম এবং রোম থেকে ২৮ মে জার্মানীতে। জার্মানীতে তার আগমনের সংবাদ কিছুদিন চেপে রাখা হয়। সুভাষ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় জার্মান ফরেন অফিসের উপর। কলকাতায় যুদ্ধ-পূর্ব জার্মান কন্স্যুলেট জেনারেল অফিস এবং কাবুল প্রতিনিধির মাধ্যমে জার্মান ফরেন অফিস এ ভারতীয় নেতার রাজনৈতিক মর্যাদা এবং পটভূমি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। তিনি ইচ্ছানুযায়ী বার্লিনে আজাদ হিন্দ রেডিও স্থাপন করা হয়। তাছাড়া, তিনি জার্মানীর হাতে বন্দী সাড়ে ৪ হাজার ভারতীয় সৈন্য

www.pathagar.com

নিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের নিউক্লিয়াসও গঠন করেন। ওয়াফেন-এসএস'র সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সংযুক্ত করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

১৯৪১ সালে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাত্মক হামলা শুরু করলে সুভাষ বসু মর্মাহত হন এবং জার্মানী ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। জার্মান ইউ-বোট 'ইউ-১৮০' তাকে উত্তমাশা অন্তরীপের কোথাও নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে তিনি আরেকটি জাপানী ডুবোজাহাজ '১-২৯'-এ আরোহন করে টোকিওতে গিয়ে পৌছান। বিশ্বে কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে এক দেশের নৌ- বাহিনীর সাবমেরিন থেকে আরেক দেশের নৌ-বাহিনীর সাবমেরিনে স্থানান্তর করার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। এক সময় জাপান থেকে সিঙ্গাপুর এসে সুভাষ বসু ৮৫,০০০ সৈন্যের পূর্ণাঙ্গ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তার বাহিনীতে মহিলা ইউনিটও ছিল। মহিলা ইউনিটের নামকরণ করা হয় ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের নামে। অতুলনীয় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অকুতোভয় সৈন্যরা লড়াই করতে করতে ভারতের মনিপুর পর্যন্ত এসে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণ সবকিছু পাল্টে দেয়। জাপান আত্মসমর্পণ করে। জাপানের আত্মসমর্পণের কয়েক দিন আগে ভারতের এ মহান বীর সন্তান সুভাষ বসু রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এ রহস্যের জট পরে আর কোনোদিন খুলেনি।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com